বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস

(*Bangla Goyenda Sahityer Ouponibeshik Pragitihas*)

Thesis submitted for
the Degree of Doctor of Philosophy
at Jadavpur University, Kolkata

By
Anirban Mondal

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC)
R-1 Baishnabghata Patuli Township
Kolkata 700094

Jadavpur University
Kolkata 700032

2025

Certified that the Thesis entitled

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস *(Bangla Goyenda Sahityer Ouponibeshik Pragitihas)*
submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of
Professor Dr. Rosinka Chaudhuri.
And neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor
Professor
CENTRE FOR STUDIES IN
SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA

Dated: 18/08/25

Signature of the Candidate
[ANIRBAN MONDAL]

Dated: 18/8/2025

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সময়টা ২০০৪-০৫, প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস বিভাগের পড়ুয়াদের সেমিনার। জীবনে প্রথমবার সেই সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের নাম ছিল ‘ব্যোমকেশ ও ফেলুদার কলকাতা’। আজ জীবন যখন চলে গেছে কুড়ি বছরের পার, তখন সেই প্রবন্ধের স্মৃতির আলোয় এই গবেষণা-সন্দর্ভকে বিচার করলে একটা দীর্ঘ পথের হদিশ পাওয়া যায়। সেই পথ ধরে যে এই গবেষণাপত্রটি লিখে ওঠা গেল, তার জন্য অনেক ব্যক্তির প্রতি ঋণ জমে গেছে। সেই ঋণ-স্বীকৃতিই প্রমাণ যে, আদতে সব গবেষণাই হয়ত ব্যক্তির বকলমে সমষ্টির উদ্যোগ-ভাবনা-স্বপ্ন-আশা পূরণের উপায়।

প্রথমেই বলা দরকার, এই গবেষণার কাজটি সম্ভবত সেন্টার ফর স্টাডিজ় ইন সোশাল সায়েন্সেজ়, কলকাতা ছাড়া আর কোথাও সম্ভব হত না। সেন্টারের আবহে এমন এক নিশ্চিন্ততার ভাব আছে যা দুর্লভ। ২০০৮ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানে সবসময়েই নিজেকে গড়ে-পিটে যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক রোসিঙ্কা চৌধুরির তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে এই কাজটি শেষ হত না। ওঁর বিভিন্ন প্রশাসনিক ও বিদ্যায়তনিক কাজ, গবেষণা— সমস্ত কিছুর পরেও যে নিবিড় পাঠে তিনি প্রতিটি বাক্য খুঁটিয়ে বিচার করেছেন, শুধরে দিয়েছেন, মতামত দিয়েছেন, সময় দিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পুরোটাই এত দ্রুত ঘটেছে যে তা বিস্ময়কর। ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ঋণ জীবনব্যাপী অপরিশোধ্য থাকবে।

অধ্যাপক অনির্বাণ দাশ সবসময়ে পরামর্শ দিয়েছেন। তার বাইরে, সেন্টারে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভুল শুধরে দিয়েছেন অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সে এক মস্ত পাওনা। নগণ্য এক ছাত্রের গবেষণার পরিকল্পনা ধৈর্য্য নিয়ে তিনি শুনেছেন ও সূত্রের হদিশ দিয়ে, ভাবনার আলগা দিকগুলো চিহ্নিত করে প্রথমেই গভীরে ভাবতে শিখিয়েছেন। সেন্টারের সমস্ত অধ্যাপক এবং গ্রন্থাগারিক ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং পিএইচডি দফতরের সকলে সবসময়েই সহায়তা করেছেন। বস্তুত ওঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা শেষ করা সম্ভব হত না।

২০০৮ সালে আরটিপি কোর্সের জন্য যখন সেন্টারে যাওয়ার শুরু তখন সেখানে যে বিদ্যাবত্তার সমাবেশ ছিল তা বিস্ময়কর। মাস্টারমশাই গৌতম ভদ্রর থেকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিস্তর তিরস্কার জুটেছিল, সঙ্গে ছিল গভীর শিক্ষাও। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী গুহ ঠাকুরতা, জানকী নায়ার, সুগত মারজিৎ, মানবী মজুমদার, কেয়া দাশগুপ্ত, প্রিয়া সঙ্গমেশ্বরন, প্রয়াত প্রদীপ বসু, প্রয়াত অঞ্জন ঘোষ, বোধিসত্ত্ব কর, রাজিউদ্দিন আকিল, ও

পরবর্তীকালে প্রাচী দেশপাণ্ডে, রাজর্ষি ঘোষ প্রমুখের কাছে লেখাপড়া করা ও নানান বিষয়ে আলোচনার সুযোগ ঋদ্ধ করেছে।

সদ্য স্কুল পেরোনো ছাত্রকে যথোচিত অভিভাবকত্বে জ্ঞানচর্চার বড় জগতে ডেকে নিয়েছিলেন যে অধ্যাপকরা, তাঁদের প্রতিও অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। প্রেসিডেন্সি কলেজ (২০০৩-'০৬) ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (২০০৬-'০৮) ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকদের থেকেই ইতিহাসের প্রাথমিক পাঠ এসেছিল। সেই ভিতের উপরেই এই গবেষণা সন্দর্ভ দাঁড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গত, সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক শ্রীরজতকান্ত রায়ের পুণ্যস্মৃতির প্রতি আনত প্রণাম। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা খোঁজ নিয়েছেন, গবেষণা শুরু ও শেষ করার জন্য তাগাদা দিয়েছেন, বইপত্র জুগিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হিমাদ্রিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিরিণ মাসুদ, পরিমল ঘোষ, প্রয়াত অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, ইষিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দক সেনগুপ্ত, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী, কুণাল চট্টোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা রায়, জয়ন্ত সেনগুপ্ত, তরুণ পাইন, অরিন্দম দাশগুপ্ত, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিনী জানা, সৌভিক নাহা, মণিকর্ণিকা দত্ত, মেরুনা মুর্মু, অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যেন পাল, সুস্নাত চৌধুরী, বরুণ চট্টোপাধ্যায়, পৌলমী গুহ বিশ্বাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, তিস্তা দাস, স্বাতী চ্যাটার্জি, প্রত্যয় নাথ, শৌভিক মুখোপাধ্যায়, ধীমান বসু, অভীক মজুমদার, প্রয়াত শ্রীমতী প্রতিমা মজুমদার, ঋত্বিক মল্লিক, প্রীতম মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণাভ বালা, অনির্বাণ দাস প্রমুখ। প্রসঙ্গত, অনুষ্টুপ ও আলোচনা চক্র পত্রিকাদুটির সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে অনিল আচার্য ও চিরঞ্জীব শূর ওঁদের পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ দিয়ে বাধিত করেছেন।

ব্যক্তিগত পরিসরে যাঁরা সবসময়ে ভরসা জুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে পার্থ মুখার্জি, রোমিলা ধর, জিনিয়া রায়, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, অভিষেক ঘোষাল, নীলাঞ্জন পাণ্ডে, রূপাঞ্জনা সিনহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পিনাকী ভট্টাচার্য ও সব সহকর্মীদের এই অবকাশে ধন্যবাদ জানানো দরকার। ওঁদের সহযোগিতা ছাড়া জীবিকা রক্ষা করেও গবেষণা চালানো সম্ভব হত না। এমন সহমর্মী সহকর্মী বড়ই দুর্লভ। ২০১৪ সালের এক ঘরোয়া আলোচনায় শার্লক হোমস নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়া গিয়েছিল। এই গবেষণার পথে সেটি দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল। ঐ সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ। বিশেষত, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঘোষের কথা উল্লেখ্য। বিভিন্ন সময়ে নানান ভাবনা-চিন্তা গ্রহণ-বর্জনের যে পরিসর ওঁর থেকে পেয়েছি, তা ঋদ্ধ করেছে। করোনার অভিঘাত থেকে বেঁচে গিয়ে গবেষণাটি যে শেষ করা গেল তার জন্য সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষাণ দত্তকে প্রভূত কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, পরিবারে ফিরে আসতে হবে। পারিবারিক জীবনে সমস্ত ভার গ্রহণ করে তাঁরা কেবলই লেখাপড়ার অবকাশ তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অপরিশোধ্য। মা গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত, আগাথা ক্রিস্টির পাঠক। হয়ত ওঁর সুবাদেই সেই শিশু বয়সেই এই নিয়ে মনের গহনে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। বাবা-মা ও পিতৃপরিবারের সকলে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন যে কবে গবেষণার মূল লেখাটি শেষ হবে। কেবল শেষ হওয়ার আগেই

শ্রীমতী মোক্ষদা মণ্ডলের প্রয়াণ যে শূন্যতা তৈরি করে দিল তা পূর্ণ হবে না। শ্রীমতী শিখা ভট্টাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। বাকি থেকে গেল যে দুজন— সৌমী ভট্টাচার্য ও অম্ভৃণী— তাদের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই গবেষণার জন্য সবথেকে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে তাঁরাই, সেই ত্যাগ— সময়। সময়ের থেকে বেশি মূল্যবান আর কী-ই-বা হতে পারে। সৌমী সেই সময় দিয়েছেন, কিন্তু গবেষক নিজের ব্যস্ততায় সময় ফেরত দিতে পারেনি। আর অম্ভৃণী যে কত খেলার সময় ত্যাগ করেছে তা অভাবনীয়। সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ না-করে সে গবেষণার অবকাশ জুগিয়ে গেছে। একদিন হয়ত সে বুঝবে তার মজার সময়ের ঝুলি থেকে একটু করে মুহূর্ত নিয়ে এই গবেষক যে সন্দর্ভ রচনা করেছিল, তাতে তার ছোটোবেলাটিও বাঁধা পড়েছে। তখন হয়ত সে আজকের সময়-চুরির অপরাধ মার্জনা করতে পারবে, এবং তার দাদাভাই আলেখ্যকে জুটিয়ে গোয়েন্দা গল্পে মজে যাবে।

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা—
‘সাহিত্যে খুন’ :
বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক আবহ **পৃ. ১**

প্রথম অধ্যায়—
ইঙ্গ গোয়েন্দার বঙ্গযোগ :
ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত **পৃ. ৫২**

দ্বিতীয় অধ্যায়—
‘অন্ধকার’ ব্রিটেন ও ‘ছায়া কালো কালো’ :
নেশা, ষড়যন্ত্র ও ‘অপরাধী’ নির্মাণের মতাদর্শ **পৃ. ৮৮**

তৃতীয় অধ্যায়—
‘অপরাধী’র বঙ্গযাত্রা :
বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ‘অপরাধী’ নির্মাণের ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব **পৃ. ১২৭**

চতুর্থ অধ্যায়—
‘সত্য’ অন্বেষীর বঙ্গ-বিজয় :
‘ক্লু’-র ‘সত্য’মূল্য ও গোয়েন্দা পরিচয় নির্মাণের ঔপনিবেশিক আবহ **পৃ.১৬৭**

পঞ্চম অধ্যায়—
গোয়েন্দায় ‘গেল!’ রব :
বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর মুদ্রিত জনজীবন **পৃ. ২২০**

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী **পৃ. ২৪৭**

উপক্রমণিকা

‘সাহিত্যে খুন’

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক আবহ

খুনের নাম শুনিলেই লোক শিহরিয়া উঠে। কলিকাতায় যে সকল খুন হয়, লোকে তাহা কি প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকে? না দেখিলেও হত্যাকাণ্ড শুনিলেই মনে মনে তাহার চিত্র অঙ্কিত হয়, কল্পনা রক্তারক্তি মনে চিত্রিত করিয়া দেয়! শিশুহত্যা, নারীহত্যা, স্বামিহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যার নাম শুনিলেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। লোক স্বচক্ষে যেন সেই হত্যাকাণ্ড জাজ্বল্যমান দেখিতে থাকে। সুতরাং… প্রকাশ্যরূপে সেই খুন দেখান বা না দেখান, উভয়ই সমান কুফল প্রসব করিয়া থাকে।… ইংরাজীর অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার দোষ গ্রহণে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।… সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি স্বদেশীয় রত্নরাজি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় বর্বরতার একশেষ রক্তারক্তিতে হাত কলুষিত করি কেন?

— পূর্ণচন্দ্র বসু[1]

আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গদেশে যাঁহারা পুস্তক কিনিয়া পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকের একার অভাব, … যে-সকল গল্প জাল জুয়াচুরি, খুন আত্মহত্যা, ব্যভিচার চুরি, ডাকাতি, ইত্যাদির বিবরণে পূর্ণ, যে সকল গল্পের ঘটনায় স্বাভাবিকতার লেশমাত্র নাই; যথায় অদ্ভুতকর্মা দৈব সহায় সম্পন্ন ডিটেক্‌টিভ অসম্ভব রকমের স্থূলবুদ্ধি চোরের পশ্চাতে দৌড়াইয়া হয়রান হইতেছে, সেই সকল গল্পের পুস্তক বাজারে পড়িতেও পাইতেছে না।

— নলিনীকান্ত ভট্টশালী[2]

ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে— যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য। আমি তাহা মনে করি না। Edgar Allan Poe, Conan Doyle, G. K. Chesterton যাহা লিখিতে পারেন, তাহা লিখিতে অন্তত আমার লজ্জা নাই।

— শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়[3]

---

[1] পূর্ণচন্দ্র বসু, ‘সাহিত্যে খুন’, সমালোচনা-সাহিত্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ), পৃ. ৯৮-৯৯। মূল প্রবন্ধটি ১৩০২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

[2] নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ‘বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রগল্প’, ভারত-মহিলা, ৬ষ্ঠ ভাগ, দশম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৪-২৯৫। মূল প্রবন্ধটি ১৩১৭ বঙ্গাব্দে ৬ষ্ঠ ভাগ অষ্টম সংখ্যায় শুরু হয়ে ঐ সনেই চৈত্রে প্রকাশিত দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শুরুতে প্রবন্ধটির নাম ছিল ‘বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প’। কেবল একটি সংখ্যাতেই সেই শিরোনামে ছোটগল্প-র বদলে ক্ষুদ্রগল্প ছাপা হয়েছিল। উদ্ধৃতটি সেই সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে ঐ নির্দিষ্ট শিরোনামটিই উল্লিখিত হল।

[3] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ভূমিকা’, ব্যোমকেশের ডায়েরী (কলকাতা: গুরুদাস চট্টাপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৪০। এখানে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে, ব্যোমকেশ সমগ্র, (কলকাতা : আনন্দ, ২০০৭ [১৯৯৫]), পৃ. ১০০৫।

আলোয়ানটা রোমান কায়দায় গায়ে ফেলে তক্তোপোসে সটান বসে ফেলুদার দিকে একটা বড়ো খাতা এগিয়ে দিয়ে সিধুজ্যাঠা বললেন— "পড়ে দেখো ফেলুমাস্টার। তোমার অনুযোগ ছিল, আমি কেবল পড়ি; লিখি না কিছুই। তাই অবশেষে বাংলায় তোমাদের পেশার ইতিহাসের গোড়ার কথা লিখব ভেবেছি। এই তার খসড়া।" ইদানীং ফেলুদা ফি শনিবার সকাল-সকাল সিধুজ্যাঠার কাছে ঢুঁ মারে। ও বলে, "এই গুগলায়িত যুগে মোবাইল ঘেঁটে মহাকাশ থেকে পাতালের সব কথা জেনে ফেলা গেলেও, তাতে মানবিক স্পর্শ থাকে না। মানুষই যদি না-থাকল তাহলে আর তথ্য কী কাজে লাগবে! মানুষটার বয়স হয়েছে। তাই আজকাল ওঁর সঙ্গ আরও বেশি করে পেতে ইচ্ছে হয়। সারাদিন একলা ঐ বইয়ের ঘর আগলে আছেন। সিধুজ্যাঠার মত মানুষরা আজকাল জীবন্ত জীবাশ্ম হয়ে গেছেন।"

খাতার প্রথম পাতায় বড় হরফে লেখা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস। ফেলুদা বলল, "বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজি গোয়েন্দা আখ্যানের পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে 'অপরাধ', 'অপরাধী', 'গোয়েন্দা' প্রভৃতি ধারণার বিকাশ, এবং ঔপনিবেশিক বাংলার বৌদ্ধিক পরিসরে সেসবের প্রতিফলন কেমন ভাবে পড়েছিল তার ইতিহাস নিয়ে আপনিতো অনেকদিন ধরেই ভাবছেন, তাই না?" সিধু জ্যাঠার ঠোঁটে আলতো হাসির রেখা ফুটল— "ভাবছিলাম, কিন্তু লিখছিলাম না। এখনতো আর সক্রেটিসের যুগ নেই, যে আমি ভাবব, বলব আর অন্যে লিখে নেবে। নিজের ভাবনা নিজেকেই টুকে রাখতে হয়। তাই ইদানীং ভাবনাগুলোকে একটু গুছিয়ে খসড়া করেছি। দেখো কেমন হচ্ছে, তোমার মতামত পেলে ভরসা পাবো।"

ফেলুদা খাতায় মন দিলো। সিধুজ্যাঠা বলে চলেছেন: "বুঝলে ফেলু, গোয়েন্দা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুনে ভুরু কুঁচকোবেন অনেকেই। তবু অনেকদিন থেকেই জরুরি মনে হচ্ছে বিষয়টা। হরেক রকম মানুষের প্রবৃত্তির ভিন্নতাকে উপজীব্য করে যে বিস্তারে গোয়েন্দা সাজান তাঁর যুক্তিক্রম, তাকে পুরো অবহেলা করা যায় না যেন। বিশেষতঃ আজকের সময়-বাস্তবতায় ক্রমশঃ রূপান্তরিত মানবসত্তার গতিকে যেন একদিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করা যেতে পারে গোয়েন্দা সাহিত্যের যুক্তিক্রম দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই, এই বুঝতে চাওয়ার প্রয়োজনেই নানাভাবে ভেঙেচুরে কখনওবা ছক বদলে সাজিয়ে নিতে হবে গোয়েন্দার যুক্তিকেও, কারণ সেই যুক্তির আছে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা। সীমাবদ্ধতাগুলি বুঝে সেই যুক্তিক্রমগুলিকেই উল্টো করে ব্যবহার করলেই কি পৌঁছে যাওয়া যাবে এক ভিন্নতর বাস্তবতায়? বলতে পারা যাবে কি যে, মাথায় ভর করে দাঁড়ানো যুক্তিক্রমকে পায়ে ভর করিয়ে দাঁড় করালেই যুক্তির আয়নায় প্রতিবিম্ব ভিন্ন হয়? সেসবই ভেঙে ভেঙে দেখার চেষ্টায় এই লেখার উদ্যোগ।"

ফেলুদা বলল, "ইদানীং শার্লক হোমস নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে সেতো জানেনই। লন্ডনে গিয়ে বেকার স্ট্রিটে হাজির হয়েছিলাম শুধু ঐ নামের টানেই। ওখান থেকেইতো যাত্রা শুরু।" সিধু জ্যাঠা বললেন, "আমরা একদা ব্রিটিশ উপনিবেশের মানুষ বলেই আমাদের গোয়েন্দা সাহিত্য-চর্চার মনু হয়ে উঠেছেন হোমস। কিন্তু এখনতো মন্বন্তর বিচার করারও সময় এসেছে। হুবহু হোমসের ছায়া হয়েই কী ছিল বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা? হোমসের

উপরেও কী নেই ভারতীয় উপনিবেশের ছায়া? উপনিবেশের অভিজ্ঞতা ছাড়া আদৌ কি ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনী দু-পায়ে দাঁড়াতে পারত? পাঁচকড়ি দে শার্লক হোমসকে বাঙালী পোশাকে গোবিন্দরাম (১৯০৫) করে তুলেছিলেন।[4] কিন্তু, কেবল পরশুরাম জানতেন যে হোমস সশরীরে একবার বঙ্গে এসেছিলেন। পরশুরাম হোমস নিয়ে দুটো লেখা লিখেছেন। একটা 'সরলাক্ষ হোম' (১৩৬০)। সরলাক্ষ হোম নামটা শার্লক হোমস অনুপ্রাস মিলিয়ে করা। হোমের পেশাও গোয়েন্দাগিরি। তার সহকারী বটুক সেন। ওয়াটসন এর উচ্চারণের সঙ্গে মিলটা লক্ষণীয়। দ্বিতীয় গল্পটা 'নীল তারা' (১৩৬১)।[5] সেই গল্পে রাখাল মাস্টারের বাবার কবিরাজী পেশার কথা বলা হয়েছে। সেই থেকেই রাখালের পর্যবেক্ষণ শক্তির চর্চা। ডয়েল তাঁর শিক্ষক জোসেফ বেল ধরে হোমস চরিত্র বানান। বেলও ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও তার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি যুক্ত করার বিষয়টা খেয়াল করার মতো। হোমস এমনিতে মনে হয় যেন উন্নাসিক। বিশেষত, পূর্ববর্তী গোয়েন্দা চরিত্র আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশগোয়েন্দাদের নিয়েও হোমস ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু রাখাল মাস্টার সম্বন্ধে হোমস তেমন করেননি। বরং নিজের মতোই বুদ্ধিমান বলেছেন। আসলে কী জানো ফেলু, পরশুরাম ব্রিটিশ কলোনির মানুষ। মেট্রোপোলের গোয়েন্দাকে কেন্দ্র করে গল্প বুনলেও, কলোনির একজন শিক্ষিত ব্যক্তিও যে মেট্রোপোলের মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হতে পারে, সেটাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর সব মিলিয়ে গোয়েন্দাগিরি পেশা নতুন হলেও, পর্যবেক্ষণ যে নতুন কিছু নয় বা পাশ্চাত্যের একচেটিয়া উদ্ভাবন নয়, সেটাই বলা হচ্ছে বকলমে। তাই গল্পে হোমস ওয়াটসনকে উদ্দেশ্য করে রাখাল মাস্টার সম্পর্কে বলেছে, "সায়েন্স অভ ডিডক্শন এই বেঙ্গলী জেন্টলম্যান ভালই জানেন"।"[6]

ফেলুদা বলল, "বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য নিয়ে যতটুকু আলোচনা হয়, সবক্ষেত্রেই এই কথাটা আসে যে ভারতীয় ঐতিহ্যে গোয়েন্দা কাহিনীর রেশ আগে প্রাক্-ঔপনিবেশিক বা বলা ভাল প্রাচীন আমল থেকেই ছিল। পরাশর বর্মার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রও বলেছেন যে, ক্রাইম থ্রিলার ব্যাপারটা আধুনিক যুগের ফসল বলে মনে হলেও, মধ্যযুগে আমাদের দেশে সংস্কৃতে যে দশকুমার চরিত লেখা হয়েছিল, তাকে ক্রাইম থ্রিলারের আদিরূপ বলা যেতে

---

[4] পাঁচকড়ি দে, গোবিন্দরাম (কলিকাতা : বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৫)। এই বইটি আর্থার কনান ডয়েলের দুটি কাহিনীর সমন্বয়ে লেখা। ডয়েলের নাম না-করলেও পাঁচকড়ি তাঁর 'বিজ্ঞাপনে' কথাটি জানিয়েছেন।

[5] রাজশেখর বসু (পরশুরাম), 'নীল তারা', পরশুরাম গল্পসমগ্র, দীপংকর বসু সম্পাদিত (কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৯২, অখণ্ড সংস্করণ), পৃ. ৫১১-৫১৮। 'নীলতারা' গল্পটা খুব অভিনব। কারণ, হোমস নিয়ে এই জাতীয় প্যাস্টিশ (pastiche) ধাঁচের গল্প ইংরেজিতে যা লেখা আছে, তা ১৮৯১-১৮৯৪-এর মধ্যে লেখা। কারণ, ঐ সময়ের কথা হোমস খুব সামান্য বলেছেন ওয়াটসনকে। তাই সেই প্রায় অজানা তিন বছর নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়। যদিও, তার একটায়ও ওয়াটসন নেই। কারণ, ওয়াটসন তখন লন্ডনে। কিন্তু, এখানেই 'নীল তারা' গল্পটার অভিনবত্ব, এখানে হোমস ও ওয়াটসন একসঙ্গে ভারতে এসেছে। অথচ, এমন কোনো সূত্রের উল্লেখ ওয়াটসন করেননি কখনও। ফলে হোমস-চর্চায় এটা একদম নতুন। পরশুরাম জানিয়েছেন, তখন ছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল। মানে, একদিকে ১৯০১-এর আগে হতে হবে, অন্যদিকে ১৮৮৬-র পরে হবে, কারণ তার আগে হোমসকে ওয়াটসন চিনতেন না। আবার ১৮৯১-১৮৯৪-এর মধ্যেও হবে না। কারণ তখন হোমস বেঁচে সেটা ওয়াটসন জানতেন না। তাই এটা ১৮৮৭-১৮৯১-এর ভেতরে হতে পারত, কিন্তু তা নয়। কারণ, গল্প শুরুই হচ্ছে এই বলে যে, বর্ণিত ঘটনাটি ষাট বছর আগের কথা। অর্থাৎ , ১৯৫৪ – ৬০= ১৮৯৪। ১৮৯৪-এ রোনাল্ড এডেয়ারের মামলায় হোমস আবার লন্ডনে ফিরছেন। তাহলে ধরতে হবে এরপরে হোমস ওয়াটসনকে নিয়ে ঐ বছর নাগাদই ভারতে এসেছিলেন। কারণ, অন্য কতগুলো সারকামস্টানসিয়াল রেফারেন্স পরশুরাম দিচ্ছেন, যেমন মোটর গাড়ি, বিজলী বাতির চল না-হওয়া, বা রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি না হওয়া।

[6] তদেব,পৃ. ৫১৩

পারে।[7] সুকুমার সেনের ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি বইতেও এমন একটা বক্তব্য আছে। তিনি ভাষাবিদ্ সাহিত্যবেত্তা। ফলে, ইন্দো-ইরানীয় অবেস্তা কিংবা ইন্দো-আর্য ঋগ্বেদ— সবক্ষেত্রেই তিনি 'ক্রাইম কাহিনী'র হদিশ পেয়েছিলেন।[8] কিন্তু, একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, আধুনিক পুঁজিবাদী বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক শ্রেণি-সংস্কৃতি ও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া কি প্রকৃত গোয়েন্দা কাহিনী লেখা সম্ভব?"[9]

"একেবারে গোড়া ধরে নাড়া দিলে যে ফেলু!" বললেন সিধু জ্যাঠা। "এই প্রশ্নটাই আমার ভাবনার ধরতাই। আর সেই কারণেই আমি শিরোনামে 'প্রাগিতিহাস' শব্দের ব্যবহার করেছি। 'প্রাক্' অর্থে এখানে শুরু সংক্রান্ত বা পূর্ববর্তী। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে যা লেখাপত্র সবই মোটামুটি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর থেকে শুরু হয়। আর নয়ত, সুকুমার সেনের মত অনেকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে তার ইতিহাস খোঁজেন।[10] এটা ঠিক যে, সেই প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সভ্যতায় শাসন ও ন্যায্যতা সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গেই অপরাধ সংঘটন, অপরাধী নির্ণয় ও তার বিচার তথা শাস্তির হরেক প্রকরণ নিয়ে নানান আলোচনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু, তার মানে এই নয়, যে কালিদাস ও ব্যোমকেশ বক্সী একই ধারার প্রতিনিধি। গোয়েন্দা কাহিনী বলতে আজ যা লেখা-পড়া-চর্চা হয়, সেটা আধুনিক ইউরোপীয় আধুনিকতার ফল। সেই আধুনিকতার ভিত্তি বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী চিন্তন, যার মূলে নিহিত আছে ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তির অচ্ছেদ্য অধিকারের ধারণা। সেই ধারণা ব্যতিরেকে আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনীর ভিত্তিই গড়ে উঠত না। ফলে, রহস্য সমাধান করলেও, কালিদাস কখনই ব্যোমকেশ বক্সীর সগোত্র নন। এইবারে লেখাটা পড়ো।"

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস : গবেষণার মূল প্রশ্নাবলী

১২৮৭ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই", কারণ "ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম"।[11] এই একই কথার হেরফের করে বলা যায়, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাস চাই। কারণ—আবারও

---

[7] প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'রহস্য কাহিনীর পটভূমি ও পরাশর রহস্য', বিভাব, বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা— ৩৬, ধরণী ঘোষ ও সিদ্ধার্থ ঘোষ সম্পা, গ্রীষ্ম, ১৩৯৪, পৃ. ৫০

[8] সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি (কলকাতা : আনন্দ, ২০১২ [১৯৮৮]), পৃ. ১২-১৪

[9] অবশ্য সুকুমার সেন এটাও বলেছিলেন যে, আধুনিক "পুলিশী ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে লেখা কোনো গোয়েন্দা-কাহিনী জাতীয় রচনাকে আধুনিক অর্থে ডিটেকটিভ কাহিনী বলতে পারি না।"। দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ. ১৪৬

[10] তদেব, পৃ ১১-৪৩। প্রসঙ্গত, প্রাচীন সাহিত্যিক কালিদাসকে মুখ্য চরিত্র করে বেশকিছু গোয়েন্দা গল্প লিখেছিলেন সুকুমার সেন। চলিত ভাষায় লেখা গল্পগুলির সময়কাল খ্রিস্টীয় প্রথম দুই শতক। দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, গল্প সংগ্রহ (কলকাতা : আনন্দ, ২০০৯)

[11] রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ) লিখেছিলেন বঙ্কিম। দ্রষ্টব্য: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১৭), পৃ. ২৯০-২৯৩

বঙ্কিমী লব্জে বলা যায়— তার মধ্যে মিশে আছে "প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস"। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯৪৭)[12]-এর দারোগার দপ্তর-এর প্রথম কিস্তি থেকে সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)-এর 'রবার্টসনের রুবি' গল্পের রচনাকাল পর্যন্ত ধরলে বাংলায় গোয়েন্দা গল্পের পাক্কা একটি শতাব্দের হিসেব পাওয়া যায়। ১৮৯১ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২১৭ কিস্তিতে দারোগার দপ্তর লিখেছিলেন প্রিয়নাথ। সত্যজিতের খসড়ার সন-তারিখ ধরলে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল 'রবার্টসনের রুবি'। এই একশ বছরে জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যের নিরিখে গোয়েন্দা গল্পের গতি অপ্রতিহত হলেও, মননশীল আলোচনা ও গভীরতর বিশ্লেষণ-চর্চায় তার তেমন কল্কে জোটেনি। আলোচনা যা হয়েছে তাও টুকরো-টুকরো, কখনও নেহাতই পাঠ প্রতিক্রিয়া ও স্মৃতিচারণসুলভ, কখনও ভক্ত পাঠকের নৈবেদ্য।[13]

কিন্তু যেটা একেবারেই বিশেষ আলোচনায় আসেনি তা হল— ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ও ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদের আদিপর্বে রহস্য-রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে মাতৃরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন এবং বঙ্গীয় উপনিবেশ কীভাবে এক অচ্ছেদ্য গাঁটছড়ায় জুড়ে ছিল? উপনিবেশের অভিজ্ঞতা মাতৃরাষ্ট্রের সমাজে ও সাহিত্যে পুলিশ ও গোয়েন্দা চরিত্রদুটিকে কীভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল? ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর আদিপর্ব থেকে কীভাবে উপনিবেশের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করেছিল গোয়েন্দাপ্রবর এবং 'অপরাধী' চরিত্রের ছাঁচ তৈরিতে উপনিবেশের ভূমিকা কী ছিল? ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে দেশীয় সমাজে সেই 'অপরাধ', 'অপরাধী', 'শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া' ও 'শাস্তিবিধান'-এর নানান ধারণাগত প্রতর্ক গড়ে উঠেছিল (যার বনিয়াদের উপরে ভর করেই পল্লবিত হয়েছিল বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য)? বস্তুত, এই প্রশ্নগুলিই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল তাত্ত্বিক ধরতাই।

কিন্তু, গোয়েন্দা সাহিত্য কী ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হতে পারে? এদেশে নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭) কিংবা বিদেশে এডমন্ড উইলসন (১৮৯৫-১৯৭২) প্রমুখ বিশুদ্ধতাবাদী উচ্চকোটির পাঠক-সমালোচকেরা গোয়েন্দা কাহিনীকে গুরুত্ব দিতে নারাজ হলেও, বাংলার পাঁচকড়ি দে বা বিলেতের আগাথা ক্রিস্টি প্রমুখের বইয়ের বিক্রির খতিয়ান দেখলেই বোঝা যায় গোয়েন্দা কাহিনী এমন একটি সাংস্কৃতিক পণ্য যার সমতুল্য

---

[12] প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু ওঁর মৃত্যু সন নিয়ে বিতর্ক আছে। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান ও তার মূল সূত্র শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত জীবনীকোষ অনুসারে প্রিয়নাথের জীবনাবসান হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত গিরিশচন্দ্র বসু রচিত সেকালের দারোগার কাহিনী বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (জানুয়ারি, ১৯৮৩) 'ভূমিকা' বলা আছে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নাথের লেখা আত্মজীবনী তেত্রিশ বৎসরের পুলিশ কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী প্রকাশিত হয়। আবার বঙ্গসাহিত্যাভিধান-এ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে প্রিয়নাথ মারা যান ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু অন্যদিকে সুকুমার সেন ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি-তে জানিয়েছেন ওঁর মৃত্যু সন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

[13] এমন কয়েকটি বইয়ের নাম হিসাবে বলা যায়— কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্যুপাঁ থেকে ব্যোমকেশ (কলকাতা, ১৯৭২); মঞ্জুরে মওলা, পড়তে চাই গোয়েন্দা গল্প (ঢাকা, ১৯৯৩)।

জনপ্রিয় সাহিত্য বাজারে বিরল।[14] বস্তুত, পৃথিবীর জনপ্রিয় গোয়েন্দারা রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষের মতোই হয়ে উঠেছে। শার্লক হোমস চরিত্রটি এমন এক সাংস্কৃতিক মিথে পরিণত হয়েছে যে, জীবদ্দশাতেই তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং কনান ডয়েল।[15] ক্রিস্টি-কৃত বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা এ্যরকুল পোয়ারোর মৃত্যুতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ অগাস্ট স্মরণিকা ছাপা হয়েছিল *The New York Times* সংবাদপত্রে।[16] কিন্তু, সমস্যার বিষয় হল যে, পশ্চিম ইওরোপের একটি বিশেষ কালপর্বে উদ্ভূত এই ধরনের আবিশ্ব জনপ্রিয় একটি সাহিত্যধারার আদিপর্বের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সমাজ-বাস্তবতার সম্পর্ক বিচার করে সামাজিক ইতিহাসের গবেষণা-প্রণালী কী হবে? বস্তুত, এহেন 'জনপ্রিয়' অর্থাৎ 'পপুলার' সাংস্কৃতিক ধারা সম্পর্কে গবেষণার বিষয়ে অনেক সময়েই বিদ্যায়তনিক পরিসরে বিতর্ক তৈরি হয়। বস্তুত, যে-কোনো গণভোগ্য জনপ্রিয় সংস্কৃতির গবেষণাতেই সেই সমস্যা নিহিত থাকতে পারে, বিশেষত যদি সে সম্পর্কে আর্কাইভ অর্থাৎ মহাফেজখানায় যথেষ্ট পরিমাণে নথিপত্র সংরক্ষিত না-থাকে তাহলে ঐতিহাসিক মহলে সেই গবেষণার মান্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়।[17]

বস্তুত, সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও, গোয়েন্দা কাহিনী এমন এক সাংস্কৃতিক পণ্য, যার উদ্ভব পুঁজিবাদের জঠর থেকে। পুঁজিবাদী সমাজে গণ-নাগরিক পরিসরের বিকাশ ও গোয়েন্দা কাহিনীর প্রসার অঙ্গাঙ্গি জড়িত। সেই বিচারে উনিশ শতকে বঙ্গীয় নাগরিক সমাজে ঔপনিবেশিকতার চিহ্নধারী বিভিন্ন পণ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, যেমন— ঘড়ি, ফাউন্টেন কলম, কলমের কালি, নানা রকমের সালসা, রবার স্ট্যাম্প, সুগন্ধী তেল, সাবান, ফুটবল। সেই জনপ্রিয়করণে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা ছিল প্রবল, সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই ছিল নানান চালু বা অভিনব বৈজ্ঞানিক লব্জ।

---

[14] বিশিষ্ট মার্কিন সাহিত্য সমালোচক এডমন্ড উইলসন *The New Yorker* পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধে গোয়েন্দা কাহিনীকে নাকচই করে দিয়েছিলেন। শার্লক হোমসের কাহিনী অল্প-বিস্তর পড়লেও, তার পরবর্তীকালে বিশেষ গোয়েন্দা কাহিনী তিনি পড়েননি বলেই জানিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মতে সেগুলি পাঠযোগ্য সাহিত্য নয়। বিশেষত আগাথা ক্রিস্টির উপরে তিনি সাংঘাতিক চটেছিলেন, প্রায় অপাঠ্যই মনে করেছেন ক্রিস্টি-কাহিনীগুলি। প্রবন্ধদুটি দু-কিস্তিতে রচিত নয়, তিন মাসের ব্যবধানে লেখা। প্রথমটি "Why do people read Detective Stories?" (October 14, 1944), দ্বিতীয়টি "Who cares who killed Roger Ackroyd?" (January 20, 1945). দুটি শিরোনামেই প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহারটি লক্ষণীয়। সূত্র: http://www.crazyoik.co.uk/workshop/edmund_wilson_on_crime_fiction.htm

[15] প্রসঙ্গত, জুলিয়ান সাইমন্স বলেছেন যে: "Sherlock Holmes became a myth so potent that even in his own lifetime Doyle was almost swamped by it, and the myth is not less potent today. Criminal and emotional problems are still addressed to Holmes for solution, and pilgrimages are made to his rooms at 2218 Baker Street. দ্রষ্টব্য: Julian Symons, *Bloody Murder — From the Detective Story to the Crime Novel : A History* (London : Faber & Faber, 1972), পৃ. ৭৮

[16] সেই Obituary বা স্মরণিকাটির সূত্র: https://www.nytimes.com/1975/08/06/archives/hercule-poirot-is-dead-famed-belgian-detective-hercule-poirot-the.html

[17] কার্লো গিন্‌সবার্গ তাঁর অনন্য গবেষণা গ্রন্থ *The Cheese and the Worms* বইয়ের ইতালীয় সংস্করণে ইতরজনের সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিক ঐতিহাসিক গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। গিন্‌সবার্গের মূল বইটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ও তার ইংরেজি তরজমা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য: Carlo Ginzburg, *The Cheese and the Worms : The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller*, Translated by John and Anne C. Tedeschi (Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2013 [1980]), ePub সংস্করণ

তেমনই একটি পণ্য ছিল ডিটেকটিভ উপন্যাস বা গোয়েন্দা কাহিনী, যার বিজ্ঞাপনে ভরে থাকত ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন গণজ্ঞাপন মাধ্যম।[18]

প্রকৃতপক্ষে, নৃতত্ত্বের বিচারে 'গণ সংস্কৃতি' বলতে সমাজের লোকজ-দেশজ উপাদান-সঞ্জাত সাংস্কৃতিক উপকরণসমূহ বোঝায়, যেগুলি গণ বা লোকেরা নিজেদের আত্মপ্রকাশের গরজেই সৃষ্টি করে চলে। কিন্তু, গোয়েন্দা কাহিনী সেই অর্থে ঔপনিবেশিক বাংলায় দেশজ নয়। বরং, এক্ষেত্রে গোয়েন্দা আখ্যানগুলি এক মধ্যবর্তিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য-প্রসূত ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও দেশজ নানান সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছিল— কখনও তার বাহ্য যুক্তি ছিল আইনের শাসন, কখনও-বা সামাজিক ঐতিহ্য বা দেশীয়তা। উপরন্তু, গোয়েন্দা কাহিনীগুলির লেখক বা উৎপাদকের সংখ্যা ছিল সীমিত, কিন্তু ভোক্তা পাঠকের সংখ্যা ছিল বিপুল; কিন্তু সেই বিরাট পাঠককুল ঐ সাংস্কৃতিক উৎপাদনের পরোক্ষ গ্রাহক বৈ প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত ছিল না। সেই বিচারে গোয়েন্দা কাহিনীকে জনপ্রিয় গণভোগ্য সংস্কৃতি বলা হচ্ছে এই দিক থেকে যে, তা বহু সংখ্যক ভোক্তা কেনে ও উপভোগ করে।[19]

ঘটনাচক্রে, উনিশ শতকী বাংলায় জনপ্রিয় সংস্কৃতির নানান অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর ইতিহাস সেভাবে চর্চিত হয়নি। বস্তুত, ইওরোপীয় আধুনিকতার ঔপনিবেশিক ছাঁচে-ঢালা দেশীয় সমাজের ইংরেজি শিক্ষিত অংশে 'জনপ্রিয় উপন্যাস'-এর প্রতি একটা উন্নাসিক মনোভাব বেশ প্রকট ছিল।[20] তার একটা বড় কারণ ছিল সেগুলিতে রহস্য-রোমাঞ্চ-যৌনতা-বীভৎসতা প্রভৃতি নানান বিষয়বস্তুর একত্র সমাবেশ। সেই বিষয়গুলিই উন্নত বা অধঃপতিত রুচি এবং আভিজাত্য ও গণভোগ্যতার সাংস্কৃতিক উচ্চাবচতার চিহ্ন বলে গণ্য হত। সেই মনোভাবই পূর্ণচন্দ্র বসু কিংবা নলিনীকান্ত ভট্টশালীর লেখায় যেমন পাওয়া যায়, তেমনই গোয়েন্দা গল্পের বই মলাট দিয়ে পড়ার স্মৃতিও সেই একই সামাজিক মনোভঙ্গির প্রতিফলন। বস্তুত, ঔপনিবেশিক বাংলায় রুচিমানতার উচ্চাবচতার লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কে আগ্রহ। গোয়েন্দা গল্পও যে 'সৎ' সাহিত্য সেটি প্রতিষ্ঠা করতে লেখক-প্রকাশকের রীতিমত ময়দানে নামতে হয়েছিল।

বস্তুত, সাহিত্যের মূল কাজ কী এবং পাঠকের উপরে তার নৈতিকতার প্রভাব কী হওয়া উচিত— এই নিয়ে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয় বলেই, অনেক সমালোচক গোয়েন্দা কাহিনীকে 'অ-সৎ' সাহিত্য মনে করেছেন, কারণ সেখানে আদতে একই কাঠামোকে নাম-ধাম-ঘটনার পট বদলে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যেমনটা যেকোনো জনপ্রিয়

---

18 উনিশ ও বিশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায় পঞ্জিকাগুলি এই বিষয়ে বিচিত্র সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার লক্ষণবাহী হরেক পণ্য— সে ঘড়ি কিংবা ফাউন্টেন কলম হোক বা নানা রকমের বলবর্ধক ও পুরুষত্ববর্ধক ওষুধ, সুগন্ধী তেল, সাবান, ফুটবল, ডিটেকটিভ উপন্যাস বা গোয়েন্দা কাহিনী সবেরই বিজ্ঞাপন পঞ্জিকায় ভরে থাকত। দ্রষ্টব্য: অসিত পাল, আদি পঞ্জিকা দর্পণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস— আনন্দ, ২০১৮), পৃ. ৯৫-২৯১

19 Bob Ashley (ed.), *The Study of Popular Fiction: A Sourcebook* (London : Pinter Publishers, 1989), পৃ. ২

20 বস্তুত, 'জনপ্রিয় উপন্যাস' বা 'popular novel' অভিধার মধ্যেই একটি নেতিবাচক অনুষঙ্গ নিহিত আছে। যেন-বা সেগুলি প্রকৃত সমঝদার পাঠকের যোগ্য নয়, না-আছে সাহিত্য হিসাবে সেগুলির প্রসাদগুণ। সেই বিচারেই বাংলা ছোটগল্পের বিচার করতে গিয়ে নলিনীকান্তের উষ্মা গিয়ে পড়ে গোয়েন্দা কাহিনীর উপরে।

গণভোগ্য পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। ফলে, গোয়েন্দা কাহিনী পাঠককে আসলে কোনো বাস্তব বা দার্শনিক প্রশ্নের তথা সংকটের মুখে দাঁড় না-করিয়ে কতগুলি ছদ্ম ধাঁধা সমাধানের খেলায় মাতিয়ে রাখে।[21] প্রকৃতপক্ষে, পাঠযোগ্যতা ও রুচিমানতা তথা এই 'সৎ'-সাহিত্য বিতর্কটি আদতে চরিত্রের বিচারে রাজনৈতিক এবং তার মাধ্যমে শ্রেণি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বস্তুত, বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্যবাদী সমাজে সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার যে অনিবার্য সম্পর্ক নির্মাণ করা হয়, সেই নিরিখে 'অ-সভ্য' যা-কিছু সেগুলিকে সংস্কৃতির প্রান্তে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু, পুঁজিবাদী বাজারের অমোঘ টানে গোয়েন্দা কাহিনীকে পুরোপুরি নস্যাৎ করাও সম্ভব ছিল না। ফলে, মলাটের আড়ালে গোয়েন্দা কাহিনী পড়া সেই গ্রহণ-বর্জনের সংঘাতের রূপক। বিশেষত, উনিশ শতকী বঙ্গে শিক্ষিত পাঠকের হার বিচার করলে ঐ মলাটের আড়ালের রূপকটির সামাজিক বৈশিষ্ট্য আরও প্রবল হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ায় আদমশুমারির খতিয়ান দিয়ে মান্য এক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, 'খাস কলিকাতায়' লিখনপঠনক্ষম অর্থাৎ নিরক্ষর নয় এমন বঙ্গভাষীর সংখ্যা শতকরা হিসাবে ৩১.৬ জন।[22] এইবারে প্রশ্ন ওঠে যে, এই যদি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সংখ্যাগত অবস্থা হয়, তাহলে গোয়েন্দা গল্পের পাঠক ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন উপন্যাসের পাঠককে কি আদৌ দা-কাটা বিভাজনে আলাদা করা যায়? জনসমক্ষে রুচির বড়াই করলেও, মলাটের আড়ালে বা বালিশের তলায় লুকিয়ে সেই রুচিমান পাঠক কী গোয়েন্দা কাহিনীও পড়তেন না?

এখন প্রশ্ন হল, জনপ্রিয় গণভোগ্য সাহিত্য-পণ্য কীভাবে সামাজিক ইতিহাসের প্রতিফলন হিসাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে? বস্তুত, জনপ্রিয় সাহিত্যের বিশ্লেষণ থেকে সামাজিক সংবেদের কাঠামো অনুধাবন করা যায়। একটি বিশেষ স্থানিক ও কালিক পরিসরে অনুভব ও অভিজ্ঞতারাজির প্রতিফলন ঘটে জনপ্রিয় সাহিত্যধারায়। ফলে, যে কাহিনী অনেক পাঠককে বুঁদ করে রাখে সেই কাহিনীতে অবশ্যই সেই সমাজ-মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষণীয়। সেই কারণেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক সমাজের অলি-গলির হদিশ পাওয়ার জরুরি চাবিকাঠি হতে পারে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য।

শার্লক হোমসের মত অতিমানবিক গোয়েন্দা যে গণ-সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে সেই কথাটা খেয়াল করিয়ে আন্তোনিও গ্রামশি লিখেছিলেন যে, জনগণের বৌদ্ধিক জগতে গল্পের গোয়েন্দারা এমনভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে যে পাঠক ভুলেই যায় যে সেগুলি কাল্পনিক চরিত্র, বাস্তবের মানুষ নয়।[23] হোমসের বাড়ির কাল্পনিক ঠিকানাকে সত্য আস্তানা ভেবে লোকে বিভিন্ন বাস্তব সমস্যায় সেই কল্প-চরিত্রের থেকে সমাধান প্রত্যাশা করে। অতএব, গ্রামশি প্রশ্ন করেন, গোয়েন্দা কাহিনীর এত পাঠকপ্রিয়তার কারণ কী? তার এমন গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই-বা কেন? গোয়েন্দা সাহিত্যের নান্দনিকতা নিয়ে গ্রামশি মোটেই ভাবিত নন। বরং, তাঁর মতে গোয়েন্দা কাহিনী কেবল একবার

---

[21] Christine Anne Evans, "On the Valuation of Detective fiction : A Study in the Ethics of Consolation", *Journal of Popular Culture*, 28:2, Fall, 1994, পৃ. ১৫৯

[22] প্রবাসী, তৃতীয় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১০, পৃ. ২০০-২০৫

[23] Antonio Gramsci, *Selections from the Cultural Writings*, Q. Hore & G. Nowell-Smith eds. & trans.(London : Lawrence and Wishart, 1985), পৃ ৩৫০

পাঠযোগ্য। তার মাধ্যমে পাঠক এক কল্পজগতে ধাঁধার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে, বাস্তব জগতের সমস্যাগুলিকে ভুলে থাকতে চায়। গোয়েন্দা কাহিনী পাঠের আনন্দ এক আত্মছলনাময় পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভুত।[24] বস্তুত, হত্যাকারী কে?— তা একবার জেনে ফেললে সেই কাহিনীর আবেদন সেখানেই শেষ হয়ে যায়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের এক সাহিত্যিক-সমাবেশে ম্যাক্সিম গোর্কি গোয়েন্দা সাহিত্যকে বুর্জোয়া সমাজের প্রতিফলন বলেই বিচার করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর মতে, গোয়েন্দা কাহিনী বাস্তব-বিচ্যুত ও জীবনের সঙ্গে সংশ্রবহীন এক মেকি কাল্পনিকতার মোহ-আবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।[25]

প্রসঙ্গত, উপন্যাস বর্গের সাহিত্য-ধারা নিয়েই রোলাঁ বার্ত-এর আলোচনা মনে পড়তে পারে। বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী মতাদর্শ-সঞ্জাত 'নভেল' আদতে যে একরকমের 'মিথ' তৈরি করে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার্ত লিখেছেন:

> This is strictly how myths function, and the Novel— and within the Novel, the preterite— are mythological objects in which there is, superimposed upon an immediate intention, a second-order appeal to a corpus of dogmas, or better, to a pedagogy, since what is sought is to impart an essence in the guise of an artefact.[26]

বস্তুত, বার্তের মতে, উপন্যাস সমাজে উপভোগ করা হলেও, আদতে তা সেই সমাজবিচ্ছিন্ন— "(T)he Novel is… dissociated from the society which consumes it."[27] সেই বিচ্ছিন্নতার প্রকৌশল উপন্যাসের প্রথম পুরুষ (third person)-ভিত্তিক বয়ান। সেই প্রকৌশলের মাধ্যমেই 'মিথ' ও বাস্তবকে একীভূত করা হয়:

> The 'he' is a typical novelistic convention; like the narrative tense, it signifies and carries through the action of the novel; if the third peson is absent, the novel is powerless to come into being, and even wills its own destruction. The 'he' is a formal manifestation of the myth, and we have just seen that, in the West at least, there is no art which does not point to its own mask. The third person, like the preterite, therefore performs this service for the art of the novel, and supplies its consumers with the security born of a credible fabrication which is yet constantly held up as false.[28]

এখানে বার্ত আগাথা ক্রিস্টির বহুল (সম)আলোচিত উপন্যাস *The Murder of Roger Ackroyd* (১৯২৬)-এর প্রসঙ্গ টেনে দেখিয়েছেন যে, পাঠক যেহেতু সর্বনামের আড়ালেই অপরাধীকে খুঁজতে থাকে, তাই ক্রিস্টি সুচতুরভাবে উত্তম

---

[24] "One reads a book because of practical impulses, one rereads it for artistic reasons. The aesthetic emotion hardly ever comes on the first reading." দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ. ৩৭০

[25] গোর্কির মতে: "The bourgeoisie read about the dexterity of thieves and the cunning of murderers with the same relish as they read about the astuteness of detectives. Detective fiction is to this very day the favourite spiritual food of well-fed persons in Europe." ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে Soviet Writers' Congress উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ম্যাক্সিম গোর্কির সেই বক্তৃতার মুদ্রিত রূপের জন্য দ্রষ্টব্য: Maxim Gorky, 'Soviet Literature' (1934). সূত্র: https://www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1934/soviet-literature.htm

[26] Roland Barthes, *Writing Degree Zero* (USA : Hill and Wang, 1970 [1953 in French as *Le Degré Zéro de L'Ecriture*]), পৃ. ৩৩-৩৪

[27] তদেব, পৃ. ৩৮

[28] তদেব, পৃ. ৩৫

পুরুষের মুখোশে হত্যাকারীকে ঢেকে রেখেছিলেন। আর তাতেই ভেঙে গিয়েছিল যাবতীয় স্বস্তিপাঠের অভ্যাস।[29] অপরাধীকে চিনতে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় পাঠককে। আর তাই উন্নাসিক সমালোচক উইলসন ক্রিস্টির ঐ বিশেষ উপন্যাসটিকেই আক্রমণের প্রধান চাঁদমারি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বার্তের মতে শুধু গোয়েন্দা কাহিনীই নয়, উপন্যাস বর্গটিই বাস্তবতার আবেশ নির্মাণকারী 'মিথ'।

প্রকৃতপক্ষে, গোয়েন্দা কাহিনীর সামাজিক আবেদনের মধ্যে যেমন গ্রামশি ও বার্ত-কথিত বাস্তবতার আবেশ আছে, তেমনই আদতে সেই কাহিনীগুলি কল্পিত জগতের ছায়া। ফলে, সেই কাহিনীগুলিকে বাস্তব ধরে নিয়ে তার নিরিখে সামাজিক প্রতিফলন বিচার করতে গেলে গবেষককে ধন্দে পড়তে হবে। গোয়েন্দা কাহিনীর মত সাংস্কৃতিক আঙ্গিককে যেমন সমকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করা যায়, তেমনই এ-কথাটিও খেয়াল রাখতে হবে যে, সামাজিক বাস্তবতার জটিল আবর্তগুলি হুবহু সেই আখ্যানে ধরা পড়ে না। অপরাধ কিংবা হত্যা সেখানে কেবল এক ধাঁধার সূচনা মুহূর্তকে চিহ্নিত করে। তারপরে সমগ্র আখ্যান গোয়েন্দার জয়গাথায় পরিণত হয়ে বস্তুত আধুনিক রূপকথার চরিত্র ধারণ করে।[30] ফলে, সামাজিক মতাদর্শের নির্ণায়ক বলে না-দেখে ঔপনিবেশিক সমাজে শ্রেণি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গগত পরিচয়ের আন্তঃসম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় তথা প্রশাসনিকতার যুক্তির প্রসার-প্রকৌশল হিসাবে বিচার করা যায়। বস্তুত, গোয়েন্দা কাহিনীর মত জনপ্রিয় সাহিত্য আঙ্গিককে সমাজের অন্তর্গত উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিরিখে বিচার করলে বোঝা যেতে পারে যে কীভাবে সামাজিক সম্পর্কের বুননে ঐ বর্গের কাহিনীগুলি প্রভাব বিস্তার করে। ঐ বর্গের সাহিত্য পাঠকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষ কতগুলি ছাঁচে ফেলে দেয়, যার ফলে কোনো নির্দিষ্ট জাত কিংবা সম্প্রদায় হয়ে ওঠে 'অপরাধপ্রবণ' কিংবা 'রক্তলোলুপ'।

পাশাপাশি, ঔপনিবেশিক সমাজে যেসব অর্থনৈতিক সম্পর্কের ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রকরণসমূহের সঙ্গে যুক্তভাবে গোয়েন্দা কাহিনীর সামাজিকীকরণ ঘটে ও আখ্যানগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেই সূত্রগুলিও বিচার করা দরকার। উনিশ শতকীয় শিল্প বিপ্লবজাত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভব এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার গোয়েন্দা কাহিনীকেও ছড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বের নানান কোণে। তাই, পাশ্চাত্যের এক বিশেষ চিন্তন-শাসন ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো কীভাবে দিকেদিগন্তরে ঔপনিবেশিক সমাজগুলিতে নানান প্রতর্কের জন্ম দিল তার একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে গোয়েন্দা কাহিনীগুলির বিশ্লেষণে। ঔপনিবেশিক সমাজে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতাদর্শের পুষ্টিসাধন, বৈজ্ঞানিকতাসিদ্ধ যুক্তিবাদের বিকাশ, নাগরিকতার প্রসার এবং নজরদারির নানান ফিকির ও বিশেষত পুলিশি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনীর সম্পর্ক অল্প-বিস্তর আলোচিত হয়েছে। তবে, অবশ্যই তার আরও অনেক গভীর ও সার্বিক বিশ্লেষণ দরকার।

---

[29] তদেব, পৃ. ৩৪-৩৫

[30] Colin Mercer, 'That's Entertainment: The Resilience of Popular Forms' in Bennett Tony ed., *Popular Culture and Social Relations* (Milton Keynes : Open University Press, 1986) পৃ. ১৮৩-১৮৪

তবে, বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতাদর্শের সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনীর সম্পর্ককে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বিচার করা যায়। অনেকেই বলেন যে, গোয়েন্দা আখ্যানের উৎস বিকাশমান নাগরিক পরিসরের আওতায় সামাজিক যাপনের নৈর্ব্যক্তিকীকরণ ও গণকরণ। সেখানে শহুরে ছাঁচে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয় এবং সেই বিরাট নগরের আবর্তে বহু মানুষের ভিড়ে অপরাধী আত্মগোপন করে থাকতে পারে। হ্বাল্টার বেনিয়ামিনের চোখে উনিশ শতকী গোয়েন্দা সাহিত্য "বুর্জোয়া বিশৃঙ্খলার" নমুনা।[31] বলা যায়, সেই অন্তর্নিহিত সুগভীর বিশৃঙ্খলাকে ঢেকে 'অপরাধ' আপাত বিশৃঙ্খলার সমাধান করে কল্প-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে পাঠককে আশ্বস্ত করেন গল্পের গোয়েন্দা। গ্রামশি-কথিত সাময়িক আনন্দের তলায় চাপা পড়ে থাকে গ্রামশি-কথিত মৌলিক সামাজিক-রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক সংকটগুলি অথবা বার্ত-কথিত প্রকৃত সামাজিক বাস্তবতা। সাধারণ চোখে ধরা-না-পড়া ক্লু বা সূত্র খুঁজে পেয়ে সেগুলিকে অবরোহী যুক্তির নৈর্ব্যক্তিক অমোঘতায় সাজিয়ে নিশ্চিত ভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে গোয়েন্দা পাঠকের মনে আপাত শান্তিকল্যাণের স্বস্তি জুগিয়ে চলে এবং ঔপনিবেশিক সমাজে নিত্যকার নানান বাস্তব অন্যায়ের উপরে যেন এক যুক্তির জাদুপর্দা টেনে দিয়ে বাস্তবতা অতিক্রম করে কাল্পনিক স্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। সেই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় পাঠক অবচেতনে স্বস্তি পায়, বাস্তব যাপনের হরেক সমস্যা-উদ্বেগ তাৎক্ষণিকভাবে দূর হয় কাল্পনিক রহস্যের সমাধানে।

বস্তুত, আর্নেস্ট মেন্ডেল প্রমুখের বিশ্লেষণ মাথায় রেখে বলা যায় যে, গোয়েন্দা কাহিনী একদিকে বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী সম্পত্তি-সম্পর্কের সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি, আবার উল্টোদিক থেকে সেই সমাজ-বাস্তবতায় উদ্ভূত সামাজিক বাস্তবতাকে বিচার করা ও তার সমাধান করার প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হওয়া থেকে গণমনকে আপাত-সমাধানে মজিয়ে রাখার কাজও করে সেই কাহিনীগুলি।[32] সেই বিচারে, ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন বর্গের ও গোত্রের শোষণ ও অন্যায়ের মৌলিক সমস্যাগুলি বিচার না-করে আপাত রহস্যের জটিল জাল ভেদ করে আপামর বাঙালি পাঠককে এক আধুনিক রূপকথার জগতে নিয়ে গিয়েছিল বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী, যেখানে আখ্যানের শেষে দুয়োরানিকে উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলার বদলে অপরাধীকে আইনের শাসন মোতাবেক শাস্তির জন্য কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয় ও তারপরে রাজা-রানি রাজকুমার-রাজকন্যা নিয়ে সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করার মতই গোয়েন্দা নতুন অপরাধীর সন্ধানে মগ্ন হয়।

---

[31] "This character of the bourgeois apartment, tremulously awaiting the nameless murderer like a lascivious old lady her gallant, has been penetrated by a number of authors who, as writers of "detective stories"— and perhaps also because in their works part of the bourgeois pandemonium is exhibited-have been denied the reputation they deserve." দ্রষ্টব্য: Walter Benjamin, *One Way Street and Other Writings*, Trans. Edmund Jephcott & Kingsley Shorter (London : New Left Books, 1979), পৃ. ৪৮-৪৯

[32] Ernest Mandel, *Delightful Murder : A social history of the crime story* (Minneapolis : University of Minnesota Press, 1984 Reprint)

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা-গবেষণার হালহকিকত

বস্তুত, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য নিয়ে এযাবৎ যেটুকু আলোচনা হয়েছে তাতে তার কালানুক্রমিক ধারাবাহিক ইতিহাস সেভাবে লেখা হয়নি। আবার তার পাশাপাশি এটাও স্বীকার্য যে, খাপছাড়া ভাবে হলেও, সেই সমস্ত লেখাপত্র থেকে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ক্রমবিকাশের একটা আপাত আঁচ-আন্দাজ পাওয়া যায়। তবে, ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় লেখা গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুগভীর ঐতিহাসিক-দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া যায়।[33] চীন, জাপান, কিউবা, মেহিকোর মত বিভিন্ন দেশীয় সমাজে গোয়েন্দা সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস নিয়ে যেমন গবেষণা হয়ে চলেছে।[34] কিন্তু, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য নিয়ে এখনও সেইভাবে তাত্ত্বিক পরিসরে ধারাবাহিক গবেষণা-আলোচনার বিস্তৃত পরিসর তৈরি হয়নি।[35] অথচ, ইংরেজি ও ফরাসি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদলে ঔপনিবেশিক বাংলায় উনিশ শতকের শেষ পর্যায়েই গোয়েন্দা আখ্যান রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলায় যে 'সাহিত্যের ইতিহাস' গোত্রের লেখাপত্র চালু আছে, তাতেও গোয়েন্দা কাহিনীকে অল্প জায়গা দেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সাহিত্যেরও যে একটা ইতিহাস থাকতে পারে আর সেই ইতিহাসও যে চর্চাযোগ্য সেই কথা ভেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা সুকুমার সেন একটি বই লিখেছিলেন। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর ঠিকুজি-কুষ্ঠীর হদিশ পেতে হলে সেই বইয়ের কথা বিস্তারে বলতে হবে।

উনিশ শো আশির দশকের গোড়ায় কয়েকজন "ডিটেকটিভ গল্পখোর" মিলে আড্ডা জমিয়েছিলেন 'হোমসিয়ানা' নামে। সেই আড্ডার অনুপ্রেরণায় ক্রমে সুকুমার সেন লিখে ফেলেছিলেন বাংলা "গোয়েন্দা কাহিনীর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস"। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বই হয়ে বেরোয় ওঁর লেখা ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি। সেই বইয়ে অবিভক্ত বাংলায় বাংলা ভাষায় লেখা হরেক কিসিমের "ক্রাইম কাহিনী বা গোয়েন্দা কাহিনী"-র কুলুজি নির্মাণ

---

[33] সেই আলোচনার পরিসর ক্রমে বিস্তৃততর হচ্ছে। ফলে তার গ্রন্থপঞ্জীর হদিশ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে, কেউ কেউ তাঁদের বইতে সুদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করেছেন। তেমনই একটি বই: Stephen Knight, *Crime fiction, 1800–2000 : Detection, Death, Diversity* (New York : Palgrave Macmillan, 2004)

[34] এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গোয়েন্দা কাহিনীর প্রসার সম্পর্কে গবেষণার জন্য দ্রষ্টব্য: Persephone Braham, *Crimes against the State Crimes against Persons : Detective Fiction in Cuba and Mexico* (Minneapolis, London : University of Minnesota Press, 2004); Stephen Wilkinson, *Detective Fiction in Cuban Society and Culture* (Bern : Peter Lang, 2006); Sari Kawana, *Murder Most Modern : Detective Fiction and Japanese Culture* (Minneapolis & London : University of Minnesota Press, 2008); Mark Silver, *Purloined letters : Cultural borrowing and Japanese crime literature, 1868–1937* (Honolulu : University of Hawai'i Press, 2008); Satoru Saito, *Detective Fiction and the Rise of the Japanese Novel, 1880–1930* (Cambridge, Massachusetts & London : Harvard University Press, 2012); Yan Wei, *Detecting Chinese Modernities : Rupture and Continuity in Modern Chinese Detective Fiction, 1896–1949* (Leiden & Boston : Brill, 2020).

[35] প্রসঙ্গত বাংলা গোয়েন্দা গল্পের বিভিন্ন প্রসঙ্গের ভিত্তিতে লেখা কয়েকটি অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে: অনামিকা দাস, ব্যোমকেশের জীবনী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পিএইচডি গবেষণার অপ্রকাশিত সন্দর্ভ, ২০১৪), বসুন্ধরা মণ্ডল, বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা : একটি পর্যালোচনা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পিএইচডি গবেষণার অপ্রকাশিত সন্দর্ভ, ২০২৩) প্রভৃতি। প্রসঙ্গত, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী ও তার সঙ্গে ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর তুলনা করে আরও কয়েকটি প্রকাশিত গবেষণা ও প্রবন্ধ সংকলনের হদিশ পাওয়া যায়। যেমন, পিনাকী রায়ের প্রকাশিত পিএইচডি গবেষণা সন্দর্ভ *The Manichean Investigators: A Postcolonial and Cultural Rereading of the Sherlock Holmes and Byomkesh Bakshi Stories* (New Delhi : Sarup & Sons, 2008); বিশ্বজিৎ কর্মকার, গোয়েন্দা সাহিত্যে অপরাধ মনস্তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (নদীয়া : লহর পাবলিকেশন হাউস, ২০১৫); দেবায়ন দেব বর্মণ সম্পাদিত *Critical Essays on English and Bengali Detective Fiction* (Lexington Books : Lanham, 2022). শেষোক্ত বইটিতে ইংরেজি ও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য ও সিনেমার বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুড়িটি আলাদা আলাদা প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

করলেন সুকুমার সেন। তার আগে অবশ্য পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা কাহিনীর বিবর্তনের রূপরেখা হাজির করলেন। পরে তার সঙ্গে তুলনা টানলেন বাংলা গোয়েন্দা গল্পের। সেই আলোচনা শেষ হলো বিশ শতকের ষাটের দশকে এসে। সুকুমার সেন কৈফিয়ত দিলেন: "ইতিহাসের দৃষ্টি দূরবীনের মতো, খুব কাছে খোলে না।"[36] কিন্তু, মুশকিল হল সুকুমার সেনের ইতিহাসদর্শনে বর্ণনার তুলনায় বিশ্লেষণের গুরুত্ব কিছু কম। অন্তত আলোচ্য বইটি বিচার করলে মনে হয়, বাংলা গোয়েন্দা গল্পের আরও গভীরতর বিশ্লেষণ সম্ভব। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, সুকুমার সেন তাঁর বইটি কোনো ঠাসবুনোট গবেষণা হিসাবে লেখেননি, তেমন ইচ্ছাও তাঁর ছিল বলে ব্যক্ত করেননি। "সমধর্মা পাঠকের" গোয়েন্দা কাহিনি পড়ার "অহেতুক আনন্দ" ভাগ করে নেওয়ার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ফলে মূলত আত্মস্মৃতিনির্ভর রচনার ফলে বইটিতে বেশকিছু তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে এবং অল্প কিছু অসঙ্গতিও আছে।

সুকুমার সেন-এর বইয়ের ধারায় ২০১৩ সালে সাহিত্যের গোয়েন্দা নামে একটি বই লেখেন প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত। সেই আলোচনায় বিংশ শতকের দেশবিদেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনী ও সেই সম্পর্কে অল্প-বিস্তর আলোচনা আছে। কিন্তু, সেখানে সুগভীর তাত্ত্বিক আলোচনার অভাব স্পষ্ট এবং লেখকের অভীষ্টও সম্ভবত তা ছিল না।[37] এই দুইটি বইয়ের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি সাহিত্যপত্রিকা নানা সময়ে বিশেষ গোয়েন্দা সংখ্যা প্রকাশ করেছে। সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিভাব পত্রিকার বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা। শার্লক হোমসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ধরণী ঘোষ ও সিদ্ধার্থ ঘোষের যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ঐ পত্রিকা-সংখ্যায় বেশ কয়েকটি আলোচনামূলক প্রবন্ধ ও পুরোনো-নতুন মিলিয়ে কয়েকটি কাহিনী মুদ্রিত হয়। সম্পাদকদ্বয় শুরুই করেছিলেন এই বলে যে:

> গোয়েন্দা গল্প পড়ার যোগ্য কি না এ প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর, কিছুটা অপমানজনকও বটে। এদেশের এবং বিদেশের বহু মনীষী এ-রসে মশগুল এ তথ্য জানানো বাহুল্যমাত্র। জগৎ বিখ্যাত মার্কসবাদী নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেশট্ সাহিত্যের শুধু এই শাখাটিকে বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। আরও একজন স্বনামধন্য মার্কসীয় দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামস্চি নির্জন কারাকক্ষে বসে শার্লক হোমসের উৎপত্তি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। গ্রামস্চির মতে হোমসের চেয়ে চেস্টারটনের গোয়েন্দা, ক্যাথলিক ধর্মযাজক ব্রাউন অনেক বেশি আকর্ষণীয়, কথাটা ভাববার মতো।[38]

আবার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর প্রকাশের কালে কলকাতায় যে বাস্তবেই বেসরকারি প্রাইভেট গোয়েন্দা ছিল, সেই কথাটাও তাঁরা জানিয়েছেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অগাস্ট *The Statesman*-এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়:[39]

---

[36] সুকুমার সেন, 'কৈফিয়ৎ', প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত

[37] প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সাহিত্যের গোয়েন্দা (কলকাতা : পরশপাথর, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ)

[38] 'সম্পাদকীয়', বিভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[39] তদেব, পৃ. ৯

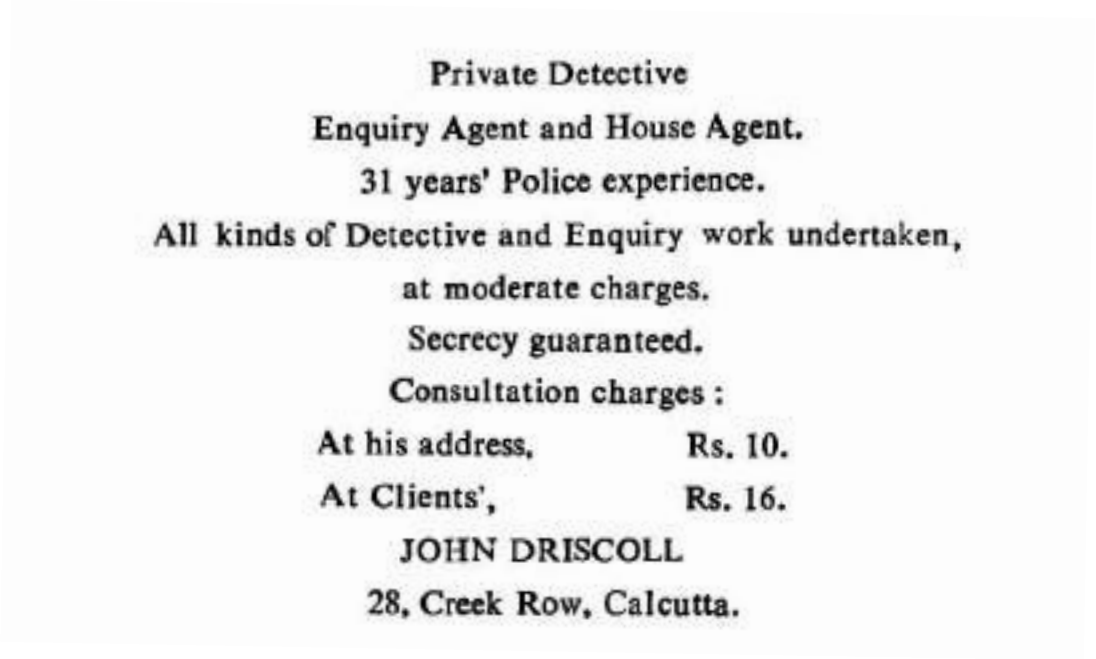
Private Detective
Enquiry Agent and House Agent.
31 years' Police experience.
All kinds of Detective and Enquiry work undertaken,
at moderate charges.
Secrecy guaranteed.
Consultation charges :
At his address, Rs. 10.
At Clients', Rs. 16.
JOHN DRISCOLL
28, Creek Row, Calcutta.

বিভাব-এর ধাঁচে ১৪২০ বঙ্গাব্দে কোরক পত্রিকাও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য-কেন্দ্রিক একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। সেখানে সম্পাদক ঘোষণা করেছিলেন: "বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য জনপ্রিয় হলেও আজও প্রথম শ্রেণীর পদবাচ্য নয়। এখনও এরকম ভাবা হয় যে, তার সাহিত্যমূল্য যথেষ্ট কম। অথচ গোয়েন্দা সাহিত্য তো বাস্তবেরই প্রতিফলন। সমাজের মধ্যে মিশে থাকা অপরাধ, প্রতিশোধস্পৃহা ও লালসার বিবিধ চালচিত্র ফুটে ওঠে এইসব কাহিনিতে"।[40]

এই ধরনের বইপত্র কিংবা পত্রিকা সংকলনে বিদ্যায়তনিক আলোচনার পরিসর বিশেষ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে বিদ্যায়তনিক গবেষণা খুবই কম। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে।[41] ঔপনিবেশিক বাংলায় পুলিশি ব্যবস্থা বিষয়ে রঞ্জন চক্রবর্তীর *Authority and Violence in Colonial Bengal : 1800-1860* (Calcutta: Bookland Private Limited, 1997), বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের *Crime and Control in Early Colonial Bengal : 1770-1860* (Calcutta : K P Bagchi & Co., 2000) এবং মৃণালকুমার বসু-লিখিত দারোগার দরবার : উনিশশতকীয় বাংলার পুলিশ ব্যবস্থার দর্পণে (কলকাতা : এবং মুশায়েরা, ২০০৮) বই তিনটি উল্লেখ্য। প্রথম দুটি বইয়ের মূল উপজীব্য ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় নজরদারির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পুলিশ ব্যবস্থার সূচনা। তবে, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের অষ্টম অধ্যায় "'Police and the People' : The Literary Stereotypes of the Darogha" শীর্ষক আলোচনায় ঔপনিবেশিক দারোগা তথা বিভিন্ন স্তরের পুলিশ কর্মচারী সম্পর্কিত নানান গোত্রের আলোচনা ও বাংলায় লেখা প্রহসনের, স্মৃতিকথা, কাহিনীর মাধ্যমে দারোগা ব্যবস্থার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু জরুরি বিশ্লেষণ হাজির করেছেন।[42]

---

[40] 'সম্পাদকের নিবেদন', কোরক, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক্-শারদ, ১৪২০, পৃ. অনির্দেশিত

[41] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য: Uponita Mukherjee, *Colonial Detection: Crime, Evidence, and Inquiry in British India, 1790-1910* (Unpublished PhD thesis in Columbia University, 2022)

[42] Basudeb Chattopadhyay, *Crime and Control in Early Colonial Bengal : 1770-1860* (Calcutta : K P Bagchi & Co., 2000), পৃ. ১৬৩-১৮৩

দারোগার দরবার বইটিতে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় পুলিশি বন্দোবস্তের খতিয়ান আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে একেবারেই 'কেস স্টাডি'র মত দুটি প্রসঙ্গ ধরে লেখক ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতার পরিসরটি জরিপ করেছেন। শেষে বাঁকাউল্লা-সংক্রান্ত বিতর্কেও ঢুকেছেন।[43]

অপরদিকে, ঔপনিবেশিক বাংলার ভৌগোলিক চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে 'অপরাধ' ও 'শাস্তি'র পরিসর, 'অপরাধী' নির্মাণ প্রকল্প এবং নজরদারি ও নির্যাতনের নানান প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব রচনা সংক্রান্ত জরুরি আলোচনার পাওয়া যায় Anand A. Yang সম্পাদিত *Crime and Criminality in British India* (Arizona : The University of Arizona Press, 1985), David Arnold-এর গবেষণা গ্রন্থ *Police Power and Colonial Rule : Madras 1859-1947* (Delhi : OUP, 1986), Yumna Siddiqi-লিখিত *Anxieties of Empire and the Fiction of Intrigue* (New York : Columbia University Press, 2008) প্রভৃতি বইতে। প্রসঙ্গত, Upamanyu Pablo Mukherjee-র *Crime and Empire : The Colony in Nineteenth-Century Fictions of Crime* (New York : OUP, 2003) এবং David Arnold-এর আরেকটি বই *Toxic Histories : Poison and Pollution in Modern India* (United Kingdom : CUP, 2016) উল্লেখ্য।

সম্প্রতি অরিন্দম দাশগুপ্তর সম্পাদনায় পুরোনো গোয়েন্দা কাহিনীর কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।[44] সেই সংকলনগুলির মুখবন্ধের সীমিত পরিসরে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাস বিষয়ে জরুরি কতগুলি প্রসঙ্গ কেবল ছুঁয়ে যেতে পেরেছেন সম্পাদক। তবে, সেই স্বল্প পরিসরেও উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের বিবর্তন ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাজার-বিজ্ঞাপন-অনুবাদ ও বৃহত্তর সামাজিক-নৈতিক বিতর্ক সংক্রান্ত আলোচনার জরুরি হদিশ পাওয়া যায়। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের একেবারে আদি পর্বে লিঙ্গ-বৈষম্য ও তার সঙ্গে জড়িত আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা শম্পা রায়ের গবেষণার উপজীব্য। সেই বইতে প্রধানত প্রিয়নাথ মুখাপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তরকেই মূল আলোচ্য বিষয় ধরে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠা লিঙ্গ প্রসঙ্গ ও অপরাধিত্বের ধারণার সম্পর্ক চর্চা করা হয়েছে।[45]

এই আলোচনার শুরুতে সুকুমার সেনের গুরুত্বপূর্ণ বইটির কথা যেমন এসেছে, তেমনই ঔপনিবেশিক বাংলার গণ-সংস্কৃতি তথা 'ইতর'জন সম্পর্কিত আলোচনায় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিক অবদানের কথা বলা

---

[43] মৃণালকুমার বসু, দারোগার দরবার : উনিশশতকীয় বাংলার পুলিশ ব্যবস্থার দর্পণে (কলকাতা : এবং মুশায়েরা, ২০০৮)

[44] অরিন্দম দাশগুপ্ত-কর্তৃক সম্পাদিত ও আনন্দ পাবলিশার্সের (কলকাতা) তরফে প্রকাশিত সেই সংকলনগুলি যথাক্রমে সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি ১ (২০১৬) ,২ (২০১৭),৩ (২০২১), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি— বামাগণ বিরচিত ৪ (২০২৪) এবং সেকালের গোয়েন্দা গল্প (২০১৯)

[45] Shampa Roy, *Gender and Criminality in Bangla Crime Narratives : Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries* (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017). পরবর্তীকালে তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার কয়েকটি অপরাধ-আখ্যানের ইংরেজি অনুবাদ ও টীকা-ভাষ্য একটি দীর্ঘ ভূমিকাসহ প্রকাশ করেছেন: Shampa Roy, *True Crime Writings in Colonial India : Offending Bodies and Darogas in Nineteenth-Century Bengal* (London & New York : Routledge, 2021). কিন্তু, প্রিয়নাথ কিংবা বাঁকাউল্লাদের বর্ণিত আখ্যানগুলিকে কোন যুক্তিতে তিনি 'True Crime Writings' বলে সাব্যস্ত করলেন তা বোঝা যায় না। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রিয়নাথ প্রমুখ অনেক সময়েই ইংরেজি গল্পের বঙ্গীকরণ করছেন, সেখানে সেগুলিরে 'সত্য' আখ্যান বলে মেনে নেওয়া কি সম্ভব?

দরকার। শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে 'অপরাধ', 'অপরাধী', 'শাস্তি', 'বিচার', 'শাসন' প্রভৃতি বিভিন্ন ধারণার একটি আলোচনা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন ওঁর *Crime and Urbanization : Calcutta in the Nineteenth Century* (New Delhi : Tulika Books, 2006) বইতে। পরে সেই বইয়ের পরিবর্ধিত রূপ *The Wicked City : Crime and Punishment in Colonial Calcutta* প্রকাশ পায়। সেখানে শহরের 'শৃঙ্খলা' বজায় রাখতে পুলিশি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও তার হাত ধরে বাঙালি সরকারি গোয়েন্দার আবির্ভাবের প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে সুমন্তবাবু আলোচনা করেছিলেন।[46] একইভাবে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় লিখিত ওঁর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান বইটির কথাও উল্লেখ্য।[47] বইটিতে উনিশ শতকের কলকাকার সমাজে 'অপরাধ', 'অপরাধী', 'আইন-শাসন' প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই বিশ্লেষণের মূল স্থানিক ধরতাই ঔপনিবেশিক শাসনের রাজধানী কলকাতা। বস্তুত, গোয়েন্দা গল্পের মাধ্যমে শহর কলকাতার ক্রমবিবর্তনের যে একটা হদিশ মিলতে পারে, সেটা সুকুমার সেনও খেয়াল করেছিলেন।[48]

শেষত, পরিমল ঘোষের একটি প্রবন্ধের কথা বলা দরকার। "From Byomkesh to Feluda : The Strange Life of the Bengali Detective" শিরোনামের উক্ত প্রবন্ধে তিনি প্রাক্-ব্যোমকেশ পর্বের তদন্ত কাহিনীর সামাজিক পরিসর ও পরবর্তীকালে ব্যোমকেশ বক্সী ও প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদার সামাজিক পরিসরগুলি বিশ্লেষণ করে 'ভদ্রলোক' বর্গের সঙ্গে গোয়েন্দা গল্পের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, সার্বিকভাবেই 'ভদ্রলোক' বর্গের পিছু হঠে যাওয়ার ফলেই ক্রমে গোয়েন্দা গল্পের স্থান সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষিত, ভদ্র গোয়েন্দা তার রহস্যভেদী জাদু দেখানোর সুযোগ বাস্তবত হারিয়ে ফেলেছে।[49]

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণার তত্ত্বভিত্তি

প্রকৃতপক্ষে, ঔপনিবেশিক বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনী রচনার ভিত্তি কীভাবে তৈরি হয়েছিল সেই সবিস্তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ উপরিউক্ত বই বা প্রবন্ধগুলির উপজীব্য নয়। কোনও কোনও আলোচনায় কেবল রূপরেখার হদিশ আছে, কখনও একটি-দুটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নজরনিবদ্ধ করেছেন কেউ কেউ। ফলে, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর প্রাথমিক

---

46 Sumanta Banerjee, *The Wicked City : Crime and Punishment in Colonial Calcutta* (New Delhi : Orient Blackswan, 2009). "Rise and Growth of the Police" ও "Subalterns of the Calcutta Police" প্রবন্ধদুটি প্রধানত দ্রষ্টব্য।

47 সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৩ [২০০৮])

48 আষাঢ়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে দারোগার দপ্তর ১৫৯তম সংখ্যায় প্রকাশিত দীর্ঘকেশী গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মন্তব্য করছেন: "কাহিনীটিতে খাঁটি কলকাত্তাই ছাপ আছে। গল্পটি গোয়েন্দা কাহিনী হিসাবে যেমন, কলকাতার টোপোগ্রাফির দিক দিয়েও তেমনি চিত্তাকর্ষক।"— দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

49 Parimal Ghosh, "From Byomkesh to Feluda : The Strange Life of the Bengali Detective", *What Happened to the Bhadralok* (New Delhi: Primus Books, 2016), পৃ. অনির্দেশিত (pdf version)

পর্বের সমাজেতিহাসের সুলুক-সন্ধান এখনও বিস্তৃততর গবেষণার বিষয়। সেই সম্ভাবনা থেকেই বর্তমান গবেষণার উদ্ভব।

এখানে শুরুতেই স্পষ্ট করা দরকার যে, বাংলার শিক্ষিত সমাজে গোয়েন্দা সাহিত্য বহুদিন 'মান্য' সাহিত্যের জাতে না-উঠতে পারার ফলে তার কোনও পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বইয়ের তালিকায় উল্লেখ থাকলেও বস্তুত অনেক সময়েই মূল বইটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। কখনও আবার বইগুলি ব্যবহার বাহুল্যে জীর্ণ বা খণ্ডিত। ফলে, ঐতিহাসিক গবেষণার অন্যতম প্রধান শর্ত যে নথি মিলিয়ে দেখা তার সুযোগ সবক্ষেত্রে নেই। সেই অভাব পূরণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে প্রাপ্ত সংস্করণগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তাতেও একই বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ মিলিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা মুশকিল। ফলে, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যে-কোনও আলোচনাই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। উপরন্তু, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক ইতিহাস ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিসর থেকে তার বিশ্লেষণের সমূহ অভাব আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও পাথুরে প্রমাণের অভাব একটা মৌলিক সমস্যা।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, যতদিন-না সমস্ত তথ্যের অভাব পূরণ হয় বা পাথুরে প্রমাণ হাতে আসে অর্থাৎ এই বিষয়ে যথাযথ মহাফেজখানা বা আর্কাইভ তৈরি করা যায়, ততদিন কী এই বিষয়ে গবেষণা সম্ভব নয়? বস্তুত, বর্তমান গবেষণার পিছনে সেই ভাবনাও কাজ করেছে। যেটুকু লেখাপত্র আপাতত ব্যবহার করা যায় তার থেকেই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস অর্থাৎ একেবারে আদিপর্যায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক-অর্থনীতিগত পরিসরগুলি বিশ্লেষণ করা যায়। সেই বিচারে বলা যেতে পারে, এই গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর আদিপর্বে নিহিত ঔপনিবেশিকতার লক্ষণ-চিহ্নগুলি বিচার করে মাতৃরাষ্ট্র ও উপনিবেশের মধ্যে আদর্শনৈতিক-তাত্ত্বিক-বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক বিনিময়ের হরেক প্রসঙ্গগুলির মধ্যে নিহিত একটা সমাজেতিহাসের কাঠামো দাঁড় করানো। সালতামামির অসম্পূর্ণতা মাথায় রেখেও, প্রাপ্ত লেখাগুলির একটা কাঠামোগত বিশ্লেষণ (structural analysis) থেকে তার মনোভঙ্গির হদিশ করা সম্ভব।

খেয়াল করা দরকার যে, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য একদিকে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামো ও অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ-বিস্তার-প্রকাশের বিভিন্ন মুহূর্ত ও প্রক্রিয়ার সহগামী। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি গোয়েন্দা সাহিত্যের মধ্যে ছাপ ফেলেছে। ফাঁড়ি দারোগা বাঁকাউল্লা কিংবা পুলিশি গোয়েন্দা প্রিয়নাথ থেকে দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র হয়ে ক্রমে বেসরকারি ডিটেকটিভ তথা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী দেখা দিয়েছে। পুলিশের কাজে দেবেন্দ্রবিজয়রা মাইনে পেলেও, ক্রমে জনপ্রিয় হতে থাকা জয়ন্ত-হেমন্ত-ব্যোমকেশের মতো বেসরকারি গোয়েন্দারা কখনও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার-পোষিত, কখনও মক্কেলের দক্ষিণা-পুষ্ট, কখনও-বা 'অপরাধী' ধরে দেওয়া বাবদ সরকার-তরফে ঘোষিত ইনামভোগী। কায়িক শ্রম নয়, বৌদ্ধিক বৃত্তির অহং সেখানে স্পষ্ট। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সেই হাতছানিই হয়ত গোয়েন্দা কাহিনির জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫), দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) প্রমুখের পাঠকবর্গ সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের নিরিখে মূলত নগর ও মফস্বলবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণি, যার সিংহভাগ হিন্দু। সেই পাঠককুল একই সঙ্গে রহস্য-রোমাঞ্চের বই পড়েছে, আবার স্বদেশি রাজনীতির আদর্শে মোহিত হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনীতে আইনের শাসনের জয়গানে শামিল হওয়ার সমান্তরালে কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতায় সেই পাঠক সামিল হত, তা বিশেষ করে ভাববার বিষয়।

ঔপনিবেশিক শাসক দেশীয় প্রজাদের 'হীন' প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে নিজেদের শাসন বলবৎ করার যুক্তি তুলে ধরত। সেই যুক্তির একটি রূপ ছিল বাঙালিদের 'মেয়েলি' বলে প্রমাণ করা। তথাকথিত যোদ্ধৃ জাতির ('Martial Race') উল্টোদিকে কায়িক সামর্থ্যহীন নুব্জ বাঙালির সেই ছাঁচ স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত স্বদেশচেতনায় দীক্ষিত বাঙালি অস্বীকার করেছে, ভাঙতে চেয়েছে।[50] 'বাহুবল' বিচারে বাঙালি যে একদিন কারো থেকে কম ছিল না, বরং ঔপনিবেশিক শাসনেই সেই বাহুবল খর্ব হয়েছে— সেই কথাটা নানাভাবে ফিরে ফিরে এসেছে উনিশ শতকী জাতীয়তাবাদী চেতনার হাত ধরে। সেই পর্যায়ে সবথেকে বেশি আত্মসমালোচনায় মুখর হয়েছিল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ঔপনিবেশিক সরকারে অধীনে চাকরি করে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করায় কোনো গৌরব ছিল না। তাছাড়া চাকরির সুযোগও ক্রমে কমে আসছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় মান্য পত্রিকায় হিসাব দিয়ে দেখানো হয়েছিল যে, "লেখাপড়াজানা হিন্দুরা অতিরিক্ত মাত্রায় ওকালতী, মাষ্টারী প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করে, এইরূপ যে একটা ধারণা আছে, তাহা ভুল।"[51] ঔপনিবেশিক শাসক বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয়দের জীবন-জীবিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে সেই কথাটিই স্পষ্ট হয়ে যায়।

একদিকে চাকরির সুযোগ নেই, অন্যদিকে পূর্বপ্রচলিত বংশজ পেশাগুলি ঔপনিবেশিকতার ধাক্কায় ঠাঁই নাড়া হয়ে গেছে। ইংরেজি শিখলে তো কথাই নেই, এমনকী স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্যেও পুরানো পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে গিয়েছিল: "কলিকাতার সেন্সস্ হইতে … জানা যায়, যে উচ্চজাতির হিন্দুরা খুব বেশী পরিমাণে তাহাদের জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা তত পরিমাণে পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসা ত্যাগ করে নাই।"[52] চাকরি তথা জীবিকার সেই দোলাচল ও সংকটে জাতীয়তাবাদ যে বাহুবল পুনরুদ্ধারের প্রকল্প হাজির করেছিল, তারই সঙ্গে সাযুজ্য পাওয়া যায় রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতে।

বাহুবলের উপরেও যে বুদ্ধি বা মেধা আরও বড় শক্তি সেই আত্মস্বীকৃতির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী হিন্দু শিক্ষিত বাঙালি শ্রেণির প্রতিনিধি গোয়েন্দা নিজের স্বকপোলকল্পিত 'স্বদেশ'সাধনায় ব্রতী হয়েছিল। গায়ের জোরে কারো সঙ্গে এঁটে উঠতে পারা যাক বা নাই-যাক, আর্থ-রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা বাঙালির গর্বের ধন

---

[50] এই বিষয়ে অনবদ্য বিশ্লেষণের জন্য দুটি বই দেখা দরকার : Mrinalini Sinha, *Colonial masculinity : The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century* (Manchester : Manchester University Press, 1995) এবং Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History : Gender and t1e Politics of Culture in Colonial Bengal* (Delhi : OUP, 1998).

[51] প্রবাসী, তৃতীয় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০৫

[52] তদেব

তাদের বুদ্ধিবল— মেধা। সেই শাণিত বুদ্ধির অহং গণভোগ্য সাহিত্যে গোয়েন্দার আকার নিয়েছিল। সেই গোয়েন্দা সরকারি হতে পারে কিংবা বেসরকারি, তাতে ইতর বিশেষ তারতম্য নেই। শরীরে বল একটু কম হলেও তাদের দক্ষতা এবং সাফল্যের মাপকাঠি ছিল শাণিত বুদ্ধি। তাছাড়া, ঔপনিবেশিক প্রভুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে না-জড়িয়ে তারই শাসনতন্ত্রকে ব্যবহার করে নিজের আত্মস্বীকৃতি ঘোষণা করার উপযুক্ত পরিসর হয়ে ওঠে গোয়েন্দা কাহিনী। ঔপনিবেশিক শাসনে সবচেয়ে বিদ্রূপের শিকার বঙ্গীয় কেরানিকুলের প্রতিনিধি নয় বাঙালি গোয়েন্দারা। তারা বরং দেশহিতব্রতে নিয়োজিত এবং গড়পড়তা ঔপনিবেশিক প্রজার উল্টোদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিভূ, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার রূপক। সেই পরিসরে স্বদেশপ্রেম এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও ঔপনিবেশিক শাসনের মূল ছাঁচটিকে অল্পবিস্তর সমালোচনা করেও শেষাবধি তারই অধীনে থাকা যায়।

খেয়াল করা দরকার, যে কেরানিকুলকে বিদ্রূপ করার দস্তুর ছিল, তারাই আবার গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকবর্গ। ফলে, সে হেন পাঠক একই সঙ্গে অবসর বিনোদন ও আত্মসমালোচনার এক অভূতপূর্ব পরিসর পেয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা সাহিত্যে। পাশাপাশি, লিঙ্গগত রাজনীতির নিরিখে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ, নারীর নৈতিক 'স্খলন' ও তজ্জনিত 'অপরাধ', 'আদর্শ' নারীর ছাঁচ— সবই হাজির ছিল গল্পের আনাচে-কানাচে। তার সঙ্গে অবশ্য করে মিশে গিয়েছিল যৌনতার নানান ইঙ্গিত। কখনও বর্ণনায়, কখনও ছবিতে সেই ইঙ্গিতগুলির মূল উপজীব্য ছিল নারী। 'ভ্রষ্টা' কীভাবে যৌনতার কুহকে সকলকে আবিষ্ট করে রাখে, কিন্তু গোয়েন্দা সেই মোহাবেশে আচ্ছন্ন না-হয়ে রহস্য সমাধান করে 'ভ্রষ্টা'র শাস্তিবিধান শেষে নিজের 'সতী-সাধ্বী' স্ত্রীর কাছেই ফিরে আসেন— সেই রূপকল্প গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতে বারবার ফিরে এসেছে। উপরন্তু, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার হরেক উপকরণ— আধুনিক বিজ্ঞানিক যুক্তি, নানান রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ, নতুন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র এবং অবশ্যই খবরের কাগজ— সব মিলিয়ে সেই চাকচিক্যের হাতছানি উপনিবেশের আদতে বঞ্চিত শিক্ষিত প্রজাকুলের পক্ষে এড়ানো কঠিন ছিল।

তাই, গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকরা কেবল পাঠকের মৌতাত জমিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। কারণ, তাতে বিক্রির আঁকড়া পুষ্ট হলেও, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন হয় না। ফলে, গল্পের তলায় তলায় দেখা যায় নিহিত আছে এক বিশেষ নৈতিকতার বৃত্তান্ত। সেই বৃত্তান্তে 'আধুনিক' ও 'ঐতিহ্য'— দুয়ের মিশেল দিতে হয় মাপ বুঝে। কখনও আধুনিকতার জয়গান গাইলে, অন্যত্র ঐতিহ্য, প্রথা প্রভৃতির পক্ষেও সওয়াল হাজির করতে হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের সুফল পুরো অস্বীকার করলেও চলে না। আবার গল্পের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রাখতে হয় কীভাবে তাবৎ ঔপনিবেশিক শাসন যা পারল না, সেই সমস্যার সমাধানকারী দেশীয় যুবক গোয়েন্দার প্রশস্তি। এ যেন, শাসকের থেকে শেখা খেলাতেই শাসককে পরাস্ত করার গৌরব। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়ার এও এক প্রকাশ বৈকি।

আবার, পরাধীন প্রজার দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকেও গোয়েন্দার মুক্তি নেই। তাই শেষ বিচারে ঔপনিবেশিক শাসকের ছকে দেওয়া শাসন-শৃঙ্খলার বড়ো কাঠামোকেই রক্ষা করার ভার নিতে হয় বাঙালি গোয়েন্দাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে 'অপরাধী'কে আইনের শাসনে সমর্পণ না-করলেও, বেশিরভাগ সময়েই 'দোষী'র বিচারের ভার ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর ওপরেই বর্তায়। ফলে, ঔপনিবেশিকতার বাস্তবতার সঙ্গে গ্রহণ-বর্জন তথা আত্তীকরণ-প্রত্যাখ্যানের একটা চলমান প্রক্রিয়া বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের মজ্জাগত। আবার অন্যদিকে, নতুন নেশনের যে কাঠামো তাতে কাকে কোন মান্যতা/বশ্যতার পাঠ দেওয়া দরকার, কার কোন ধাপে ঠাঁই হবে— সে সবের একটা আদলও যেন দেখতে পাওয়া যায় গল্পগুলির অন্দরে-অন্তরে। উচ্চবর্গীয়/উচ্চবর্ণীয় হিন্দু পুরুষের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক-অর্থনীতির অবস্থান থেকে বাকি সবকিছুকে দেখার, বিচার করার ও প্রতিনিধিত্ব করার যে মনোভঙ্গি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বর্গে প্রকট, গোয়েন্দা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম বিশেষ দেখা যায় না। তবে, কখনও কখনও একই লেখার ভিন্ন সংস্করণের তুলনা করলে কিছু কিছু পরিমার্জনের চিহ্ন যে ধরা পড়ে না, তেমনটাও নয়।[53]

তবে, পণ্য হিসাবে যতই বিক্রি হোক, গোয়েন্দা কাহিনী আদৌ সাহিত্য হিসাবে 'মান্য' কি-না সেই বিতর্ক ছিলই। গোয়েন্দা গল্প আদৌ 'সৎ সাহিত্য' কিংবা সাহিত্য পদবাচ্য কি না; জনসমক্ষে গোয়েন্দা গল্পের মৌতাতি পাঠক হিসেবে পরিচিতি পেলে, সেটা গৌরবের না লজ্জাকর— সে নিয়ে শিক্ষিতজনের মনে দ্বিধা যে ছিল, তার হরেক নমুনা আছে। ফলে, গল্প লিখিয়ে ও প্রকাশকদের মধ্যেও চেষ্টার অন্ত ছিল না কীভাবে তাদের লেখাকে সাহিত্য পংক্তিভুক্ত করা যায় ও তার প্রকাশন জৌলুসে পাঠকের চোখ-মন ধাঁধানো যায়। তাই কখনও ভালো কাগজে ছাপানো, ছবিওয়ালা প্রকাশন, তো কখনও তাঁর লেখা/প্রকাশিত বইটি কেন সমাজের প্রচলিত মান্য নৈতিকতার সীমানাতেই রয়েছে, সে কথা বিজ্ঞাপিত করতে দেখা যায় গোয়েন্দা গল্পের লেখক/ প্রকাশকদের। একইসঙ্গে, তাঁদেরও দরকার হয়ে পড়ে এক 'অপর', যার নিরিখে নিজের ভালোত্বের গুণগান করা যেতে পারে। সেই 'অপর' হলো বটতলার প্রকাশনা। এখানে খেয়াল করার মতো বিষয় হলো 'বটতলা' বলে 'অপর'কে দাগানোর সাংস্কৃতিক ও ক্ষমতার রাজনীতিটা। কে, কাকে, কেন, কীভাবে 'বটতলা' সাহিত্য বলে দাগাচ্ছেন, সেটি খেয়াল করা জরুরি। তার থেকে দেশীয় জনসমাজে বই-প্রকাশন-পাঠরুচি-কেন্দ্রিক জন-সংস্কৃতির ইতিহাসচর্চায় জরুরি কতগুলি প্রসঙ্গ উঠে আসতে পারে। পাশাপাশি, গোয়েন্দা কাহিনির বই প্রকাশনার একটা নিজস্ব পরিসরও ছিল। বিশেষত, লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক, লেখার সত্ব, বইয়ের বিপণন-বিজ্ঞাপনের নানা মারপ্যাঁচ ও অনুবাদ-তরজমার নানা কায়দা— সেই সবই সুগভীর আলোচনার বিষয়।

বস্তুত, এই গবেষণা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্বের একটা সমাজেতিহাস তৈরি করা। সেই আদিপর্বকেই এখানে 'প্রাগিতিহাস' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর

---

53 তেমন একটি নজির কিশোরীমোহন বাকচির সচিত্র অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড। এই বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: অরিন্দম দাশগুপ্ত, 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত

থেকে শুরু করে যে ধারাটির অল্প-বিস্তর যাত্রার খতিয়ান বা ইতিহাস তবু কিছুটা চর্চা হয়েছে, এই গবেষণায় তার আগের পর্যায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন মান্য বাংলা অভিধান অনুসারে 'প্রাক্' অর্থে যে শুরু সংক্রান্ত বা পূর্ববর্তী সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে, সেই অনুষঙ্গেই 'প্রাগিতিহাস' শব্দটি এখানে এসেছে। একটি নির্দিষ্ট স্থানিক ও কালিক পরিসরে ভাষা তথা প্রতর্কের মাধ্যমে কীভাবে একটি ধারণাগত কাঠামো বিন্যস্ত হয়— সেই সূত্র নিয়ে ভাবতে গিয়েই কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল— এই মূল প্রশ্নকে ঘিরেই এই গবেষণা আবর্তিত হয়েছে। তারই হদিশ পেতে গিয়ে বোঝার চেষ্টা হয়েছে যে কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের জটিল আবর্তে, পুঁজিবাদ নামের বিশ্বব্যবস্থার ছাঁচে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের অংশ হিসেবে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' এবং 'সাক্ষ্য-প্রমাণ', 'আইন', 'শাস্তি', 'ন্যায় বিচার' প্রভৃতি ধারণা সম্পর্কিত প্রতর্কগুলি দেশীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও ক্রমে তার ভিত্তিতে অপরাধের তদন্ত কাহিনীর বাজার গড়ে উঠেছিল। বস্তুত, সেই বাজার না-গড়ে উঠলে গোয়েন্দা গল্প নামের পণ্যের পসরা সাজিয়ে উপর্যুপরি এত লেখক-প্রকাশক হাজির হতেন না। এই গবেষণায় সেই বাজার তৈরির প্রক্রিয়াটিকে উপনিবেশের শাসক ও শাসিত— কেন্দ্র ও প্রান্তের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা হয়েছে।

দেশীয় সমাজের সামাজিকতা, নৈতিকতা, সংস্কার আন্দোলন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ ও জাতীয়তার চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রসঙ্গগুলি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছিল; ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ও একটি ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও জীবিকা-নির্ভর সমাজব্যবস্থায় গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে কীভাবে শ্রেণি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায়; শ্রম ও উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র ও 'অপরাধী' বর্গের নির্মাণের মধ্যে সম্পর্ক কী ছিল; ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী — উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গ প্রসঙ্গে ভাবনা, নারীর যৌনতা ও তার নিয়ন্ত্রণ, নারী শরীরের ও স্বাধীনতার অধিকার তথা যৌন নৈতিকতার বিশেষ ধরনের মাপকাঠির প্রয়োগ, 'খলনায়িকা' ধারণার বিভিন্ন প্রকাশ কীভাবে ঘটেছিল; এবং এই সবেরই স্থানিক পরিসর হিসাবে ঔপনিবেশিক ভারতের আদি রাজধানী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদা লন্ডনের পরে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শহর কলকাতার স্থানিকতার (topological) বিবর্তন ও গোয়েন্দা গল্পের সঙ্গে তার সম্পর্ক, দেশীয় জনসমাজের পাঠাভ্যাস; জনরুচি নির্মাণে ও ঔপনিবেশিক শাসনের মান্যতা তৈরিতে গোয়েন্দা সাহিত্যের ভূমিকা; জাতীয়তাবাদী বিকল্প ও ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিস্তারে গোয়েন্দা গল্পের ভূমিকা— এই সবই স্বল্প বা দীর্ঘ আয়তনে, সরলরেখায় কিংবা তির্যকভাবে এই গবেষণায় জুড়ে গিয়েছে। সেই বিশ্লেষণের কৌশল হিসাবে ঐ বিষয়ক বিভিন্ন প্রতর্কের নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলি (Discursive Formations) বিচার করা হয়েছে এবং সেগুলির সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিত মিলিয়ে গোয়েন্দা কাহিনীগুলিও পুনঃপাঠ করা হয়েছে।

কোনো সুনির্দিষ্ট সন-তারিখ দিয়ে এই গবেষণার কালিক পরিসর চিহ্নিত করা হয়নি। তার প্রধান কারণ ক্যালেন্ডারি তারিখ বা বছর মেনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে না। সেই বদল এক বড় কাল-

পরিসরব্যেপে ঘটে। সেই বিচারে বর্তমান গবেষণার কালগত সূচনা হিসাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্নে ঔপনিবেশিক শাসনের কাঠামোয় মাতৃরাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও তার বঙ্গীয় উপনিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে প্রতর্কের উদ্ভবকে ধরা যেতে পারে। তবে, মূলত উনিশ শতকে পুঁজিবাদের অধীনে ঔপনিবেশিক শাসন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন প্রকরণ থেকে কীভাবে গোয়েন্দা কাহিনী উদ্ভূত হয় ও সেই কাহিনীগুলিতে ঐ কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছিল, তাই মূল বিবেচ্য। সেই প্রসঙ্গেই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনীর প্রসার ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে, মূলত উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ এই গবেষণার কালিক পরিসর।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ঐ কালগত পরিসরে ইংরেজিতে ও বাংলায় অগণিত রহস্য-রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা কাহিনী লিখিত হয়েছিল। কিন্তু, সেই সমস্ত উদাহরণ কোনো মতেই একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বিচার করা সম্ভব নয়। ফলে, লেখক ও কাহিনী নির্বাচনের কৌশল অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই গবেষণায় মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক লেখক ও কাহিনীগুলিকেই আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে। একই লেখকের সমস্ত বইও অনেকক্ষেত্রে আলোচিত হয়নি। বাদ পড়েছেন অনেকে। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে, ঐ বাদ যাওয়া লেখক কিংবা কাহিনীর প্রসঙ্গগুলি গুরুত্বহীন। বস্তুত, প্রতর্ক বিশ্লেষণে কোনো বয়ানই গুরুত্বহীন হতে পারে না। ভবিষ্যতে, সেইসব কাহিনী সম্পর্কে আরও গবেষণা হলে হয়ত বর্তমান গবেষণায় তোলা মূল প্রশ্নগুলির আলোচনা আরও ঋদ্ধ হতে পারে, আবার নতুন বিতর্ক তৈরি হতে পারে, কিংবা এই আলোচনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অবকাশ ঘটতে পারে। ফলে, এই গবেষণা কোনোভাবেই সামগ্রিকতার দাবি করছে না। বরং, এটি আদতে একটি অণু-পরিসরের গবেষণা (Micro Study), যা অবশ্যই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে অংশ ও পরিচয়বাহী। ফলে, অণুকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বৃহতের একটি আন্দাজ পাওয়াই বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

শ্রম ও মৃত্যু : পুঁজিবাদ ও গোয়েন্দা সাহিত্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণে মেন্ডেলীয় তত্ত্ব কাঠামো

মৃত্যুই জীবনের অপর, সত্তাগতও বটে। তাই মানুষী যাপন তথা সভ্যতার ইতিহাসে মৃত্যুর ঠাঁই গভীরে। আর (প্রধানত) সেই মৃত্যু নিয়েই গোয়েন্দার কারবার। একের জিঘাংসার বাস্তবায়নে যখন অন্যের জীবনের স্বাভাবিক চলন ব্যাহত হয় সেখানেই গোয়েন্দার আবির্ভাবের উপযুক্ত আবহের সূত্রপাত। তারপরে মৃত্যুর মত আধিবিদ্যক অবস্থাকে গোয়েন্দা একটি অতীত ঘটনামাত্রে পরিণত করেন। তাঁর কাছে মৃত্যুর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে হত্যাকারী। মৃত্যু উপলক্ষ্য কেন্দ্র করে লক্ষ্য হয়ে ওঠে গোয়েন্দার মগজাস্ত্রের প্রদর্শনী— একজনের হত্যা অন্যজনের বুদ্ধিবৃত্তির কেরামতি দেখানোর রসদ যোগান দিয়ে চলে। মার্কসীয় তাত্ত্বিক আর্নেস্ট মেন্ডেল মৃত্যুর সঙ্গে শ্রমের তুলনা

করে বলেছেন, শ্রমের মতোই মৃত্যুও অনিবার্য নিয়তি। মেন্ডেলের কথা আরেকটু এগিয়ে নিলে বলা যায়, পুঁজিবাদে শ্রমের মতোই গোয়েন্দা গল্পে মৃত্যুকেও দ্রব্যায়িত (Reification) করা হয়।[54]

অনেক আলোচক মনে করেন গোয়েন্দা সাহিত্যের মতাদর্শগত ভিত্তির কেন্দ্র ভয়, প্রধানত মৃত্যু ভয়।[55] কিন্তু, মৃত্যু-ভয় তো মানুষের আদিমতম চেতনার অন্যতম। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, কেনো গোয়েন্দা সাহিত্য প্রাচীন গ্রিসে বা ভারতে কিংবা চীনে লেখা হলো না? কেনো, রেনেশাঁস-আবহে পশ্চিম ইওরোপ কিংবা প্রাচীন চৈনিক, ভারতীয় বা পারসিক সভ্যতায় আধুনিক ধাঁচের গোয়েন্দা গল্পের জন্ম হলো না? বস্তুত, গোয়েন্দা সাহিত্যে এক বিশেষ ধরনের মৃত্যুভয় ফুটে ওঠে। মেন্ডেল বলবেন, সেই ভীতি বুর্জোয়া সমাজের আবহ-পুষ্ট, সেই সমাজেই নিহিত আছে তার শিকড়। কৌম ও ব্যক্তির মধ্যে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে প্রথাগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা পুঁজিবাদের আমলে বদলে যেতে থাকে। পুঁজি ও সম্পদ এবং মূল্য ও অর্থের আধিপত্য বুর্জোয়া সমাজে বিচ্ছিন্ন মানব-সত্তার জন্ম দেয়, যে মানব-সত্তা শরীরের অখণ্ডতা নিয়ে সদা সচেতন। কারণ, শরীরের মধ্যেই নিহিত আছে শ্রম এবং সেই শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমেই উৎপাদন ব্যবস্থা তথা সমগ্র পুঁজিবাদী কাঠামো সচল থাকে। তাই, বুর্জোয়া দার্শনিক প্রতর্কে মৃত্যু মানে পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামোয় ছেদ। সেই ছেদ একরকমের দুর্ঘটনা। মেন্ডেল তাই বলেন, জীবনের অনিবার্য পরিণতি যে মৃত্যু তার পরিবর্তে যে মৃত্যু প্রলয়ঙ্কর দুর্ঘটনা কিংবা ছেদ তা চরিত্রগতভাবে 'অপরাধ' এবং সেই 'অপরাধ'সম মৃত্যু তথা হত্যা নিয়েই বুর্জোয়া চেতনা বেশি আলোড়িত। দুর্ঘটনারূপী মৃত্যু নিয়ে সেই আবেশ থেকেই জন্ম নেয় হিংসাজনিত মৃত্যু অর্থাৎ হত্যা নিয়ে মোহ এবং তার পরিণতিতে হত্যা ও অপরাধ নিয়ে মোহাবেশ গড়ে ওঠে। তাই, বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী আবহেই গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভব।[56]

মেন্ডেল আরও দেখিয়েছেন যে, ঐতিহ্যানুসারে মৃত্যু সংক্রান্ত প্রতর্কগুলি একদিকে যেমন দার্শনিক, অন্যদিকে সাহিত্যিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চৌহদ্দিতেই ঘোরাফেরা করত।[57] কিন্তু, ঊনবিংশ শতকে সাহিত্যের একটি বিশেষ গোত্র হিসাবে গোয়েন্দা গল্পের উত্থানের ফলে সেই ঐতিহ্যগত প্রতর্কে ছেদ পড়ে। গোয়েন্দা আখ্যানের কেন্দ্রে সাধারণত থাকে এক বা একাধিক মৃত্যু, যা চরিত্রের বিচার হত্যা। কিন্তু, সেই মৃত্যু তার মানবিক ইতিহাস বিযুক্ত হয়ে কেবল এক বা একাধিক মৃতদেহে পরিণত হয়। সেটি বা সেগুলি বিষয়ী সত্তা হারিয়ে দ্রব্যায়িত হয়ে কেবল গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়, যেখানে গোয়েন্দা গবেষকের মতই ঐ মৃত্যুগুলির সঙ্গে অসংযুক্তভাবে কেবলই যৌক্তিক কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে কেনো, কীভাবে ও কার বা কাদের দ্বারা সেই হত্যা বা হত্যাগুলি ঘটেছে তার বিশ্লেষণ করে। ফলে, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে গোয়েন্দার অবস্থানে উচ্চাবচতা তৈরি হয়, যেখানে মৃত ব্যক্তি কেবলই মৃতদেহ। ঠিক যেমন, ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর নৈর্ব্যক্তিক উচ্চাবচতা থাকে। চিকিৎসক রোগীর যাপিত মুহূর্তগুলির শরিক নন,

---

[54] "Reification of death is at the very heart of the crime story." দ্রষ্টব্য: Ernest Mandel, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[55] তদেব

[56] তদেব, পৃ. ৪২

[57] তদেব, পৃ. ৪২-৪৩

তিনি বিযুক্তভাবে রোগের নিদান খোঁজেন চিকিৎসাশাস্ত্রীয় যুক্তিতে। ঠিক সেইভাবেই গোয়েন্দা হত ব্যক্তির যাপিত মুহূর্তের হদিশ জানতে চান কেবল হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার জন্য।[58]

বস্তুতপক্ষে, মৃত্যু নামের বিমূর্তকে মৃতদেহ নামের গ্রাহ্য বাস্তব তথা দ্রব্যে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াই গোয়েন্দা সাহিত্যের অন্তঃস্থল। তাই, গোয়েন্দা আখ্যানে মৃত্যু অন্যান্য সাহিত্য-বর্গে বর্ণিত মৃত্যুর থেকে আলাদা। এমন নয় যে, কেবল গোয়েন্দা গল্পেই হত্যার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু, মৃতদেহ তথা মৃত্যুকে বিষয়ী থেকে বিষয়ে পরিণত করার এই প্রক্রিয়াই গোয়েন্দা সাহিত্যকে সাহিত্যিক বর্গ হিসাবে স্বতন্ত্র করে তোলে। বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী মতাদর্শে জীবনের অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার অবিচ্ছিন্ন, এবং সম্পত্তি অর্জন ও উপভোগের জন্য ব্যক্তিক সুরক্ষা অপরিহার্য। হত্যা সেই ব্যক্তিক সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করে। তাই গোয়েন্দা সাহিত্যে ধরেই নেওয়া হয় জীবন ও সম্পত্তির ব্যক্তিক অধিকার ইষ্ট এবং তার উপরে নেমে আসা আঘাত অনিষ্ট। ইষ্ট-অনিষ্টের এই দ্বৈততাই গোয়েন্দা সাহিত্যের জগদ্দর্শন। সেখানে অপরাধী অনিষ্টের প্রতীক, বুর্জোয়া-জাগতিক রীতিনীতির ভিত সে ধ্বসিয়ে দিতে চায়। আর তার বিপরীতে ইষ্টকর গোয়েন্দা, যে প্রতিনিয়ত সেই ভিতকে রক্ষা করে চলে, সেই ভিত যে অলঙ্ঘনীয় ও অমোঘ তা বারংবার প্রতিপন্ন করতে সে মরীয়া। গোয়েন্দা সাহিত্যে জয়গান গাওয়া সেই ভিতের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে বুর্জোয়া-ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেন্দ্রিক মতাদর্শ।[59]

ইষ্ট-অনিষ্টের দা-কাটা বিভাজনের এই যে জগত গোয়েন্দা সাহিত্যে পুনরুক্ত হয়ে চলে, তা আদতে ব্যক্তিক সীমা ছাড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিকে পরিণত হয়। তাই গোয়েন্দা সাহিত্যের মূল কাঠামো একই থাকে, বদলে যায় কেবল স্থান-কাল-পাত্র। মৃতদেহকেও তার পূর্ব-যাপিত বিষয়ী সত্তা থেকে বিযুক্ত করে অনুসন্ধানের বিষয় করে তোলার পিছনে ঐ নৈর্ব্যক্তিক নৈতিকতার দোহাই দেওয়া হয়। সেখানে অপরাধী ও গোয়েন্দা দুজনেই চতুর, একজন পায়ের ছাপ মুছতে মুছতে চলে গেছে, অন্যজন সেই আপাত-লুপ্ত চিহ্নকে অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দৃশ্যমান করে তোলে।[60] মানবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-উত্তরণ হয়ে পড়ে দুজন মানুষের বুদ্ধির লড়াই, যেখানে মৃতদেহ(গুলি) কার্যত উলুখাগড়া। শবদেহ আদতে এক কুরুক্ষেত্র, যার উপরে দাঁড়িয়ে অপরাধী ও গোয়েন্দার মধ্যে চলে বিমূর্ত ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত—বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী ধর্মযুদ্ধ। পাঠক সেই যুদ্ধে ধর্মের পক্ষে মনে মনে লড়াই করে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করে ব্যক্তিগত

---

[58] ডাক্তার ও গোয়েন্দার তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়তে পারে শার্লক হোমস কল্প-চরিত্রটির উপরে ডয়েলের শিক্ষক ডাক্তার জোসেফ বেলের ছাপের কথা।

[59] সপ্তদশ শতক থেকেই ইওরোপের বিশেষত ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া তত্ত্বচিন্তায় সম্পত্তির অধিকার ও জীবনের অধিকারের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কথা উঠে এসেছিল সেই আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism : Hobbes to Locke* (USA : Oxford University Press, 1964).

[60] প্রসঙ্গত জি কে চেস্টারটনের ফাদার ব্রাউন-কেন্দ্রিক একটি গল্পের বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে : "The criminal is the creative artist; the detective only the critic." দ্রষ্টব্য: G.K. Chesterton, 'The Blue Cross', *The Innocence of Father Brown* (New York : John Lane, 1911), পৃ. ৯ (১-৩২)। এখানে বলা দরকার যে, ফিলাডেলফিয়ার *Saturday Evening Post*-এ এই গল্পটি প্রথম প্রকাশের সময়ে (২৩ জুলাই, ১৯১০) নাম ছিল 'Valentin Follows a Curious Trail', পরে ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বরে *The Story-Teller*-এ পুনঃপ্রকাশের সময়ে নাম বদলে হয় 'The Blue Cross'.

সম্পত্তি রক্ষার মোহনীয় দর্শন— বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী মতাদর্শের প্রাণভোমরা। তাই গোয়েন্দার সাফল্যে পাঠকের নিজের লালিত বিশ্বাসের ভিত পোক্ত হয়।

এখন প্রশ্ন হল, এই দ্রব্যায়ণ ও বিষয়করণ কি পুরোটাই নেতিবাচক? অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক কিংবা প্রাক্-পুঁজিবাদী অভিজ্ঞতাগুলি মূলত শারীরিক যন্ত্রণা-নির্ভর। অনেক সময়ে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে নিরপরাধও নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নিত কিংবা শাস্তির ফলে বিচারের আগেই অনেকের মৃত্যু হত। যন্ত্রণা দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের এই পদ্ধতির সঙ্গে বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী মতাদর্শের ভিত্তি যে শরীর ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার তার সংঘাত অনিবার্য। ফলে, শারীরিক শাস্তির বদলে অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করে, সেই প্রমাণগুলির যাথার্থ্য বিচার করে অপরাধীকে চিহ্নিত করা ও শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে আইনের শাসন বলবৎ করা হয়। এর মাধ্যমে মানুষী স্বাধীনতা সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণার প্রতিষ্ঠা ঘটে।[61] সামন্ততান্ত্রিক প্রথাগত শারীরিক অত্যাচারের বিরোধিতা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মতাদর্শের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। স্বভাবতই সেই মতাদর্শপুষ্ট গোয়েন্দা সাহিত্যে যে এর ছাপ পড়বে তা বলাই বাহুল্য।

সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শের বিরোধিতায় বুর্জোয়া বিপ্লবের মূল বক্তব্যের অন্যতম ছিল আত্মরক্ষা ও আত্মস্বার্থ চরিতার্থের অধিকার। গেয়েন্দা সাহিত্য এই দুই অধিকারের পক্ষেই সওয়াল করে। সেহেতু, গোয়েন্দা আখ্যান বাস্তবত বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী কাঠামোর সাহিত্যিক মান্যতা। আর্নেস্ট ব্লখের মতে, বিপ্লবী বুর্জোয়া মতাদর্শের যে ঐতিহাসিক জয়যাত্রা তার প্রতিফল গোয়েন্দা সাহিত্য। অপরাধ নির্ণয়ের প্রধান ভিত্তি যে প্রমাণ সংগ্রহ এবং অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায়ের 'বর্বর' পদ্ধতি খারিজ করে বিধিসম্মত প্রমাণের অভ্রান্ততা সম্পর্কে আদালতি বিচারের মাধ্যমে অপরাধী সাব্যস্ত করার 'মানবিক' পদ্ধতিতে উত্তরণ আদতে পশ্চিম ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট তথা জ্ঞানদীপ্তির জয়যাত্রা। সেই জয়গাথাই গোয়েন্দা সাহিত্য।[62]

এখানে একটি জরুরি বিতর্ক তুলেছেন আর্নেস্ট মেন্ডেল। তাঁর মতে, যৌক্তিকতা ও যুক্তিবাদ অভিন্ন নয়। দ্রব্যায়িত যৌক্তিকতা আদতে অসম্পূর্ণ এবং সেহেতু যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত নয়। তার ফলে গোয়েন্দা গল্পে মানবিক অবস্থার সামগ্রিকতাকে বিশ্লেষণ না-করে, তাকে কতগুলি চলতি খোপে ভেঙে নিয়ে বিচার করা হয়, সেই খোপ কখনও রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক, কখনও সাংস্কৃতিক বা মনস্তাত্ত্বিক, আবার কখনও যৌনতাকেন্দ্রিক বা নৈতিক।[63] ব্যক্তিগত তাড়না সেখানে অপরাধীর জন্ম দেয় আর গোয়েন্দা প্রচলিত কাঠামো তথা ন্যায়ের ধ্বজাধারী।

---

61 মিশেল ফুকো লিখেছেন: "At the beginning of the nineteenth century, then, the great spectacle of physical punishment disappeared; the tortured body was avoided; the theatrical representation of pain was excluded from punishment. The age of sobriety in punishment had begun. By 1830-48, public executions, preceded by torture, had almost entirely disappeared." দ্রষ্টব্য: Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York : Vintage Books, 1995 [1977]), পৃ. ১৪

62 Ernst Bloch, "A Philosophical View of the Detective Novel", *Discourse*, Vol. 2, Mass Culture Issue (Summer, 1980), পৃ. ৩২-৫২। পরে প্রবন্ধটি ব্লখের *The Utopian Functon of Art and Literature: Selected Essays* (Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 1988), পৃ. ২৪৫-২৬৪ বইতেও সন্নিবেশিত হয়।

63 Ernest Mandel, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

এই খোপবন্দি নেতি-ইতির দ্বন্দ্ব এতটাই সরলীকৃত যে সেখানে অপরাধী ও গোয়েন্দার সামাজিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্নই ওঠে না। অপরাধ ও ন্যায় বিচার, শাস্তি ও সম্পত্তি— এই সমস্ত আদর্শ যে একই সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সেই কথাটিই গোয়েন্দা সাহিত্যে অনুচ্চারিত থেকে যায়। অপরাধ ও তার নির্ণয় সমস্ত সামাজিক পরিস্থিতি-নিরপেক্ষভাবে কেবলই এক পূর্বনির্ধারিত ছকে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। ঘটনার বিবরণ আপাতভাবে বদলে গেলেও অন্তর্লীন যুক্তিক্রম একই থাকে। তাই কার্যত সব গোয়েন্দা আখ্যানই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বোধবিযুক্ত কোনো এক মহাআখ্যানের পুনরাবৃত্তি। ফলে, সেই আখ্যানে অপরাধের দায় কেবল ব্যক্তির, সমাজ সেখানে প্রশ্নের মুখে পড়ে না। সামাজিক যাবতীয় অসংগতির দায় ব্যক্তি অপরাধীর উপরে আরোপ করে গোয়েন্দা অবরোহী যুক্তিপদ্ধতির জয় ঘোষণা করেন, ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধী শাস্তি পায়, ন্যায়বিচার বলবৎ থাকে, সমাজ আবারও নতুন অপরাধী তৈরিতে নিয়োজিত হয়, গোয়েন্দা অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী মৃতদেহের। এই চক্রবৎ পরিক্রমার কাঠামো বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী মতাদর্শে পুঁজি, শ্রম ও পণ্যের দ্রব্যায়ণের মতোই বিশ্বজনীন, যাকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে চারিয়ে দেওয়া যায়। বার্তের পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা যেতে পারে, গোয়েন্দা সাহিত্য বুর্জোয়া মতাদর্শের জয়ধ্বনি দেওয়ার মানসিকতা তৈরির অন্যতম প্রধান অবলম্বন, আধুনিকতার রূপকথা।

গোয়েন্দা গল্পের আখ্যান কাঠামোয় দুটি স্তর স্পষ্ট। উপরিভাগে থাকে নির্দিষ্টের হিসাব, ভিতরে থাকে অনির্দেশ্যের টান। নির্দিষ্টকরণের স্তরে ঘটে বিশদ তথ্যের সমাহার— খুনের যথাযথ সময়, স্থান, মৃতদেহ কেমন অবস্থায় ছিল, তার পোশাক থেকে দেহের কোনো বিশেষ চিহ্ন, খুনের সময়ে সন্দেহভাজনদের গতিবিধির নাড়িনক্ষত্র সমস্ত খুঁটিনাটি গোয়েন্দার নখদর্পণে থাকতে হবে। অথচ ভিতরে এক অনির্দেশ্য কুহক, রহস্যের ধোঁয়াশা সবকিছুকে ঢেকে রাখে। সেই স্তরে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়, সবই কেমন যেন 'ছায়া কালো কালো'। হাজির পাত্ররা মুখে এক-মনে আরেক, সত্য-মিথ্যার ভেদ দুর্ভেদ্য। সেই কুহকের জাল ভেদ করার হাতিয়ার অবরোহী যুক্তি, যা প্রয়োগ করে উপরিভাগের নির্দিষ্ট প্রমাণকে পারম্পর্যে বিন্যস্ত করে গোয়েন্দা অন্দরের কুহক সরিয়ে সাধারণত একজনের দিকেই আঙুল তোলেন। এক বিশৃঙ্খল অবস্থা পেরিয়ে পরবর্তী বিশৃঙ্খলা ঘটার আগে পর্যন্ত পুনর্বহাল হয় শৃঙ্খলা, আইনের শাসন। এখানেই গোয়েন্দা সাহিত্যের বুর্জোয়া মতাদর্শগত অবস্থানের শ্রেণিভিত্তি। মেন্ডেলের মতে:

> (T)he common ideology of the original and classical detective story in Britain, the United States, and the countries of the European continent remains quintessentially bourgeois. Reified death; formalized crime-detection oriented toward proof acceptable in courts of justice operating according to strictly defined rules; the pursuit of the criminal by the hero depicted as a battle between brains; human beings reduced to 'pure' analytical intelligence; partial fragmented rationality elevated to the status of an absolute guiding principle of human behaviour; individual conflicts used as a generalized substitute for conflicts between social groups and layers— all this is bourgeois ideology par excellence, a striking synthesis of human alienation in bourgeois society.[64]

[64] তদেব, পৃ. ৪৭

মেন্ডেল-কথিত সেই পুঁজিবাদী সমাজ-প্রসূত আর্থার ক্যনান ডয়েলের শার্লক হোমস-আখ্যানে শিল্পবিপ্লব-সমকালীন ইংরেজ সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, আর সেখানেই ঐ বুর্জোয়া মতাদর্শের সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মেন্ডেলের মতে, শিল্প বিপ্লব-প্রসূত সমাজে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাসীন মতাদর্শের তরফে শ্রেণিচেতনা ও তজ্জনিত লড়াইকে অস্বীকার করে সবসময়েই সেগুলিকে 'অপরাধ' বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। বিদ্রোহী প্রলেতারিয়েত 'অপরাধপ্রবণ শ্রেণি'র তকমা পায়। তবে, এটাও দেখা যায় যে, ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও পারি কমিউনের অভিজ্ঞতার ফলে ফরাসি নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজে এই জাতীয় বর্গীকরণ গ্রাহ্য হয়নি।[65] শ্রেণি সংগ্রাম-মুখর ফ্রান্সে শ্রেণির পরিচয়কে 'অপরাধী' বলে দাগিয়ে দেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু, ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীতে নীচুতলার মানুষকে 'অপরাধপ্রবণ' বলে পেশ করা হলেও, সেখানে মধ্যবিত্ত কিংবা ধনী-অভিজাত 'অপরাধী'র নমুনাও বিরল নয়। বস্তুত, 'অপরাধী'র শ্রেণি-পরিচয়ের থেকেও যেটা বেশি ফুটে ওঠে তা হল সামাজিক সহগতির প্রশ্ন। 'অপরাধ' যে করে সে প্রচলিত সামাজিক সঙ্গতি বিনষ্ট করেছে। সেই সামাজিক সঙ্গতির বিধান শাসক শ্রেণির মতাদর্শে জারিত। ফলে, 'অপরাধী'কে শাস্তি দিয়ে, বহিষ্কার করে ঐ 'আইনের শাসন' তথা সামাজিক স্থিতিকে পুনর্বহাল করতে হবে। 'অপরাধ' নামের মুহূর্ত একটি ব্যতিক্রম। সেই ব্যতিক্রমকে শায়েস্তা করাই গোয়েন্দার কাজ। সেক্ষেত্রে সরকারি হোক বা বেসরকারি সকল গোয়েন্দাই রাষ্ট্র ও শাসকের মতাদর্শের ধ্বজাবাহক। সমস্ত গোয়েন্দা কাহিনীই শেষ হয় বুর্জোয়া মতাদর্শগত ইষ্টরক্ষার বার্তায়, যেন-বা আধুনিক রূপকথার শেষ অংশ: অপরাধী ধরা পড়িল ও শাস্তি পাইল; অপরাপর সকলে সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করতে থাকল— এই স্থিতাবস্থায় আবার যখন কোনো 'অপরাধ' ধাক্কা দেবে, তখন ভগবদ্গীতা-উক্ত কৃষ্ণের মত 'অধর্ম' তথা 'অপরাধ' দমন করে সুস্থিতি পুনরুদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হবেন গোয়েন্দা। সেই কথাটাই ফিরে মনে করিয়ে দেন মেন্ডেল:

> "The detective story is the realm of the happy ending. The criminal is always caught. Justice is always done. Crime never pays. Bourgeois legality, bourgeois values, bourgeois society, always triumph in the end. It is soothing, socially integrating literature, despite its concern with crime, violence and murder."[66]

পুঁজিবাদ, উপনিবেশ ও আইনের শাসন : প্রশাসনিক বাস্তবতা ও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্ব

আধুনিক পুঁজিবাদের প্রসারণক্ষেত্র হিসাবে আবিশ্ব ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার গোয়েন্দা কাহিনীকেও ছড়িয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন দেশে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বাংলা থেকেই শুরু হয়েছিল এবং তার ফলে ঔপনিবেশিক কাঠামোর গোড়াপত্তনের হাত ধরেই বাংলায় এসেছিল 'আইনের শাসন' বলবতে যত্নবান শৃঙ্খলা

---

[65] তদেব, পৃ. ৪৪

[66] তদেব, পৃ. ৪৭-৪৮

রক্ষা ও শাস্তিদানের বিভিন্ন প্রকরণ। সেই প্রকরণের অন্যতম ছিল পুলিশি ব্যবস্থা। ওদিকে পুঁজিবাদী ব্রিটেনেও শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে সামাজিক স্থিতি ধাক্কা খেয়েছিল। সেখানেও নজরদারির হরেক ফিকির তৈরি করে রাষ্ট্রীয় নীতিপ্রণেতারা চাইছিলেন ন্যায়ের এক নতুন যুগোপযোগী সংজ্ঞা তৈরি করতে। সেই সংজ্ঞা নির্ধারণে 'অপরাধ' নিয়ে রচিত সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বস্তুত, ১৮৬০-এর দশকে ইংরেজ সমাজে 'sensational' গোত্রের সাহিত্যের জনপ্রিয়তা শুদ্ধাচারীদের সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৬১ সালের ২৮ ডিসেম্বরে প্রকাশিত *The Spectator* পত্রিকায় জনৈক আলোচক রোমাঞ্চকর বা রোমহর্ষণ কাহিনীর বাড়বাড়ন্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, ঐ জাতীয় 'সেনসেশনাল' অর্থাৎ লোমহর্ষক আখ্যানের জনপ্রিয়তা ক্রমে বাড়ছে।[67]

ঐ গল্পগুলির মূল আকর্ষণ আপাতজটিল কাহিনীর বুনন। লেখক শুরুতেই একটি রহস্যপট তৈরি করেন এবং ক্রমে ক্রমে পর্দা সরানোর মত করে সেই রহস্য-কুহকের উপর থেকে আচ্ছাদন সরাতে থাকেন। এক দুর্দান্ত আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে পাঠক। সেই ধারার রচনায় উইলকি কলিন্সের খ্যাতি ও সিদ্ধি ছিল বিপুল। ঐ বর্গের সাহিত্যের নজির হিসাবে বিখ্যাত ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত কলিন্স-রচিত *The Moonstone*, অনেকের মতে, সেইটি 'প্রথম গোয়েন্দা কাহিনী'।[68] ঐ জাতীয় লোমখাড়াকরা গল্পের মধ্যে হিংসা ও যৌনতার প্রচ্ছন্ন বা প্রকট প্রলেপ সমালোচকদের নজর এড়ায়নি। তবে, সেইসঙ্গে বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী সমাজে পারিবারিক নৈতিকতার যে বৃত্তান্ত হামেশাই প্রচার করা হত, তার তলায় নিহিত অপরাধ, ব্যাভিচার ও জিঘাংসার প্রবৃত্তিগুলিও ফুটে উঠেছিল ঐধরনের লোমহর্ষণ আখ্যানগুলিতে। ফলে, সেখানে কুৎসার একটা বড় ভূমিকা ছিল। আদিপর্বে তাই ঐজাতীয় রচনা বহুলাংশে 'কেচ্ছা' আখ্যানের রূপ নিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত বাংলায় ঐ বিশেষ রকমের লোমহর্ষক সাহিত্যবর্গের প্রসার ঘটে। বাংলায়ও গোয়েন্দা সাহিত্য সৃষ্টির অব্যবহিত আগে ও সমকালেও অপরাধ সংক্রান্ত লেখাপত্রের একটা বড় অংশ ছিল কেচ্ছা কাহিনী। সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর (১৮৯১) প্রকাশের কিছুকাল আগেই ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৯, মতান্তরে ১৯১৬) কেচ্ছাকেলেঙ্কারি ও ক্রাইম কাহিনী ঘটনা নিয়ে বড় রহস্য উপন্যাস লিখতে বা অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। George W.M. Reynolds-লিখিত ও ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *Joseph Wilmot, or, The memoirs of a man-servant*-এর ছায়া অবলম্বনে দু খণ্ডে লেখেন বিলাতী গুপ্তকথা (১৮৮৮)। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ৬৪৪ পৃষ্ঠার আর একটি দীর্ঘ 'নবন্যাস' প্রকাশিত হয় আর এক নতুন! হরিদাসের গুপ্তকথা।

---

[67] Patrick Brantlinger, 'What Is "Sensational" About the "Sensation Novel"?', *Nineteenth-Century Fiction*, Vol. 37, No. 1 (Jun., 1982), পৃ. ১-২৮

[68] টি এস এলিয়টের মতে: "*The Moonstone* is the first and greatest of English detective novels." দ্রষ্টব্য: T. S. Eliot, 'Wilkie Collins and Dickens' (1927), *Selected Essays* (London : Faber & Faber, 1932), পৃ. ৪২৬

ভুবনচন্দ্রের সেই ‘গুপ্তকথা’ এককালে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বস্তুত, ‘বটতলা’ বইয়ের বাজার বলে যে পরিসরকে চিহ্নিত করা হয়, তার অন্যতম ‘বেস্টসেলার’ ছিল ঐ বইটি। হরিদাসের গুপ্তকথা আদতে দেশী ও বিলিতি নানারকম কেচ্ছা ও অপরাধের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক অনাস্বাদিতপূর্ব বর্গের রহস্য-রোমাঞ্চকর বই, যা বিলিতি ‘সেনসেশনাল’ সাহিত্যধারার অনুসারী ছিল। ভুবনচন্দ্রের ক্রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্যে একটি রচনা কুঞ্জবালা/ কাশ্মীর কুসুম (১৮৯০)। তার আখ্যানে নারীহত্যা, নারীহরণ, ডাকাতি, ইন্দ্রজাল, ডাকিনীবিদ্যা, সন্ন্যাসীর কেলেঙ্কারি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম অপরাধ ও রহস্য-রোমাঞ্চের সন্নিবেশ ঘটেছিল।[69] সেকালে ‘গুপ্তকথা’ শব্দটি পাঠকমহলে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল বলেই মনে হয়। তাই ঐ শব্দটি ভুবনচন্দ্রের আরও কয়েকটি বইয়ের শিরোনামে দেখা যায়, যেমন— বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা (১ম খন্ড-১৮৯০, ২য় খন্ড-সম্বৎ ১৯৪৭)।

নিছক কেচ্ছার বদলে পুলিশি তদন্তভিত্তিক রহস্যগল্পের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের সামাজিক ও মতাদর্শগত পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করেছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনে পুলিশি ব্যবস্থার বিভিন্ন সংস্কার। বস্তুত, পুলিশ আর গোয়েন্দা এই দুয়েরই ধারণাই ঔপনিবেশিক শাসনের ফল। ঔপনিবেশিক বাংলায় তথা পুরো ভারতীয় উপমহাদেশেই পুলিশি ব্যবস্থা শাসক-কর্তৃক আরোপিত ছিল। স্বভাবতই, প্রবল পরাক্রমশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তির প্রজারা বাধ্য হল সেই পুলিশি বন্দোবস্ত মেনে নিতে। কিন্তু, দেশীয় দারোগাদের দুর্নীতির ভুরিভুরি অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করল, যার অনেকগুলিই যথার্থ। বস্তুত, ক্ষমতাপুষ্ট দারোগারা অনেকেই ছিল ভ্রষ্ট, ঘুষ নিতে বদ্ধপরিকর এবং নিরপরাধ লোকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নাজেহাল করতে সিদ্ধহস্ত। উপরন্তু, শিক্ষিত ভদ্রলোক-সমালোচক ধরেই নিত যে, কোনো ভদ্রলোকে দারোগা হতে চায় না, বরং যারা যায় তারা প্রকৃতিগতভাবেই নিষ্ঠুর, অসৎ এবং লোভী।

১৮৩৬ সালের ডিসেম্বরে জ্ঞানান্বেষণ-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, বেতন ও উপরি উপার্জন মিলিয়ে দারোগার আয় রীতিমত ভাল। বস্তুত, দারোগাদের সেই অসদুপায়ে আয় ও ক্ষমতার অপব্যবহারের নমুনা মহামান্য সরকার বাহাদুরের গোচরে আনাই সেই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।[70] উপনিবেশে পুলিশি অত্যাচারের খবর ইংল্যান্ডেও গিয়ে পৌঁছোয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দীর্ঘ আলোচনার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্স ১৮৫৫ সালে একটি *Torture Commission*, বা পুলিশি নির্যাতন তদন্তের জন্য একটি ‘কমিশন’ ভারতে পাঠাতে বাধ্য হয়। ঐ কমিশনের তদন্ত উপলক্ষে, ১৮৫৫-এর ২১ জুনের *Hindu Patriot* সম্পাদকীয় রচনায় কলকাতায় থানায় ধৃত ব্যক্তিদের উপর দারোগার নির্যাতনের কিছু নমুনা দেয়।[71] এহেন ভ্রষ্ট দারোগা ব্যবস্থার

---

[69] সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৪

[70] ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর (১৮ পৌষ, ১২৪৩ বঙ্গাব্দ) ‘জ্ঞানান্বেষণ’-এ প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদনের বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪২), পৃ. ৩১১

[71] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, “সারজন্ থানার চৌকিদার”, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২-২৯৩

সংস্কার করে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে পুলিশ আইন প্রণয়ন করে ঔপনিবেশিক প্রশাসন পুলিশি-বন্দোবস্তকে 'আইনের শাসন' বলবতের উপযুক্ত করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল।[72]

একদা প্রবাদ ছিল জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যে কথা, এই তিন নিয়ে কলিকাতা। ঔপনিবেশিক শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই কলকাতা বিচিত্র অপরাধের কেন্দ্র হিসেবে (কু)খ্যাতি অর্জন করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক শাসক এবং নব্য-শিক্ষিত দেশীয়— উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শহর কলকাতায় 'অপরাধ', 'অপরাধী' ও তার শনাক্তকরণ সম্পর্কিত আলোচনা এবং তার সাহিত্যিক প্রতিফলন বিভিন্ন ভাবে ঘটেছিল। বস্তুত, ঔপনিবেশিক সমাজে উদ্ভূত বিভিন্ন চমকপ্রদ, তাজ্জবকর চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি ইত্যাদির তদন্ত ও অপরাধীদের ধরে শাস্তি বিধানের প্রয়াসে, বাংলা প্রদেশে 'স্পেশাল ডিটেকটিভ ফোর্স' নামে একটি স্বতন্ত্র পুলিশ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল ১৮৬৩-৬৪ সালে।

সেইসব সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতেই ক্রমে পুলিশি তদন্ত-আখ্যানকে পুলিশি-শিক্ষার কাজে লাগানোর পাশাপাশি সেগুলিকে রহস্যগল্পের অবয়বে বই হিসাবে পাঠকের সামনে পেশ করা শুরু হয়। এমন বইয়ের নজির হিসাবে অন্তত দুটি ইংরেজি বইয়ের উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি *Detective footprints, Bengal, 1874-1881: With Bearings for a Future Course*. বইটির লেখক Major H.M. Ramsay ছিলেন বাংলা প্রদেশের পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের Army and Navy Co-operative Society থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি ছেপে বেরোনোর দু-দশক আগে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ঔপনিবেশিক পুলিশের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন মেজর র‍্যামসে।[73] দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বিহার (১৭৭৪) কিংবা প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত-আগমন (১৮৭৬), ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও করেছেন তিনি।[74] নিজের দীর্ঘ কর্মজীবনে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন র‍্যামসে এই বিশ্বাসে যে, তাঁর আখ্যান শিক্ষাপ্রদ হবে। মূলত, পর্যবেক্ষণ-প্রাপ্ত তথ্যরাজিকে অবরোহ যুক্তিসঙ্গত পরম্পরায় বিন্যস্ত করে রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা-বৃত্তান্তই তাঁর আলোচনার উপজীব্য। সেহেতু, আখ্যানগুলি আদি পুলিশি-রহস্যবৃত্তান্ত হিসাবে সমাদৃত হয়েছিল। 'প্রমাণ' কাকে বলে ও কীভাবে তা সংগৃহীত হবে সে বিষয়েও র‍্যামসে আলোচনা করেছেন।

এই গোত্রের দ্বিতীয় বইটি ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার W. Newman & Co. কর্তৃক প্রকাশিত *Every Man His Own Detective!*. বইটির লেখক R. Reid একদা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন এবং র‍্যামসের রচনায় প্রিন্স অব ওয়েলসের যে ভারত-আগমনের কথা পাওয়া যায় সেই আগমনকালে

---

[72] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঁকাউল্লার প্রত্যাবর্তন", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭-২৯৯

[73] H.M. Ramsay, *Detective Footprints, Bengal, 1874-1881: With Bearings for a Future Course*. London : Army and Navy Co-operative Society, 1882), পৃ. vii - ix

[74] তদেব, পৃ. ১-১১

ভারতে ওয়েলসের যুবরাজের রক্ষার্থে ছায়াসঙ্গী ছিলেন রীড। সেই কথাটি বইয়ের আখ্যাপত্রে দস্তুরমত ঘোষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে কলকাতা পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ তদন্তকারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এই বইটিকে বস্তুত অপরাধের তদন্ত ও সূত্র অনুসন্ধানের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ পুস্তিকা বলা যেতে পারে। ঘটনাচক্রে লক্ষণীয় যে, ঐ একই বছরে বীটনের ক্রিসমাস অ্যানুয়ালে প্রকাশিত হয়েছিল আর্থার কোনান ডয়েলের প্রথম হোমস-আখ্যান— *A Study in Scarlet* (১৮৮৭)। রীডের বইটি চারটি পর্বে বিন্যস্ত: 'Physiognomy' বা মুখমণ্ডল, 'Observation' বা পর্যবেক্ষণ, 'The Art of Great Crimes' অর্থাৎ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের হালহকিকত বর্ণনা করে রহস্যানুসন্ধানের হরেক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং শেষত 'Detective Stories, Amusing and Instructive' পর্বে শুনিয়েছেন এমন কিছু রহস্য-তদন্ত যা একইসঙ্গে রোমাঞ্চকর ও সেহেতু পাঠকপ্রিয় এবং শিক্ষণীয়। প্রতিটি পর্বেই তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতার নানান বর্ণনা দিয়ে বক্তব্যকে প্রতিপন্ন করেছেন রীড। আলোচনা শুরু করেছেন তিনি মুখমণ্ডলের প্রসঙ্গ দিয়ে।[75] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপে ও তার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ভারতেও মুখমণ্ডল ও শারীরিক নানান গঠন-সংস্থানের সঙ্গে অপরাধপ্রবণতাকে মিলিয়ে বিচার করার পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদ জারি ছিল। সেই বিতর্কে গোড়াতেই সোজাসাপটা জানিয়েছেন রীড যে, তাঁর মতে মুখেই পড়ে মনের ছাপ। রীড জানেন যে, ততদিনে বিজ্ঞান হিসাবে ফিজিওনমির পালে বাতাস আর বিশেষ নেই, তবুও তিনি মনে করেন গোয়েন্দাকে মুখ পড়তে শিখতেই হবে:

> It is a well established fact in physiognomy, that the face is an unerring index to the human heart: those who hold an opinion adverse to this are men incapable no understanding, applying, or testing the value of this useful science. Delight, anger, fear, shame, guilt, or innocence can be traced in the expression of the face by any intelligent observer, and the educated eye of the detective may, with unerring certainty, distinguish guilt from innocence by a study of the human face alone.[76]

রীডের তদন্ত-জীবনের অন্যতম মোড়ঘোরানো ঘটনা ছিল ১৮৬৮ সালে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তরুণী রোজ ব্রাউনের বীভৎস হত্যাকাণ্ড, যা বইটিতে আমহার্স্ট স্ট্রিট রহস্য নামে উল্লিখিত হয়েছিল। সেই তদন্তে ফরেনসিক ফটোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, যার রেওয়াজ তখন খুবই বিরল ছিল। পাশাপাশি মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য পোস্টমর্টেম ফটোগ্রাফের বহুল প্রচার করা হয়। রীড তখন সাধারণ পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। কিন্তু রোজ ব্রাউন হত্যারহস্যের সঙ্গে যুক্ত গোয়েন্দা হিসাবে রীডের ব্যক্তিগত দক্ষতার ব্যাপক প্রচার ঘটেছিল। নিছক অনুমান নয়, বরং সন্দেহভাজনের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে নস্যাৎ করে দোষীকে চিহ্নিত করার যে প্রকরণ গোয়েন্দা-রহস্যের প্রধান ভিত্তি তারই প্রয়োগ করেছিলেন রীড। তাঁর মতে, গোয়েন্দা হতে গেলে হস্তলিপি বা ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কেও ধারণা থাকতে।[77] পাশাপাশি, গোয়েন্দাও যেহেতু মানুষ, অতএব তিনি সর্বদা

---

[75] R. Reid, *Every Man His Own Detective!* (Calcutta : W. Newman & Co., 1887), পৃ. ১-৩

[76] তদেব, পৃ. ১

[77] তদেব, পৃ. ৬৫-৭০

অভ্রান্ত হতে পারেন না এবং দক্ষতার পাশাপাশি দুর্নীতিও যে গোয়েন্দাকে গ্রাস করতে পারে, সে বিষয়েও আলোচনা করে পাঠককে সাবধান করেছেন রীড:

> The reader of this little work on the art of detection must not jump to the conclusion that an experienced detective, if well on his guard, will never make a mistake, or allow himself to be "sold" by even the acutest sharper that ever trod the earth's surface. Detectives are "sold" like men of all other professions, and sometimes very cheaply too…[78]

বস্তুত, একদিকে রোজ ব্রাউনের হত্যার মত শহর-কাঁপানো ভয়াবহ কাণ্ড, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বিশেষীকৃত গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিষ্ঠা, এবং তার অভিঘাতে রহস্য-রোমাঞ্চ তথা গোয়েন্দা কাহিনীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আমহার্স্ট স্ট্রিট হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে শহুরে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মিশে ছিল ঔপনিবেশিক পুলিশি ব্যবস্থার প্রতি নাগরিকের গভীর অসন্তোষ। সেই অসন্তোষের মোকাবিলা করে নাগরিক প্রজার আস্থা পুনরুদ্ধার এবং আইনের শাসন বলবৎ করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার এবং কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান স্যার ষ্টুয়ার্ট সন্ডার্স হগ (১৮৩৩-১৯২১) জটিল এবং অ-স্বাভাবিক অপরাধ মোকাবিলার জন্য তৎপর হন। ১৮৬৮ সালের ২৮ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি বিশেষায়িত গোয়েন্দা বাহিনী তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। তার ফলে ক্রমে কলকাতা পুলিশের অন্দরে একটি আধুনিক, প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে উঠেছিল, যা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশেই ঔপনিবেশিক নজরদারি তথা প্রশাসনিকতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখনীয় বিবর্তন। এই নবগঠিত গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন শ্বেতাঙ্গ প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট — 'স্পেশাল ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল'। চারজন বাঙালি 'একস্ট্রা এসিস্ট্যান্ট সুপরিন্টেন্ডেন্ট' এবং তাদের অধীনে দশজন 'হেড কনস্টেবল', দশজন 'দ্বিতীয় শ্রেণী'র কনস্টেবল এবং দশজন 'তৃতীয় শ্রেণী'র কনস্টেবল ছিলেন। সুপারিনটেনডেন্টকে তদন্ত পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।[79]

তবে প্রাথমিক পর্বে গোয়েন্দা বিভাগকে নানান দোলাচলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। হগের উত্তরসূরী স্যার ষ্ট্যানলি ওয়াউচোপ গোয়েন্দা বাহিনীকে সাময়িকভাবে বিলুপ্ত করেছিলেন। যদিও আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটলেও, গোয়েন্দারা সরাসরি কমিশনারের কাছে জবাবদিহি করত। পরবর্তীকালে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিভাগটি পুনর্গঠিত হয় এবং রিচার্ড রিড দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুত, কলকাতার পুলিশ বিভাগ অন্যান্য প্রধান ভারতীয় শহরগুলিতে আধুনিক পুলিশি ব্যবস্থার আদর্শমান হিসাবে কাজ করেছিল। উপরন্তু, রোজ ব্রাউন মামলা ও পরবর্তী অন্যান্য তদন্তের ক্ষেত্রে নানান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তদন্তের আওতায় আনা হয়েছিল। ব্রাউন হত্যাকাণ্ডে মৃত ব্যক্তির শনাক্তকরণ এবং অপরাধের দৃশ্য সংরক্ষণের জন্য ফটোগ্রাফির ব্যবহারিক প্রয়োগ হতে দেখা যায়। একটি নির্দিষ্ট তদন্তের আওতায় নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা হয়েছিল, এবং ক্রমে বিভিন্ন ফরেনসিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটতে দেখা

---

[78] তদেব, পৃ. ৬২

[79] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঁকাউল্লার প্রত্যাবর্তন", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-২৯৯

যাবে। ঔপনিবেশিক সমাজে অপরাধীর শনাক্তকরণ ক্রমে একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর প্রতর্কে পরিণত হবে, যেখানে সাক্ষ্য-সাবুদের অভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠাই হয়ে উঠেছিল আইনের শাসনের ভিত্তি। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নৃদেহ পরিমাপের উপর ভিত্তি করে অপরাধমূলক রেকর্ড বজায় রাখার জন্য একটি অ্যানথ্রোপোমেট্রিক ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়।[80] এর কয়েক বছর পরেই ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা পুলিশের মহাপরিদর্শক এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরির নেতৃত্বে, কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের প্রথম ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো চালু হয়। দশ আঙুলের ছাপের নকল নথিবদ্ধ করার এহেন ব্যবস্থাটি খান বাহাদুর আজিজুল হকের গাণিতিক সূত্র এবং রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র বসুর উপ-শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থা দ্বারা আরও পরিমার্জিত হয়েছিল। বড়কর্তা হেনরির নামে চললেও, এই পদ্ধতি উদ্ভাবনে হক ও বসুর ভূমিকা তথা কৃতিত্ব ঔপনিবেশিক প্রজার বৌদ্ধিক উৎকর্ষের পরিচয়বাহী ছিল (এই বিষয়টি চতুর্থ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে)। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ফরেনসিক সেরোলজি বিভাগ, যা অপরাধ তদন্তে রক্তের এবং বিভিন্ন দাগ পরীক্ষা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে তদন্তের কাজে ব্যবহারের সুবিধা করে দেয়। তার কয়েক বছর পরে ১৯১৫ সালে তৈরি হয় অপরাধস্থলে পাওয়া পায়ের ছাপ থেকে অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্য একটি ফুটপ্রিন্ট বিভাগ এবং ১৯১৭ সালে জাল টাকা পরীক্ষা করার জন্য একটি টাকা জালিয়াতি বিভাগ গড়ে উঠেছিল।

পাশ্চাত্যে তৈরি হওয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কৌশল-পদ্ধতিকে কাজে লাগানো বা দেশজ উদ্ভাবনের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসক ক্রমে তদন্তে 'স্থানীয় জ্ঞান' এর ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধেও অবহিত হয়েছিল। ফলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে শিক্ষিত বাঙালিদের সম্প্রদায়ের একটা অংশ পুলিশি কাঠামোয় যোগ দিতে থাকে। ১৮৫৫ সালের কলকাতার পুলিশ রিপোর্টে বাঙালিদের সম্বন্ধে বলা হয় যে দৈহিক শক্তিতে অযোগ্য বলে এদের দিয়ে কনস্টেবলের কাজ হবে না, কিন্তু গোয়েন্দাগিরির জন্য বাঙালিরা সবচেয়ে উপযুক্ত।[81] ১৮৬০-এর দশকে অবশ্য স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ প্রাথমিকভাবে বাহিনীতে 'স্থানীয়দের' নিয়োগের বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রমে শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকেই তদন্তকারী হিসাবে ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিলেন। এই পর্বের বাঙালি তদন্তকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নবকৃষ্ণ ঘোষ, বৈদ্যনাথ মুখার্জি প্রমুখ। এঁদের কৃতিত্ব শাসক-কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয় এবং অনেক সময়ে তাঁদের গোয়েন্দা কর্মকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ রায় বাহাদুর বা খান বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিও দেওয়া হত। বাগবাজারের বসুবাটির সন্তান ও কেশবচন্দ্র শেনের অনুগামী কালীনাথ বসু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ হিসাবে নিযুক্ত হন। তার আগেই ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কালীনাথের তদন্ত-দক্ষতায় ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার মুকুটের রত্ন উদ্ধার করে দেওয়ায় পুরস্কৃত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে

---

[80] প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, পূর্বোক্ত H.M. Ramsay, *Anthropometry in Bengal: Or, Identification of Criminals by Anthropometric Measurement and Thumb Impressions* (Calcutta : Thacker, Spink & Co., 1889) নামেও একটি বই লিখে নৃদেহ পরিমাপবিদ্যা ও আঙুলের ছাপের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক বাংলায় 'অপরাধী' শনাক্তকরণ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

[81] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "সারজন্ থানার চৌকিদার", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

ইম্পিরিয়াল পুলিশ সার্ভিসের ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রথম ব্যক্তি জাকির হুসেন (১৮৯৭-১৯৭১)-এর কথাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়।

র‍্যামসে ও রীডের রচনার ধারা দেশীয় সমাজেও অনুসৃত হয়েছিল। বস্তুত, 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ঔপনিবেশিক শাসক-কর্তৃক ঠগিদমনের পাশাপাশি দেশের মানুষকে নিরাপত্তা দিতে যে ফাঁড়ি-দারোগা ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল, তার সঙ্গেই জুড়েছিল দারোগাদের তদন্ত বৃত্তান্তের প্রতি পাঠকের আগ্রহ। সুকুমার সেনের মতে, 'ফাঁড়িদারোগা' ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই ঔপনিবেশিক বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনী রচনা শুরু হয়েছিল:

> ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের পরেই বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা-কাহিনী রচনা শুরু হয়েছিল। ডিটেকটিভ কাহিনীর যথার্থ উৎপত্তি হয়েছিল পুলিশী ব্যবস্থার প্রবর্তনের পরেই। এ ব্যবস্থা ফরাসী দেশে প্রথম চালু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে, নেপোলিয়নের সময়। তারপর ব্রিটেনে ও ভারতে পুলিশী ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল শতাব্দীর তৃতীয় দশকে।[82]

পুলিশি কাজকারবারে তৈরি হওয়া আগ্রহজাত বাজার যে ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় *The Confession of Meajahn, Darogah of Police* (১৮৬৯), বাঁকাউল্লার দফতর (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুসারে প্রকাশ কাল ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ), সেকালের দারোগার কাহিনী (১৮৮৮), পুলিশ ও লোকরক্ষা (১৮৯২) প্রভৃতি বইগুলির প্রকাশ। রচনার শৈলীর তারতম্য সত্ত্বেও খেয়াল করা দরকার যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু কিছু তদন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যা বাংলায় আদিপর্বের রহস্য-রোমাঞ্চকর বা 'সেনসেশনাল' সাহিত্য গোত্রানুসারী। বাঁকাউল্লার বইটি সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন:

> সেকালে ঠগীর ও ডাকাতের অত্যাচার খুব বেড়ে যাওয়ায় এদের দমনের জন্য কর্নেল স্লীম্যান কমিশনার নিযুক্ত হলেন। তিনি কয়েকজন দারোগা নিয়োগ করেছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন এক ভদ্রবংশীয় চতুর বাঙালি যুবক। নাম বরকতউল্লা। দারোগাগিরি বাদে এর অসামান্য চাতুর্য ও ধূর্ততার জন্য লোকের মুখে নামটি দাঁড়ায় 'বকাউল্লা'। পরে এঁর নাম বাঁকাউল্লায় পরিণত হয়েছিল। বরকতউল্লার দক্ষতার কতকগুলি কাহিনী ঠগী কমিশনারের ফাইল থেকে উদ্ধার করে ছাপা হয়েছিল ইংরেজীতে। কবে এবং কে তা করেছিলেন জানা নেই। অনুমান করি ১৮৫৫ সালের আগে নয়। যিনি সংকলন করেছিলেন তাঁর মনে আদর্শ হয়তো ছিল ফরাসী ভিদকের মেমোয়ার্স। অনেক কাল পরে বইটি বাংলায় রূপান্তরিত ও মুদ্রিত হয়েছিল 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' নামে।[83]

বস্তুত, একথা বোধহয় বলাই যায় যে, এইসব রচনাগুলিই বাংলায় আদিপর্বের দারোগা-পুলিশের তদন্ত বৃত্তান্তের বাজারি জনপ্রিয়তার ভিত্তি নির্মাণ করেছিল। সেই বাজার সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হয়ে ও তার উপরে নির্ভর করেই নিজের অভিজ্ঞতা মুদ্রিত রূপে নিয়ে এসেছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। এখানে খেয়াল করা জরুরি যে, বাঁকাউল্লার বর্ণনায় কিংবা গিরিশচন্দ্রের দারোগা-কাহিনীতে ঔপনিবেশিক দারোগার যে বীভৎস রূপটি হাজির হয়, তার বদল ঘটে গিয়েছিল প্রিয়নাথের রচনায়। শাস্তির সঙ্গে জড়িত বীভৎসতা ক্রমে ঢাকা পড়ে যেতে থাকে রহস্যের

---

[82] সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

[83] তদেব, পৃ. ১৪৬-১৪৭। অবশ্য এই বইটির প্রকৃত লেখক ও তাঁর পরিচয় নিয়ে বিতর্ক আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে।

তদন্তে নিহিত ধাঁধা সমাধানের রোমাঞ্চে। সমালোচকেরা বলেন যে, বাংলা ভাষায় প্রকৃত গোয়েন্দা কাহিনির সূত্রপাত ঠিক কবে হয়েছিল তার সুনিশ্চিত সাল তারিখের সাক্ষ্য-সাবুদ পেশ করা মুশকিল। তবে, একই সঙ্গে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দু-দশকে বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনির বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।[84]

দারোগা প্রিয়নাথ ও তাঁর দপ্তরের অনুসন্ধান

প্রকৃতপক্ষে, বাঁকাউল্লা কিংবা গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিলে বাস্তব পুলিশি তদন্ত এবং গোয়েন্দা সাহিত্যের সেতুবন্ধনের ক্ষেত্রে সবথেকে জনপ্রিয় ভূমিকা ছিল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের। নদীয়া জেলার মানুষ হিসাবে ছোটোবেলা থেকেই প্রিয়নাথের মনোজগতে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কিংবা গ্রামে ডাকাতির মত বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার অভিজ্ঞতা ছিল। পরবর্তীকালে, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র প্রিয়নাথ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সরকারের পুলিশ বিভাগে যোগ দেন ও দীর্ঘ তেত্রিশ বছর সেখানে কাজ করেন। পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের দারোগা হিসেবে তিন দশক যাবৎ তিনি বহু হত্যা, জালিয়াতি ও জুয়াচুরির তদন্ত করেন। সেই সব অপরাধের অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রিয়নাথ বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসেন ও অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। দারোগার দপ্তর-এর বিভিন্ন আখ্যানে হরেক তদন্তের বিবরণী প্রসঙ্গে উনিশ শতকের শেষার্ধের ঔপনিবেশিক সমাজে অপরাধ জগতের একটা আলো-আঁধারি-ঘেরা পরিমণ্ডলের হদিশ পাওয়া যায়। 'বাবু' প্রিয়নাথের লেখায় ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু 'ভদ্রলোক' বর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছিল। বস্তুত, দেখা যায় যে, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য কেবল নিছক সাহিত্যগত বিনোদনের উপকরণের সীমা অতিক্রম করে ঔপনিবেশিক আধুনিকতাজাত নৈতিকতার ভাষ্য নির্মাণ করে চলেছিল এবং সেই ভাষ্যের নতুনত্ব ও চাকচিক্য পাঠকের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। গোয়েন্দা কাহিনীর বাজার শিক্ষিত বাঙালি সমাজে যে ক্রমে বিস্তৃত হয়েছিল এটিই ছিল তার অন্যতম কারণ। ক্রমে দেখা যাবে যে, সমকালীন বিভিন্ন সামাজিক প্রতর্কের ছাপ গোয়েন্দা আখ্যানে পড়েছে।

আলোচকরা সাধারণত বাংলায় মৌলিক গোয়েন্দা কাহিনির আদি লেখক বা 'জনক' হিসাবে সাধারণত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কেই গণ্য করেন। তাঁর বহুল পঠিত দারোগার দপ্তর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে মোট ২১৭টি কিস্তিতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য, দারোগার দপ্তর প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৮৯১ সাল থেকে। কিন্তু, স্বয়ং প্রিয়নাথ জানান যে, তার আগেই ১৮৮৭ সালে (১৮০৯ শকাব্দ) তাঁর ডিটেক্‌টিভ পুলিস-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়: "ডিটেক্‌টিভ পুলিস" ইতিপূর্ব্বে "বিজলী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সপ্তাহে সপ্তাহে

---

[84] অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৭ [২০১৬]), পৃ. অনির্দেশিত

প্রকাশিত হইত।"[85] সেইদিক থেকে বিচার করলে একজন আলোচক যথার্থ বলেছেন যে, দারোগার দপ্তর নয় বরং বিজলী-তে প্রকাশিত প্রিয়নাথের ডিটেক্‌টিভ পুলিস প্রকাশকেই বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির সূচনাবিন্দু হিসাবে ধরা উচিত।[86] ঊনবিংশ শতকের বাংলায় ইংরেজি শিক্ষিত ঔপনিবেশিক প্রজার যে সংস্কারক মন তারই আদলে প্রিয়নাথের ডিটেক্‌টিভ পুলিস আখ্যান গড়ে উঠেছিল। বইটির প্রথম কাণ্ডের— ডাক্তারবাবু— 'ভূমিকা'য় গ্রন্থকার লিখেছিলেন:

> সদ্‌গুণ-ভূষিত মহৎ-লোকের জীবনী বা তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপ সাধারণের আদর্শীভূত হইয়া যেমন শিক্ষাপ্রদ হয়, বহুদোষাকর ঘৃণিত লোকের লোক-বিগর্হিত ভয়ানক পাপকার্য্য সকলও সেইরূপ সাধারণের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া প্রত্যক্ষীভূত করাইতে পারিলে, তদ্দ্বারা তাহাদের পাপের প্রতি ঘৃণা শতগুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে।... একটী প্রভু-ভ্রাতা দ্রোহী, নষ্ট-প্রকৃতি অথচ সুচতুর বুদ্ধিমানের কতিপয় কার্য্যকলাপ যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি এবং ক্রমে এইরূপ পথে আরও প্রবেশ করিতে সচেষ্ট থাকিব। এক্ষণে সাধারণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন আমার এই নূতন উদ্যমে আমাকে উৎসাহিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন পক্ষে যেন অধিকতর সহায় হন।[87]

ডিটেক্‌টিভ পুলিস বইয়ের আখ্যাপত্রে প্রিয়নাথ দাবি করেছিলেন যে সেটি 'সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত'। পরবর্তীকালে দারোগার দপ্তর-এও সেই একই দাবি ঘোষিত হয় যে, বর্ণিত আখ্যানগুলি মূলত সত্য, লেখকের স্বীয় অভিজ্ঞতা-নির্ভর। বস্তুত, পুলিশের চাকরি করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজে মাথা-চাড়া-দেওয়া হরেক কিসিমের অপরাধের তদন্ত-অভিজ্ঞতার একটা সুসংহত আর মার্জিত রূপ প্রকাশ পেল প্রিয়নাথের মত অবসৃত দারোগার রচনায়। লেখনীর মেজাজগুণে তা যেমন বাঁকাউল্লার কথন থেকে আলাদা, তেমনই শিক্ষিত দারোগা গিরিশচন্দ্রের লেখার মধ্যে যে আত্মপক্ষ সমর্থনের তাগিদ দেখা যায়, তার থেকেও প্রিয়নাথের লেখার প্রভেদ স্পষ্ট। কারণ ঔপনিবেশিক সমাজে হিন্দু-শিক্ষিত-ভদ্রলোক দারোগা ততদিনে অনেক বেশি সপ্রতিভ হয়েছে এবং পেশা হিসাবেও দারোগার সামাজিক সম্মান বেড়েছে।[88]

উপরন্তু, কেবল সমাজের কেচ্ছার পুনরাবৃত্তি নয়, বরং দারোগার বৃত্তান্তে উঠে আসতে শুরু করেছিল 'অপরাধ', 'অপরাধী', তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীর শনাক্তকরণ ও আইনানুগ শাস্তিবিধান এবং সেই সবের মাধ্যমে আইন তথা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তান্ত। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত সেই বিচিত্র জগতের হদিশ দিয়ে প্রিয়নাথ যে ঔপনিবেশিক বঙ্গীয় পাঠকের 'সেনসেশনাল' সাহিত্যের চাহিদা পূরণ করছেন এবং ভদ্রলোক

---

[85] প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, 'বিজ্ঞাপন', ডিটেক্‌টিভ পুলিশ, প্রথম কাণ্ড (কলিকাতা : সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার, ১৩০০ বঙ্গাব্দ [১৮০৯ শকাব্দ])

[86] অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৭), পৃ. অনির্দেশিত

[87] প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', প্রাগুক্ত।

[88] ১৮৩০-এর দশকে জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তুলনা করে রায়বাহাদুর খেতাবপ্রাপ্ত 'বাবু' প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক সম্মানের ঊর্ধ্বগতি লক্ষণীয়।

পাঠকের কাছে সেই গোত্রের আখ্যানের কদর যে ক্রমে বেড়েছিল তার প্রমাণ সমকালীন আলোচক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে পাওয়া যায়: "শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Detective Story—গুলি বঙ্গভাষায় মৌলিক Sensational Novel রূপে পরিগণিত হইবার উপযোগী।"[89] তাছাড়া প্রিয়নাথের রচনায় যে প্রসাদগুণ আছে তাও খেয়াল করিয়েছিলেন তিনি:

> প্রিয়বাবুর পুস্তকগুলির অধিকাংশেই তিনি স্বয়ং প্রধান অভিনেতা প্রায় সর্বত্র তিনি অন্ধকার কোটর-মধ্যস্থ পাপীকে নিষ্কাশিত করিবার নিমিত্ত, উদ্যতভাবে দণ্ডায়মান। তিনি সুযোগ্য ও অসীম প্রতিভাসম্পন্ন রাজকর্মচারী। তাঁহার পুস্তকোক্ত অধিকাংশ পাপীকে, তিনি স্বয়ং হাতে-কলমে টানিয়া আনিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ সত্যের সম্মিলনে তাঁহার গ্রন্থোক্ত ঘটনাবলী সজীবভাবে পাঠকের নয়নসম্মুখে সমুপস্থিত হয়। প্রিয়বাবুর ভাষাও বড় সরল। অনুপ্রাসের কাননে প্রবেশ করিয়া শব্দপ্রসূন-চয়নে তিনি প্রয়াসী নহেন। অলঙ্কারের কণ্টকে তাঁহার ভাষাসুন্দরী শোণিত বিলেপিত কায়া নহেন। এই গ্রন্থগুলিতে সরল কথায়, সরলভাবে, সজীব চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রিয়বাবু আপনার রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আশা করি, সকলেই এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমোদলাভ করিবেন।[90]

দারোগার দপ্তর প্রকাশের কয়েক বছর আগে অনুসন্ধান নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বেরোতে শুরু করে।[91] অনুসন্ধান-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ। পত্রিকাটির কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন দুর্গাদাস লাহিড়ী। অনুসন্ধান প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল অভিনব। পত্রিকার বক্তব্য ছিল এই যে, সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার প্রচলন হয়েছে, যার মাধ্যমে লোকে অসাধু উপায়ে অন্য মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে: "পাপের সংসার; নিয়তই অসত্য,— চারিদিকেই প্রবঞ্চনা! তাহাতে পড়িয়া সজ্জন হাবুডুবু খাইতেছেন; পাপী আনন্দে নৃত্য করিতেছে।"[92] সেইসব 'পাপী', 'জুয়াচোর'দের হদিশ দিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য গড়ে তোলা হয় 'অনুসন্ধান-সমিতি'। নানা ধরনের প্রতারক ও তাদের ব্যবহৃত বিবিধ উপায় সম্বন্ধে প্রচারের মাধ্যমে পাঠককে ও তার মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজকে অবগত করা ও সাহায্য করাই ছিল উক্ত সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুত, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রসারের সঙ্গে নিত্যনতুন জালিয়াতির পদ্ধতি যে অঙ্গাঙ্গি জড়িত সেই কথাও অনুসন্ধান-এর বক্তব্যে স্পষ্ট:

> সভ্যতা ও শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীরও নানারূপ নূতন নূতন ফন্দী বাহির হইতেছে। আগে চুরী ডাকাতি সব সাদাসিদে রকমের হইত; এখন যতই কঠোর শাসন আসিতেছে,, যতই শিক্ষা ও সভ্যতা বাড়িতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীরও নূতন নূতন কৌশল উদ্ভব হইতেছে। আমাদের

---

[89] অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), "দারোগার দপ্তর' প্রসঙ্গে', রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ১ (কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৪), পৃ. অনির্দেশিত

[90] তদেব

[91] পরে অষ্টম বর্ষ, ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২১ বৈশাখ থেকে এটি সাপ্তাহিকের রূপ নেয়।

[92] অনুসন্ধান, ১ম সংখ্যা, ১ম খণ্ড, ১৩ শ্রাবণ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/csss/Anusandhan_Lahiri-ed/Anusandhan_Vol_01.pdf

> অভিজ্ঞতায় আমরা দিন দিন যে, সকল জুয়াচুরীর বিষয় দেখিতেছি, পূর্ব্বে কেহ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছেন কিনা, সন্দেহ! কিন্তু সভ্য জগতের অপার মহিমা![93]

বিভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রে কেবল প্রতিবেদন লিখে যে ঐসব নানারকম জালিয়াতির ফিকির বিষয়ে গণসচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, সেটা বুঝেই সমিতির তরফে নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেহেতু অনুসন্ধান পত্রিকার আত্মপ্রকাশ:

> অনুসন্ধান-সমিতি গুরুভার বুঝিয়া জুয়াচোরগণের সন্ধানে সর্ব্বদাই তটস্থ আছেন; জুয়াচোরগণ কখন কিরূপভাবে কার্য্য করিতেছে, সেদিকে নিয়তই তাঁহার লক্ষ্য। আর, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে যাইলে কখন কোন ব্যক্তি কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া তাহা সাধারণকে জানান কর্ত্তব্য… এই সকল কারণেই, লোকে যাহাতে আর সামান্যরূপও না ঠকেন— এই আশায় সমিতির মুখপত্র হিসাবে 'অনুসন্ধান' প্রকাশিত হইতে চলিল। এখন অনুসন্ধানের উপকারিতা!— অনুসন্ধানের উপকারিতার বিষয়ে চিন্তা করিবার পূর্ব্বে একবার দেখা উচিত, কলিকাতার জুয়াচুরি কত রকমের। আর, কত প্রকারেই বা কলিকাতা ও সরল বিশ্বাসী মফস্বলবাসী প্রতারিত হইতেছেন ? তাহা দেখিলে সহজেই এরূপ পত্রিকার উপকারিতা সাধারণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব।[94]

ঔপনিবেশিক সমাজে হরেক কিসিমের 'জুয়াচোর' সম্পর্কে পাঠকবর্গকে সচেতন করে তোলার এহেন চেষ্টায় জনসাধারণ নিশ্চয়ই কিছুটা উপকৃত হয়েছিলেন এবং অনুসন্ধান-কে গ্রহণ করেছিলেন; কারণ পত্রিকাটির অন্ততঃ আট বছরের বিভিন্ন সংখ্যা এখনও মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে।[95] তাছাড়া পাঠকের আনুকূল্যের ফলেই নিশ্চই একসময়ে পত্রিকাটি পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিভিন্ন 'প্রলোভন'-এর ফাঁদ ও 'প্রতারণা'-র ফিকির থেকে পাঠককে সাবধান করার ব্রতে রত অনুসন্ধান-এ অবশ্য অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লেখা ছাপা হত।[96] ফলে, সাহিত্য-পত্র হিসাবেও পাঠকের কাছে পত্রিকাটির সমাদর ছিল। সমকালীন বহু মান্য লেখকের রচনাই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[97] পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নিয়মিত

---

[93] 'কলিকাতার জুয়াচুরি', অনুসন্ধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[94] অনুসন্ধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[95] অনুসন্ধান-এর মূল পত্রিকাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ রক্ষিত আছে। সেন্টার ফর ষ্টাডিজ় ইন সোশাল সায়েন্সজ়-এর হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমরিয়ল আর্কাইভে মাইক্রোফিল্ম কপিগুলি আছে এবং সেন্টার ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউট-এর যৌথতায় সেগুলির ডিজিটাল কপি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে— https://fid4sa-repository.ub.uni-heidelberg.de/view/schriftenreihen/sr-34.html?lang=en

[96] ঔপনিবেশিক শাসকের নানান কার্যকলাপ থেকে শুরু করে দেশীয় সমাজের হরেক বৃত্তান্ত, এমনকী একজন চোরের আত্মকথনও ছাপা হয়েছিল! দ্রষ্টব্য: 'সিঁদচুরী (চোরের নিজের মুখের কথা)', অনুসন্ধান, ৩য় সংখ্যা, ১ম খণ্ড, ১৫ ভাদ্র, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০-৪২। প্রবন্ধটির পরিচিতিতে বলা হয়েছিল: "নবজীবন পত্রিকায় 'বেদিয়া চোর' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের লেখক নিজ চোরের মুখে শুনিয়া যাহা লিখিয়াছেন, এ প্রবন্ধটী (স্থল বিশেষে তাঁহার ভাষাতেই) তাহার সংক্ষিপ্ত করণ মাত্র।" (নিম্নরেখ সংযোজিত)। নবজীবন-এর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/csss/Anusandhan_Lahiri-ed/Anusandhan_Vol_01.pdf

[97] অনুসন্ধান-এর লেখকবর্গের মধ্যে ছিলেন – পন্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, দামোদর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, অক্ষয়কুমার বড়াল, বীরেশ্বর পাঁড়ে, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র সরকার প্রমুখ। সে আমলের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অনেক সময়েই লেখকদের নামের পাশে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচায়ক ডিগ্রির উল্লেখ থাকত। আবার যে সব পত্রিকায় লিখে অনেকে খ্যাতিমান হয়েছেন সে সব পত্রিকারও নামের উল্লেখও বন্ধনীর ভিতরে থাকত।

লেখক। অনুসন্ধান-এর বিভিন্ন সংখ্যায় বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য ছাপা হতে থাকে। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের একটি সংখ্যায় ডিটেক্‌টিভ পুলিশ রচনা সম্পর্কে লেখা হয়:

> প্রিয়নাথ বাবু ডিটেক্‌টিভ পুলিশের সব ইনস্পেক্টর; তিনি আপন কার্য্যকালে এক হতভাগ্য 'ডাক্তার বাবুর' পাপ-জীবনের যে সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চিত্র দেখিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে লিখিত আছে। 'ডাক্তার বাবুর' জীবন বড়ই বিভীষিকাময়; 'ডাক্তার বাবুর' পাশ করা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সকল ভাগই জাল-জুয়াচুরীতে পূর্ণ, — ইহার মধ্যে তিনি আবার চার-চারিটী নরহত্যাও করিয়াছেন। অধিক কি, ডাক্তার বাবু পরিতাপ-কালে নিজেই বলিয়াছেন,— "যে যে মহাপাপের সংঘটন করিয়াছি, তাহা অন্যের করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে না।" ইউরোপ প্রভৃতি সভ্য দেশে গোয়েন্দা পুলিশের সন্ধানাদি সর্ব্বদাই প্রকাশ হয়; এই জন্যই সকলে সে সকল বিষয় জানিতে পারে। এ দেশে গবর্ণমেন্ট হইতে সে প্রথা না থাকিলেও, তাহা প্রকাশে প্রিয়নাথ বাবু অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদ পাইবেন।[98]

১২৯৫ বঙ্গাব্দে অনুসন্ধান আবার প্রিয়নাথের কর্মকৃতি সম্পর্কে পাঠককে অবগত করে 'সংবাদ' দেয়:

> ডিটেক্‌টিভ পুলিসের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম 'অনুসন্ধানের' পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও অজানিত নাই। 'অনুসন্ধানের' প্রতি সংখ্যাতেই প্রায় পাঠকগণ তাঁহার রচিত সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন।... হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুইজন ইংরাজ ডাকাইত জেল হইতে পলায়ন করে; সম্প্রতি প্রিয়নাথ বাবু বহু অনুসন্ধানে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছেন। তজ্জন্য গভর্ণমেন্টে তাঁহার বড়ই খোসনাম হইয়াছে; তিনি পারিতোষিক পাইয়াছেন। এবং দেশের লোকেও জানিয়া বিস্মিত হইয়াছেন যে, এমন বাঙ্গালী এখন পর্যন্তও এ-দেশে আছেন, যিনি দুই-দুইজন ইংরাজ ডাকাইতকে বিনা অস্ত্র-সস্ত্রে ধরিয়া আনিতে পারেন। যাইহোক, প্রিয়নাথ বাবুর দিন দিন পদোন্নতি হউক, ঈশ্বর-সমীপে আমাদের এই প্রার্থনা।[99]

পরবর্তীকালে যখন প্রিয়নাথ আলাদা করে দারোগার দপ্তর লিখতে থাকেন তখনও অনুসন্ধান পত্রিকায় তার প্রথম খণ্ড প্রকাশের খবর বের হয় এবং সেই সংকলনের বেশ কয়েকটি লেখা যে আদতে অনুসন্ধান-ই প্রথম ছেপেছিল, তাও পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া হয়:

> এ পুস্তকের সুখ্যাতি করিব, না নিন্দা করিব? সুখ্যাতি করিলেও আত্ম-প্রশংসা করা হয়— আর নিন্দা করিলেও আত্ম-নিন্দা!— কারণ এ পুস্তকের অধিকাংশ অংশই 'অনুসন্ধানে' বাহির হইয়াছিল যে! তবেই তো দেখিতেছি, মুস্কিল— তবে এ পুস্তকের আর সমালোচনা হয় কি ক'রে? যাইহোক, সাদা কথা— বইখানার বিক্রয় হওয়া উচিত— কিন্‌লে যে কেউ ঠক্‌বেন না, এটা আমরা শপথ করে বল্‌তে পারি। বইখানা সুখপাঠ্যও বটে।[100]

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দারোগার দপ্তর প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তেত্রিশ বৎসরের পুলিশ কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী শীর্ষক অসমাপ্ত আত্মকথায় প্রিয়নাথ লিখেছিলেন: "দীর্ঘকাল ডিটেক্‌টিভ্ পুলিসে কার্য্য করিয়া, যে সকল মকর্দ্দামার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য্য হইয়াছি,

---

[98] 'পুস্তক সম্বন্ধে', অনুসন্ধান, ৯ম সংখ্যা, ১ম খণ্ড, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪১

[99] অনুসন্ধান, ১৭শ সংখ্যা, ২য় খণ্ড, ৩১ চৈত্র, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০৭-৩০৮

[100] অনুসন্ধান, ১৭শ সংখ্যা, ৫ম খণ্ড, ৩০ চৈত্র, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১৫

তাহা আমি অনেক সময় "দারোগার দপ্তরে" প্রকাশ করিয়া থাকি"।[101] তবে, একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে প্রিয়নাথের এই দাবি যথার্থ প্রমাণিত হয় না। ফি মাসে পাঠকের দরবারে একটি রোমহর্ষক আখ্যান হাজির করতে গিয়ে প্রিয়নাথের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ঝুলি যথেষ্ট ছিল না। তাই নাম না-করে ও প্রেক্ষাপট এবং পাত্র-পরিচয় বদলে ইংরেজি গল্পের কাঠামোর ভাবানুগ তরজমার উপরে কখনও-কখনও নির্ভর করেছেন তিনি। একজন আলোচক খেয়াল করিয়েছেন যে, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ডয়েল-রচিত হোমস-বিবরণ 'The Adventure of the Copper Beeches' গল্পের সঙ্গে ১৩০২ বঙ্গাব্দের পৌষে দারোগার দপ্তর-এ প্রকাশিত 'পিতৃশ্রাদ্ধ' গল্পটি এবং সেই ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দেই প্রকাশিত হোমসের আরেক বিখ্যাত কাহিনী 'The Adventure of the Speckled Band' গল্পের সঙ্গে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার দারোগার দপ্তর-এ প্রকাশিত 'বাঁশী' গল্পটি মিলিয়ে পড়লে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়।[102] ডয়েল-লিখিত হোমস-আখ্যানের সঙ্গে প্রিয়নাথের 'অভিজ্ঞতা'র এহেন সাদৃশ্যের নমুনা আরও আছে: ১৩০২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে দপ্তরে ছাপা 'স্ত্রী কি পুরুষ? (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্নবিশিষ্ট লাসের টুক্‌রার ভয়ানক আশ্চর্য্য রহস্য!)' গল্পের সঙ্গে 'The Adventure of the Engineer's Thumb' (১৮৯২)-এর মিল; ১৩১১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত 'অদ্ভুত ভিখারী (বা বিষম ভ্রমে পতিত পুলিস কর্মচারীর হত্যার অনুসন্ধান)' গল্পের সঙ্গে 'The Man with the Twisted Lip' (১৮৯১) মিল; ১৩১৩-র অগ্রহায়ণে প্রকাশিত 'ছবি' গল্পের সঙ্গে 'A Scandal in Bohemia' (১৮৯১); ১৩১৩ বঙ্গাব্দেরই চৈত্রে প্রকাশিত 'চূর্ণ প্রতিমা (বা, পাগলের অদ্ভুত পাগলামি)' গল্পটির সঙ্গে 'The Adventure of the Six Napoleons' (১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ)-এর যে মিল সহজেই চোখে পড়ে তাতে প্রিয়নাথের উপর্যুক্ত স্বীয় অভিজ্ঞতারাজিলব্ধ আখ্যানের দাবি সম্বন্ধে সন্দেহ তৈরি হয়।

আখ্যানের মৌলিকত্ব নিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে সংশয় থাকলেও প্রিয়নাথের গল্পগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন এবং তার ফলে উদ্ভূত শহর কলকাতার সমাজিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ছাপ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে খেয়াল করা দরকার যে, উপনিবেশের প্রজা হিসাবেই প্রিয়নাথ বাঁধাধরা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব/হীনতার দ্বিত্ববোধক সাহেবি ছক থেকে অনেকাংশে মুক্ত। তাই প্রভুর জাতিকে নিয়ে 'ইংরেজ ডাকাত (হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুইজন দস্যুর অদ্ভুত বৃত্তান্ত)' (১৩০১ বঙ্গাব্দ, পৌষ ও মাঘ) লিখতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। তেমনই, ১৩০৮-এর বৈশাখে প্রকাশিত 'মিস্ মেরি (অর্থাৎ মেরি নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোকের অদ্ভুত রহস্য!)' গল্পের শুরুতে তিনি ঘোষণা করেন:

> এই মহানগরী কলিকাতার ভিতর বাস না করে, এরূপ জাতিই নাই। এই নগরী বঙ্গদেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে আছেন ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আমাদিগের অনুসন্ধান-উপযোগী কোন না কোনরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী ঘটনাবলীর অনেক বিবরণ সময় সময় দারোগার দপ্তরে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু অপরাপর জাতীয় ঘটনাবলী অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই খৃষ্ট-

---

[101] প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, 'উপক্রমণিকা', তেত্রিশ বৎসরের পুলিস কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী (কলিকাতা : উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১২), পৃ. ৪

[102] অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা গল্প (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৯), পৃ. অনির্দেশিত

> ধর্মাবলম্বীগণের অন্তর্ভূত আর একটি ঘটনা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইঁহাদিগের মধ্যেও সময় সময় যে কিরূপ ভয়ানক পাপ স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার একটি জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত পাঠকগণ এই স্থানে দেখিতে পাইবেন।[103]

বস্তুত, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কেই জন্মগতভাবেই 'সহজাত অপরাধী' বলে মনে করেন না প্রিয়নাথ। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য মাসে প্রকাশিত 'যমালয়ের ফেরতা মানুষ' গল্পের বর্ণনা অনুসারে লেখক একজন মুসলমানের ছদ্মবেশে কলকাতার মেছুয়াবাজারের কুখ্যাত এলাকায় একটি খন্‌চা বা চণ্ডুখানার (আফিমের আস্তানা) বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন যে, সেই নেশার আড্ডায় যাবতীয় জাতি ও লিঙ্গগত বৈষম্য ঘুচে যায়— "ইহার ভিতর স্ত্রীলোক আছে, মুসলমান আছে, হিন্দু আছে, বৃদ্ধ আছে, যুবক আছে, বালক আছে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, হিন্দু মুসলমান জ্ঞান নাই।"[104] প্রিয়নাথের চোখে অপরাধ একটি জৈবনিক বাস্তবতা, বিশেষ কোনো বিচ্যুতি নয়, বরং অপরাধকে তিনি মানব প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করেন।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্রমপ্রসর্যমান বাজার

পাঠক-প্রিয়তার নিরিখে দারোগার দপ্তর নিঃসন্দেহে একটি বাণিজ্যসফল উদ্যোগ। তার কপালে লক্ষ্মীলাভ ঘটলে পরে বাংলা ভাষায় জাঁকিয়ে বসে গোয়েন্দা কাহিনী লিখে মোটারকম উপার্জনের রেওয়াজ। প্রাথমিকভাবে কেচ্ছা-কাহিনী লেখায় উৎসাহী হলেও, ক্রমে গোয়েন্দা কাহিনির বাণিজ্যিক সাফল্যে উৎসাহিত হন পেশায় বারুইপুর সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নামডাকও ছিল। জানা যায় যে, বসুমতী সাপ্তাহিকের প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি। প্রিয়নাথ ও ভুবনচন্দ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভিদক ও ইউজিন সু-র সঙ্গে তুলনা টেনে সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, জীবনে প্রথম এবং পরবর্তীকালে বহুবার তিনি যে ডিটেকটিভ গল্পটি পড়েছেন তা ছিল ভুবনচন্দ্র-লিখিত 'বাবুচোর'।[105] বাবুচোর — অত্যদ্ভুত ডাকাতী রহস্য বইটি ১৩১২ বঙ্গাব্দে বসুমতী দফতর থেকে প্রকাশিত হয়। বস্তুত, কাহিনীটি রহস্যগল্প হলেও, সেখানে কোনো প্রকৃত অর্থে গোয়েন্দা নেই। তার কারণটিও 'পরিশিষ্টে' লেখক বলে দিয়েছেন: "যখনকার এই ঘটনা, তখন বঙ্গদেশে-এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষে ডিটেক্‌টিভ পুলিসের নাম ছিল না। গোপেশ্বরবাবু স্বেচ্ছাপূর্বক সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের আদর্শ দেখাইলেন", এবং লেখক মনে করেন যে: "বর্ত্তমান পুলিসের বেতনভোগী ডিটেক্‌টিভ ইনস্পেক্টারেরা গোপেশ্বরবাবুকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেন,

---

[103] অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ২ (কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৪), পৃ. ২৩৩

[104] অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭। প্রসঙ্গত, 'মুসলমান' ছদ্মবেশ প্রসঙ্গে এই সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

[105] সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, উৎসর্গপত্র

ইহাই বাঞ্ছনীয়"।[106] কিন্তু, গল্পটির যে ভাষ্য সুকুমার সেন তাঁর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন তাতে দেখা যায়, অপরাধীর পায়ের ছাপ থেকেই পুলিশের দারোগা ভদ্রবেশী চোর কৈলাসবাবুকে ধরে ফেলেন।[107] ফলে, মূল কাহিনী ও সুকুমার সেনের স্মৃতি-ভাষ্যের পার্থক্য সমালোচকের কাছে বিভ্রান্তিকর।[108]

এই পর্যায়ের আরেকজন লেখক ছিলেন শরচ্চন্দ্র সরকার। সুকুমার সেন তাঁকে ইংরেজির বিখ্যাত অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের ছেলে মনে করলেও, পরবর্তীকালে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, শরচ্চন্দ্রের বংশ পরিচয় ভিন্ন।[109] প্রিয়নাথের মতই শরচ্চন্দ্রও অনুসন্ধান পত্রিকায় লিখতেন। পরে তিনিও মাসে মাসে গোয়েন্দা কাহিনীর ধারাবাহিক পত্রিকা— গোয়েন্দা কাহিনী পুস্তকমালা— প্রকাশ করতে শুরু করেন। প্রিয়নাথের সঙ্গে গোড়ায় সুসম্পর্ক থাকলেও, পরে সম্ভবত ব্যবসায়িক কারণেই সম্ভবত সংঘাত বাধে। এদিকে প্রিয়নাথের দপ্তর-কাহিনীর সবই যে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, সেই কথাটি ক্রমে জানাজানি হতে থাকে। ফলে, বাধ্যত আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রিয়নাথকে নামকরণের কারিকুরির যুক্তি সাজাতে হয়:

> দারোগার দপ্তর যখন প্রথম নিয়মিত রূপে মাসে মাসে বাহির করিতে আরম্ভ করি, সেই সময় আমার এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল না যে ইহাতে যত প্রবন্ধ বাহির হইবে তাহার ঘটনা সমস্তই প্রকৃত, বা সমস্তই আমা-কর্তৃক অনুসন্ধিত। এই ভাবিয়া 'stories' নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু দুই এক সংখ্যা বাহির হইবামাত্রই দেখিলাম পাঠকগণ, 'stories' এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া, ইহার সমস্তই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকগণও সমস্ত ঘটনাই প্রকৃত বলিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও কোনও বিজ্ঞ সমালোচক অনুসন্ধানকারীর কোনরূপ দোষ না থাকিলেও লেখকের প্রতি অন্যায় কটাক্ষ প্রদান করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। এইসকল অবস্থা দেখিয়া আমি এরূপ পন্থা অবলম্বন করিব মনে করিয়াছি যে, তাহাতে তাঁহারা প্রকৃত ও কল্পিত ঘটনাদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হন।... উপায়? পাঠকগণ পাছে প্রকৃত ঘটনাকে অপ্রকৃত এবং অপ্রকৃত ঘটনাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত এখন হইতে আমি নিয়ম করিলাম, যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বের প্রথম পুরুষে বক্তাভাবে লিখিত হইবে, তাহার সমস্তই প্রকৃত ঘটনা। কেবল অধিকাংশ স্থলে নাম ঠিকানার পরিবর্তন থাকিবে মাত্র। প্রথম পুরুষ ব্যতিরেকে যে সকল ঘটনা লিখিত হইবে, তাহার সমস্তই অপ্রকৃত, স্বকপোলকল্পিত অথবা ইংরাজি বা অপর কোন গ্রন্থের ভাবালম্বনে লিখিত হইবে।[110]

তবে শেষ পর্যন্ত প্রিয়নাথের এই প্রতিশ্রুতিও সম্ভবত বজায় থাকেনি। তা না-থাকলেও দারোগার দপ্তর বাংলায় যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব সাহিত্য ধারার প্রচলন ঘটিয়েছিল সেই সম্পর্কে প্রকাশকের স্পষ্ট ধারণা ছিল। দারোগার দপ্তর-এর কার্য্যাধ্যক্ষ বাণীনাথ নন্দী দ্বিতীয় বছরের ভূমিকায় জানিয়েছেন:

---

[106] ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবুচোর — অত্যদ্ভুত ডাকাতী রহস্য (কলিকাতা : বসুমতী, ১৩১২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮১-১৮২

[107] সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩।

[108] অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত

[109] অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত

[110] অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), "দারোগার দপ্তর' প্রসঙ্গে', রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ১, প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত। আখ্যানে প্রথম ও উত্তম পুরুষ ব্যবহার সম্পর্কে বার্তের পূর্বোল্লিখিত আলোচনা খেয়াল করা যেতে পারে।

> ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ডিটেকটিভের গল্প সম্বন্ধীয় পুস্তকের বহুল প্রচার থাকিলেও তথাকার পাঠকগণের পাঠকলালসা পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁহারা আরও পাইবার জন্য সর্বদা উৎসুক থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে পাঠকগণের সেইপ্রকার ঔৎসুক্য জন্মিলেও সেই শ্রেণীর বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক এদেশে পাওয়া যায় না। আমরা এই অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে মোচন করিবার অভিপ্রায়ে বর্তমান বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে 'দারোগার দপ্তর' নামে একখানি ডিটেকটিভের মাসিক গল্প-পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।[111]

সেই একই বক্তব্য আবারও ফিরে আসতে দেখা যায় দপ্তরের সপ্তম বর্ষে প্রকাশকের বক্তব্যে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় বাণীনাথ পাঠককে জানান:

> "দারোগার-দপ্তর" একবারে সম্পূর্ণরূপ নূতন ধরণের পুস্তক। এরূপ পুস্তক ইতি-পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং ইহা কোন্ শ্রেণীর পুস্তক, ইহা "কাব্য বা উপন্যাস" তাহা অনেকে ঠিক করিতে পারেন না। তবে ইহা গল্প ধরণে লেখা হইলেও, ইহাকে কাল্পনিক ঘটনা-পূর্ণ উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এরূপ স্থলে ইহার লেখক "উপন্যাসিক" পদ-বাচ্য কিরূপে হইবেন, বলিতে পারি না। আর বোধ হয়, এ পর্যন্ত সে কথা কেহ বলেন নাই। তবে কোন লেখক "দারোগার দপ্তরের গল্প-লেখক" কে "কবি-উপন্যাসিক" বলিয়া, বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, কোন কোন সমালোচক দারোগার দপ্তরের ঘটনা-সমাবেশের বৈচিত্র্য ও পুস্তক-গত ভাষা সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন।[112]

সমালোচনা বা তির্যক মন্তব্য কিংবা ব্যঙ্গ সত্ত্বেও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনার যে একটা বাজার তৈরি হয়ে গেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দারোগার দপ্তর সম্পর্কিত আলোচনা থেকে। কুলসম বইটি সম্পর্কে হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকার ১৪ বৈশাখ ১৩০০ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল: "এই গল্পপাঠে লোকচরিত্র পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ হইবে। অথচ সেই সঙ্গে গল্পপ্রিয় পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবে।"[113] ঐ একই বই সম্পর্কে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখের উলুবেড়িয়া দর্পণ-এর বক্তব্য ছিল: "দারোগার দপ্তর ত্রয়োদশ সংখ্যা (কুলসম) ডিটেকটিভ পুলিশের সুপ্রসিদ্ধ কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা। প্রিয়নাথবাবু নিত্য কার্য্যকালে যে সকল অদ্ভুত ঘটনার রহস্য বাহির করিয়াছেন তাহাই পুস্তকাকারে উক্ত নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহা যে পাঠকগণের জানিতে বিশেষ কৌতূহল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"[114]

প্রিয়নাথ-ভুবনচন্দ্র-শরচ্চন্দ্র প্রমুখের পাঠকপ্রিয়তার দৌলতে ততদিনে বাস্তব-অবাস্তব পুলিশি তদন্ত ও বেসরকারি গোয়েন্দাদের কীর্তিকলাপের কাহিনীগুলির ভাল রকম প্রচলন ঘটেছিল। সেই সময়ে আরেকজন

---

111 তদেব

112 বাণীনাথ নন্দী, 'প্রকাশকের মন্তব্য', প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, বেওয়ারিশ লাস (অর্থাৎ পথ-পার্শ্বস্থ পুলিন্দার ভিতরে প্রাপ্ত লাসের অদ্ভুত রহস্য!), ৭৩তম সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ, বৈশাখ (কলিকাতা : সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪

113 অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), "দারোগার দপ্তর' প্রসঙ্গে', রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ১, প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত

114 তদেব

গোয়েন্দা কাহিনির লেখকের নাম পাওয়া যায়, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ। সুকুমার সেন সাব্যস্ত করেছেন ইনি হয়ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের একজন "ভুয়ো লেখক" ছিলেন। ক্ষেত্রমোহনের বইয়ের আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার গৌরডাঙা গ্রামে। ক্ষেত্রমোহনের প্রতাপচাঁদ (১৯০৩) উপন্যাসটি সেকালে বিখ্যাত ছিল।[115] সেই গল্পের প্রধান চরিত্র প্রতাপচাঁদ রায় "ডিটেক্টিভ পুলিসের একজন প্রধান প্রবীণ কর্ম্মচারী। কূট বিষয়ের মীমাংসায়, জটিল মোকদ্দমার বিশ্লেষণে, দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ঘটনার মর্মোদঘাটনে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন পুলিসবিভাগে ছিল কি না সন্দেহ"।[116] এহেন অভিজ্ঞ পুলিশ তদন্ত করে এক নারীর স্বামীকে বিনা অপরাধে শাস্তিভোগ থেকে উদ্ধার করেন এবং গল্পের শেষে লিঙ্গভেদনির্ভর সামাজিক স্থিতি-কল্পনায় লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রীর ভাগ্যেই যে পুরুষের বিপদ কেটে যায় সেই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন: "মা! তোমার পতিভক্তি অতুলনীয়া। তোমার গুণেই আজ তোমার স্বামী কারামুক্ত— লোকসমাজে এবং ধর্মাধিকরণে নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত। তুমি বড় লক্ষ্মী— আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীসুখে সুখিনী হও।"[117] ক্ষেত্রমোহনের পরবর্তীকালে লিখিত বিভিন্ন 'ডিটেকটিভ উপন্যাস'-এ প্রতাপচাঁদ সম্পর্কে বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত থাকত:[118]

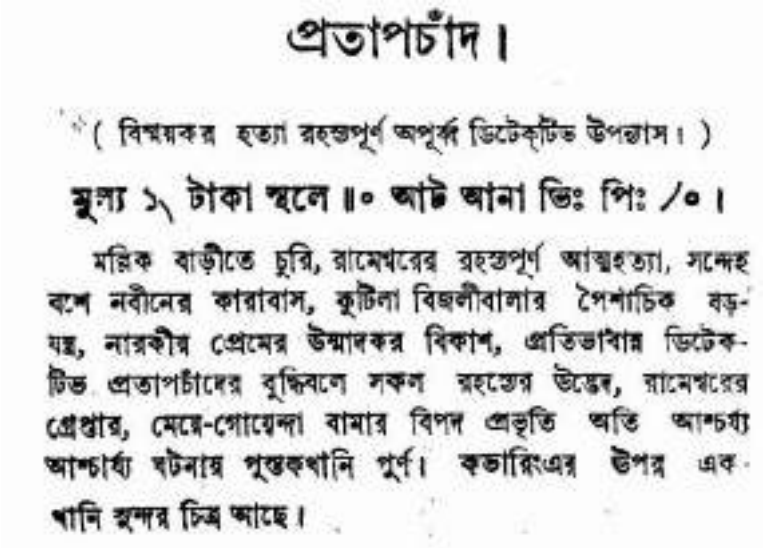

প্রতাপচাঁদ।

(বিস্ময়কর হত্যা রহস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

মূল্য ১৲ টাকা স্থলে ॥০ আট আনা ভিঃ পিঃ /০।

মল্লিক বাড়ীতে চুরি, রামেশ্বরের রহস্যপূর্ণ আত্মহত্যা, সন্দেহ বশে নবীনের কারাবাস, কুটিলা বিজলীবালার পৈশাচিক ষড়-যন্ত্র, নায়কীয় প্রেমের উন্মাদকর বিকাশ, প্রতিভাবান্ ডিটেক-টিভ প্রতাপচাঁদের বুদ্ধিবলে সকল রহস্যের উদ্ভেদ, রামেশ্বরের গ্রেপ্তার, মেয়ে-গোয়েন্দা বামার বিপদ প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্য আশ্চার্য্য ঘটনায় পুস্তকখানি পূর্ণ। কভারিংএর উপর এক-খানি সুন্দর চিত্র আছে।

---

[115] ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত, প্রতাপচাঁদ (কলিকাতা : ৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, চৈতন্যপ্রেসে শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত, ১৯০৩)। এই বইটি সম্ভবত, ক্ষেত্রমোহন নিজেই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে শীল পরিবারের শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী ওঁর বইয়ের প্রকাশক এবং শীল-প্রেসেই বইগুলির মুদ্রণ।

[116] ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[117] তদেব, পৃ. ১৫২

[118] ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ক্ষেত্রমোহনের প্রমোদা ও বিপন্ন-ব্যারিষ্টার উপন্যাসদুটির শেষে 'ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী'র তরফে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন। দ্রষ্টব্য: ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, প্রমোদা (কলিকাতা : শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ)। বিপন্ন-ব্যারিষ্টার বইটির আখ্যাপত্রে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরীর নাম নেই এবং শীলদের তরফে সদস্যদের নামেও পরিবর্তন ঘটে গেছিল।

ক্ষেত্রমোহনের লেখায় আরেকটি বিশেষ ধরনের চরিত্র এসেছিল, যা তার আগে বিশেষ দেখা যায় না— বালক গোয়েন্দা।[119] বাপ-মা-মরা যদুনাথের বয়স মাত্র পনের। ভবনীপুরে দিদিমার আশ্রয়ে সে থাকে। লেখাপড়ার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ নেই। সুযোগ পেলেই সে পুলিশ থানায় গিয়ে বসে থাকে। এহেন যদুনাথের "দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক মুখশ্রী, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক সারল্যপূর্ণ নেত্রবৃষ্টি, প্রশস্ত মাংসল বক্ষ সবিশেষ মনোজ্ঞ এবং চিত্তাকর্ষক", এবং স্থানীয় থানার ইন্সপেক্টর বিখ্যাত ডিটেকটিভ হরিনাথ মজুমদার তাকে স্নেহ করেন ও বিভিন্ন জটিল রহস্য সমাধানের বৃত্তান্ত শোনান। এইসবের ফলে যদুনাথের "হৃদয়ে পুলিস-কর্মচারী হইয়া, চোর-ডাকাত গ্রেপ্তার করিবার সাধ বলবতী" হয়ে ওঠে; তারও "গোয়েন্দাগিরী করিবার সাধ" জন্মায়। যদুনাথের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখে হরিনাথ নিশ্চিত হন যে, "এ বড় সহজ বালক নহে। উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা পাইলে, একদিন ইহার প্রতিভায় জগৎ মুগ্ধ হইবে"।

তারপর থেকেই হরিনাথ ছোটখাটো তদন্তে যদুনাথকে পাঠাতেন। বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসীপ্রত্যুৎপন্নমতি কিশোর যদুনাথের দক্ষতা ক্রমে বাড়তে থাকে। সাংসারিক পিছুটান— দিদিমা ও বাল্যবন্ধু— কাটিয়ে কি কি উপায়ে সে একজন পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠবে ও পুলিশ-বিভাগে যশস্বী হবে তাই-ই যদুনাথের "জীবনের মূলমন্ত্র" হয়ে উঠেছিল।[120] যদুনাথের চরিত্রটি যে উপন্যাসে ছিল সেই প্রমোদা-র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিল ১৩১২ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ বাংলা তখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল। সেই আন্দোলনের অন্যতম দিক ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা। সেই সমালোচনাই ফুটে উঠেছে ক্ষেত্রমোহনের লেখায়, যেখানে তিনি জানান যে, পাঠশালায় বিদ্যা অর্জন করে যদুনাথের বুদ্ধি "জড়তা প্রাপ্ত" হয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে সেই বুদ্ধি আবার "বিকাশোন্মুখী" হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রমোহন মনে করেন: "উৎসাহ এবং অধ্যবসায় উন্নতির মূলভিত্তি। অধ্যবসায়ী ব্যক্তি অনুষ্ঠিত-কর্ম্মে সাধারণের উৎসাহ পাইলে, দিন দিন তাহার উদ্ভাবনা-শক্তি এবং কর্ম্মতৎপরতা বদ্ধিত হইতে থাকে"। হরিনাথের থেকে উৎসাহ পেয়ে বালক হলেও যদুনাথ ক্রমে দক্ষ গোয়েন্দা হয়ে ওঠে।[121]

উনিশ শতকের শেষ দশকেই পাঠকের দরবারে পুলিশ গোয়েন্দার রোমহর্ষক তদন্ত-আখ্যানের একটি প্রসর্যমান বাজার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সমকালীন লেখকরা ক্রমে বুঝতে পেরেছিলেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে তাঁরা এমন একটি পণ্যের সন্ধান পেয়েছেন, যা একদিকে অনাস্বাদিতপূর্ব সাহিত্য গোত্র ও অন্যদিকে পুনরুৎপাদনযোগ্য গণভোগ্য। ফলে, নব্যশিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের কাছে এই সাহিত্যগোত্রটির আকর্ষণ অমোঘ। এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নকলনবিশী যেমন সম্ভব, তেমনই এর মাধ্যমে প্রভুর খেলায় হাত

---

[119] ক্ষেত্রমোহনের সমকালেই পাঁচকড়ির দে-ও গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র-র ভাগিনেয় তথা শিক্ষানবিশ হিসাবে শচীন্দ্র চরিত্রটি তৈরি করেছিলেন। শচীন্দ্রর বয়স উনিশ, যদুনাথের থেকে কিছু বড়। বস্তুত, বাংলায় কিশোর গোয়েন্দার আদিরূপ হিসাবে যদুনাথ ও শচীন্দ্রর কথা খেয়াল রাখা দরকার।

[120] ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, প্রমোদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-১০

[121] তদেব

পাকানোর সুযোগও মিলবে। উপরন্তু, এর মাধ্যমে আধুনিকতার একটি বিশেষ ভাবনা তুলে ঘরা সম্ভব, যেখানে একই ছকে দেশীয় ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতাকে মিশিয়ে দেওয়া যাবে। অনেক কাহিনীতে দেখা যাবে অবরোহী যুক্তিপদ্ধতি, বৈজ্ঞানিকতা কিংবা সূত্র বা ক্লু-র ইমারত সাজিয়ে নিঃসন্দেহে একজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়ার বদলে জোরদার হয়ে উঠেছিল ভাগ্যের সহায়। গোয়েন্দা সেখানে বৈজ্ঞানিক কৌশল ও যুক্তির সাহায্যে নয়, বরং 'সতী-সাধ্বী' স্ত্রীর ধর্মাচরণের পুণ্যবলেই ঐ নারীর স্বামীকে বিপন্মুক্ত করতে পারে। গোয়েন্দা কাহিনী সেখানে নিছক রহস্য সমাধানের ধাঁধার খেলা নয়, বরং ধর্মের পথে জীবন যাপনের এক আলেখ্য নির্মাণ করছে, জাতীয়তা ও ধর্মের সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রতর্কের অংশ হয়ে উঠছে।

বস্তুত, গোয়েন্দা কাহিনীর কাঠামোটি পাশ্চাত্যে নির্মিত হলেও, ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে প্রাচ্যের শাসিত সমাজে তার হুবহু অনুকৃতি ঘটছে না। ভারতের জাতীয়তাবাদ যেমন সরাসরি পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের অনুকরণ নয়, তেমনই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য ইংরেজি ও ফরাসি গোয়েন্দা কাহিনীর ছায়ায় জন্ম নিলেও, বাস্তবত তার থেকে সরে গিয়েছিল। ফলে, ইংরেজি গোয়েন্দা গল্পে বৈজ্ঞানিকতা, অবরোহী যুক্তি পদ্ধতি, ক্লু বা সূত্রের নানান বিশ্লেষণী রীতি ও তথ্য উৎপাদন ও নথিবদ্ধ করার প্রকৌশল মুখ্য হয়ে উঠলেও, বাংলা গোয়েন্দা গল্পে ভাগ্যের সহায়তা, ভবিতব্য, ধর্মানুশীলন, অধর্ম,পাপ-পুণ্য এইসব প্রধান হয়ে ওঠে। ইংরেজ গোয়েন্দার বৌদ্ধিক দক্ষতার বদলে বাঙালি গোয়েন্দা কী করে কী হয়ে গেল তা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হত। কিন্তু, সেই বৌদ্ধিক ব্যর্থতা চাপা পড়ে গিয়েছিল ঐতিহ্যের অনুকীর্তনে। সেই সাংস্কৃতিক দেশীয়তার অনুষঙ্গই বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীও ঔপনিবেশিক সমাজে জাতীয়তাবাদের নিজস্ব সংস্করণের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, হুবহু পাশ্চাত্য-প্রদর্শিত কাঠামোর অনুসরণ করেনি।[122]

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সেই আবহে গোয়েন্দা কাহিনির পাঠক পেয়েছিল আধুনিক রুচিমানতার আদল। এহেন আধুনিকতাবাহী সাহিত্য 'পণ্য' বিক্রি করে লাভ ঘরে তুলতে এগিয়ে এসেছিল অনেক পত্রিকা। বই হিসেবে প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে অসংখ্য গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস। কিন্তু, ঔপনিবেশিক বাংলায় এই বিশিষ্ট সাহিত্য 'পণ্য' কীভাবে সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিনিময় ঘটিয়েছিল তা ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণে সেভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। বর্তমান গবেষণায় সেই ইতিহাস বিশ্লেষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

---

[122] এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য খেয়াল করা যেতে পারে। জাতীয়তাবাদের মতই ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও তার দোসর গোয়েন্দা কাহিনীও প্রতীচ্য থেকে এলেও প্রাচ্যে হুবহু অনুসৃত হয়নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Partha Chatterjee, *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse* (London : Zed Books, 1993 [1986])

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজন

সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কীভাবে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়— প্রাগিতিহাস— বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ইতিহাসের কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে সম্পর্কের পারস্পরিকতার সম্পর্কটি উন্মোচন করা যায়।

প্রথম অধ্যায়ে বিবেচ্য ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত। সাধারণত, ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের যে ইউরোপ-কেন্দ্রিক যাত্রাপথের আলোচনা করা হয়, তার যুক্তি অনুযায়ী ইউরোপ তার নিজের গরজে নিজেরই সমাজ-কাঠামোর অন্তঃস্থল থেকে গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এখানে যে মূল প্রশ্নটির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে তা হল, গোয়েন্দা কাহিনীর এই শুরুয়াদি প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যের অবস্থান কোথায়? উনিশ শতকে ইউরোপ ও প্রধানত ইংল্যন্ড ও ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রসারের উদগ্র বাসনায় পরস্পর দ্বন্দ্বরত। তার পাশাপাশি, পুঁজিবাদ নামের বিশ্বব্যবস্থা ও তার দোসর বুর্জোয়া রাষ্ট্রিক মতাদর্শের জগৎজোড়া প্রসর্যমানতা। তার মূলে ছিল অষ্টাদশ শতকী ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির যমজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। সেই পুঁজি ও সাম্রাজ্য উভয় প্রসারের অভিমুখই ছিল প্রাচ্য। সেই প্রসঙ্গের গভীরে গেলে স্পষ্ট হবে যে, ইওরোপীয় বিশেষত ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভবের একটি ঔপনিবেশিক ইতিহাসও আছে। উপনিবেশের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও ইংল্যন্ডে সেই অভিজ্ঞতার প্রভাব জনসমাজে যে 'সংকট'-ধারণা তৈরি করেছিল থেকেই ইংরেজ গোয়েন্দা নামের কল্পচরিত্রের গণগ্রাহ্যতা নির্মিত হয়েছিল। এহেন গভীর প্রভাববিস্তারী সেই ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতারাজি জারিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ-আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যগর্বী প্রাচ্যবাদী মতাদর্শে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তথা বলপ্রয়োগহীন আইনের শাসন কায়েম সম্পর্কে এক নতুন কল্পনাই ইংল্যন্ডে গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। ক্রমে গোয়েন্দা বলে বিশেষ একটি চরিত্র ইংরেজি সাহিত্যে ও গণমানসে ঠাঁই করে নেয়, যে শাস্তি দিয়ে অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করে নয়, বরং যুক্তি দিয়ে বিচার করে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারে; সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয় গায়ের জোরে নয়, যুক্তি-বুদ্ধির সুচারু প্রয়োগে। এইদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্য উনিশ শতক জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘর ও বাহিরে ক্ষমতার অন্তর্গত হিংস্রতার উপরে আলোকদীপ্তি-সঞ্জাত ব্যক্তি-স্বাধীনতার উজ্জ্বলতম প্রলেপ, যে প্রলেপে এমনকী ঔপনিবেশিক প্রজারও চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে গোয়েন্দা কাহিনীর সেই ছাঁচের আদলে উপনিবেশের অভিজ্ঞতাও মিশে ছিল। বস্তুত, ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রাথমিক মালমশলার অনেকটাই এসেছিল ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অর্থে উপনিবেশই হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা সাহিত্যের কাঁচামালের জোগানদার আর লন্ডনের পুলিশি কার্যকলাপ ছিল সেই কাঁচামালের থেকে তৈরি আদিরূপের মান্যতাদাতা। ব্রিটিশ-ভারতে ঠগী দমনের পদ্ধতি ও তার বিভিন্ন আখ্যান ব্রিটিশ পাঠককে প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দা চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ভারতে ঠগীদের গোপন কার্যকলাপ ও গুপ্ত সাংকেতিক ভাষা-রহস্য ভেদ করে উপনিবেশে

আইনের শাসন কায়েম করে ভারতীয় প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের সার্থকতা ও আলোকদীপ্ত পুলিশি প্রতিষ্ঠানের যাথার্থ্য নিরূপণে অব্যর্থ ভূমিকা পালন করেছিল ঠগীদমন বিভাগ ও সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন আখ্যান। রহস্যময় প্রাচ্যের প্রতি প্রতীচ্যের মনোভাব ঠগী বিষয়ক আখ্যানগুলিতে স্পষ্ট হয়েছে। নৃশংস বল প্রয়োগ করে স্বীকারোক্তি আদায়ের 'মধ্যযুগীয়' বর্বরতার বদলে ইংরেজ-আদর্শ-সিঞ্চিত উদারনৈতিক সংস্কারমূলক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছিল ঠগী-আখ্যানগুলিতে। ফলে, ব্রিটিশ উপনিবেশ না-থাকলে ইংরেজ গোয়েন্দা ও তার মনোহর আখ্যান সৃষ্টি হত কিনা ও সেই আখ্যান ও তার কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্বজয়ে সফল হত কিনা সেই প্রশ্নের বিচারই মূল উপজীব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুটি মূল প্রসঙ্গ — ভারতীয় উপনিবেশ থেকে আফিমের ব্যবসা ও নেশা এবং ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কীভাবে নেশা, ষড়যন্ত্র ও 'অপরাধী' নির্মাণের মতাদর্শ সম্পর্কিত প্রতর্ক গড়ে তুলেছিল, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হোমসের গল্পে ঔপনিবেশিক প্রজার তৈরি জিজেল বুলেট ও উপনিবেশের 'অভিশাপ' আন্ত্রিক জ্বরের পারম্পরিক ধাক্কায় ধ্বস্ত ওয়াটসন যখন ফিরে আসেন লন্ডনে, যেন তাঁর সঙ্গেই ফিরে আসে ঔপনিবেশিক স্মৃতি, যে স্মৃতি ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের দোসর। ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের বিখ্যাততম কথক ডাক্তার ওয়াটসনের মতই তাঁর সমকালীন ব্রিটিশ মননে ও স্মৃতি-সত্তায় প্রাচ্যের উপনিবেশের অভিজ্ঞতা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। সাম্রাজ্যের চিন্তায় মোহিত ইংরেজ লেখক তাই সহজেই সাম্রাজ্যের অপর খুঁজে পেয়েছেন উপনিবেশে, পাশ্চাত্যের অপর প্রাচ্যে, শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার অপর কৃষ্ণাঙ্গ 'আদিমতায়' ; অর্থাৎ সমীকরণটা হয়ে গেছে পাশ্চাত্যের গরীয়ান সাম্রাজ্য বনাম প্রাচ্যের অসভ্য উপনিবেশ।

উনিশ শতকব্যেপে পুঁজিবাদ-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ-প্রাচ্যবাদ ও অপরাধের নৃতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিকতার যে আবহাওয়ায় ভিক্টোরীয় সমাজ-মতাদর্শের বাস্তবায়ন ঘটেছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে উইলকি কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসটি শাখা-প্রশাখা মেলতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যিক কল্পনা ও নেশার আসক্তিগত মানস-কাঠামোর সম্পর্কের এক জটিল বয়ান ফুটে উঠেছে আর্থার কনান ডয়েলের *The Sign of the Four* উপন্যাসেও। আর উভয় রচনাতেই মূল ধরতাই হিসাবে উঠে এসেছিল সেই সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবথেকে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা-স্মৃতির কেন্দ্রবিন্দু সেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের তথা ব্রিটিশ সভ্যতার বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' প্রসঙ্গ। প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের নিরিখে ঔপনিবেশিক নেশা (আফিম) এবং ঔপনিবেশিক উপপ্লব (১৮৫৭-র বিদ্রোহ)— উভয়ের নিরিখে ঔপনিবেশিক অপরাধীর অবয়ব স্পষ্ট হতে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রজার কালিক ও স্থানিক অবস্থানের আদিমতাই তার অপরাধী হওয়ার সাবুদ। ক্রমশঃ যেন সমগ্র উপনিবেশই হয়ে ওঠে বিচিত্র অপরাধের আঁতুড়ঘর। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রভাবে ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির তরফে ভারতে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্টার সমন্বয়ে ভারতে বিচিত্র 'অপরাধী' নির্মাণ শুরু হয়। পূর্বেকার ঠগী ধারণার এ যেন এক নবরূপ। সেখানে সমস্ত দেশীয় জনগোষ্ঠীই সেই ঠগীর রূপান্তর। উপনিবেশের প্রজা মাত্রেই অপরাধী— উনিশ শতকের অন্ত্যভাগে ঔপনিবেশিক

শাসকের তৈরি এই ধারণা আর কেবল কল্পিত গোয়েন্দা আখ্যান হয়েই সীমিত থাকে না, বরং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকাঠামোর মর্মস্থিত ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের জনপ্রিয়তম আদর্শমানে রূপান্তরিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে মূল আলোচ্য বিষয় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে 'অপরাধী' নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের ভূমিকা। বস্তুত, ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিতর একটা অংশের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ঠগী ও ডাকাত— এই দুই চরিত্রকে ঘিরেই ঔপনিবেশিক অপরাধীর আদিকল্প নির্মিত হয়েছিল। আর তার বিপরীতে আইনের শাসনের প্রবর্তক, আলোকদীপ্ত আধুনিক শৃঙ্খলারক্ষকের ধারণাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বস্তুত, ঠগী-বৃত্তান্ত ও তার দমনের কৌশল এক নতুন ধরনের আখ্যান-গোত্রের জন্ম দিয়েছিল, যার দ্বারা গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকের আগাম দীক্ষা ঘটেছিল বলা যেতে পারে। দ্রুতভিত্তিতে ঠগীদের চিহ্নিত করা, সেই কাজে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা, অপরাধীদের শাস্তিদানের মাধ্যমে শান্তি ও সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতি বজায় রাখা— ঠগীদমনের মধ্যে ভবিষ্যত গোয়েন্দা আখ্যানের সবকটি বৈশিষ্ট্যের বীজ নিহিত ছিল। পাশাপাশি, 'অপরাধী' কে?— সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের প্রতর্ক গড়ে উঠেছিল, যার মূল ভিত্তি ছিল 'অপরাধী'র দৈহিকতা। কোন্ সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষণ-চিহ্ন যার ভিত্তিতে সন্দেহ পরিণত হবে প্রতীতিতে, নিশ্চিত করে চিনে নেওয়া যাবে 'ক্রিমিনাল্' কে? সেই প্রশ্নের নিরসনে ক্রমে জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন দৈহিকতার নিরিখে অপরাধীর শনাক্তকরণের বিচিত্রবিদ্যা। সেইসব চর্চা-গবেষণা ঔপনিবেশিক শাসক ও ঔপনিবেশিক প্রজার মননে-আচরণেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'জন্মগত অপরাধী' সংক্রান্ত আদিকল্পকে ঘিরে নানান তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' বিষয়ে প্রতর্কের একটি জনজীবন ঔপনিবেশিক শিক্ষিত সমাজে গড়ে উঠেছিল।

ঔপনিবেশিক প্রজার মনে সংশয় থাকলেও ঊনবিংশ শতকী ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পুরোভাগে থাকা ইঙ্গ-ফরাসি জ্ঞানতত্ত্বের হাত ধরে ফ্রেনলজি ও 'অপরাধী'র নানান দৈহিক পরিমাপের মত বিদ্যাচর্চা পশ্চিম ইওরোপের ছাঁচে গড়া এক নতুন 'আদর্শমান' হাজির করেছিল। উনিশ শতকী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রশাসনিকতা-উদ্ভূত জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে অপরাধতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের যে গাঁটছড়া আপাত-বিজ্ঞান ফ্রেনলজির সুতোয় বাঁধা হয়েছিল, তার প্রতিফলন ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্বে সুস্পষ্ট। সেই প্রতর্কের প্রতিফলন দেখা যায় উপনিবেশের প্রজার তথাকথিত 'হিংস্রতা'র বর্ণনায়। ডয়েলের লেখায় স্পষ্ট হয়ে যায় জাতিগত হীনতার ছক, যেখানে পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রাচ্যজাতিসমূহের থেকে 'উন্নত ও উচ্চস্থানীয়', এবং উন্নত পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের কর্তব্য ঐ 'অনুন্নত' প্রাচ্যজাতিগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের মাধ্যমে তাদের সভ্যতার আলোয় দীপ্ত করে তোলা। এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধব্যেপে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উপস্থিতি প্রবলভাবে অনুভূত হয় সাম্রাজ্যিক রহস্য রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারধর্মী ও গোয়েন্দা-আশ্রিত ইংরেজি রচনাসমূহে, এবং তার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে এমন এক ব্রিটিশ সত্তা, যা প্রধানত সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতার নির্ভরে দাঁড়িয়ে থাকে। উনিশ শতকের ধাপ বেয়ে শিরোমিতিবিদ্যা, লম্ব্রোসীয় অপরাধতত্ত্ব, 'অপরাধ' ও 'অপরাধী'র সঙ্গে যুক্ত ঔপনিবেশিক আদিমতার ধারণা,

অপরাধীর দৈহিকতা, আন্দামান— ঔপনিবেশিক শাসন-প্রসূত সমস্ত ধারণারাজি যেন ন্যায্যতা পায় উপনিবেশের প্রজা-কর্তৃক ঔপনিবেশিক আধুনিকতার কৃতার্থ গ্রহণে। সেই বিচারে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য আদিপর্ব থেকেই সেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সন্তান।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূল উপজীব্য প্রশ্ন হল কোন আবহে ঔপনিবেশিক বাংলায় সরকারি ও সাহিত্য-নির্ভর বেসরকারি গোয়েন্দা পরিচয় নির্মিত হয়েছিল। উনিশ শতকী ইওরোপে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, অপরাধীরা শারীরবৃত্তীয়ভাবে 'বিকৃত' বা 'অধঃপতিত'। সেই শতকেই ইওরোপ জুড়ে ফ্রেনলজি চর্চার যে প্রসার ঘটেছিল, তার প্রভাবে করোটি, মস্তিষ্ক ও সামাজিক আচরণের আন্তঃসম্পর্ক এবং তার সঙ্গে অপরাধ প্রবণতাকে মিলিয়ে বিচার করার ধারা তৈরি হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের হাত ধরে 'বিপজ্জনক শ্রেণি' ও 'অপরাধী শ্রেণি' প্রভৃতি ধারণা উপনিবেশে হাজির হয়েছিল। সাধারণত সমাজের প্রান্তিক গরিবদেরই এই বর্গে ঠাঁই হত। পেটের দায়ে রোজগারের তাগিদে স্থানান্তরে ঘুরে-বেড়ানো ঐ দরিদ্র লোকেদের চরণিকতাই ছিল প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের শিরঃপীড়ার কারণ। বিশৃঙ্খলা ও অপরাধের সঙ্গে এই ভ্রামণিক মানুষগুলির অস্তিত্ব যেন এক হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গেই ক্রমে জুড়ে গিয়েছিল 'অপরাধী শ্রেণি' বা 'criminal class' সম্পর্কিত ধারণা।

বস্তুত, এভাবেই বিভিন্ন গোত্রের হরেক প্রতর্ক (discourse) থেকে তাত্ত্বিক-প্রশাসনিক ও শিক্ষিত জনপরিসরে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' ধারণাগুলি প্রসারিত হচ্ছিল। ১৮৯০-এর দশকে ইওরোপে স্পষ্টতই অপরাধ-নৃতত্ত্ব এবং অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার বহু তত্ত্ব ও লব্জ গণগ্রাহী হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা কাহিনীর মাধ্যমে। বিভিন্ন বাচনিক প্রকরণের মাধ্যমে একজন পেশাজীবী— নৃতাত্ত্বিক, অপরাধতাত্ত্বিক ও গোয়েন্দা— মানব শরীরের হাড়হদ্দ থেকে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণ করার 'বৈজ্ঞানিক' কৌশল প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে। মূলত, আইনের শাসন জারি রাখাই গোয়েন্দা আখ্যানের অভীষ্ট। সেই ছাঁচ ক্রমে উপনিবেশেও গ্রাহ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ দারোগার দপ্তর-এর জনপ্রিয়তা। লন্ডন ও কলকাতা— ব্রিটিশ উপনিবেশের দুই কেন্দ্রকে মিলিয়ে বিচার করলে গোয়েন্দা কাহিনীর মত গণমোহিনী আখ্যান, অপরাধী শনাক্ত করে 'আইনের শাসন' প্রয়োগের পদ্ধতিসমূহ এবং সেই বিষয়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষিত জনসমাজের বৈচারিক প্রতিক্রিয়া — সবই একই কালিকতায় মিশে যাচ্ছে এবং রচনার গোত্রভেদব্যেপে সবেরই কেন্দ্রীয় বিষয় অপরাধ— অপরাধী নির্ণয় ও তার বিচার তথা শাস্তিবিধান। উপরন্তু, মিশে আছে এক বৈশ্বিক নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিকতাসিদ্ধ অবরোহী যুক্তিক্রমের ধারণা, যার দ্বারা নিঃসংশয়ে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যাবে অপরাধীকে। বৈজ্ঞানিকতা ও অপরাধী নির্ণয়ের ক্ষমতার রাজনীতি সেখানে মিলেমিশে যায়। অপরাধী নির্ণয়ের সেই নৈর্ব্যক্তিক কৌশল হিসাবে পুলিশ-প্রশাসকরা ক্রমে আঙুলের ছাপকেই ব্যক্তির নির্দ্বিধ শনাক্তকরণ চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ-প্রয়োগ-প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, উপনিবেশ নামের নতুন পরিসরকে বাগে আনতে হলে এমনসব 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি যা অসমসত্ত্ব প্রজা-সমাজের সাধারণীকরণে সহায়ক হবে। তাই ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতা ও জ্ঞানতত্ত্বের অপরিহার্য

অঙ্গ হয়ে ওঠে বর্গীকরণ, এবং অ্যানথ্রোপোমেট্রি হোক কিংবা আঙুলের ছাপ— সবই সেই বর্গীকরণের ভিন্ন প্রকার মাত্র। বস্তুত, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নজরদারির প্রকরণসমূহ থেকেই আদতে আঙুলের ছাপভিত্তিক শনাক্তকরণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক আবহে। তার থেকে আবারও বোঝা যায় যে, উপনিবেশ ও মাতৃরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাসমূহের মিথস্ক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত জ্ঞানতত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল গোয়েন্দা কাহিনীতে। ঔপনিবেশিক শাসনে আঙুলের ছাপ-নির্ভর পরিচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিতে জাগতিক ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনিবার্যতার মতই এক 'বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিকতা'র ছাঁচ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তথা জ্ঞানতত্ত্বের বাহক ও শরিক হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ে মূল বিবেচ্য বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর মুদ্রিত জনজীবন কীভাবে তৈরি হয়েছিল। আঙুলের ছাপ থেকে অপরাধী ধরার কৌশল হোক বা গোয়েন্দা সাহিত্য— উভয়ই উপনিবেশ থেকে মাতৃরাষ্ট্র ইংল্যান্ডে গিয়ে আবার উপনিবেশে ফেরত এসেছিল। উপনিবেশে সেই প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে তার গায়ে লেপ্টে ছিল ইউরোপীয় আধুনিকতার চিহ্ন। বাঙলা গোয়েন্দা সাহিত্যে 'অপর' নির্মাণ প্রক্রিয়ার আদিপর্বের গ্রাহক ছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতাজাত ইংরেজি শিক্ষিত প্রজাপুঞ্জ, যারা প্রভুর ছাঁচে নিজেদের গড়ে নিতে উদ্যোগী। সেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আবহে একটি বিশেষ সামাজিক-বৌদ্ধিক দ্বন্দ্বের পরিসর তৈরি হয়েছিল। সেখানে উচ্চবর্গ ও বর্ণের পরিচয়বাহী হিন্দু পুরুষের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক-অর্থনীতির অবস্থান থেকে বাকি সবকিছুকে দেখার, বিচার করার ও প্রতিনিধিত্ব করার মনোভঙ্গি প্রকট। মাথা অর্থাৎ মগজ বা তথাকথিত মেধাই যে আসল অস্ত্র বা পুঁজি সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছিল এই শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের কাছে। এই বিমূর্ত যুক্তির প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক প্রতিরূপ হলো বেসরকারি গোয়েন্দা। উপনিবেশে মুদ্রণ-পুঁজির বিস্তারের ফলে পত্র-পত্রিকা হোক বা নানান কিসিমের সাহিত্যে ছাপার অক্ষরে সেই প্রতর্কের বহিঃপ্রকাশের হিসাবে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পৌঁছে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীগুলি 'সত্য'সন্ধানে ব্রতী, দেশহিত ও মধ্যবিত্ত জাতীয়তার 'রূপকথা'য় পরিণত হয়েছিল। সেখানে কেবল ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর অনুকরণ করা হয়নি, বরং 'ঐতিহ্য' ও 'আধুনিকতা' তথা 'দেশজ' ও 'বিদেশী' প্রভৃতির সংশ্লেষ ঘটেছিল। বিশেষত, যৌনতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি সেই প্রতর্কে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একদিকে নারীর 'সতীত্ব' রক্ষার বয়ান একাধিক কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু ছিল এবং অন্যদিকে 'ভ্রষ্টা' নারীর যৌনতার বিবরণ দিয়ে পুরুষ পাঠককে গোয়েন্দা কাহিনী নামের পণ্যটি কিনতে প্রলুব্ধ করা হত। এহেন বিভিন্ন সম্মিলন থেকে তৈরি হয়েছিল বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর নিজস্ব আখ্যান-জগত, চিহ্নাবলী ও লক্ষণাত্মক পরিচিতিসমূহ। সেই আধুনিক রূপকথায় নতুন নেশনের নেতৃত্ব সেই মেধাজীবী হিন্দু বাঙালীর স্বয়ং-কল্পনা প্রকট হয়, যারা ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থেকেই জাতীয়তার এক বিকল্প আখ্যান রচনা করেছিল।

প্রথম অধ্যায়

ইঙ্গ গোয়েন্দার বঙ্গযোগ

ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত

> A good detective story, I have found, is often a clearer mirror of ordinary life than many a novel written specially to portray it. … A historian of the future will probably turn, not to blue books or statistics, but to detective stories if he wishes to study the manners of our age. Middle-class manners perhaps. But I am old-fashioned enough to enjoy the individualism of the middle class.
>
> — C. H. B. Kitchin[1]

> (T)he detective story proper is concerned with the bringing of order out of disorder and the restoration of peace after the destructive eruption of murder…
>
> — P. D.James[2]

> (M)ystery and detective fiction is always engaged in a veiled form of colonial discourse… as it is worked through the imperial imagination, the frontier is also a symbol for the lost past… in the works that generate detective fiction—*The Moonstone*, *A Study in Scarlet*, *The Sign of Four* — a secret belonging to an older, "darker" civilization has been brought into the light of the present, where it begins to breed infection and work a curse that leads to murder... the frontiers are also a dirty world, a world of garbage and ordure.
>
> — Marty Roth[3]

রহস্যের সমাধানে ঝটিতি লন্ডন সফরে মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়ম দেখে বেরিয়ে নীরবে এগিয়ে প্রদোষচন্দ্র মিত্র থামলেন বেকার স্ট্রিটে। রাস্তার নাম দেখেই অমনি তপেশরঞ্জন বুঝে ফেলল গন্তব্যের হদিশ। ২২১ বি বেকার স্ট্রিট—এই নম্বরের সত্যিই কোনো বাড়ি লন্ডনে ছিল না। কিন্তু, কল্পনার ঐ বাড়ির বাসিন্দা পৃথিবীখ্যাত। সেই বিখ্যাত

---

[1] C. H. B. Kitchin, *Death of his Uncle* (London: The Hogarth Press, 1986 [1939]). পৃ. ৩৩-৩৪

[2] P. D. James, *Talking about Detective Fiction* (New York : Alfre A. Knopf, 2009), পৃ. ৬

[3] Marty Roth, *Foul and fair play: Reading genre in classic detective fiction* (Athens: University of Georgia Press,1995) পৃ. ২৪৬-২৪৮

ব্যক্তিত্বের স্মরণে প্রদোষ মিত্রের উক্তি— "গুরু তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি"।[4] পশ্চিম ইউরোপ-উদ্ভূত পুঁজিবাদ এবং জ্ঞানদীপ্তির দোসর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মতই ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের বাসিন্দা শার্লক হোমসও ব্যাপ্ত ঔপনিবেশায়িতের মননে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অন্যতম প্রতীক কাল্পনিক গোয়েন্দা চরিত্রদের আদিপুরুষ হোমস তাই 'গুরু'। সেহেতু বাংলার সমাজে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভব— এই দুয়ের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আলোচনার ধরতাই শার্লক হোমস।

হোমসের উত্তরসূরী এরকুল পোয়ারো ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে ঘটা হত্যারহস্য সমাধান করতে গিয়ে দুটো সমান্তরাল সম্ভাবনার কথা হাজির করছিলেন। তার একটি চলতি ধারার সহজ আখ্যান। অন্যটি একটু জটিল, কিন্তু সেটিই যে অধিকতর সম্ভাব্য তা গল্পের শেষে মালুম হয়।[5] এই আলোচনায় ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্বের প্রসঙ্গেও তেমন দুটি সমান্তরাল যাত্রার কথা বলে হবে, যে-দুটি পথরেখা আপাত সমান্তরাল মনে হলেও, শেষে দেখা যাবে পরস্পর-সম্পর্কিত। সেখানে, অষ্টাদশ শতকী পশ্চিম ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি, পুঁজিবাদ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যিক অভিজ্ঞতা ও সাম্রাজ্যের কেন্দ্র লন্ডনের মত শহরের সুরক্ষা— সব মিলেমিশে এক নতুন আখ্যান তৈরি করবে, যে আখ্যান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার হাত ধরে গোয়েন্দা সাহিত্য নামে ক্রমে চারিয়ে যাবে বিশ্বের দিকেদিগন্তরে।

যাত্রাপথ ১: শার্লক হোমসের অবরোহ পদ্ধতি ও ইওরোপীয় গোয়েন্দা সাহিত্যের পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক উদ্ভব

একদিকে ব্রিটিশ উপনিবেশের পরিপ্রেক্ষিত এবং অন্যদিকে আখ্যানের মনোহারিত্ব ও যুক্তির অভূতপূর্ব বিন্যাসে রহস্য সমাধানে অদ্বিতীয় বলেই ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্য-চর্চার প্রধানতম পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন শার্লক হোমস। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে শিল্প বিপ্লব-সমকালীন ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদ যখন ক্রমশঃ লগ্নি পুঁজি ও তার ফলে আধুনিক উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র নিচ্ছে, সেই বিশেষ আর্থ-রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তৎকালীন পৃথিবীর ক্ষমতাবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু লন্ডনে বসে এক নতুন রকমের পেশা বেছে নিচ্ছেন এক যুবক। তিনি এমন এক বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা যিনি সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত সাহায্যপ্রার্থী গোয়েন্দাকেই সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেন এবং তার বিনিময়ে সাম্মানিক দক্ষিণা নেন। সেই অভিনব পেশাটি 'Consulting detective', যার বাংলা হতে পারে 'পরামর্শদাতা গোয়েন্দা'। ওয়াটসনের সঙ্গে একত্রবাস শুরু করার সময়ে একদিন হোমস তাকে জানায়:

> Well, I have a trade of my own. I suppose I am the only one in the world. I'm a consulting detective, if you can understand what that is. Here in London we have lots of government

---

[4] সত্যজিৎ রায়, লন্ডনে ফেলুদা, ফেলুদা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫ [১৯৯২]) পৃ. ৫৮৭

[5] রহস্য সমাধান করতে গিয়ে পোয়ারো বলছেন: "There are two possible solutions of the crime. I shall put them both before you, and I shall ask… to judge which solution is the right one." দ্রষ্টব্য: Agatha Christie, *Murder on the Orient Express* (USA: Harper, 2011), ePub edition

> detectives and lots of private ones. When these fellows are at fault, they come to me, and I manage to put them on the right scent. They lay all the evidence before me, and I am generally able, by the help of my knowledge of the history of crime, to set them straight.[6]

ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রকাশের যে নানান বাঁকাচোরা যাত্রা, ও সেই যাত্রাকে 'অপরাধ' নামের বিশেষ বর্গে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা — সেসব নিয়েই হোমসের পথ চলা শুরু। শার্লকের পেশার একটি বিশেষ দিক খেয়াল করার মতো। তার নাম দিয়েছিলেন কনান ডয়েল 'Science of Deduction', *A Study in Scarlet* (১৮৮৭) উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম। অবরোহ যুক্তিক্রমের উপর নির্ভর করে 'মানুষ' নামের সাধারণ বর্গটির বিশেষীকরণ করার সে এক চমকপ্রদ চর্চা। যে চর্চাটিকে 'প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত' করে তোলার চেষ্টাই হোমসের মূল কাজ। সেই বৈজ্ঞানিকীর ভিত্তিতে চিনে নেওয়া যাবে বিশেষ সেই ব্যক্তিটিকে, ঠিক যেভাবে একজন ডাক্তার চিনে নেন তাঁর বিশিষ্ট রোগীটিকে, রোগীর অগোচরেই।

বস্তুত, শার্লক হোমসের কাণ্ডকারখানা যেন একটা ডাক্তারির জগতেই ঘটে চলে, যেখানে ব্যক্তির/রোগীর অগোচরেই তার ঘড়ি বা জুতো কিংবা প্যান্টের হাঁটু দেখে নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায় তার সম্বন্ধে নানা তথ্য। সেই সব তথ্যরাজির সাধারণীকরণ থেকে বেরিয়ে আসে 'অপরাধী-নিরপরাধ'-এর দ্বৈত ও দ্বৈধ সত্তা ও সেই সত্তার 'সত্যতা'র নানা অকাট্য প্রমাণ, ঠিক যেমন করে ছোটো ছোটো লক্ষণ থেকে রোগীর শরীরের ভেতরে অগোচরে থাকা মূল রোগের হাড়হদ্দ জেনে ফেলেন একজন তীক্ষ্ণধী ডাক্তার। হোমসের দৃষ্টিতে ব্যক্তি-রোগীর শরীর যেন এক সামাজিক-শরীর হিসেবে সাধারণীকৃত হয়ে যায়, আর সেখানে ডাক্তারের মতোই 'অপরাধ' নামের বিশেষ রোগের চিকিৎসা করে চলেন গোয়েন্দা। সেই কারণে ডাক্তারের মতোই শার্লকও তাঁর পরামর্শপ্রত্যাশীকে বলেন কোনো সামান্যতম তথ্যও অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানে এড়িয়ে না-যেতে, বারবার ঝোঁক পড়ে 'সবটা' বলার ও জানার উপরে। হোমসের কাছে, ডাক্তারের মতোই, কোনো কথা লুকানো ঠিক নয়। তাতে রোগ নিরসনে বাধার মতোই তদন্তের সাফল্য তথা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন দুরূহ হয়ে উঠতে পারে। ওয়াটসনের সন্দেহ নিরসন করতে হোমস অবরোহ যুক্তিপদ্ধতির মাধ্যমে বিন্দু থেকে সিন্ধুর অস্তিত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলে: "পাশের মানুষের দিকে একঝলক তাকিয়ে জানতে চেষ্টা করুন সে কী কাজ করে, অতীত ইতিহাস কী।... আঙুলের নখ, কোটের হাতা, বুটজুতো, প্যান্টের হাঁটু তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের কড়া, চোখমুখের চাহনি, শার্টের হাতা দেখেই যেকোনো ব্যক্তির জীবিকা বলে দেওয়া যায়"। এই সব প্রত্যক্ষ সূত্রের সমাহারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ যুক্তিবিজ্ঞানী অপ্রত্যক্ষ অতীতকে যুক্তিসিদ্ধভাবে পুনর্নির্মাণ করেন ও অপরাধীকে চিহ্নিত করেন। প্রায় এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় দমদম থেকে বাগডোগরা যাওয়ার সময়ে প্লেনে প্রদোষচন্দ্র মিত্র (ফেলুদা) ও তপেশরঞ্জন মিত্র (তোপসে)র কথোপকথনে। প্লেনের সহযাত্রীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েও তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে না-পারা তোপসেকে আলগা ভর্ৎসনা করে ফেলুদা বলে— "কবে যে অবজারভেশন শিখবি তা জানি না"। আর ফেলুদা 'দু-একবার আড়চোখে দেখেই' যে অচেনা লোকের

---

[6] Sir Arthur Conan Doyle, *A Study in Scarlet,* in *The Complete Sherlock Holmes,* Vol. 1 (New York: Barnes & Noble, 2003), ePub edition

নাড়িনক্ষত্র জেনে ফেলতে পারে, সেই ক্ষমতায় তোপসে 'অবাক' হয়ে যায়। হোমস ও ওয়াটসন— এই দুই ছাঁচ যে বারবার ভিন্ন নামে গোয়েন্দা সাহিত্যে ফিরে ফিরে আসে তাও এর থেকে স্পষ্ট হয়।[7]

এইভাবে শার্লক হোমসের আদলে গোয়েন্দা সাহিত্যের একটা বিস্তৃত ভিত্তি ও আদর্শ ছাঁচ বা আর্কেটাইপ তৈরি করে দিলেন স্যর আর্থার কনান ডয়েল। সাহিত্যের গোয়েন্দা হয়ে উঠল এমন এক অতিমানব, যিনি শেষপর্যন্ত আপাত-বিচ্ছিন্ন সূত্রসমূহ যুক্তির গিঁট দিয়ে দিয়ে এক পরস্পর-সম্পর্কিত ঘটনাপরম্পরা রূপে হাজির করে রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে সবার মধ্যে আড়াল হয়ে থাকা অপরাধীকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করবেন; ঠিক যেমন করে বিভিন্ন লক্ষণ বিচার করে শরীরে লুকিয়ে থাকা রোগকে চিহ্নিত করেন একজন তুখোড় চিকিৎসক। খেয়াল করার মতো বিষয় হলো কনান ডয়েল পেশাগতভাবে নিজেতো ডাক্তার ছিলেনই, এমনকী প্রসিদ্ধমতে যাঁর বাস্তব চরিত্র থেকে তিনি শার্লককে তৈরি করেছিলেন, সেই জোসেফ বেল ছিলেন ডাক্তার এবং ডয়েলের শিক্ষক। আবার শার্লকের নিজেরও চিকিৎসা শাস্ত্রের নানা হাল হকিকত বিষয়ে উৎসাহ ছিল। ১৮৯২ সালে একবার ডয়েল তাঁর শিক্ষক বেলকে চিঠিতে লেখেন:

> It is most certainly to you that I owe Sherlock Holmes, and though in the stories I have the advantage of being able to place [the detective] in all sorts of dramatic positions, I do not think that his analytical work is in the least an exaggeration of some effects which I have seen you produce in the out-patient ward. Round the centre of deduction and inference and observation which I have heard you inculcate, I have tried to build up a man who pushed the thing as far as it would go—further occasionally . . ."[8]

অবশ্য, শার্লক হোমস 'Master Sleuth' অর্থাৎ 'গুরু'প্রতিম গোয়েন্দা হলেও, ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে তাঁর বিভিন্ন পূর্বসূরী ছিল।

শার্লক হোমসের পূর্বপুরুষ

মঁসিয় দ্যুপাঁ ও মঁসিয় লেকক সম্পর্কে হোমসের মতামত উন্নাসিক বলে মনে হয়েছিল ওয়াটসনের। বস্তুত, নিজের পূর্বসুরীদের অস্বীকার বা খারিজ করলেও শার্লক হোমস আদতে স্বয়ম্ভূ নয়। সাহিত্যে অপরাধের নজির সুপ্রাচীন। কিন্তু যাকে গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিরূপ বলে অভিহিত করা যায়, তেমন গোত্রের রচনার উদ্ভব ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যে খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আঠারো শতকের একেবারে শেষে উইলিয়ম গডউইনের *Caleb Williams: Or Things as They Are* (১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) তথাকথিত নিউগেট উপন্যাসের অন্যতম

---

[7] স্যার আর্থার কনান ডয়েল, এ স্টাডি ইন স্কারলেট, অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত, শার্লক হোমস সমগ্র, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: লালমাটি, ২০১১), পৃ. ২১ এবং সত্যজিৎ রায়, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, ফেলুদা সমগ্র, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫) পৃ. ১১৯-১২১

[8] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Leslie S. Klinger, ed., 'The World of Sherlock Holmes', in *The New Annotated Sherlock Holmes,* Vol. 1 (New York: W. W. Norton and Company, 2003), EPub edition

নমুনা।[9] লন্ডনে বহু জেলখানার মধ্যে নিউগেট জেল সবথেকে বড় ও কুখ্যাত। দ্বাদশ শতকে নির্মিত এই জেলখানা প্রায় কিংবদন্তী হয়ে গেছে। ফলে, ইংরেজি কাব্য-উপন্যাস-নাটক বিভিন্ন সাহিত্য-আখ্যানে নিউগেটের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজ সমাজে শৃঙ্খলা ও শাস্তির কাঠামোয় নিউগেট জেলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আঠারো শতকে ড্যানিয়েল ডিফোর মত ব্যক্তিও এই জেলে বন্দী ছিলেন। ডিফোর মনে হয়েছিল এই স্থানটিই আদতে নরক।

এহেন নিউগেট কারাগারের রক্ষক ফি মাসে কারা জেলে যাচ্ছে তার একটি তালিকা রাখত, সেটাই নিউগেট ক্যালেন্ডার নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে সেই জেলকে কেন্দ্র করে অপরাধ-বিচার-শাস্তি-নৈতিকতার ধারণা মিশ্রিত রোমাঞ্চকর সাহিত্যের কারবার শুরু হয়। সেই ধারায় যেমন অকিঞ্চিৎকর নানান লেখা আছে, তেমনই বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিকদের রচনাও আছে। রহস্য-রোমাঞ্চ ধারার সাহিত্যবর্গ থেকেই ক্রমে ঐ বিশেষ ধারার আদিপর্বের অনেক লেখার ক্ষেত্রে নিউগেট সাহিত্য বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়ে এসেছে। ক্রমে উনিশ শতকে নিউগেট উপন্যাস ধারার মাধ্যমে অপরাধকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনার নজির বাড়তে থাকে।[10] এমনও বলা হয় যে, ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত চার্লস ডিকেন্সের *Oliver Twist* সেই নিউগেট উপন্যাসেরই গোত্রভুক্ত। গডউইন ও ডিকেন্সের উপর্যুক্ত দুটি উপন্যাসেই অপরাধ আছে, কিন্তু গোয়েন্দা নেই। তবে, গোয়েন্দা চরিত্র ছাড়া অপরাধ আখ্যান গোয়েন্দা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না, কারণ— যেমনটি তোদোরভ বলবেন— সেই চরিত্রই পাঠকের হয়ে দ্বিতীয় আখ্যানে উপস্থিত থেকে প্রথম আখ্যানের অসমাধিত রহস্যের মীমাংসা করে সব অঙ্ক মেলাবেনই মেলাবেন।[11]

নিউগেট উপন্যাস ধারার অনুসরণে অপরাধকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনায় যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে মার্কিন লেখক এডগার অ্যালন পো-কে গোয়েন্দা সাহিত্যের 'আদিলেখক' বলা হয়। কিন্তু, এই বক্তব্য পর্যালোচনার অবকাশ আছে। সালতারিখের বিচারে পো-র লেখা তিনটি গল্প ১৮৪১ থেকে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল— 'The Murders in the Rue Morgue' (১৮৪১), 'The Mystery of Marie Roget' (১৮৪২-৪৩), এবং 'The Purloined Letter' (১৮৪৪)। তবে, পো অবশ্য তাঁর এই গল্পত্রয়কে গোয়েন্দা গল্পের বদলে যৌক্তিক প্রণালীতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া অর্থাৎ 'tales of ratiocination' হিসাবেই দেখেছিলেন। অবশ্য অগুস্ত দ্যুপাঁই যেভাবে অবরোহমূলক যুক্তিপদ্ধতি ব্যবহার করে একটি সমস্যা সমাধান করেন সেই নিরিখে শার্লক হোমস কিংবা এ্যরকুল পোয়ারো, মিস মার্পল কিংবা ফাদার ব্রাউন, জয়ন্ত, হেমন্ত, ব্যোমকেশ কিংবা প্রদোষচন্দ্র মিত্র — রহস্য সমাধানে সিদ্ধ সমস্ত কাল্পনিক গোয়েন্দারই আদি পূর্বপুরুষ দ্যুপাঁ। কিন্তু, পো কি কেবল পুলিশ-ধাঁধানো

---

[9] অপরাধমূলক তথা রহস্যকাহিনী হিসাবে *Caleb Williams*-এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Julian Symons, *Bloody Murder: From the Detective Story to the Crime Novel: A History* (London: Faber & Faber, 1972), পৃ. ২৬-২৮। এই গডউইনই ছিলেন ইংরেজ কবি শেলীর শ্বশুরমশায়। এঁর কথাই সিধু জ্যাঠা বলেছিলেন গোরস্থানে সাবধান গল্পে।

[10] নিউগেট জেল ও তার সাহিত্যে প্রতিফলন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Stephen Halliday, *Newgate: London's Prototype of Hell* (UK: The History Press, 2013), ePub edition

[11] Tzvetan Todorov, 'The Typology of Detective Fiction' (1966), in Chris Greer (Ed.) *Crime and media: a Reader* (UK: Routledge, 2010) পৃ. ২৯৩-৩০১

রহস্য সমাধানেই দ্যুপাঁর অবরোহমূলক যৌক্তিক প্রণালীর সিদ্ধিকে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন?[12] নাকি তা জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নিরূপণের সমস্যার বিষয়ে পাঠকের ভাবনা উশকে দেয়?[13] দ্যুপাঁর গল্পে আদতে দুটো স্বতন্ত্র আখ্যান জুড়ে যায়। তার একটি আখ্যানের কেন্দ্রে আছে এক বা একাধিক অপরাধ, যা আগেই ঘটে গেছে এবং যে সম্পর্কে কেউই বিশেষ কিছু জানে না। দ্বিতীয় আখ্যানের কেন্দ্রে আছে গোয়েন্দা, যিনি নিজের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যরাজি থেকে অবরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন ও ফলত রহস্য সমাধান করেন। ধ্রুপদী গোয়েন্দা সাহিত্যে এই সমগ্র আখ্যানের কথক সাধারণত অপরাধী ও গোয়েন্দার বাইরে তৃতীয় এক ব্যক্তি, যিনি গোয়েন্দার সঙ্গে নৈকট্যের কারণ তদন্তের সময়ে হাজির থাকেন। কিন্তু, কেবল হাজির থাকাই যথেষ্ট নয়, সেই কথকের নেই রহস্য সমাধানের যোগ্যতা। ফলে, শেষে গোয়েন্দাই রহস্য সমাধানের পূর্বাপর ব্যাখ্যা করে অপরাধের কার্য-কারণ ও কর্তার হদিশ দেন। এখানেই পো-র লেখা গল্পের সঙ্গে আগের রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের মৌলিক তফাত ঘটে যায়। অপরাধীর ঘটানো কাজের ভিত্তিতে শুরু হলেও এই আখ্যান ক্রমেই গোয়েন্দা নামের চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। অপরাধের গুরুত্ব এটাই যে তার ভিত্তিতেই গোয়েন্দা নিজের বিশিষ্টতা সকলের সামনে তুলে ধরতে পারে।[14] অপরাধ না-ঘটলে গোয়েন্দাকে আলাদা করে চেনার যে কোনো উপায় নেই।

অতএব, সেই প্রশ্নে আবারও ফিরে আসা যাক— গোয়েন্দা গল্প লিখবেন ভেবেই কি পো দ্যুপাঁ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন? যদি তা না-করে থাকেন, তাহলে কার্যত পো-কে গোয়েন্দা গল্পের আদিপুরুষ বলা যায় কি? এমনটা বলা যাবে না যে, আলোচ্য তিনটি গল্প প্রকাশের পরেই অনেকেই পো-র অনুসরণে লিখতে শুরু করেন। বরং, পরবর্তী প্রায় দু-দশকে শহুরে যুবক-শ্রমিকদের কাছে জনপ্রিয় সস্তা দামের রোমহর্ষক নভেলা গোত্রের বিভিন্ন রচনার— তথাকথিত 'penny-dreadfuls'— মাধ্যমেই অপরাধকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা টিঁকে ছিল। বস্তুত, সেগুলি আগের নিউগেট সাহিত্যেরই সস্তা চটুল জনপ্রিয় রূপ। শৈল্পিক গুণবিচারে অনুৎকৃষ্ট সেই লেখাগুলির মূল আকর্ষণ ছিল ভয়ালভাবে হিংসাত্মক অপরাধের বর্ণনা। সেই বইগুলিতে গোয়েন্দার চরিত্র বিশেষ থাকত না, আর যদি-বা থাকত তাহলে তারা মোটেই দ্যুপাঁর বৌদ্ধিক-যৌক্তিক উৎকর্ষের উত্তরসূরী নয়। বরং, এই জাতীয় জনপ্রিয় রোমহর্ষক সস্তা বইগুলি গর্হিত অপরাধকে যেভাবে সীমাহীন গৌরবে ভূষিত করেছিল তার সমালোচনা করে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ

---

[12] এডগার অ্যালন পো-র লেখা গোয়েন্দা গল্প নিয়ে জর্জ লুই বোর্হেস থেকে টি এস এলিয়ট, কিংবা মার্ক টোয়েন থেকে জি কে চেস্টারটন বা ডরথি সয়ার্স সরলেই উচ্ছ্বসিত হলেও, পো নিজে তাঁর গল্পগুলিকে 'ডিটেকটিভ' গল্প বলেননি। তাঁর মতে সেগুলি ছিল: "perhaps, the best of my tales of ratiocination", যেখানে প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি মনযোগ —"a minuteness of attention"— এবং সমস্ত সমস্যার সঙ্গে আপাত-বিচ্ছিন্ন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও— "things external to the game"— জানার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Richard Kopley (Ed.), *Edgar Allan Poe and the Dupin Mysteries* (New York: Palgrave Macmillan, 2008) বিশেষত 'Introduction' অংশটি, পৃ. ১-৫ এবং Peter Thoms, 'Poe's Dupin and the power of detection', in *The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe* edited by Kevin J. Hayes (UK: Cambridge University Press, 2004) পৃ. ১৩৩-১৪৭

[13] প্রসঙ্গত একজন আলোচক মন্তব্য করেছেন: "Dupin begins the tale with reflections on the problems of epistemology and reasoning, and one might be forgiven for regarding this as the preface to a fictionalized warning against the dangers of the Cartesian paradox rather than a detective mystery." দ্রষ্টব্য: Richard Bradford, *Crime Fiction: A Very Short Introduction* (UK: Oxford University Press, 2015), ePub edition.

[14] Tzvetan Todorov, প্রাগুক্ত

সাংবাদিক ও সমালোচক জেমস গ্রিনউড (১৮৩২-১৯২৭) লেখেন যে, এগুলি অপাঠ্য, অশুদ্ধ লেখাপত্র।[15] সেক্ষেত্রে বলতে হবে, সমকালে পো-র দ্যুপাঁর সেভাবে উত্তরসূরী তৈরি হয়নি। বরং, ১৮৪৪-এ প্রকাশিত 'The Purloined Letter' গল্পের প্রায় চার দশকেরও বেশি পরে শার্লক হোমসের আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তীকালে যখন গোয়েন্দা সাহিত্যের সূত্রপাত নিয়ে চর্চা শুরু হয় তখন হোমসের পূর্বসূরী হিসাবে উঠে আসে দ্যুপাঁ-র নাম। কিন্তু, দ্যুপাঁও কি তাহলে স্বয়ম্ভূ? কেবল পো-র মস্তিষ্কপ্রসূত? নাকি তারও আড়ালে আছে কোনো বাস্তব চরিত্র?

ইতোপূর্বে, মূল পশ্চিম ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ফ্রান্সে অপরাধকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা শুরু হয়ে গেছিল। ফরাসী মঁসিয় লেককের বিপুল জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, দ্যুঁপাঁর মতোই লেককের প্রতিও চূড়ান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করে হোমস ওয়াটসনকে বলেছিল:

> Now, in my opinion, Dupin was a very inferior fellow. … He had some analytical genius, no doubt; but he was by no means such a phenomenon as Poe appeared to imagine. …. Lecoq was a miserable bungler.[16]

হোমসের মতে, যে সমস্যা সমাধানে লেককের ছ-মাস লেগেছে, তা মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় সমাধেয়। বস্তুত, গোয়েন্দাদের কী করা উচিত নয় তা শেখার জন্যই লেককের কাজ-কারবার পড়া যেতে পারে। দ্যুপাঁর জন্ম আমেরিকায় হলেও, লেককের জন্ম হয় ফ্রান্সে। কিন্তু দ্যুপাঁ হয়ে লেককে পৌঁছানোর আগে ছুঁয়ে যেতে হবে একজন রক্তমাংসের ব্যক্তিকে।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব, জ্যাকবিন রাজত্ব, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন পার করে বুরবোঁদের পুনঃসিংহাসনপ্রাপ্তি— ফ্রান্সে সে এক উথাল-পাথাল সময়। সেই পর্যায়ে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের চার তারিখে *Mémoires de Vidocq, chef de la police de Sûreté, jusqu'en 1827* (*Memoirs of Vidocq, head of the Security Police, until 1827*) শিরোনামে একটি বই প্রকাশ পায়। বইটির বিপুল কাটতি হয়। এমনকী পরের বছরে ঐ স্মৃতিকথার উপরে ভিত্তি করে আরেকটি রচনা *Histoire de Vidocq* (*History of Vidocq*) প্রকাশিত হলে মাত্র কয়েক দিনে বইটি দশহাজার বিক্রি হয়। এরই মধ্যে আবার ফ্রান্সে প্রকাশিত হওয়ার আগেই ভিদকের বইপত্র নকল করে বেআইনিভাবে ইংল্যান্ডে ও হল্যান্ডে বিক্রি শুরু হয়ে যায়। ফলে ভিদকের নাম জানতে ততদিনে আর কারো বাকি নেই। ভিদকের নামে প্রকাশিত এই গোত্রের বইয়ের কাটতি দেখে বিভিন্ন পুলিশ কর্মচারীর আত্মচরিত রচনার উৎসাহ তৈরি হয়। ভিদকের বইয়ের সাফল্য দেখে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লুই ফ্রাঁসোয়া রাবাঁ এবং এমিল মার্কো দে সান্তিলেয়া নামের দুই সাংবাদিক ম্যালগারে নামের এক অপরাধীর ছদ্মনামে *Mémoires d'un forçat ou Vidocq dévoilé* (*Memoirs of a Convict or Vidocq Unveiled*) শিরোনামের একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন, যার মুখ্য বিষয় ভিদকের

---

[15] গ্রিনউডের লেখায় জানা যায় যে, এইধরনের বইগুলি সপ্তাহে প্রায় আড়াই লক্ষ বিক্রি হত। লন্ডন কিংবা তার থেকে দূরবর্তী মফস্বল, যেখানে অনেক বোর্ডিং স্কুল ছিল সেই সর্বত্র যে ছোট দোকানদাররা এইসব বই রাখত। Blue- skin কিংবা Mysteries of London প্রভৃতি রচনা সুছাঁদ পোশাকপরা পড়ুয়াদের হাতে ঘুরত বলে গ্রিনউড আক্ষেপ করেছেন। দ্রষ্টব্য: James Greenword,*The Seven Curses of London* (London, 1869). পৃ. ১৪৩।

[16] Sir Arthur Conan Doyle, *A Study in Scarlet*, প্রাগুক্ত

স্মৃতিচারণা, ও তার ভিত্তিতে ভিদক-কৃত বিভিন্ন তথাকথিত অপরাধের বর্ণনা। আর সেই একই বছরে ব্রিটিশ সাংবাদিক ও রসরচনাকার ডগলাস উইলিয়ম জেরল্ড *Vidocq the French Police Spy* নামে একটি নাটিকা রচনা করেন।[17] ফলে স্মৃতিকথা প্রকাশের অনতিবিলম্বে ভিদক স্বনামেই হয়ে ওঠেন অপরাধমূলক আখ্যান ও তার তদন্তের বর্ণনা গোত্রীয় সাহিত্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু কে এই ভিদক?

ইউজিন ফ্রাঁসোয়া ভিদক (১৭৭৫-১৮৫৭) একদিকে যেমন মার্কামারা অপরাধী, অন্যদিকে তেমনই দুঁদে অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দা। দুই বিপরীত চরিত্রের একত্রসন্নিবেশ ভিদককে করে তুলেছিল জীবন্ত কিংবদন্তী, ভিক্তর উগো কিংবা অনর দে বালজাক অথবা এডগার অ্যালন পো-র মত লেখকদের আকর্ষণের উৎস। কৈশোর থেকেই অপরাধ জগতে ভিদকের হাতেখড়ি। তারপরে বেশ কয়েকবার শাস্তি পাওয়ার পরে এবং নির্ঘাত ফাঁসির হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে অবশেষে চৌত্রিশ বছরের জন্মদিনের কিছু আগে তিনি আবার ধরা পড়ার পরে আদালত ও আইনরক্ষার বড়কর্তাদের বোঝাতে পারেন যে, প্যারি ও তার আশপাশের অপরাধ জগতের হালহকিকত সম্বন্ধে তাঁর মত করতলবৎ জ্ঞান বিশেষ কারো নেই। ফলে, শাস্তির বদলে তাঁকে যদি গুপ্তচর হিসাবে বহাল করা হয় তাহলে তাঁর সাহায্যে ফরাসী রাজধানীর দুর্ধর্ষ অপরাধীদের শায়েস্তা করা আইনরক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হবে। সেই কাজে ভিদকের চমকপ্রদ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে নিজের একটি বাহিনী তৈরির অধিকার দেওয়া হয়। শুধরে যাওয়া প্রাক্তন অপরাধীদের নিয়ে ভিদক তৈরি করেন এমন এক বাহিনী যা আদতে পুলিশের মধ্যে সর্বপ্রথম উর্দিহীন গোয়েন্দাবাহিনী Brigade de la Sûreté-এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভিদক নিরাপত্তাবাহিনী Sûreté সামলান এবং ততদিনে আধুনিক অপরাধতত্ত্বে তাঁর অবদান স্বীকৃতি পেয়েছে। পদত্যাগ করার পরেই ভিদক তাঁর ঐ বিখ্যাত স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন, যদিও সেখানে লেখক হিসাবে তাঁর নাম ছাপা ছিল না। কিছুটা উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য সেই বইতে অপরাধীকে চিহ্নিত করার আশ্চর্যকর পদ্ধতি-প্রকরণের কথাগুলি অব্যবহিত পরেই গোয়েন্দা সাহিত্যে রহস্য সমাধানের যে কাঠামো অবলম্বন করা হবে তার ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। অনেক আলোচকই মনে করেন পো-র দ্যুপাঁ আদতে ভিদকেরই আরেক রূপ। ভিদকের সঙ্গে দ্যুপাঁর আর্থ-সামাজিক, শ্রেণি ও সাস্কৃতিক অবস্থানগত পার্থক্য বিস্তর। কিন্তু দুজনের প্রধানতম মিল— যৌক্তিক চিন্তনের মাধ্যমে অপরাধ ও অপরাধীর উপর থেকে রহস্যের পর্দা উন্মোচন। তার জন্য দরকারে ছদ্মবেশ ধারণ কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমান্তরালে নিজের বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা শুরু করতেও ভিদকের দ্বিধা ছিল না। দ্যুপাঁও বেসরকারি গোয়েন্দা। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিতেই তাঁর বসবাস। দ্যুপাঁর গল্পের কথক প্রথম আলাপে গোয়েন্দাপ্রবরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর বংশগৌরব ও ভাগ্যতাড়িত দারিদ্র্য ও তার থেকে নিজস্ব গরজে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন। বস্তুত, অবস্থানগত তারতম্য ভেদটুকু সরিয়ে রাখলে রক্তমাংসের ভিদকের ছায়াই যে সাহিত্যিক কায়া রূপে দ্যুপাঁ হয়ে উঠেছিল, তা স্পষ্ট হয়ে যায়:

---

[17] Loïc P. Guyon, 'In Vidocq's footsteps — A comparative study of some explicit and implicit references to the adventurer Vidocq in nineteenth-century literature', *Journal of European Studies*, Vol. 33, No. 2, 145-160 (2003). https://dspace.mic.ul.ie/bitstream/handle/10395/516/Guyon,L.(2003) 'In Vidocq's footsteps.' (Journal Article).pdf?sequence=2&isAllowed=y

> Poe is credited with inventing the modern crime novel with his short story 'The Murders in the Rue Morgue' but the accolade is founded on a technicality. Dupin is based on Vidocq… What impressed Poe most about Vidocq was his ability to assume such a vast range of disguises… Dupin does not resort to such crude methods as dressing to deceive, yet he borrows from Vidocq an air of the esoteric… in this respect Poe's character is a convenient perversion of Vidocq… Peel away the morally, culturally, and politically suspect features of Vidocq and another aspect of Dupin emerges: a man who regards himself as above the law, immune from the crude machinations of the state, and contemptuous of middle-class complacency.[18]

সংস্কৃত অপরাধী ও তার সঙ্গে পুলিশের যোগ, অপরাধের তদন্তে সেই প্রাক্তন অপরাধীর অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, বিচার ব্যবস্থা— সবমিলিয়ে একটা পুরো সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ভিদকের সমকালীন বিশিষ্ট কয়েকজন ফরাসী ঔপন্যাসিক। ১৮৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে *Le Père Goriot* উপন্যাসে ভিদকের ছায়া অবলম্বনে ভত্র্যাঁ নামের এক অপরাধীর চরিত্র হাজির করেছিলেন বালজ়াক। পরবর্তীকালে, আলেকজ়ন্দ্র দুমার *Les Mohicans de Paris* (১৮৫৪-৯) রচনায় পুলিশের গোয়েন্দা মঁসিয় জ্যাকাল কিংবা ভিক্তর উগোর *Les Misérables* (১৮৬২) উপন্যাসে সংশোধিত অপরাধী জঁ ভ্যালজ়ঁ এবং পুলিশ আধিকারিক জ্যাভের— সব চরিত্রগুলির ছাঁচ স্বয়ং ভিদক। অতঃপর, পলাশীর ঘুরঘুটিয়া গ্রামের বৃদ্ধ জমিদার কালীকিঙ্কর মজুমদারের সংগ্রহে থাকা বইগুলির ফরাসী লেখক, 'যিনি প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন',[19] সেই এমিল গাবোরিও (১৮৩২-১৮৭৩) বালজ়াক, উগো কিংবা দুমার উচ্চমার্গীয় সাহিত্যের পথ থেকে ভিদককে নিয়ে এলেন জনপ্রিয় গোয়েন্দা সাহিত্যের আঙিনায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে নিজের প্রথম উপন্যাসে— *L'Affaire Lerouge* (*The Lerouge Affair*)— গাবোরিও লে পের তাবারে নামের যে অতিশায়ী গোয়েন্দাকে হাজির করান তা মূলত মাইক্রফ্ট হোমসের আদিরূপ। প্রথমদিকে লেকক আদতে তাবারের শিক্ষানবিশ।[20] ফলে, গাবোরিওর প্রথম উপন্যাসে লেকক থাকলেও সেটির মূল গোয়েন্দা তাবারে। এরপরে সরাসরি মঁসিয় লেককে পাঠকের দরবারে এনে ফেলেন গাবোরিও। লেককও, বাস্তবের ভিদকের মত অপরাধী থেকে শুধরে গিয়ে পুলিশের গোয়েন্দা বনে যান, তাঁর আদ্যনাম অজানা। রাজনৈতিক বিপ্লবমুখর উথাল-পাথালের সেই আমলে ফরাসী সমাজের বাঁকবদলের কোনো মহৎ আখ্যান রচনায় গাবোরিও উৎসাহী ছিলেন না; তাঁর ঝোঁক কেবল ভিদকের স্মৃতিকথার সেই অংশগুলিতে যেখানে অপরাধী ধরার চমকপ্রদ ও অভিনব কৌশল বর্ণিত হয়েছিল। এই বিচারে বলা যেতে পারে দুপ্যাঁ থেকে হোমসে পৌঁছনোর যোগসূত্র মঁসিয় লেকক। অপরাধের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির ঝটিতি হদিশ করে ফেলে অসম্ভব দক্ষতায় তিনি চিহ্নিত করেন দোষীকে। আর সেই সুবাদে

---

[18] Richard Bradford, *Crime Fiction*, প্রাগুক্ত

[19] "এমিল গ্যাবেরিও-র নাম শুনেছ? 'হ্যাঁ হ্যাঁ', উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল ফেলুদা, 'ফরাসি লেখক, প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন'।" দ্রষ্টব্য: সত্যজিৎ রায়, ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা, ফেলুদা সমগ্র, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫) পৃ. ৪৯৯

[20] হাওয়ার্ড হেক্র্যাফ্ট *L'Affair Lerouge* সম্পর্কে লিখেছেন: "In the sense that it was the first story of novel length to employ detection as an important theme, it is perhaps entitled to the appellation "the first detective novel"—though it bears little resemblance to what we mean by the term today." দ্রষ্টব্য: Howard Haycraft, *Murder for Pleasure* (New York : Dover Publications, 2019 [1941]), ePub edition. প্রসঙ্গত বলা যায়, তাবারে ও লেককের গুরু-শিক্ষানবিশ সম্পর্ক পাঁচকড়ি দে-সৃষ্ট অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পাঠকও একদিকে রোমহর্ষক অপরাধের বর্ণনা পড়ে সামাজিক স্থিতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় দ্যোদুল্যমান, আবার অন্যদিকে গোয়েন্দাচূড়ামণির অপঠিতপূর্ব অবরোহী যুক্তিবিন্যাসের অটুট জালে মোহাবদ্ধ। আপাত অসংলগ্ন ঘটনাবলীকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা 'ক্লু' বা সূত্রের গিঁটে জুড়তে জুড়তে গাবোরিওর মঁসিয় লেকক তৈরি করে ফেলেন এমন এক আখ্যান, যেখানে অপরাধের কী-কখন-কেনো-কীভাবে এবং শেষত অপরাধী কে?— এক সম্পূর্ণ আপাত-নিটোল যুক্তিশৃঙ্খলে পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়। সেহেতু হোমস মুখে দ্যুপাঁর থেকেও লেককে নিকৃষ্ট বললেও, আদতে হয়ত তা ব্যজস্তুতি।[21]

১৮৫০-এর দশকের শেষদিকে ইংলিশ চ্যানেলের অন্য পারেও 'ছোটলোকের' পাঠ্য পেনি-সুলভ সস্তা-চটকদার ভয়াল-রোমহর্ষক অপরাধের বৃত্তান্তের— 'penny-dreadfuls'— এক 'ভদ্রলোকী' বিকল্প হাজির হতে থাকে। ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা যখন ইংরেজ-সমাজে বহুলচর্চিত, তেমনই এক পর্যায়ে প্রকাশিত হল উইলকি কলিন্সের *The Woman in White* (১৮৫৯)। এই বইয়ের মাধ্যমে যে রহস্য-রোমাঞ্চময় সাহিত্যের শুরুয়াদ হল, দ্রুতই তা ইংল্যান্ড ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের হাত ধরে সুদূর ভারতের বঙ্গদেশ বিজয় করে ফেলল।[22] রহস্য-রোমাঞ্চ আর কেবল 'ইতর'জনের রুচিবিকৃতির নমুনা নয়, বরং শিক্ষিত ভদ্রলোকের অবসরযাপনের সঙ্গী হয়ে উঠল। কলিন্সের উপন্যাস প্রকাশের পরেপরেই পাঠক পেলো শ্রীমতী হেনরি উডের *East Lynne* (১৮৬০-৬১), মেরি এলিজ়াবেথ ব্র্যাডনের *Lady Audley's Secret* (১৮৬১-৬২) এবং চার্লস রীডের *Hard Cash* (১৮৬৩)।[23] সবকটি আখ্যানেই দেখা যাবে চরিত্রগুলি সমাজের উঁচুতলার, অর্থবান ও মোটামুটি নাম-গোত্র-জ্ঞাত পরিবারের; এবং তাদের মধ্যেই গুপ্ত স্বার্থের সংঘাত, ভয়, ষড়যন্ত্রের মধ্যে পাকিয়ে ওঠে অপরাধের প্রেক্ষাপট। আর্থিক উত্তরাধিকার কিংবা যৌনতা-কেন্দ্রিক সংঘাত, গোপন কেচ্ছা নিয়ে টানাপোড়েন, অবৈধ সম্পর্কের জের— সবমিলিয়ে ভদ্রলোকী সমাজ যেন 'আপনার মুখ আপনি দেখুন'-এ মজতে লাগল। তবে, কলিন্সের *The Woman in White*-এ কিংবা অন্যান্যদের রচনায় তখনও পুলিশের গোয়েন্দা কিংবা বেসরকারি গোয়েন্দা উঁকি দেয়নি। সমাজের যে স্তরের থেকে এই লেখাগুলির চরিত্রদের আমদানি, সেই স্তরে পুলিশি বখেড়া মানহানিকর। তাই এই পর্যায়ের রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসগুলি যেন-বা বুর্জোয়া পাঠককুলকে আশ্বস্ত করে বলতে চায় যে, নিজেদের কুকীর্তি নিজেরাই সামাল দেওয়া যায়, তার জন্য নীচু শ্রেণির পুলিশি হুজ্জুতি ডেকে আনার দরকার নেই। পুলিশের প্রতি একরকমের

---

[21] ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আত্মজীবনী *Memories and Adventures*-এ স্যর আর্থার কনান ডয়েল অ্যালন পো ও গাবোরিওর প্রতি ঋণ স্বীকার করে লিখছেন: "I felt now that I was capable of something fresher and crisper and more workmanlike. Gaboriau had rather attracted me by a neat dovetailing of his plots, and Poe's masterful detective, M. Dupin, had from boyhood been one of my heroes. But could I bring an addition of my own? " এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Leslie S. Klinger, ed., 'The World of Sherlock Holmes', প্রাগুক্ত।

[22] উইলকি কলিন্সের এই উপন্যাসটি তিনভাগে বাংলা তরজমা করেছিলেন দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭)। শুক্লবসনা-সুন্দরী নামের সেই অনুবাদের ১ম ভাগ ১৮৮৫, ২য় ভাগ ১৮৮৮ ও তৃতীয় ভাগ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়— যিনি গোয়েন্দা গল্পও লিখতেন— ঐ একই নামে একটি বই লিখেছিলেন।

[23] Richard Bradford, *Crime Fiction*, প্রাগুক্ত।

অবজ্ঞা ও নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ সুরক্ষিত রাখার দুর্মর বাসনা আদিপর্বের রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের ভদ্রলোকী অবতারে সুস্পষ্ট।

The Woman in White প্রকাশের প্রায় এক দশক পরে কলিন্সের আরেকটি উপন্যাস সাড়া ফেলে দেয়— *The Moonstone* (১৮৬৮)। অনেকের মতে, এটিই নাকি শ্রেষ্ঠতম গোয়েন্দা গল্প। টি.এস.এলিয়টের মতে: "The Moonstone is the first and greatest of English detective novels". এই বলে এলিয়ট পো-র সঙ্গে কলিন্সের তুলনা করে লিখেছেন, পো গোয়েন্দা গল্পকে দাবা খেলার মত একটি বৌদ্ধিক বিশেষীকৃত স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন; অন্যদিকে কলিন্সের উদ্দিষ্ট উপন্যাসে গাণিতিক ধাঁধা নয়, মানবিক রহস্যময়তা গুরুত্ব পেয়েছে।এক্ষেত্রে এলিয়ট বলেছেন পো নয়, বরং ইংরেজি গোয়েন্দা গল্প বর্গটির স্রষ্টা কলিন্স— "In detective fiction England probably excels other countries; but in a genre invented by Collins and not by Poe.[24] বস্তুত, অ্যালন পো-র সৃষ্ট চরিত্র দ্যুপাঁর থেকে আলাদাভাবে কলিন্স ও গাবোরিও যেভাবে সৎ, কর্মনিষ্ঠ, অনুসন্ধিৎসু পুলিশ গোয়েন্দার চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন সে সম্পর্কে একজন আলোচক লিখেছেন:

> Collins and Gaboriau gave us the honest professional, often disdained by the amateur,…After Collins and Gaboriau the professional detective, whether uniformed or in plain clothes, no longer appears in fiction as the corrupt oppressor, but as the protector of the innocent. The detective's changed character in fiction reflected a change in the nature of society, and his standing as a watchdog against evil…[25]

ভেরিনডার পরিবার থেকে অপহৃত রত্ন উদ্ধারে নামেন সার্জেন্ট কাফ। বস্তুত, রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসে পুলিশের গোয়েন্দার আমদানি সেই প্রথম। আলোচকদের মতে, সার্জেন্ট কাফের চরিত্রটির পিছনে একজন বাস্তব মানুষ আছে, তিনি মেট্রোপলিটান পুলিশের ইন্সপেক্টর জনাথন 'জ্যাক' হুইচার (১৮১৪-১৮৮১)। ১৮৪২ সালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নব্য প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা বিভাগে নিযুক্ত প্রথম আটজন গোয়েন্দার অন্যতম ছিলেন হুইচার। ১৮৬০-এ নিজের প্রায় চার বছর বয়স্ক ভাইকে হত্যার অভিযোগে কন্সটান্স কেন্ট নামে এক ভদ্রমহিলাকে গ্রেফতার করেন হুইচার। কিন্তু, শ্রমিক-শ্রেণির সগোত্র একজন পুলিশের দ্বারা একজন ভদ্রমহিলার গ্রেফতার নিয়ে গণমাধ্যমে হৈচৈ বেধে যায়। তার চাপে শেষ পর্যন্ত বিনা বিচারেই কেন্টকে মুক্তি দেওয়া হয়। অবশ্য ঘটনার পাঁত বছর পরে কেন্ট নিজের দোষ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, ভদ্রলোক সমাজের বিষয়ে নীচু তলার পুলিসের 'নাক গলানো' যতই নায্য ও প্রমাণ সিদ্ধ হোক, তা যে বরদাস্ত করা হতো না, তারই প্রমাণ হুইচার-কেন্ট ঘটনা। সার্জেন্ট কাফের মাধ্যমে কলিন্স মধ্য-উনিশ শতকী ইংরেজ সমাজের ঐ উন্নাসিকতাকে সমালোচনা করেছেন না হুইচারকেই ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন

---

[24] T. S. Eliot, 'Wilkie Collins and Dickens' (1927) in *Selected Essays* (London: Faber & Faber). পৃ. ৪২৬-৪২৭।

[25] Julian Symons, *Bloody Murder*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৮

সেটা অবশ্য বিতর্কের বিষয়।[26] অবশ্য পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান হলেও কাফের সিদ্ধান্ত ছিল ভ্রান্ত। টি.এস.এলিয়ট সার্জেন্ট কাফের চরিত্রটি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

> Since Collins, the best heroes of EnglIsh detective fiction have been, like Sergeant Cuff, fallible; they play their part, but never the sole part, in the unravelling… Sergeant Cuff, far more than Holmes, is the ancestor of the healthy generation of amiable, efficient, professional but fallible inspectors of fiction among whom we live to-day.[27]

বরং, কলিন্সের উপন্যাসে রহস্য সমাধানের বাহাদুরি ফ্রাঙ্কলিন ব্লেকের। ব্লেক অনেকটা শখের গোয়েন্দার আদিছাঁচ, তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতিভূ। তাই কাফ শেষপর্যন্ত রহস্য সমাধানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, সে সম্ভ্রান্ত, কুলীন সমাজের প্রতিনিধি নয়। বরং, জন্মসূত্রে উঁচুতলার প্রতিনিধি ব্লেকই সেই মেধার অধিকারী, যা প্রয়োগ করে সেই উঁচুতলারই সমগোত্রীয় অপরাধীকে চিহ্নিত করা যায়। হোক-না অপরাধী, তবু শ্রেণী কৌলিন্যের অবস্থানকে টিঁকিয়ে রাখতে হবে। নয়ত, গোয়েন্দা সাহিত্য প্রচলিত ক্ষমতাতন্ত্রের কাঠামোর পক্ষে সওয়াল করার বদলে আদতে চারিয়ে দিতে পারে উলটো বাগের মনোভাব। ফলে, সমাজের নীচুতলা থেকে আসা পুলিশের দারোগা কাফের বদলে উঁচুতলার গোয়েন্দা ব্লেকেরই করায়ত্ত সেই মেধা, যার মাধ্যমে সন্দেহ, ভুল সূত্র, গোলকধাঁধাময় রহস্য-কুজ্ঝটিকা ভেদ করে 'সত্য' উদ্ধার করা যায়। অতঃপর, 'সত্য'-উদ্ধারের শ্রেণি চরিত্র গোয়েন্দা সাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে গেল। পাঠকও মনে মনে গোয়েন্দাকে 'গুরু' ভেবে নিজেকে তার দোসর ভেবে বসল, যেন-বা সেই সম্ভ্রান্ত বৃত্তে গোয়েন্দার মতই পাঠকেরও অবস্থান।

শার্লক হোমসের বিভিন্ন দোসর ও অনুসারী

উইলকি কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাস জনপ্রিয় হলেও, এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, ঠিক যেমন পো-র অনুসরণে গোয়েন্দা সাহিত্যে যেমন জোয়ার আসেনি, তেমনই কলিন্সের দেখাদেখি সকলে লিখতে শুরু করেনি। বরং, কলিন্সের লেখা ও ডয়েলের লেখার মধ্যে একটা কালের নিরিখে প্রায় দু-দশকের ব্যবধান আছে যাকে জুলিয়ান সাইমন্স 'Interregnum' বলেছেন।[28] সাইমন্সের আলোচনা থেকে দেখা যায়, কলিন্স থেকে ডয়েলে পৌঁছানোর মধ্যে অনেক রকমের রহস্য গল্প লেখা হলেও, পাঠককে একেবারে বুঁদ করে তোলার মত গোয়েন্দা গল্পের অভাব ছিল। অথচ, আখ্যানের কাঠামো কেমন হবে, তার আন্দাজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল— সূত্র অর্থাৎ ক্লু-এর জট ছাড়াতে

---

[26] হুইচার ও অন্যান্য আদিপর্বের বাস্তব ইংরেজ গোয়েন্দাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Alan Moss and Keith Skinner, *The Victorian Detective* (Great Britain: Shire Publications, 2013), ePub edition.

[27] T. S. Eliot, 'Wilkie Collins and Dickens', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬-৪২৭

[28] জুলিয়ান সাইমন্সের পূর্বোক্ত বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনামই 'Interregnum', এবং সেখানে সাইমন্স ঐ পর্যায়ে এমন বেশ কয়েকটি বই নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলির উপজীব্য অপরাধ হলেও সেগুলি গোয়েন্দা কাহিনী নয়। তেমনই একটি বই ফিওদর দস্তয়ভস্কির লেখা *Crime and Punishment*. সাইমন্সের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Julian Symons, *Bloody Murder,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬৬

ছাড়াতে শেষে রহস্য উন্মোচন। পেশাগতভাবে কিংবা শখের— উভয় রকমের গোয়েন্দাও ততদিনে হাজির, যিনি হয় বিশুদ্ধ অবরোহী যুক্তিক্রম কিংবা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করে রহস্যভেদ করবেন। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে সাক্ষরতা ও ছাপাখানা— দুয়ের প্রসারের ফলে পাঠক পেলো বিভিন্ন সস্তার জনপ্রিয় পত্রিকা, যার পাতায় পাতায় থাকত বিচিত্র রকমের গল্প, রহস্য-রোমাঞ্চ ও প্রবন্ধ। সাইমন্সের মতে, সেগুলি হালকা গোত্রের লেখা হলেও 'পেনি ড্রেডফুল' ও 'ডাইম নভেল'গুলির থেকে উঁচুদরের— "a level above that of the penny dreadful and the dime novel", এবং সেই উর্বর জমিতে যে মুহূর্তে কনান ডয়েল হোমসের আখ্যান হাজির করলেন, তা একটা চাহিদা পূরণের মাধ্যম হয়ে উঠল।[29] লেখক, সম্পাদক ও পাঠক— সকলেই অনুভব করল যে, গোয়েন্দা গল্প গণসাহিত্যের জলহাওয়ায় বেড়ে উঠছে। পাশাপাশি, আখ্যানের নির্ণায়ক কাঠামোর একটা হদিশও স্পষ্ট হয়ে উঠল হোমসের গল্পগুলির মাধ্যমে— "There was to be a crime or an attempted crime, a problem, a solution reached through the skill of the detective, and all this was to be compassed within some five thousand words", এবং *The Strand Magazine*-এর বিক্রি বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেলো। ফলে, বিক্রির অঙ্ক- লাভের হিসাব এবং মুদ্রণ পুঁজির সমন্বয়ে গোয়েন্দা গল্প হয়ে উঠল নতুন যুগের সাহিত্য।[30] জর্জ নিউনেস ১৮৯০ সালে দ্য স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৯১ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এইচ. গ্রিনহাফ স্মিথ এর সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি মূলত সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে প্রকাশিত হত। নানান ধরনের ছোট গল্প, তথ্যবহুল নিবন্ধ, এবং ধারাবাহিক গল্প সংবলিত ও সচিত্র পত্রিকাটি শার্লক হোমসের গল্পগুলির জন্য বিশেষভাবে পরিচিতি পায়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে হোমসের গল্পের হাত ধরে পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল দ্য স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন।

অবশ্য, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে *A Study in Scarlet* উপন্যাসের মাধ্যমে হোমসের সঙ্গে পাঠক পরিচিত হলেও এবং মোটামুটি ভাল বিক্রি সত্ত্বেও তখনই হোমসকে নিয়ে তেমন গণআগ্রহ তৈরি হয়নি। বরং, তার কয়েক বছর পরে ১৮৯১ থেকে '৯২ পর্যন্ত দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকায় প্রকাশিত ডয়েলের ছোটগল্পগুলিই— যার একত্র সন্নিবেশ ঘটে *The Adventures of Sherlock Holmes* (১৮৯২) বইতে— পাঠকের কাছে হোমসকে প্রায় রক্তমাংসের মানুষে পরিণত করে। সেই শার্লক হোমসকে যখন 'The Final Problem' (১৮৯৩) গল্পে রাইখেনবাখ জলপ্রপাতে পড়ে যেতে দেখে পাঠক, তখন স্বাভাবিক যে প্রিয় চরিত্রের মৃত্যু তারা মেনে নেবে না। ফলে, গণদাবী মেনে নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থে বাধ্যত হোমসকে পুনর্জীবিত করেন ডয়েল।[31] বেশ কিছু বছরে পরে স্বমহিমায় ফিরে আসে হোমস। রাইখেনবাখ দুর্ঘটনার আগের একটি অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে হোমস-সঙ্গী ডাক্তার ওয়াটসন 'লিখতে' শুরু করেন *The Hound of the*

---

[29] তদেব, পৃ. ৬৪

[30] তদেব, পৃ. ৬৫

[31] জানা যায় যে, হোমসের সলিলসমাধির প্রতিবাদে লোকেরা নাকি শোকজ্ঞাপনের জন্য বাহুতে কালো পট্টি বেঁধে রাখত এবং রাতারাতি দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকার কুড়ি হাজার গ্রাহক কমে যায়; এমনকী ব্রিটেনের রাজপরিবারের সদস্যরাও শার্লকের মৃত্যু মেনে নিতে না-পেরে তাঁদের হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। সূত্র: *Britannica*, 'Sherlock Holmes', Last Updated: Oct 21, 2024, https://www.britannica.com/topic/Sherlock-Holmes

Baskervilles, যা দ্য স্ট্রান্ড পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে ছাপা হতে থাকে (১৯০১-'০২) এবং ১৯০২ সালেই কয়েক মাসের ব্যবধানে ইংল্যান্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বই হিসাবে প্রকাশ পায়। এর পরের বছরে প্রকাশিত হয় হোমসের নতুন একটা গল্প 'The Adventure of the Empty House', সেখানে ওয়াটসন জানতে পারে রাইখেনবাখ জলপ্রপাতে প্রোফেসর মরিয়ার্টি তলিয়ে গেলেও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়েছিল হোমস।[32]

শার্লক হোমসকে নিয়ে ক্রমশ মাতামাতি শুরু হলেও, নিছক বিক্রির হিসাবে অবশ্য তাকে টেক্কা দিয়েছিল পুলিশের গোয়েন্দা ডিটেকটিভ গর্বি। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে প্রকাশিত *The Mystery of a Hansom Cab* বইটি পরের বছরে ব্রিটেনে ও তারপরের বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রকাশিত হয়। সমগ্র উনিশ শতকে আর কোনো গোয়েন্দা কাহিনী এই বইটির থেকে বেশি লোকে কেনেনি। নিউজ়িল্যান্ডবাসী আইনজীবী ফার্গাস হিউমের লেখা এই বই শুধু ব্রিটেনেই প্রথম ছ-মাসে প্রায় তিনলক্ষ বিক্রি হয়েছিল। গ্যাবোরিওর বইয়ের জনপ্রিয়তা দেখে হিউম গোয়েন্দা কাহিনী লেখায় আগ্রহী হন। একবার এক বই বিক্রেতাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে সবথেকে জনপ্রিয় বই কোনগুলি। দোকানি যখন গাবোরিওর নাম বলেন তখন হিউম একে একে প্রায় এগারোটা মত গাবোরিওর বই মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং কাহিনীগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেই ধরনের বই লিখতে মনস্থ করেন, যাতে রহস্য থাকবে, খুন হবে এবং মেলবোর্নের নীচুতলার জীবনযাপনের বর্ণনা থাকবে। ফলে দ্রুতই গ্যাবোরিওর ছাঁচে তিনি নিজে হত্যা-রহস্য-গোয়েন্দাগিরি সব মিলিয়ে লিখে ফেলেন বইটি।[33] তবে, সেই ছকে লেখা *The Mystery of a Hansom Cab* যে এমন জনপ্রিয় হবে তা হিউম প্রথমে কল্পনাও করতে পারেননি। গোড়ায় প্রকাশকেরা বইটি ছাপতে উৎসাহ না-দেখানোয় নিজের পয়সাতেই হিউম বইটি ছাপিয়ে ফেলেন। ক্রমে এমন পরিস্থিতি হয় যে, একসময়ে দিনে প্রায় তিন হাজার বই বিক্রি হতো। অবশ্য, সমালোচকেরা বিশেষ খুশি হয়নি। এর রচনাশৈলী খেলো এবং আখ্যান সাহিত্যগুণহীন। তবে বোঝাই যায়, সাধারণ পাঠক এইসব উঁচুদরের সমালোচনাকে বিশেষ পাত্তা না-দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ডিটেকটিভ গর্বির কেরামতি পড়ত।[34] কনান ডয়েল যদিও ফার্গাস হিউমের বইয়ের বিক্রির হিসাব বিলক্ষণ জানতেন। ব্রিটেনে ডিটেকটিভ গর্বি ও শার্লক হোমসের প্রথম উপন্যাস একই বছরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু, হোমসের বইয়ের বিক্রি তেমন আহামরি হয়নি, সমালোচকরাও তত গুরুত্ব দেননি। ফলে, কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ কনান ডয়েল

---

[32] 'The Adventure of the Empty House' গল্পটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর *Collier's* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেই বছরে অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের *The Strand* পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়। মার্কিন সংস্করণের জন্য সাতটি অলংকরণ করেছিলেন এবং দ্য স্ট্র্যান্ডের সংস্করণে সাতটি ছবি এঁকেছিলেন সিডনি প্যাজেট। পরবর্তীকালে গল্পটি *The Return of Sherlock Holmes* শিরোনামের সংকলনে যুক্ত হয়। সেই সংকলনটি ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে এবং মার্চে যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

[33] Merrick Burrow, 'Holmes and the History of Detective Fiction' in *The Cambridge companion to Sherlock Holmes*, edited by Janice M. Allan & Christopher Pittard (UK: Cambridge University Press, 2019), পৃ. ১৬-১৭

[34] আরও জানা যায় যে, উনিশ শতকের শেষে ফার্গাস হিউমের গোয়েন্দা কাহিনী *The Mystery of a Hansom Cab* যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃপ্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি তার নাট্যরূপ লন্ডন, মেলবোর্ন ও নিউ ইয়র্কে দীর্ঘদিন মঞ্চস্থ হয়েছিল। ৫০০ রজনীরও বেশি দিন ধরে তা লন্ডনে অভিনীত হয়। হিউমের গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Clare Clarke, *Late Victorian Crime Fiction in the Shadows of Sherlock* (UK: Palgrave Macmillan, 2014), পৃ. ৪৩-৭১ এবং Clare Clarke, *British Detective Fiction 1891–1901: The Successors to Sherlock Holmes* (UK: Palgrave Macmillan, 2020), পৃ. ৮৫-১০৮

হিউমের উপন্যাসকে কার্যত ‘জোচ্চুরি’ বলে দাগিয়ে দেন। হিউমের সাফল্যকে সমালোচনা করে ডয়েল এক চিঠিতে লেখেন: “What a swindle *The Mystery of a Hansom Cab* is,.. One of the weakest tales I have read, and simply sold by puffing”.[35] হিউমের গোয়েন্দারা হোমসের মত দক্ষ নয়, তাদের রহস্য সমাধানে যুক্তির বদলে ভাগ্যের সহায়তা বেশি। অনেকে মনে করেন, হয়ত হিউমের গোয়েন্দাদের থেকে হোমসকে আলাদা করার জন্যই ডয়েল ভিন্ন পথে হেঁটে মঁসিয় দ্যুপাঁর বৌদ্ধিক দক্ষতা ও ডাক্তার বেলের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছিলেন শার্লক হোমসকে। সত্যি বলতে কী, ক্যারিশমায় হোমসের ধারেকাছেও ছিল না ডিটেকটিভ গর্বি। তাই বিক্রিতে টেক্কা দিলেও শেষ বিচারে শার্লক হোমসের বিশ্বব্যাপী ছায়ায় লীন হয়ে গেছে গর্বি। হোমসই হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিংবদন্তী গোয়েন্দা। তবে তার পিছনে পৃথিবীজোড়া ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কখনও সূর্য-অস্ত-না-যাওয়া সেই সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছিল শার্লক হোমস। খেয়াল করার বিষয়ে যে হোমসের মাত্র বারোটি গল্প ১৯২১ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি সব কাহিনীরই প্রকাশ কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে, যুদ্ধ চলাকালীন কেবল *The Valley of Fear* উপন্যাস (১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছিল দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকায়) এবং ‘His Last Bow’ গল্পটি (১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছিল দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকায়) প্রকাশিত হয়। ফলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে জড়িত ছিল শার্লক হোমসের আখ্যানগুলি। বস্তুত, যুদ্ধ চলাকালীন হোমস-আখ্যানের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আবেগ সঞ্চারিত করার নমুনা ‘His Last Bow’ গল্পটি। একজন আলোচক লিখেছেন: “its prime function is to stir up patriotic feelings against Germany (at the time of publication, German U-boats were a huge threat to British merchant shipping)”.[36]

সকলে যখন ধরে নিয়েছিল যে, রাইখেনবাখের জলপ্রপাতে মরিয়ার্টির সঙ্গে হোমসের সলিল সমাধি হয়েছে, তখন আগ্রহী পাঠকের বাজার ধরতে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের সামনে নমুনাও ছিল হরেক— দ্যুপাঁ, লেকক, হোমস। দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকার পাতায় বেরোল আর্থার মরিসন (১৮৬৩-১৯৪৫)-এর বেসরকারি গোয়েন্দা মার্টিন হেউইটের কীর্তি— ‘The Lenton Croft Robberies’ (মার্চ, ১৮৯৪)। হোমসের আদলে গড়ে উঠলেও হেউইট মাটির কাছাকাছি থাকা অনেক সাধারণ মানুষ। চরিত্রটি পাঠকের পছন্দ হল, হোমসের অভাব একটু হলেও পূরণ হল। ক্রমে দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকায় বিভিন্ন গোয়েন্দার গল্প বেরোতে থাকল। মেয়েদের জন্য প্রচুর লিখে হাতপাকানো লেখিকা এলিজ়াবেথ টমাসিনা মীড স্মিথ (১৮৪৪-১৯১৪) এল. টি. মীড ছদ্মনামে রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী লিখতে থাকেন। ডয়েলের বন্ধু ও প্রতিবেশী গ্র্যান্ট অ্যালেনও (১৮৪৮-১৮৯৯) দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকায় গোয়েন্দা গল্প লিখতে শুরু করেন। নিরীশ্বরবাদী ও সমাজতন্ত্রী অ্যালেন গোড়ায় হার্বার্ট স্পেনসারের (১৮২০-১৯০৩) বক্তব্যের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু

---

[35] ডয়েলের চিঠির উদ্ধৃতির সূত্র: Merrick Burrow, ‘Holmes and the History of Detective Fiction’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

[36] Mark Campbell, *Sherlock Holmes* (UK: Pocket Essentials, 2007).

পরে তিনি স্পেনসারের সমালোচনা করে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৮০-র দশকের গোড়ায় স্যার উইলিয়ম উইলসন হান্টার (১৮৪০-১৯০০)-কে *Gazetteer of India* রচনার কাজে সাহায্য করার পরে অ্যালেন গল্প লেখায় মন দেন। ১৮৯২-এ প্রকাশিত হয় 'The Great Ruby Robbery', কিন্তু তিনি বেশি খ্যাত যে তিনটি গল্পের জন্য সেগুলি হল— 'An African Millionaire' (জুন ১৮৯৬ - মে ১৮৯৭), 'Miss Cayley's Adventures' (মার্চ ১৮৯৮ - ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯), এবং 'Hilda Wade' (মার্চ ১৮৯৯ - ফেব্রুয়ারি)। এর মধ্যে শেষ গল্পটি সম্পূর্ণ না-করেই প্রয়াত হন অ্যালেন। তখন ডয়েল অসমাপ্ত খসড়া শেষ করেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ তথা নারীর অধিকার, যৌনতা প্রভৃতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে অ্যালেনের অবস্থান রক্ষণশীল ডয়েলের থেকে ভিন্ন হলেও দ্য স্ট্র্যান্ড পত্রিকায় সস্তা কিন্তু ভালো গল্প লেখার তাগিদের প্রতি ডয়েল ও অ্যালেন নিষ্ঠ ছিলেন। তাই সাধারণত নারীদের সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখানো হোমসের স্রষ্টা ডয়েল অ্যালেনের যে গল্পটি শেষ করেছিলেন তার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিল্ডা ওয়েড পেশায় নার্স এবং 'নারীসুলভ সজ্জা'সম্পন্ন গোয়েন্দা। ওয়েডের সহযোগী ডাক্তার হুবার্ট কাম্বারলেজ একাধারে আখ্যানের কথক ও ওয়েডের প্রেমিক। গোয়েন্দা ও তার কীর্তি-কথক তথা সহযোগীর মধ্যে যে প্রায় সমবয়স্ক দুই পুরুষের এক বিশেষ সম্পর্ক-সমীকরণ পো থেকে ডয়েল পর্যন্ত চলে এসেছিল তাকে ভাঙেন অ্যালেন।

নারী গোয়েন্দা হাজির করলেও ইতি-নেতি কিংবা ন্যায়-অন্যায় নীতিবোধের দুই প্রতিনিধি যথাক্রমে গোয়েন্দা ও অপরাধী এবং শেষে ন্যায়েরই জয়— এই কাঠামোটা মোটামুটি ততদিনে পাঠরীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিল। নৈতিকতার দা-কাটা বিভাজনের সীমানা গোয়েন্দা আর অতিক্রম করতে পারে না। মরিয়ার্টির মত কোনো অপরাধী যদিও-বা গোয়েন্দার মতই বৌদ্ধিক দক্ষতার অধিকারী হয়, তবুও সামাজিক নীতিবোধে শেষ পর্যন্ত অন্যায়কারী অপরাধীকে পরাস্ত হতেই হবে। একবার এই ছকটা ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন আর্থার মরিসন, ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত ছটি গল্পের সংকলন *The Dorrington Deed-Box*-এ, কিন্তু সে বই লোকে কদর করেনি।[37] সৎ বেসরকারি গোয়েন্দা মার্টিন হিউয়েটের উল্টোদিকে অসৎ ও স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অপরাধ সংঘটনেও নির্দ্বিধ লন্ডনবাসী বেসরকারি গোয়েন্দা হোরাস ডোরিংটনকে পাঠক খারিজ করে দেয়। ডোরিংটনের কার্যকলাপ গোয়েন্দা সাহিত্যে ততদিনে প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরীয় নীতি-সিঞ্চিত ন্যায়-অন্যায়ের ভেদ মুছে দিতে চেয়েছিল। তাতে সমাজ-সংস্থার প্রতিষ্ঠিত স্থিতাবস্থা ভেঙে চৌচিরের সম্ভাবনা মাথা চাড়া দিতে পারে। অতএব, সেই আখ্যান পাঠকের পক্ষেও সুখকর নয় আবার সামাজিক স্থিতির পক্ষাবলম্বীও নয়। ফলে, মরিসনের এই সংকলনটির বেহাল দশা এটাই দর্শায় যে গোয়েন্দা ও অপরাধীর পরস্পর-বিরোধী সত্তার বৈশিষ্ট্যটি উনিশ শতকের শেষভাগে পৌঁছে গণমনে মান্যতা পেয়ে গিয়েছিল।

---

[37] ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের শেষ পর্বের বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Clare Clarke, *Late Victorian Crime Fiction in the Shadows of Sherlock*, প্রাগুক্ত এবং Clare Clarke, *British Detective Fiction 1891–1901,* প্রাগুক্ত।

এখানে অনিবার্য প্রশ্ন হলো, ইংল্যন্ড ও ফ্রান্স ব্যতিরেকে ইউরোপের আর কোথাও কি উনিশ শতকে গোয়েন্দা সাহিত্য লেখা হয়নি? বস্তুত, গোয়েন্দা সাহিত্য হিসাবে না-হলেও ইঙ্গ-ফরাসী ধারার বাইরে পশ্চিম ও পূর্ব ইওরোপে উনিশ শতকে অপরাধকে উপজীব্য করে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কিন্তু, তথাকথিত গোয়েন্দা কাহিনীর অবারিত উদযাপন সেক্ষেত্রে দেখা যায় না এবং সেগুলি নিছক গোয়েন্দা ও অপরাধীর মধ্যে সাপলুডোর খেলা নয়, বরং গভীরতর নানান সামাজিক-দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানী। আদতে সদ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো থেকে বেরোনো রাশিয়া (১৮৬১ সালে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তির ঘোষণা) কিংবা প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জর্মনি (১৮৭১) তখনও পুরোনো সাম্রাজ্যিক আবহ ত্যাগ করতে পারেনি। ইংল্যন্ড কিংবা ফ্রান্সের রাজনৈতিক-অর্থনীতি ও সামাজিক আবহ, তাদের ঔপনিবেশিক প্রসার ও পুঁজির বিকাশ ততদিনে অনেক ব্যাপ্ত। ফলে অপরাধ-উপজীব্য সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনীর সিদ্ধি ইংল্যন্ডে বা ফ্রান্সে যেভাবে হয়েছিল, রাশিয়া বা জর্মনিতে সেভাবে হয়নি। উপরন্তু, রুশ সমাজে ক্রমবর্ধমান সামাজিক-দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধের সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে গভীরতর দার্শনিক অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল, যার প্রতিফলন সমকালীন রুশ সাহিত্যে দেখা যায়। এই ধরনের লেখাগুলি থেকে আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে যে, অপরাধমূলক আখ্যান রচনায় ইঙ্গ-ফরাসি ছাঁচের গোয়েন্দা সাহিত্যের সর্বত্র-বিস্তৃত প্রভাবের বিকল্প ছাঁচ কেমন হতে পারত।[38]

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রিডরিশ শিলারের (১৭৫৯-১৮০৫) লেখা 'Der Verbrecher aus verlorener Ehre' (ইংরেজি তরজমা করলে The criminal of lost honor ও বাংলায় সম্মানহীন অপরাধীর আখ্যান) গল্পটি অপরাধের চরিত্র নিয়ে গভীর রসহীন দার্শনিক আলোচনায় ঢুকে না-পড়লে হয়ত লেখাটিকে প্রথম আধুনিক অপরাধ সাহিত্য বলা যেতে পারত। বস্তুত, গল্পটি আড়াইশো বছর পরে লেখা হলে বোধ হয় উত্তরাধুনিক ধাঁচের অপরাধ সাহিত্য হিসাবে খ্যাত হত।[39] আর্নস্ট থিওদোর আমাদেওস হফমান (১৭৭৬-১৮২২) সপ্তদশ শতকের প্যারি নগরের প্রেক্ষাপটে একটি উপন্যাস লেখেন— *Fräulein von Scuderi* (১৮১৮)। সেই উপন্যাসেরও আখ্যান একটি অপরাধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যদিও সেটিকে কোনোভাবেই গোয়েন্দা সাহিত্যের গোত্রে ফেলা যায় না, কিন্তু স্কুদেরির চরিত্রটি যেন পরবর্তী আমলের শখের গোয়েন্দার ভ্রূণাকার রূপ।[40] কিন্তু, তার মানে এই নয় যে, এই উপন্যাসটি পো কিংবা কলিন্সের রচনার পূর্বসূরী, এবং স্কুদেরির চরিত্রটা ঠিক অবরোহী যুক্তিনির্ভর গোয়েন্দার মত নয়। বস্তুতপক্ষে, আপাতদৃষ্টিতে অসমাধেয় রহস্যের জলদি সমাধানে সিদ্ধহস্ত কোনো গোয়েন্দা চরিত্রের আমদানি করে হফমান পলায়নোন্মুখ অবভাস তৈরি করে পাঠককে স্থিতাবস্থার প্রতি আশ্বস্ত করতে চাননি। বরং, শিলারের

---

[38] এই বিষয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Richard Bradford, *Crime Fiction* , প্রাগুক্ত।

[39] তদেব

[40] তদেব

মতই তিনিও পাঠককে গূঢ়তর সামাজিক-দার্শনিক প্রশ্নাবলীর মুখে দাঁড় করিয়ে অভ্যস্ত জমি পুনর্জরিপ করাতে চেয়েছেন।

অপরাধ-নির্ভর সাহিত্য এবং সেখানে গোয়েন্দার উপস্থিতি সত্ত্বেও মোটেই গোয়েন্দা কাহিনী পদবাচ্য নয় এমন ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সাম্রাজ্যিক রাশিয়ার কিংবদন্তী কথাকার ফিওদর দস্তয়ভস্কির (১৮২১-১৮৮১) উপন্যাস *Преступление и наказание* যার ইংরেজি তরজমার শিরোনাম *Crime and Punishment* (১৮৬৬)। হত্যাকারী রাসকলনিকভের অপরাধের পিছনে আপাত উদ্দেশ্য, যা গোয়েন্দা সাহিত্যে 'মোটিভ', নেই, এবং সেই উদ্দেশ্য খোঁজার বদলে হত্যাকারীর প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধ, ভীতি, অনুশোচনা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে আখ্যান এগিয়েছে। সেই জটিল আবর্তের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেবল একজন গোয়েন্দা পেত্রোভিচ। কিন্তু, পেত্রোভিচ পো-র সৃষ্ট দ্যুপাঁ বা ডয়েলের হোমস নয়। পেত্রোভিচের প্রায় অলৌকিক বৌদ্ধিক চতুরালিতে পাঠককে বুঁদ করা দস্তয়ভস্কির অভীষ্ট নয়। তাই অপরাধী কে, তা পাঠক আগেই জানে, এবং সেই তথ্য আগেই জানান দিয়ে হননের সঙ্গে যুক্ত মানসিক-নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়দীর্ণ এক জগতে পাঠককে টেনে নিয়ে যান লেখক। ফলে, উপন্যাস জুড়ে হত্যাকারী কে?— এই প্রশ্নের আপাত-রোমাঞ্চকর উত্তর অনুসন্ধানের বদলে খুনকে কেন্দ্র করে অপরাধের ধারণা, অপরাধীর জটিল মনোজগৎ প্রভৃতির বিশ্লেষণে দস্তয়ভস্কি মনোযোগী। সেই জটিলতর বিষয়গুলি এড়িয়ে গিয়ে পো, কলিন্স, গাবোরিও, ডয়েল প্রমুখ গোয়েন্দার নির্বিকল্প কিংবদন্তী প্রতিষ্ঠা করে গোয়েন্দা সাহিত্যকে প্রায় আধুনিক রূপকথায় পরিণত করেছিলেন। যদিও, ইংরেজ সমাজে শার্লক হোমসের অবরোহ যুক্তিপদ্ধতির তুঙ্গ জনপ্রিয়তা থাকলেও, ঐ যৌক্তিক কাঠামো সম্পর্কে সংশয় ব্যক্ত করেছিলেন লুই ক্যারল। রাইখেনবাখ জলপ্রপাতে তথাকথিত পতনের পরে হোমস যখন অন্তর্হিত, সেই সময়ে ১৮৯৫ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ জার্নাল *Mind, A Quarterly Review of Psychology and Philosophy*-তে ক্যারল একটি প্রবন্ধ লেখেন— 'What the Tortoise said to Achilles', যেটি গ্রীক কিংবদন্তীর বীরশ্রেষ্ঠ অ্যাকিলিস ও একটি কচ্ছপের মজার কথোপকথন। কিন্তু, সেই লেখায় যুক্তিবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত প্রয়োগের সঙ্গে সত্যে উপনীত হওয়ার সম্পর্ক বিষয়ে মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন ক্যারল। ঐ প্রবন্ধে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক জেনোর কূটাভাসকে নতুন করে বিচার করেছিলেন তিনি। অনুমানলব্ধ তথ্যাদি থেকে নির্বিকল্প সত্যে উপনীত হওয়ার যে খেলা দ্যুপাঁ থেকে হোমস পর্যন্ত গিয়ে বিশ্বজনীন 'সত্য' প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি হয়ে উঠেছিল, তাকেই প্রশ্ন করেছেন ক্যারল।[41]

পাশাপাশি, অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতকে সরলীকৃত করে জনমোহিনী গোয়েন্দা সাহিত্যের ছাঁচ তৈরি করার বিষয়টি সমালোচিতও হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আরেক রুশ লেখক আন্তন চেকভের (১৮৬০-১৯০৪) 'The Swedish Match' (১৮৮৩) গল্পটি। একটি খুনের রহস্য সমাধান করতে গিয়ে পুলিশের গোয়েন্দা দুকভস্কি অকুস্থলে

---

[41] ক্যারলের মূল রচনাও সেই সম্পর্কে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য: Amirouche Moktefi & Francine F. Abeles (Ed.), 'What the Tortoise Said to Achilles' - Lewis Carroll's Paradox of Inference (special issue), *The Carrollian,* No. 28, Double Issue , November 2016

পড়ে থাকা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ দেশলাই কাঠিকে সুইডেনে তৈরি বলে সাব্যস্ত করেন। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুসন্ধান করে যে ঐ দেশলাই বাক্স সুইডেন থেকে কিনেছিল তাকে পাকড়াও করে দুকভস্কি। কিন্তু, আখ্যান যত এগোতে থাকে ততই দুকভস্কি যেন দ্যুপাঁ হয়ে ওঠে, যত তুচ্ছ, নজর-এড়ানো সূত্রের প্রতিই তার মনোযোগ, আর সেইসব বিন্দু জুড়ে সে অবরোহী যুক্তির জাল বুনে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, হত্যাকারীর পরিচয় খোলসা হয়। কিন্তু, কার্যত দেখা যায় দুকভস্কির সিদ্ধান্ত একেবারে ভুল! এইভাবে অবরোহী যুক্তিপদ্ধতির ছাঁচে গোয়েন্দা কাহিনী লেখার ছলে ঐ গোত্রের সাহিত্যের আপাত-বৌদ্ধিক প্রকরণকে সমালোচনা করেছেন চেকভ।[42]

এইসব বৌদ্ধিক সমালোচনা অতিক্রম করে ইঙ্গ-ফরাসী ছাঁচের গোয়েন্দা সাহিত্য ক্রমে বিশ্ববিজয়ে বেরিয়ে পড়ল। এই পর্যন্ত যে যাত্রাপথের রূপরেখা পাওয়া গেল তার সব অলি-গলি-সড়ক মূলত পশ্চিম ইউরোপের চৌহদ্দিতেই সীমিত। সেই যুক্তি অনুযায়ী ইউরোপ তার নিজের গরজে নিজেরই সমাজ-কাঠামোর অন্তঃস্থল থেকে গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। বাস্তবের পুলিশ প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে গোয়েন্দা গল্পের ভিত্তি তৈরি হওয়াই সম্ভব ছিল না বলে অনেকে মনে করেন। ইংল্যান্ডে ১৮৪২ সালে মেট্রোপলিটান পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সেই বাস্তব পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল।[43] এই পর্যন্ত এসে ইওরোপীয় গোয়েন্দা সাহিত্যের পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক উদ্ভবের যাত্রাপথ শেষ করা যেতে পারে। কিন্তু, যে প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়, তা হল এই প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যের অবস্থান কোথায়? উনিশ শতকে ইউরোপ ও প্রধানত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রসারের উদগ্র বাসনায় পরস্পর দ্বন্দ্বরত। তার পাশাপাশি, পুঁজিবাদ নামের বিশ্বব্যবস্থা ও তার দোসর বুর্জোয়া রাষ্ট্রিক মতাদর্শের জগৎজোড়া প্রসর্যমানতা। তার মূলে ছিল অষ্টাদশ শতকী ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির যমজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। সেই পুঁজি ও সাম্রাজ্য উভয় প্রসারের অভিমুখই ছিল প্রাচ্য। সেই প্রসঙ্গের গভীরে গেলে স্পষ্ট হবে যে, ইওরোপীয় বিশেষত ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভবের একটি ঔপনিবেশিক ইতিহাসও আছে। উপনিবেশের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও ইংল্যান্ডে সেই অভিজ্ঞতার প্রভাব জনসমাজে যে 'সংকট'-ধারণা তৈরি করেছিল তার ভিত্তিতেই ইংরেজ গোয়েন্দা নামের কল্পচরিত্রের গণগ্রাহ্যতা নির্মিত হয়েছিল। এহেন গভীর প্রভাববিস্তারী সেই ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতারাজি জারিত

---

[42] আন্তন চেকভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়ার সময়েই এই গল্পটি লেখেন। ঘচনাচক্রে ডয়েলের সামনে যেমন তাঁর শিক্ষক জোসেফ বেল ছিলেন, তেমনই মনে করা হয় চেকভের শিক্ষক গ্রিগরি ক্ষাখারিন অবরোহী যুক্তপদ্ধতি মোতাবেক রোগনির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জন কুপ চেকভ সম্পর্কিত বইতে ডাক্তার ক্ষাখারিন সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি জোর দিতেন— "precise analysis of the evolution of the presenting symptoms, the circumstance of personal life and occupation and the psychological state of the patient". তবে ক্ষাখারিনের গুণমুগ্ধ শিষ্য চেকভ নিজের গল্পে অবরোহী যুক্তিপদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। জন কুপের বইয়ের সূত্র: John Coope, *Doctor Chekhov: A Study in Literature and Medicine* (Chale: Cross Publishing, 1998), পৃ. ২১। কুপের বইয়ের সূত্র গৃহীত হয়েছে: Anthony Storr, 'Review', *Journal Of The Royal Society Of Medicine*, Volume 91, (March, 1998 থেকে। https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/014107689809100321
চেকভের মূল গল্পটির জন্য দ্রষ্টব্য: https://www.chekhovshorts.com/stories/014.html

[43] ১৯৭৮ সালে জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনীকার রেজিনাল্ড হিল লিখেছিলেন: "Let me be clear. Without a police force there can be no detective fiction although several modern writers have, with varying degrees of success, tried to write detective stories set in pre-police days." হিলের উদ্ধৃতির সূত্র: P. D. James, *Talking about Detective Fiction* (New York : Alfre A. Knopf, 2009), পৃ. ৬

হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ-আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যগর্বী প্রাচ্যবাদী মতাদর্শে। অতঃপর, দ্বিতীয় যাত্রাপথ অর্থাৎ ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রাচ্যকেন্দ্রিক উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতটি বিচার করা যেতে পারে।

যাত্রাপথ ২: উপনিবেশ থেকে মাতৃরাষ্ট্র — ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক ভিত্তি

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রভূত সম্পদ হস্তগত করে। তারপরে যখন ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব ও মুঘল বাদশাহের মিলিত বাহিনী কোম্পানির হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে অবশেষে পরাজিত কিন্তু পুনঃস্থাপিত মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম কোম্পানির হাতে বাংলা ও বিহারের রাজস্ব আদায় তথা দেওয়ানির অধিকার তুলে দেয়, তখন থেকে কোম্পানির প্রশাসকরা সোৎসাহে বাংলার নবাবী মসনদের আড়ালে বসে আর্থনীতিক সুবিধার হিসাব কষতে থাকে; রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়ভার মাথায় নিয়ে চিনির বলদে পরিণত হয় বাংলার নবাব। এই দ্বৈত শাসনের কুফল অচিরেই বাংলায় মন্বন্তরের আকার নেয়। বঙ্গাব্দের বিচারে সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) অভিঘাতে উপনিবেশটাই না হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই দুশ্চিন্তা কোম্পানি-প্রশাসনের বড়কর্তা থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য— সকলকেই পেয়ে বসেছিল। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে:

> The first generation of British administrators were appropriators themselves and ruled the country with predatory intentions. Their personal loot of the Bengal revenue, known in history as the 'Plassey Plunder', had defrauded the government so much of its revenue that in the early seventies of the eighteenth century, the Company's administration had to solicit financial help from the Parliament in England.[44]

ঘটনাচক্রে সেই একই দশকের মাঝামাঝি ব্রিটেনের করতল থেকে মুক্তি ঘোষণা করেছিল উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলি (১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। ফলে, ১৭৭০-এর দশক জুড়ে নানান সংস্কার ও উদ্যোগের মাধ্যমে বঙ্গদেশে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে তৎপর হয়েছিল তথা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটেনের শাসককুল। মন্বন্তরের ধাক্কা সামলাতে ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল পদে মনোনীত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে হেস্টিংসের বিচার করা হয়। সেই বিচারসভায় হেস্টিংসের অন্যতম প্রধান বিরোধী এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) প্রাচ্যে 'স্বৈরাচারী' কোম্পানি শাসনের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং বিট্রিশ কর্তৃত্ব যে চরিত্রগতভাবে অহিংস সেটা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হন। উনিশ শতকের গোড়ায় ইংল্যান্ডের পণ্ডিতসমাজে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে বলপ্রয়োগের বদলে অপরাধ শনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রতি উৎসাহ লক্ষণীয়। তার পক্ষে যেমন ভারত-ইতিহাস—*The History of British India* (১৮১৭)— প্রণেতা জেমস মিল সওয়াল করেছিলেন, তেমনি

---

[44] Ranjit Sen, 'Social Banditry in Bengal 1757-1857' in *A Comprehensive History of Modern Bengal 1700–1950*, Vol. I, edited by Sabyasachi Bhattacharya (Delhi: Primus Books, 2020) পৃ. ৬০৫

Caleb Williams-এর লেখক গডউইনও ছিলেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তথা বলপ্রয়োগহীন আইনের শাসন কায়েম সম্পর্কে এই নতুন কল্পনাই ইংল্যান্ডে গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। ক্রমে গোয়েন্দা নামের বিশেষ একটি চরিত্র ইংরেজি সাহিত্যে ও গণমানসে ঠাঁই করে নেয়, যে শাস্তি দিয়ে অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করে নয়, বরং যুক্তি দিয়ে বিচার করে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারে; সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয় গায়ের জোরে নয়, যুক্তি-বুদ্ধির সুচারু প্রয়োগে। তথ্য-যুক্তি পরম্পরা ও বৈজ্ঞানিকতার সঙ্গে কাল্পনিক আখ্যানের মিশ্রণে এক নতুন ধরনের জ্ঞানতত্ত্বের নির্মাণ ঘটেছিল উনিশ শতকী ইংল্যান্ডে। তারই অন্যতম প্রকাশ গোয়েন্দা সাহিত্য, যার মাধ্যমে ইংরেজ পাঠক জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা বিষয়ে মনে ভরসা পেয়েছিল। তবে, অন্যদিকে আবার বহির্বিশ্বে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য কতটা নৈতিক তা নিয়ে ভিক্টোরীয় সমাজের সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক সংশয়েরও প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন গোয়েন্দা সাহিত্যে। তাই দেখা যাবে, কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসে অন্তর্লীন হয়ে আছে এক জোরালো সামাজিক সমালোচনা। সেখানে ঔপনিবেশিক হিংসা যে আদতে একটি অপরাধ সেই ধারণা আপাত-অদৃশ্য কিন্তু আখ্যানে নিহিত আছে।

বস্তুত, ভিক্টোরীয় গোয়েন্দা সাহিত্যে সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যিক প্রকরণকে কখনও-বা 'অপরাধ' বলে স্বীকার করে নেওয়া হলেও, দ্রুতই তুলনায় অগুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রোমহর্ষক কোনো রহস্যের অবতারণা করে সমগ্র অপরাধ নির্ণয় পদ্ধতির তথাকথিত বৈজ্ঞানিকতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। উপনিবেশের হিংসা ও প্রাচ্যবাদের অপরায়ণকে সেই রোমাঞ্চের পর্দার আড়ালে রাখার প্রবল চেষ্টা ভিক্টোরীয় গোয়েন্দা সাহিত্যের যুগলক্ষণ। সেই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপরে ক্রমে উনিশ শতকের শেষে শার্লক হোমস নামের সৌধচূড়া নির্মিত হবে এবং সমগ্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে হিংস্র ক্ষমতার আখ্যানকে চাপা দিয়ে তথাকথিত 'অহিংস' ক্ষমতার আখ্যান নির্মাণে গোয়েন্দা চূড়ামণি শার্লক হোমসই হয়ে উঠবে একমেবাদ্বিতীয় রূপকল্প।[45]

তবে, কেবল প্রাচ্যের উপনিবেশে নয়, উনিশ শতকের গোড়ায় স্বদেশেও পুলিশ ব্যবস্থা স্বাধীনতা ও সংযমের ধ্বজাধারী ইংরেজ জনতার প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের প্রসার ও পুলিশি ক্ষমতার বিস্তার— উভয়ের মধ্যে নিহিত আগ্রাসন যে ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শের পরিপন্থী সেই কথাটা ঘুরেফিরে উঠতে থাকে। বার্ক থেকে মিল— সকলেই জাতির সামনে আইনের শাসন, অপরাধীর বিচার ও সাম্রাজ্যের প্রসারের নব্য আখ্যান তুলে ধরতে উদগ্রীব ছিলেন। পাঠক জনতা যাতে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচিয়ে একাত্মবোধে উৎসাহী হয় তার জন্য হিংস্রতার উপকরণগুলিকে মনধাঁধানো রহস্য সমাধানের বৌদ্ধিক খেলায় পরিণত করতে হবে; আর সেই খেলায় যিনি সব্যসাচী তিনি গোয়েন্দা। এইদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্য উনিশ শতক জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘর ও বাহিরে ক্ষমতার অন্তর্গত হিংস্রতার উপরে আলোকদীপ্তি-সঞ্জাত ব্যক্তি-স্বাধীনতার উজ্জ্বলতম

---

[45] এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Ronald R. Thomas, "Minding the Body Politic: the Romance of Science and the Revision of History in Victorian Detective Fiction", *Victorian Literature and Culture* 19 (1991): ২৩৩-২৫৪ এবং John R. Reed, "English Imperialism and the Unacknowledged Crime of The Moonstone", *Clio: An Interdisciplinary Journal* (1973): ২৮১-২৯০

প্রলেপ, যে প্রলেপে এমনকী ঔপনিবেশিক প্রজারও চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। পুলিশের অত্যাচারের বিরোধিতায় সরব ঔপনিবেশিক প্রজা গোয়েন্দার কেরামতিকে মাথায় তুলে নেবে— আইনের শাসনের আখ্যান ও বাজারলক্ষ্মী— উভয়ের সম্মিলন ঘটবে।

বস্তুত, লন্ডনে হোক কিংবা কলকাতায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দীর্ঘ উনিশ শতক জুড়ে অপরাধ দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সম্পর্কে শিক্ষিত গণমানসে উদ্ভূত সংশয়-সন্দেহ নিরসনে গোয়েন্দা সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই আখ্যানের একদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষে যেমন সওয়াল করা হয়েছে, তেমনই সামাজিক কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতাবস্থা রক্ষার পক্ষেও যুক্তি সাজানো হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে ক্রমপ্রসর্যমান সাম্রাজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার নরম-গরম পাঠ চারিয়ে গেছে পাঠকের মনে। ব্যক্তি গোয়েন্দা বলের কদর্যতায় নয়, অবরোহী যুক্তিবিন্যাসের রুচিমান চকমপ্রদতায় রাষ্ট্র-সমাজ-প্রাতিষ্ঠানিকতা-উদ্ভূত অপরাধের দায় একজন ব্যক্তির উপরে চাপিয়ে তাকে 'অপরাধী' সাব্যস্ত করে একদিকে যেমন ক্ষমতার বৃহত্তর প্রকরণগুলিকে রক্ষা করেছে, তেমনই অন্যদিকে আইনের শাসন মোতাবেক অপরাধীর শাস্তিভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী স্বাধীনতার ও ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়ায় পাঠককুলকে আশ্বস্ত করেছে। পাঠকও বলের দর্পমগ্ন পুলিশের বদলে জ্ঞানের গর্বে গরীয়ান গোয়েন্দাকে গ্রহণ করেছে অন্তরে, কারণ উনিশ শতকে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবক্তা ব্রিটিশ জনতা সাম্রাজ্যের অন্তর্লীন রূপক হিসাবে পেশিশক্তির বদলে বৈজ্ঞানিকতানির্ভর তথ্যভিত্তিক জ্ঞানের ক্ষমতায় আস্থাবান ছিল। একজন আলোচক লিখেছেন যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ক্রমে ব্রিটিশ জনতার কাছে নব্য ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্য বিস্তারের বিষয়টি কৌতূহলের কেন্দ্র হয়ে ওঠে:

> (T)hanks to a new set of ideas about the nature of long-distance control, ideas largely scientific in origin, borrowed from the new disciplines of geography, biology and thermodynamics — people in Britain began to think differently about what it meant to hold on to an empire. The narratives of the late nineteenth century are full of fantasies about an empire united not by force but by information.[46]

(ব্যক্তি) স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের এমন রাজযোটক গোয়েন্দা সাহিত্যে উপস্থাপিত হয়েছিল, যাতে মজেছিল তাবৎ প্রজাপুঞ্জ, দুহাত তুলে গোয়েন্দার সাম্রাজ্যিক-স্বার্থ-রক্ষার বিজয় অভিযানে সমর্থন জানাতে কসুর করেনি তারা।

সমগ্র উনিশ শতকব্যেপে অপরাধী নির্ণয়ের এই আধুনিক পন্থা নিয়ে ইংরেজ বৌদ্ধিক মহল ব্যস্ত ছিল। উপনিবেশে ও ব্রিটেনে হরেক কিসিমের অপরাধ দমন করতে যে পুরানো পুলিশি ব্যবস্থা কাফি নয়, তা ততদিনে টের পাওয়া গিয়েছে। নতুন সাম্রাজ্যের সঙ্গে মানানসই কেন্দ্রীভূত ও আধুনিক অপরাধদমন বাহিনীর পক্ষে ততদিনে কথা বলা শুরু হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডের হিংসাত্মক কর্তৃত্বের সমালোচনার যে ধারা ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারসভায় এডমন্ড বার্কের বক্তব্যে উঠে এসেছিল তার রেশ ক্রমে ব্যাপ্ত হয়েছিল। পুরাতনপন্থী আগ্রাসনের মাধ্যমে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনসুলভ কর্তৃত্ব প্রকাশের বদলে আধুনিকতর, আলোকদীপ্ত কর্তৃত্ব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল অপরাধী

---

[46] Thomas Richards, The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire (London : Verso, 1993) পৃ. ১

নির্ণয়ের পদ্ধতি, এবং গোয়েন্দা সাহিত্য তারই বহিঃপ্রকাশ। আইন, কারাগার প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি অবরোহী যুক্তিবিদ্যা, অপরাধতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জীববিদ্যা, অঙ্গসংস্থানবিদ্যা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক এবং শিরোমিতিবিদ্যা বা ফ্রেনলজির মত (অপ)বৈজ্ঞানিক প্রতর্ক গোয়েন্দা সাহিত্যে মিশে গিয়েছিল। তার ফলে, পাঠকের বৌদ্ধিক মনোরঞ্জন ও রোমহর্ষক উত্তেজনা উভয়ের যৌগপত্য ঘটেছিল।

বস্তুত, ডিকেন্স কিংবা কলিন্সের উপন্যাসগুলির প্রায় অর্ধ-শতক আগেই খোদ ইংল্যান্ডে নব্যধারার পুলিশবাহিনী ও ইংরেজ জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে তার সাযুজ্য নিয়ে আলোচনা ও কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের বো স্ট্রিটের আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মরত হেনরি ও জন ফিল্ডিং নামে দুই ভাই শহরে ক্রমবর্ধমান অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে বেতনভোগী আঞ্চলিক পুলিশবাহিনী তৈরি করেন, যাদের 'বো স্ট্রিট রানার' বলা হত। তাদের কাজ ছিল বো স্ট্রিট জেলার রাজপথ ও সড়ক পাহারা দেওয়া।[47] পরবর্তীকালে বো স্ট্রিটের মত আরও বাহিনী তৈরির আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়। কিন্তু, সেই সময়ে সমগ্র দেশে মাইনেপ্রাপ্ত পুলিশবাহিনী গড়ার বিষয়ে সরকার বা জনগণের বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

আঠারো শতকের শেষদিক থেকে লন্ডনের পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বেশকিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও লেখক কলম ধরেন। স্কটল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ প্যাট্রিক কহুন (১৭৪৫-১৮২০) আঠারো শতকের একেবারে শেষদিকে *A Treatise on the Police of the Metropolis* (১৭৯৬) বইয়ে ব্যবসায়িকতার নীতি প্রয়োগ করে পুলিশি সংস্কারের ছক বাতলে দেন। তাই কহুনকেই অনেকে আধুনিক পুলিশি ব্যবস্থার রূপকার বলে মনে করেন। *A Treatise on the Functions and Duties of a Constable* (১৮০৩) নামের আরেকটি বই লিখেছিলেন কহুন। সেই বইতে তিনি সবিস্তার আলোচনা করেন যে, কনস্ট্যাবুলারি বাহিনীর সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য কী কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে— যেমন, সবথেকে জরুরি দক্ষতা ও আগ্রহ; তার সঙ্গে সততা ও নৈতিক গুণাবলীও জরুরি। আঠারো শতকের একেবারে শেষে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে টেমস রিভার পুলিশ বাহিনী তৈরি করা হয়, যা লন্ডনের প্রথম নিয়মিত পেশাভিত্তিক পুলিশদল। লন্ডন শহরের বাণিজ্যিক কাজকারবার টেমস নদীবন্দরকে কেন্দ্র করেই চলত। তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম সেই বন্দরে চুরি-ছিনতাই ছিল নিত্য বখেড়া। স্বভাবতই সেই আপদে অতিষ্ঠ বণিককুল ঐ পুলিশবাহিনীর খরচ জোগাত, আর বাহিনীর পরিচালক ছিলেন খোদ কহুন। তাতে আশিজন স্থায়ী নিযুক্ত ছিল এবং প্রয়োজনমত ডেকে নেওয়া হত আরও প্রায় হাজার জন পুলিশ। সেই বন্দরপুলিশের দুটি বৈশিষ্ট্য খেয়াল করার মত— প্রথমত, তাদের কাজকর্ম সবার দৃষ্টিগোচর হত, ফলে তার মধ্য দিয়ে এই ধরনের বাহিনীর কার্যকরতা জনসমক্ষে প্রমাণিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত, বাহিনীতে নিযুক্তরা ভাতা নয়, বেতনভোগী ছিল, ও কোনো অন্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করতে পারত না। কহুনের এই পরীক্ষা প্রভূত সাফল্য পায় এবং অপরাধের সংখ্যা কমতে থাকে। পরবর্তীকালে, রবার্ট পীল ইংল্যান্ডে আধুনিক পেশাদারি পুলিশি ব্যবস্থার প্রসার ঘটান।

---

[47] ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্বে বো স্ট্রিট রানার-এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Martin A. Kayman, *From Bow Street to Baker Street : Mystery, Detection and Narrative* (New York : Palgrave Macmillan, 1992).

কিন্তু, পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ে কহুন, পীল ও অন্যান্য অনেকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও, ইংরেজ সমাজে প্রতাপশালী অংশ তখনও পুলিশ ব্যবস্থায় আস্থাবান হতে পারেনি। বাহিনীতে ভাতার বদলে মাইনে চালু করতে হলে দরকার ছিল টাকা, তার জন্য জনগণের উপরে বাড়তি কর চাপাতে হত। অথচ তাতে সকলের সায় ছিল না। তাছাড়া, ইংরেজ পুলিশের নৈতিকতার প্রশ্নটি বারেবারেই সামাজিক আলোচনায় উঠে এসেছিল। প্রদেশগুলির নেতারা পুলিশের অদক্ষতা ও দুর্নীতির বিষয়টি লন্ডন শহরের একান্ত সমস্যা হিসাবে দেখতেন। নিজ নিজ প্রাদেশিক এলাকায় তাঁরা কন্সট্যাবুলারি ব্যবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। পাশাপাশি, সমকালীন ইংরেজ দার্শনিক আদর্শ ও চিন্তায় নিহিত ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের ধারণার সঙ্গে পুলিশি নজরদারি চালানোর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সংযোগের বিষয়টি খাপ খায় কিনা তা নিয়ে বিস্তর সংশয় ছিল। সেই আমলের জনপ্রিয় ধারণা ছিল যে সরকার কম শাসন করে সেই উত্তম প্রশাসক। ইংল্যান্ডের অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ধারণা ছিল যে, স্থায়ী পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক কুঅভিপ্রায় চরিতার্থ করতে ব্যবহার করা হতে পারে। বস্তুত, উনিশ শতকের প্রথম পর্বে ইংরেজ সমাজে এহেন পুলিশবাহিনী গড়ে তোলা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল।[48]

পীল পুলিশি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধনে হাল ছাড়েননি। তাঁরই উদ্যোগে ইংল্যান্ডে পেশাদার পুলিশবাহিনী তৈরি সম্পর্কিত আইন পাশ হয়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে *The Metropolitan Police Act* মারফত লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ তৈরি হয় এবং সমগ্র ব্রিটেন ও ব্রিটিশ উপনিবেশে সেই ছাঁচেই পুলিশ ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল। সেনাবাহিনীর কায়দায় সেই 'নব্য পুলিশ' পদাধিকারের উচ্চাবচতায় সংগঠিত হয়, যেখানে যোগ্যতা অনুসারে ক্রমান্বয়িক পদোন্নতির ব্যবস্থা ছিল। সবথেকে নীচে ছিল অস্ত্রহীন কনস্টেবল, যাদের ক্ষমতা ছিল সামান্য। তবে, আয়ারল্যান্ডে যেমন জনগণকে দমন করতে পুলিশ মোতায়েন হয়, ইংল্যান্ডে আবার লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনীর প্রতি শাসিত জনগণের সমর্থন তৈরির জন্য পুলিশ ও জনতার মধ্যে যোগাযোগের পরিসর বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্য ছিল অপরাধ দমন, এবং সমস্ত নাগরিকের প্রতি সমদর্শনের উপরে জোর দেওয়া হয়। অনবচ্ছিন্ন পাহারাদারির মাধ্যমে অপরাধের সংকোচন ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বদায় রাখাই ছিল পুলিশের কাজ। তার বিনিময়ে তারা নিয়মিত মাইনে পেলেও, অপরাধ দমনে সফল হওয়ার জন্য কোনো ভাতা কিংবা চুরি যাওয়া দ্রব্যের ভাগ পেত না। কনস্টেবল বা চৌকিদাররা পাহারার পাশাপাশি আরও কয়েকটা কাজ করত, যেমন পথের বাতি জ্বালান, সময় হাঁকা, আগুন লাগলে খবর দেওয়া ও প্রভৃতি ছুটকো পরিষেবা।[49]

---

[48] স্বদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধ্বজাধারী ও সব বিষয়ে রাষ্ট্রের নাকগলানোর বিরোধী ইংরেজ রাজনীতিকরা অবশ্য ভিনদেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখতে পুলিশের প্রয়োজন বিলক্ষণ জানতেন এবং সেই বিষয়ে সবারই এক রা ছিল। ১৭৮০-র দশকে আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী বিক্ষোভকে দমন করতে সেখানে স্থায়ী পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে *The Dublin Police Act* মারফত ডাবলিনে পেশাদার উর্দিধারী, সশস্ত্র স্থায়ী পুলিশবাহিনী তৈরি করা হয়েছিল, যাতে প্রায় চারশ কনস্টেবল ও চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার পুলিশ ছিল। পরে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যখন রবার্ট পীল আয়ারল্যান্ডের মুখ্য সচিব পদে নিযুক্ত হন ততদিনে ডাবলিনে অপরাধ-মুক্ত হয়ে যায়।

[49] পুলিশি ব্যবস্থার বিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Haia Shpayer-Makov, *The Ascent of the Detective : Police Sleuths in Victorian and Edwardian England* (New York : OUP, 2007) এবং Clive Emsley, *Crime, Police, and Penal Policy : European Experiences 1750–1940* (New York : OUP, 2007)

অবশ্য, অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করার কাজ তখনও পুলিশের রপ্ত ছিল না। তাদের মূল কাজ ছিল ধারাবাহিক নজরদারির মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের উপায়গুলি আটকানো। কিন্তু, সংস্কারকদের আশায় জল ঢেলে দেয় অপরাধের বাড়বাড়ন্ত। ফলে, কেবল আর পাহারা নয় সঙ্গে অপরাধের তদন্ত করার চাপও পুলিশের উপরে গিয়ে পড়ে। তারই ফলে তৈরি হয় পুলিশের গোয়েন্দাদল— ডিটেকটিভ বিভাগ। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগ তৈরি হয় এবং ১৮৭৮-এ সেটি সিআইডি (Criminal Investigations Department— CID) বিভাগে পরিণত হয়। পুলিশ বিভাগেই যারা আগে ভাতার বিনিময়ে তদন্তের কাজ করত বা চোর ধরত কিংবা কনস্টেবল ছিল তারাই অনুসন্ধানকারী হিসাবে নিযুক্ত হয়। কিন্তু, ভাতাভোগী পুলিশের অনুসন্ধানী দক্ষতার সঙ্গেই ছিল ঘুষ ইত্যাদি দুর্নীতির সংযোগ। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের গোয়েন্দা বিভাগের চারজন চিফ ইন্সপেক্টরের মধ্যে তিনজনই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয় এবং সেই ঘটনার অভিঘাতেই পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগ তুলে দিয়ে তাকে সিআইডি হিসাবে পুনর্গঠন করা হয়। বস্তুত, ইংল্যান্ডের পুলিশ ব্যবস্থার সঙ্গে উত্তর আমেরিকার পুলিশ কাঠামোর বিবর্তনের গভীর সম্পর্ক আছে। দুর্নীতির অভিযোগে আমেরিকার শিকাগো, বস্টন ও নিউ ইয়র্কেও যথাক্রমে ১৮৬৪, ১৮৭০ ও ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে অপরাধ তদন্ত বিভাগগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। উপরন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে স্বাধীন পুলিশ বাহিনী সংগঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। সেক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য পিঙ্কারটন ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সি। গ্লাসগোর বাসিন্দা অ্যালন পিঙ্কারটন (১৮১৯-১৮৮৪) চার্টিস্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক কারণে স্কটল্যান্ড থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান ও ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে নিজস্ব ডিটেকটিভ বাহিনী তৈরি করেন। ট্রেন ডাকাতি আটকানো থেকে শুরু করে শ্রমিক ইউনিয়নের উপরে নজরদারি— বিভিন্ন কাজের বরাত পেত পিঙ্কারটন-বাহিনী।[50]

এইভাবে পুলিশি গোয়েন্দার বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে ইংরেজি গোয়েন্দার ছাঁচ উনিশ শতকের শেষদিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ডিকেন্সের সম্পাদিত পত্রিকায় ১৮৫০-এ জনৈক আলোচক লিখেছিলেন যে, সাধারণ পুলিশ ও গোয়েন্দার মধ্যে ফারাক বিস্তর। তাঁর মতে, কেবল ছিঁচকে অপরাধীদের পাকড়াও করা নয়, তার সঙ্গে রহস্য সমাধান করাও গোয়েন্দার কাজ। সেসব রহস্য সমাধানের জন্য দরকার মস্ত্রগুপ্তি ও সুচারু কৌশল। সে কাজ হেলাফেলা করে হয় না। গোয়েন্দারা সেই কাজে অতীব দড়, দ্রুত এমনকী কখনও-বা মাত্র দশ মিনিটে তারা রহস্য সমাধান করে ফেলে।[51] কিন্তু, খেয়াল রাখতে হবে সেই ছাঁচের আদলে উপনিবেশের অভিজ্ঞতাও মিশে ছিল। বস্তুত, ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রাথমিক মালমশলার অনেকটাই এসেছিল ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অর্থে উপনিবেশই হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা সাহিত্যের কাঁচামালের

---

[50] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Beau Riffenburgh, *Pinkerton's Great Detective : The Amazing Life and Times of James McParland* (New York : Viking, 2013)

[51] William Henry Wills, "The Modern Science of Thief-Taking." in *Household Words* 1.16 (1850), পৃ. ৩৬৮-৩৭২। এই বক্তব্যের সূত্র: Rachel Franks, "Building a Professional Profile: Charles Dickens and the Rise of the "Detective Force"," *M/C Journal* 20(2) (2017). https://doi.org/10.5204/mcj.1214

জোগানদার আর লন্ডনের পুলিশি কার্যকলাপ ছিল সেই কাঁচামালের থেকে তৈরি আদিরূপের মান্যতাদাতা। একজন আলোচক খেয়াল করিয়েছেন যে, ব্রিটিশ-ভারতে ঠগী দমনের পদ্ধতি ও তার বিভিন্ন আখ্যান ব্রিটিশ পাঠককে প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দা চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।[52]

মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসীর পিছনে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকা নিয়ে বার্কের অভিযোগ কিংবা জেমস মিলের দীর্ঘ বিবরণ যেমন ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার দিকটি তুলে ধরেছিল, তেমনি ঠগীদমনে নিযুক্ত ঠগী পুলিশ আধুনিক আইনের শাসনের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিল। ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ভারতে ঠগীদের গোপন কার্যকলাপ ও গুপ্ত সাংকেতিক ভাষা-রহস্য ভেদ করে উপনিবেশে আইনের শাসন কায়েম করে ভারতীয় প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের সার্থকতা ও আলোকদীপ্ত পুলিশি প্রতিষ্ঠানের যাথার্থ্য নিরূপণে অব্যর্থ ভূমিকা পালন করেছিল ঠগীদমন বিভাগ ও সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন আখ্যান। রহস্যময় প্রাচ্যের প্রতি প্রতীচ্যের মনোভাব ঠগী বিষয়ক আখ্যানগুলিতে স্পষ্ট হয়েছে। নৃশংস বল প্রয়োগ করে স্বীকারোক্তি আদায়ের 'মধ্যযুগীয়' বর্বরতার বদলে ইংরেজ-আদর্শ-সিঞ্চিত উদারনৈতিক সংস্কারমূলক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছিল ঠগী-আখ্যানগুলিতে। নির্দ্বিধভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে কৌতূহল ও তার নিরসনে প্রমাণ সংগ্রহ এবং শেষত প্রমাণের অটুট শৃঙ্খলা নির্মাণের প্রক্রিয়া ইংরেজ পাঠকের আনুকূল্য পেয়েছিল। ঠগীদমনের বিভিন্ন বৃত্তান্ত ইংরেজ পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। জানা যায় যে, স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়া তাঁর যৌবনে ক্যাপ্টেন ফিলিপ মেডো-র লেখা জনপ্রিয় উপন্যাস *Confessions of a Thug* (১৮৩৯)-এর মনোযোগী পাঠক ছিলেন। এমনকী মহারানি নাকি প্রকাশকের থেকে ঐ বইটির খসড়া সংগ্রহ করেছিলেন এবং ক্যাপ্টেন মেডো যাতে দ্রুত লেখা শেষ করেন তার জন্য রাজ্ঞী স্বয়ং অনুরোধ করেন।

বস্তুতপক্ষে, ঠগীকে কেন্দ্র করেই তথ্য-প্রমাণ ও বৌদ্ধিক যুক্তিপ্রণালীনির্ভর অপরাধ নির্ণয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের ইতিবাচক ভূমিকা নির্ণয়ে ঠগীদমনের সাফল্য একটি মাপকাঠিতে পরিণত হয়।[53] বিচিত্র সব আখ্যানের মাধ্যমে পাঠকের সামনে হাজির করা হয়েছিল ঠগীদের সম্পর্কে হরেররকম 'তথ্য' ও তার ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ 'প্রমাণ'। আর সেই তথ্য-প্রমাণের পারম্পর্য নির্মাণের মাধ্যমে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীয় হওয়ার খেলায় মগ্ন-মোহিত পাঠক আলোকদীপ্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যশোগানে সামিল হয়, এবং উপনিবেশের প্রজাকুলও অনেক সময়ে সেই গাথার অনুকীর্তন করত। ঠগীদমন যে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রধান সাফল্য ছিল এই কথাটা ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। জনৈক উচ্চপদস্থ ঔপনিবেশিক রাজকর্মচারী ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে লিখছেন: "দেশে সর্ব্বপ্রকার ঠগী অত্যাচার একেবারে উন্মূলিত না হউক, উহার মূলদেশে কঠিন কুঠারাঘাত পড়িল।... ভয়াবহ স্থান সকল নিরুপদ্রব হইল এবং সর্ব্বত্র

---

[52] Caroline Reitz, *Detecting the Nation : Fictions of Detection and the Imperial Venture* (Columbus : The Ohio State University Press, 2004), পৃ. ২২-৪২

[53] তদেব, পৃ. ২২-২৪

পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপিত হইল।" এই 'শান্তি সংস্থাপন'-এর জন্য "ধন্য ব্রিটিশ পুরুষকার! ধন্য কোম্পানী বাহাদুরের বিক্রম বিস্তার!" আর সেই প্রতাপ প্রতিষ্ঠায় রত কর্নেল স্লীম্যান একজন 'মহোদয়', 'মহাত্মা' ও 'সদাশয় সাহেব'।[54]

ঔপনিবেশিক ভারতে সরকারিভাবে প্রথম মান্য ইতিহাসপ্রণেতা জেমস মিল একদিকে যেমন ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকলাপের প্রবল সমালোচনা করেছিলেন, তেমনই নিজের বান্ধব টমাস ব্যাবিংটন মেকলেকে মোটামুটিভাবে সমস্ত ভারতবাসীর জন্য ন্যায় বিচারের একটি সাধারণ পদ্ধতি, আইন সংহিতা ও পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মেকলের প্রতি মিলের পরামর্শ ছিল যে উপনিবেশের দরকার ন্যায় বিচারের একটি সার্বিক তন্ত্র ও পুলিশ— "a general system of justice and police, and a code of laws common (as far as may be) to the whole people of India, and having its varieties classified and systematized, shall be established throughout the country". মেকলে সেই কাজ দ্রুতই শুরু করে দিয়েছিলেন এবং তার জন্য আইন কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের মতাদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় জেমস মিলের ভূমিকা স্মরণ করে জেরেমি বেন্থাম বলেছিলেন: "Mill will be the living executive—I shall be the dead legislative of British India".[55]

মিল-নির্দেশিত কাজে নিয়োজিত মেকলে সমগ্র প্রশাসনিক পদ্ধতিটি ইংরেজ জাতীয় আদর্শের ছাঁচে তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন। অজানা-অচেনা উপনিবেশের জন্য যথাযথ আইন সংহিতা বানানো যে কঠিন কাজ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত মেকলে মনে করতেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্গত সভ্যতার প্রসারের অন্যতম শর্ত সুশাসন ও তার দৃঢ় আইনি ভিত্তি। উপরন্তু, তার সর্বাঙ্গে ব্রিটিশ মূল্যবোধ ও দর্শনের ছাপ থাকতে হবে: "to take the law of England, reform it so far as a small committee of the day working with an absolutely free hand thought that it required reform; then to inquire how far the resultant draft required modification to suit Indian conditions; and finally to clothe the product with the force of an Act of the Indian Legislature". সেই দর্শন বিষয়ে মেকলে অবশ্যই বেন্থামের প্রতি ঋণী ছিলেন। কিন্তু, ভারতের জন্য তৈরি Penal Code ভিত্তিগত বিচারে ইংরেজ আইনের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। হুইটলি স্টোকস মন্তব্য করেছেন: "Its basis is the law of England, stript of technicality and local peculiarities, shortened, simplified, made intelligible and precise."। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে Penal Code-এর যে খসড়া মেকলে তৈরি করেন তা বিভিন্ন সমালোচনা ও বিকল্প প্রস্তাবের বাধা পার করে অবশেষে ১৮৬১ সালে যখন কার্যকর হয় ততদিনে মেকলে প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু, ইংরেজ আইন, ইংরেজ শাসন ও ইংরেজিয়ানার সঙ্গে ভারতীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার নির্বিকল্প সম্পর্ক তৈরি দিয়েছিলেন মেকলে।[56]

---

[54] রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, পুলিশ ও লোকরক্ষা, সংকলন ও সম্পাদনা অশোক উপাধ্যায় ও অরিন্দম দাশগুপ্ত (কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১-১৪

[55] Eric Stokes, *The English Utilitarians and India* (Great Britain : Oxford Clarendon Press, 1963 [1959]), পৃ. ১৯১-১৯৫

[56] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সমস্ত উদ্ধৃতির সূত্র হিসাবে দ্রষ্টব্য: Eric Stokes, *The English Utilitarians and India,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৮

ততদিনে উপনিবেশের ঠগীদমনে সফল স্লীম্যানের খ্যাতি ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশ-বিভুঁইয়ে ইংরেজ পুলিশ-গোয়েন্দার সেই কর্মকৃতির আদলে ইংরেজ পাঠক-সমাজের সামনে নতুন করে সাহিত্যিক চরিত্র গড়ে তোলার শুরুয়াদ হয়। যে পুলিশ-গোয়েন্দা শারীরিক বলের কর্কশতার বদলে বৌদ্ধিক বলের চমৎকারিতার উপরে জোর দেয়। ফলে, উপনিবেশের কাঁচামাল অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকে ইংরেজ সমাজের নিজস্ব আদলে ঢেলে সাজানোর সূচনা হল। ঔপনিবেশিক কাঠামোর উপরে ইংরেজ-সুলভ বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য, আইনের শাসনের প্রতি আনুগত্য, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির প্রলেপ দিয়ে নতুন ইংরেজ পুলিশ-গোয়েন্দার চরিত্র তৈরি হল। দেখা গেল, ভারতীয় উপনিবেশে ঠগী-পুলিশের বড়কর্তা তথা ন্যায়ের শাসনের কীর্তিমান হিসাবে কর্নেল স্লীম্যানের কৃতিত্বে মোহিত ইংরেজ পাঠকসমাজ গোয়েন্দা নামের নতুন চরিত্রটিকে সাদরে গ্রহণ করেছে। সেই গ্রাহ্যতাই ছিল ডিকেন্স ও কলিন্সের পুলিশি গোয়েন্দাদের আবির্ভাবের পটভূমি।

ততদিনে ক্রমবর্দ্ধমান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতার নির্ভরে বিশেষত ঠগীদমনে সফল 'ভাল' পুলিশের কার্যকরতা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ঘরের 'নব্য পুলিশ' ও বাইরের 'ভাল' পুলিশ মিলে এক নতুন পরিচিতির জন্ম দিয়েছিল। ফলে, ব্রিটিশ উপনিবেশ না-থাকলে ইংরেজ গোয়েন্দা ও তার মনোহর আখ্যান সৃষ্টি হত কিনা ও সেই আখ্যান ও তার কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্বজয়ে সফল হত কিনা সেই প্রশ্ন এসেই পড়ে। বস্তুত, চার্লস ডিকেন্স ও উইলকি কলিন্স তাঁদের গোয়েন্দা বিষয়ক সাহিত্যের মাধ্যমে এই ঘর ও বাহির অর্থাৎ লন্ডন তথা বৃহত্তর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে দূরস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সুদূর ভারত থেকে রহস্য-রোমাঞ্চ হানা দিয়েছে লন্ডনে। তারপর থেকে অগণিত ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীতে ভারতীয় উপনিবেশ, আফ্রিকা তথা প্রাচ্যের অস্তিত্ব হানা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসের ভূমিকায় অ্যান্থিয়া ট্রড লিখেছেন যে, ডিকেন্স ও কলিন্স মিলে একটি এমন গোয়েন্দা সাহিত্যধারার শুরুয়াদ করেছেন, যা ইংল্যান্ডের গ্রাম্য আবহে প্রাচ্য-রহস্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল— "set the English countryside crawling with Oriental assassins, Egyptian mummies, signs of four and the like".[57]

বস্তুতপক্ষে, এমন ভাবেও বলা যায় যে, গডউইন কিংবা মিলের রচনাপত্র অথবা ঠগীদমন সম্পর্কিত বয়ানে যেমন ইংরেজ প্রণীত ন্যায়ের শাসনের পক্ষে সওয়াল-জবাব ফুটে উঠেছে, তেমনই ডিকেন্স সেই বিষয়টাকে ইংরেজ চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একাত্মভাবে বিচার করেছেন। ফলে, ডিকেন্সের রচনায়, এবং কিছু মাত্রায় কলিন্সের লেখাতেও সাম্রাজ্যিক-রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকতার সঙ্গে যুক্ত গোয়েন্দার চরিত্রটি ইংরেজ পাঠকজীবনের ঘরোয়া ও ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়েছিল। ডেভিড মিলার উপন্যাস সাহিত্যবর্গের সঙ্গে পুলিশ তথা গোয়েন্দার সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত আলোচনায় লিখেছেন:

---

[57] Anthea Trodd, 'Introduction' to *The Moonstone* (New York: Oxford University Press, 1991) পৃ. xvii

> the detective story performs a drastic simplification of power… the detective story is fully prepared to affirm the efficacy and priority of personal agency, be it that of the criminal figures who do the work of concealment or that of the detective.[58]

সেভাবেই ইংরেজ জাতীয় চরিত্র ও আলোকদীপ্তির দোসর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ— উভয়কেই গোয়েন্দা চরিত্রে মিশিয়ে দিয়েছেন ডিকেন্স। গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন উপনিবেশে ভিক্টোরীয় সাম্রাজ্যিক আদর্শের জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভূ, শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার আবিশ্ব বাহক— ক্ষমতার অধিগত হিংসার উপরে বৌদ্ধিক চমৎকৃতির প্রলেপ। প্রসঙ্গত, গোয়েন্দা সাহিত্যের সঙ্গে বুর্জোয়া উদারনৈতিক মতাদর্শ ও নজরদারির বিভিন্ন প্রকরণের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে ফ্রাঙ্কো মরেত্তি এক জায়গায় লিখেছেন: "detective fiction fosters the values of liberal democracy because it embodies the ideal of habeas corpus".[59] সেই একই আলোচনা প্রসঙ্গে মরেত্তি অন্যত্র লিখছেন:

> Detective fiction is a hymn to culture's coercive abilities: which prove more effective than pure and simple institutional repression. Holmes's culture - just like mass culture, which detective fiction helped found - will reach you anywhere. This culture knows, orders, and defines aIl the significant data of individual existence as part of social existence. Every story reiterates Bentham's Panopticon ideal: the model prison that signals the metamorphosis of liberalism into total scrutability.[60]

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে প্রাচ্যের রহস্যময়তা যে বিপদসঙ্কুল গোলকধাঁধা পদে পদে বিছিয়ে রেখেছে তার সমাধান করে শাসন টিঁকিয়ে রাখতে হলে গোয়েন্দা যে অপরিহার্য সে নিয়ে ক্রমে ইংরেজ পাঠক নিঃসংশয় হতে থাকে। সেই কাজে চার্লস ডিকেন্সের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ডিকেন্সের সমকালীনরা নাকি তাঁকেই আধুনিক গোয়েন্দার উদ্ভাবনার কৃতিত্ব দিয়েছিলেন।[61] পুলিশ গোয়েন্দার পক্ষ নিয়ে ডিকেন্সের অন্যতম লেখা 'A Detective Police Party' (১৮৫০), সেখানে ডিকেন্স পুরোনো বো স্ট্রিট পুলিশের অকর্মণ্যতার সঙ্গে নব্য ডিটেকটিভ বিভাগের কর্মচারীদের তুলনা করছেন:

> We are not by any means devout believers in the Old Bow-Street Police. To say the truth, we think there was a vast amount of humbug about those worthies. Apart from many of them being men of very indifferent character, and far too much in the habit of consorting with thieves and the like, they never lost a public occasion of jobbing and trading in mystery and making the most of themselves… On the other hand, the Detective Force organised since the establishment of the existing Police, is so well chosen and trained, proceeds so systematically and quietly, does its business in such a workman-like manner, and is always so calmly and

---

[58] D. A. Miller, *The Novel and the Police* (Berkeley: University of California Press, 1988), ePub edition.

[59] Franco Moretti, *Signs Taken for Wonders: Essays in the Sociology of Literary Forms* (New York: Verso, 1988), পৃ. ১৩১

[60] তদেব, পৃ. ১৪৩

[61] ডিকেন্সের সমকালীন এক আলোচক লিখেছিলেন: "Charles Dickens may be said to have discovered the modern detective." উদ্ধৃতির সূত্র: Philip Collins, *Dickens and Crime* (London: Macmillan, 1994 [1962]), পৃ. ১৯৬

> steadily engaged in the service of the public, that the public really do not know enough of it, to know a tithe of its usefulness.[62]

চার্লস ডিকেন্সের ইন্সপেক্টর ফিল্ড পুরোদস্তুর নব্য ইংরেজ পুলিশ এবং ইন্সপেক্টর বাকেট উনিশ শতকী ইংরেজ গোয়েন্দার অন্যতম আদিরূপ।

ঠগী আখ্যানের কৌতূহলী পাঠক ও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে সিপাহীদের 'বর্বরতা'র কঠোর সমালোচক চার্লস ডিকেন্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ ও পুলিশি ব্যবস্থার সমালোচনা বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। ফলে নতুন রকমের পুলিশ গোয়েন্দার চরিত্র তৈরি করে তিনি পাঠকের সামনে ভাল পুলিশ বনাম মন্দ পুলিশের বিরোধ তুলে ধরেন। এর মধ্যে দিয়ে ডিকেন্স গোয়েন্দা-পুলিশের কাজকে সামাজিকভাবে মান্য করে তুলে একপ্রকার অদৃশ্য নজরদারির আবহ তৈরি করেন, যেখানে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ক্ষমতার প্রকরণগুলি দৃষ্টির অগোচরে সক্রিয় থাকবে।[63] সেই কারণেই সাম্রাজ্য ও গোয়েন্দা উভয়ই ইংরেজ চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য প্রকাশ। প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কর্তৃত্বের প্রতি খড়্গহস্ত ডিকেন্স কেবল দুটি ক্ষেত্রে ভিন্নমত— নব্য পুলিশবাহিনী এবং বেয়াদব নেটিভদের শায়েস্তা করে শৃঙ্খলারক্ষায় ব্রতী ঔপনিবেশিক প্রশাসকবর্গ।

ফিলিপ কলিন্স তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতি ডিকেন্সীয় সমালোচনার ধারায় দুটি প্রকট ব্যতিক্রম— "conspicuous exceptions"— ছিল: "the New Police and, overseas, of those who resolutely disciplined the turbulent natives… Dickens hated mobs and their violence, even if he could not imaginatively approve of their rulers. Nor did he deny the necessity for firm government".[64] তাই ঘুরেফিরে ডিকেন্সের গোয়েন্দা সাম্রাজ্যরক্ষায় ব্রতী, ভাল পুলিশ ও গোয়েন্দা সম্মিলিতভাবে সূর্য-অস্ত-না-যাওয়া বিশাল মহারানির রাজত্বকে ইংল্যান্ডের পক্ষে অনুকূল রাখে। সেজন্যই উভয় চরিত্রকে সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকমনে তথা বৃহত্তর সমাজে মান্য-প্রতিষ্ঠিত করতে ডিকেন্স জান-কবুল।

১৮৫০-এর দশকে মহতী প্রদর্শনী অর্থাৎ 'The Great Exhibition'-কে (১৮৫১) কেন্দ্র করে প্রাচ্য যেভাবে খোদ লন্ডনে হাজির হয়েছিল তাতে অনেক লন্ডনবাসীর কাছে নিজের পরিচিত পরিসরগুলি অচেনা ঠেকতে শুরু করেছিল।[65] বস্তুত, উনিশ শতকে আইনজীবী, কুসীদজীবী, জনহিতৈষী ও পুলিশি গোয়েন্দার সমাহারে লন্ডন শহর নিজেই রহস্যের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছিল। রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনী পল্লবিত হয়ে ওঠার আদর্শ সেই পটভূমিতে

---

[62] Charles Dickens, 'A Detective Police Party [i]', *Household Words,* Volume I, Magazine No. 18, 27 July 1850, পৃ. ৪০৯-৪১৪। সূত্র: https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/fulllist/special/crimefiction/dickens_a_detective_police_party_i_1850.pdf

[63] ডিকেন্সের *Bleak House* প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডেভিড মিলার দেখিয়েছেন যে, ডিকেন্সীয় অনুসন্ধান পদ্ধতির মধ্যে নিহিত আছে বেন্থামীয় প্যানঅপটিকনের অদৃশ্যমানতার ধারণা। দ্রষ্টব্য: D. A. Miller, *The Novel and the Police,* প্রাগুক্ত

[64] Philip Collins, *Dickens and Crime*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[65] ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের এই মহতী প্রদর্শনী কীভাবে ব্রিটিশ সমাজে আলোড়ন ফেলেছিল ও তার মাধ্যমে ব্রিটেনের ক্ষমতারও প্রদর্শন ঘটেছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Thomas Richards, *The Commodity Culture of Victorian England: Advertising and Spectacle, 1851-1914* (California: Stanford University Press, 1990), পৃ. ১৭-৭২

সাহিত্যের মাধ্যমে 'সাম্রাজ্যের সংকট'কে কেন্দ্র করে কাণ্ডজ্ঞানহীন আতঙ্ক ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল, এবং সেই আদর্শনৈতিক প্রচারকার্য কলিন্সের *The Moonstone* লেখার অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছিল।[66]

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের 'করাল' ছায়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে গোয়েন্দা-পুলিশের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। সেই বিষয়ে সচেতন ও উৎসাহী ডিকেন্সের নব্য পুলিশ একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মন্ত্রগুপ্তির আদর্শে বিশ্বাসী, তেমনই অন্যদিকে তারা শ্বেতাঙ্গ, আত্মসচেতন, বিচক্ষণ, অপ্রগলভ ও নম্রতার পরাকাষ্ঠা, যারা কখনই সহযোগীর কাজে নাক গলায় না।[67] তারা বলদর্পী নয়, বরং অপরাধীকে যেমন ওভারকোট এগিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না, তেমনই সন্দেহভাজনকে আত্মীয়-স্বজনের আড়ালে নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার করে। এভাবেই উপনিবেশের ঠগীদমানো পুলিশ ডিকেন্সের কলমে উদার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের রক্ষক, আপাত মোলায়েম কিন্তু অষ্টপ্রহর অদৃশ্য নজরদারি চালানো সুবোধ ইংরেজ পুলিশ-গোয়েন্দায় পরিণত হয়। সেই চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য দারুণভাবে ফুটে উঠেছে ডিকেন্সীয় পুলিশি-গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর চার্লস ফিল্ডের মধ্যে। লেখক ও চরিত্রের নামের প্রথমাংশের মিল ছাড়াও লক্ষণীয় ফিল্ডের প্রতি তার স্রষ্টার সমীহমিশ্রিত স্বীকৃতি— সর্বত্রই তাদের (আলোকদীপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিভূ তথা শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার বাহকের উপযুক্ত) সপ্রতিভ উপস্থিতি। বস্তুত, চার্লস ফ্রেডরিক ফিল্ডের প্রতি ডিকেন্সের সমীহ এতটাই ছিল যে, বলা হয় *Bleak House* উপন্যাসে ইন্সপেক্টর বাকেটের চরিত্রটি তিনি ফিল্ডের ছাঁচেই গড়ে তুলেছিলেন। ডিটেকটিভ পুলিশ সম্পর্কে ডিকেন্সের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম প্রায় বীরপূজার স্তরে চলে গিয়েছিল। ডিকেন্স লিখেছেন:

> They are, one and all, respectable-looking men; of perfectly good deportment and unusual intelligence; with nothing lounging or slinking in their manners; with an air of keen observation and quick perception when addressed; and generally presenting in their faces, traces more or less marked of habitually leading lives of strong mental excitement. They have all good eyes; and they all can, and they all do, look full at whomsoever they speak to.[68]

এর বিনিময়ে ফিল্ড ও অন্যান্য কতিপয় ডিটেকটিভও ডিকেন্সকে প্রভূত শ্রদ্ধা করতেন এবং ডিকেন্স জানতেন যে, তাঁরা ডিকেন্সের যেকোনো দরকারে হাজির হতে পারে— "Any of the Detective men will do anything for me".[69]

সাম্রাজ্যের অজানা আনাচে-কানাচে অচেনাকে চিনেচিনে এগিয়ে চলা গোয়েন্দার ক্ষেত্রে শাসন নির্বাহের মাধ্যমই অনুসন্ধান-তদন্ত। উপচিকীর্ষু সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্বের কিংবদন্তীই গোয়েন্দা সাহিত্য, অতঃপর ডিকেন্সের

---

[66] Richard Maxwell, *The Mysteries of Paris and London* (Charlottesville and London: University of Virginia, 1992)

[67] ডিকেন্সের বর্ণনায় ডিটেকটিভ পুলিশরা সম্পর্ণ ভিন্ন গোত্রের। তারা "reserved and thoughtful," "well-spoken," "polite" তো বটেই, এমনকী তাদের গাত্রবর্ণও 'সভ্য' মানুষের উপযুক্ত— "bright complexions", এবং তারা কখনই "brother officers"-এর কাজে নাক গলানোর মত অসৌজন্য প্রকাশ করে না। এক কথায় তারা সভ্য ভদ্র আইনরক্ষক। দ্রষ্টব্য: Charles Dickens, 'A Detective Police Party [i]', প্রাগুক্ত।

[68] ডিকেন্সের উদ্ধৃতির সূত্র: Philip Collins, *Dickens and Crime*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

[69] তদেব, পৃ. ১৯৬

আরেক পুলিশি গোয়েন্দা বাকেটকে অনেকেই উদারনৈতিক কর্তৃত্ব-প্রসূত ক্ষমতার রূপক হিসাবে বিবেচনা করেছেন। বাকেট যেন সেই গোপনচারী ঔপনিবেশিক পর্যবেক্ষক যে সর্বদা দেখে যায় আড়াল থেকে এবং স্থানিক অবস্থান থেকে বিযুক্ত হয়ে সে ক্ষমতার একটি উচ্চতর অবস্থান নির্মাণ করে, যেখান থেকে নিজে সর্বদর্শী হয়েও বাকিদের কাছে অদৃশ্য থেকে যাওয়া সম্ভব হয়। ডেভিড মিলার তাঁর 'Discipline in Different Voices' প্রবন্ধে ডিকেন্সের ইন্সপেক্টর বাকেটকে উদারনীতিবাদী কর্তৃত্বের প্রতিভূ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। বাকেট যে অদৃশ্য থেকেও নজর রাখেন সেই বিষয়টি সাম্রাজ্যিক প্যানঅপটিকন ধারণার সঙ্গে যুক্ত।[70]

প্রসঙ্গত মিশরে ঔপনিবেশিক শাসন ও প্যানঅপটিকন ধারণার সম্পর্ক বিষয়ে টিমথি মিচেলের আলোচনা স্মর্তব্য: "The ability to see without being seen confirmed one's separation from the world, and constituted at the same line a position of power."— এই যে গোপনচারী নজরদারি তা একই সঙ্গে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু ক্ষমতার অবস্থানে থিতু।[71] অদৃশ্য এক ক্ষমতার ঘেরাটোপ মনে পড়িয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের সেই উচ্চারণ: "যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,/ ভালোবাসে আড়াল থেকে,/ আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়"।[72] এখানে 'ভালোবাসা' শব্দটির জায়গায় যদি ঔপনিবেশিক শাসনের পিতৃত্বসুলভ মনোভঙ্গির প্রতিভূ 'শাসন' কথাটি বসিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে একদিকে শাসকের মননে শাসনের হেজিমনি বা আধিপত্যের প্রভাব ও অন্যদিকে মিশেল ফুকোর বক্তব্যে পৌঁছনো যায় যে, প্যানঅপটিকনের মূলে নিহিত আছে এক স্ববিরোধ: "eyes that must see without being seen", এবং তার মধ্য দিয়ে "secretly preparing a new knowledge of man."[73] মানুষের অগোচরে তার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনে ফেলার যে কেরামতি গোয়েন্দার প্রশ্নাতীত দক্ষতার প্রমাণ তার সঙ্গে এই গোপনে জ্ঞান সঞ্চয়ের ধারণাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে।

চার্লস ডিকেন্স গোয়েন্দা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও, পুলিশি ও বেসরকারি শখের— উভয় রকমের গোয়েন্দা চরিত্রকে ইংরেজ পাঠকের মনে গেঁথে দেওয়ার কাজটি আদতে উইলকি কলিন্সই করেছিলেন। সাম্রাজ্যের অভিশাপকে নিরুদ্বেগ ইংরেজ গৃহস্থের অন্দরে ঢুকিয়ে এনে তিনিও সাম্রাজ্যকে ইংরেজিয়ানার সঙ্গে জুড়ে দেন। শ্রীরঙ্গপত্তনমের সঙ্গে একাত্ম মহীশূর-শার্দূল টিপু সুলতান যেন অভিশপ্ত হিরের মত ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর। কলিন্স চান সেই শ্রীরঙ্গপত্তনম থেকে চুরি করে আনা হীরক-অভিশাপ বিদায় হোক কিন্তু সাম্রাজ্য থাক। এভাবেই কলিন্স শান্ত ইংরেজ গ্রামের চৌহদ্দিতে সাম্রাজ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে গোয়েন্দা সাহিত্যকে ইংরেজ সমাজের ঘরের কথা ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বাহিরের কথার টানাপোড়েনের আখ্যানে পরিণত করেন

---

[70] D. A. Miller, *The Novel and the Police*, প্রাগুক্ত

[71] Timothy Mitchell, 'Orientalism and the exhibitionary order' in *Colonialism and Culture* edited by Nicholas B. Dirks (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 [1992]), পৃ. ৩০৬

[72] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান (অখণ্ড) (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩০৭

[73] Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Vintage, 1995 [1977]) পৃ. ১৭১

এবং অগ্রবর্তী ডিকেন্সের মতই গোয়েন্দা চরিত্রকে সাম্রাজ্যিক সংস্কৃতির অনিবার্য অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেন। খেয়াল করার বিষয়ে হল, কলিন্স যে সময়ে *The Moonstone* লিখছেন সেই সময়ে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে চটকদার, রোমাঞ্চকর বিবরণে বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকরাও বিদ্রোহের নানান দিক নিয়ে লিখছিলেন। যেমন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয় টমাস ব্যাবিংটন মেকলের(১৮০০-১৮৫৯) ভগ্নী-পুত্র স্যর জর্জ অটো ট্রেভেলিয়ানের (১৮৩৮-১৯২৮) লেখা ১৮৫৭-র বিদ্রোহের বিবরণ *Cawnpore.* কিন্তু, কলিন্স তাঁর উপন্যাসে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের কথা অনুক্ত রেখেছেন, এবং ১৭৯৯ সালের ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরঙ্গপত্তম অবরোধের পশ্চাৎপট থেকে আখ্যানের ঘটনাক্রম শুরু করেছেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ঔপনিবেশিক শাসক বহুলাংশে পর্যুদস্ত হয়েছিল, অন্যদিকে শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসার সুগম হয়। কলিন্স তাই ব্রিটিশ বাহিনীর কীর্তি থেকেই তাঁর রহস্যের আখ্যান শুরু করেছেন। বস্তুত, হিন্দুস্থানে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের প্রতি চার্লস ডিকেন্স যতটা বীতশ্রদ্ধ, উইলকি কলিন্স বিদ্রোহের ততটা উগ্র-বিরোধী ছিলেন না। Deirdre David মনে করেন যে, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনমে ব্রিটিশের তরফে হিংসার বয়ান দিয়ে উপন্যাস শুরু করার মাধ্যমে কলিন্স ব্যক্তিক হিংস্রতার কিংবদন্তীর —"a fable of individual brutality"— কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে হিংসার মধ্যে পরবর্তীকালে ঘটা ১৮৫৭-র বিদ্রোহের বীজ লুকিয়ে ছিল।[74]

সেই ধারাই পরবর্তীকালে আর্থার কনান ডয়েলও শার্লক হোমসের বহু কাহিনীতে অনুসরণ করেছেন। হোমসের *The Sign of Four* (১৮৯০) সরাসরি ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় ঘটা ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয়েছে। কিন্তু, তাছাড়াও আরও কয়েকটি হোমস-আখ্যানে ভারতের কথা আছে। যেমন ১৮৯২-এ প্রকাশিত 'The Speckled Band' ও ১৮৯৩-এ প্রকাশিত 'The Crooked Man'— উভয় কাহিনীতেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও তার মতাদর্শগত ভিত্তি হিসাবে প্রাচ্যবাদের স্পষ্ট রূপ দেখা যায়। প্রথম কাহিনীটিতে যা কিছু 'খল' চরিত্রের কার সবের সঙ্গেই ভারতের যোগ আছে। গ্রাইসমবি রয়লট ভারতে বাসকালে রাগের চোটে ভারতীয় আর্দালিকে খুন করে ভারতেই জেল খাটে। যে বিষধর সাপ রয়লটের চক্রান্তের মূলে সেটিও ভারতীয়— "swamp adder!..the deadliest snake in India". বস্তুত, রয়লটের উগ্রচণ্ড কিন্তু ক্রূর-খল রূপ বা ঐ বিষধর সাপ, সবই যেন ভারতের হিংস্র উগ্রতার প্রতিভূ। অথচ, গল্পে যেনতেন প্রকারে ভারতের কুহককে তুলে ধরতে গিয়ে ডাক্তার ডয়েল এমন কতগুলো বৈজ্ঞানিক ভুল করেছেন যা পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে। যেমন, সাপের কান থাকে না, অথচ গল্পে সাপটি মৃদু শিস শুনতে পায়; সাপের মেরুদণ্ড নেই, অথচ গলিপে সাপটি অনায়াসে দড়ি বেয়ে উঠতে পারে; এমনকী বায়ুনিরুদ্ধ পাত্রে সে বেঁচেও থাকে! আর সবথেকে প্রধান হল, হোমস-বর্ণিত সাপটির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয় গল্পটির মূলে আবারও সেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ও সেই সময়ে ঘটা বিশ্বাসঘাতকতা। ভারতে সেই নারকীয়

---

[74] Deirdre David, *Rule Britannia: Women, Empire, and Victorian Writing* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1995), পৃ. ১৮

বিদ্রোহের অভিঘাতে ইংরেজ সৈনিকও ফেরেববাজ বনে যায় ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে রফা করে বসে। পরে সুসন্তান ইংরেজ সৈনিক স্বদেশে ফিরে গিয়ে ঘটনাচক্রে সেই বিশ্বাসঘাতক সৈনিককে হত্যা করে বসে। আদতে হত্যা রহস্যের জট ছাড়ানোই মূল হলেও, তার তলায় সংগোপনে বুনে দেওয়া হয় আরেক আখ্যান— তা হল, যাবতীয় গোলমালের মূল সেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের হাড়হিম-করা ১৮৫৭-র বিদ্রোহ। উভয় কাহিনীর মূলেই সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির গভীরে নিহিত প্রাচ্যবাদ স্পষ্ট। সেই প্রাচ্যবাদের প্রভাবে অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য কাহিনীতে থাকলেও, তাতে কিছু ক্ষতি নেই।[75] গোয়েন্দা সাহিত্য হয়ে ওঠে ইংরেজের কলে তৈরি এমন এক পণ্য যার কাঁচামালের যোগানদার উপনিবেশ ও নির্মিত পণ্যের ভোক্তা নব্যাদর্শে দীক্ষিত ইংরেজ পাঠককুল এবং বিশ্ববিস্তৃত উপনিবেশের শিক্ষিত প্রজাপুঞ্জ।

আগেই আলোচিত হয়েছে যে, কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসে পুলিশি গোয়েন্দা কাফ শেষ পর্যন্ত রহস্য সমাধানে সফল হননি। বরং, অনেকেই মনে করেন যে, শেষে ঘটনাচক্রে আখ্যানে কাফের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। ডেভিড মিলার মনে করেন যে, একদিকে আদিপর্বের গোয়েন্দা কাহিনী হলেও অন্যদিকে আবার কলিন্স ইন্সপেক্টর কাফের রহস্যসন্ধানে ব্যর্থতার মাধ্যমে হয়ত পেশাদার গোয়েন্দার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই সংশয় ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে রত্ন-রহস্য সমাধান করেছে শখের রহস্য-অনুসন্ধানী ফ্রাঙ্কলিন ব্লেক। মিলারের মতে:

> the text organizes itself as a movement from mystery to solution supervised by an extraordinary police detective. It comes somewhat as a puzzle, then, when the text abandons the scenario it has so conscientiously set up. Cuff's investigation is broken off, suspended, and even its provisional conclusions are revealed to be erroneous. The detective disappears from what remains a novel of detection, and although he reappears to clear up some incidental matters at the end, the mystery is solved without his doing.[76]

কিন্তু, লক্ষণীয় যে, তদন্তের কাঠামোটি তুলে ধরার জন্য কাফের প্রত্যাবর্তন জরুরি ছিল। কলিন্স হোমসের মত কোনো বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দার আখ্যান বা কীর্তিকলাপ বর্ণনা করেননি। কারণ তখনও শখের গোয়েন্দাকে কেন্দ্রে রেখে রহস্য কাহিনী রচনার ধারা ইংরেজি ভাষায় পোক্ত হয়নি। সেই টানাপোড়েনের যুগে নতুন পুলিশ গোয়েন্দা ব্যবস্থা ক্রমে থিতু হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে সামাজিক উৎসাহ তৈরি হচ্ছিল। ফলে পুলিশি গোয়েন্দা কাফ সফল আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও, হোমসের আদলে বিচার করতে গেলে হয় চরিত্রটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব হ্রাস পাবে। বরং, একটু খেয়াল করলেই প্রাচীনপন্থী কর্কশ পুলিশের প্রতিভূ সুপারিনটেন্ডেন্ট সীগ্রেভ (যে ধরনের প্রতি ডিকেন্স খড়্গহস্ত) ও নব্যধারার পুলিশের প্রতিনিধি সার্জেন্ট কাফ (যাদের প্রশংসায় ডিকেন্স পঞ্চমুখ)— উভয়ের মধ্যের পার্থক্যগুলি স্পষ্ট হবে। হিরে চুরির খবর পেয়ে হাজির হওয়া সীগ্রেভ মেজাজে মিলিটারি, তার স্বর, হাবভাব সবই রুক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই ডিকেন্সীয়-কলিন্সীয় ছক মোতাবেক মিলিটারি-মেজাজের 'বাজে' পুলিশ সীগ্রেভ রহস্য সমাধানে সর্বৈব ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে, অচিরেই তার জায়গায় হাজির হয় কাফ— স্বভাবে শান্ত, সমব্যথী ও

---

[75] Leslie S. Klinger, ed., *The New Annotated Sherlock Holmes,* Vol. 1 (New York: W. W. Norton and Company, 2003), EPub edition

[76] D. A. Miller, *The Novel and the Police,* প্রাগুক্ত

ভদ্রঘরের গোপন কথা পাঁচকান না-করার মত সংবেদনসম্পন্ন— একবাক্যে সংস্কারকদের নয়নের মণি: 'নব্য' পুলিশ। কিন্তু, তাই বলে কাফ মোটেই 'পেলব রায়' নন। সমব্যথী হয়েও তিনি কর্তৃত্ব-সচেতন, কর্কশ মিলিটারি মেজাজের না-হয়েও তীক্ষ্ণধী ও স্থিতপ্রজ্ঞ।'নব্য' পুলিশ কাফ সমবেদনার বশে কর্তৃত্বের রাশ আলগা করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে মিলিটারি রুক্ষতার ছাপ না-থাকলেও, সেই দৃষ্টি স্থির— "immovable" এবং তাঁর স্বরে কোনো কর্তাসুলভ হামবড়ামি নেই, তা কর্তৃত্বের গর্বে কর্কশ নয়, বরং তাঁর সম্মানপ্রদায়ী বাক্যবিন্যাসে নিহিত থাকে চারিত্রিক দার্ঢ্য— "it was spoken very respectfully, but very firmly at the same time".[77] কার্যত, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। অজানা-অচেনা জগতে লুকানো রহস্য সেই স্থিতপ্রজ্ঞ বুদ্ধিমানের সামনে উন্মোচিত হতে বাধ্য।

বস্তুত, কাফ সেই রহস্যসন্ধানী গোত্রের প্রতিনিধি যাদের পক্ষে দ্রুত জাগতিক রহস্য বুঝে ফেলা সম্ভব — "all the universe is, given half an hour, knowable".[78] তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায় কাফ ও তার সহযোগী মার্থোয়েট হীরকখণ্ডের ইংল্যন্ড থেকে ভারতে যথাস্থানে ফিরে যাওয়ার বৃত্তান্ত লিখছে। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যিক সংযোগ অটুট থাকছে। সৈনিক মেজাজের 'বাজে' পুলিশ সীগ্রেভ নয়, সাম্রাজ্যের জন্য যে ভাল পুলিশ কাফের দরকার সেই কথাটাই ডিকেন্স-বান্ধব কলিন্স স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। তার মাধ্যমে ক্রমে ইংরেজ সমাজে প্রান্তবাসী কিন্তু কর্তৃত্ব-জাহিরে অভিনিবিষ্ট পুলিশের বদলে স্থিতপ্রজ্ঞ, তীক্ষ্ণধী গোয়েন্দা আখ্যানের কেন্দ্রস্থানের দিকে যাত্রা শুরু করে। উনিশ শতকের শেষার্ধে সেই যাত্রার পরিণতি ঘটেছিল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বন্দিত শার্লক হোমসে— বেসরকারি গোয়েন্দা, যার কাছে নতজানু লন্ডনের পুলিশ থেকে তাবড় মন্ত্রী, বিদেশী রাজন্যবর্গ থেকে রহস্য-ভীত রমণী। সেই শার্লক হোমস একাধারে প্রাচ্যবাদ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বৈজ্ঞানিকতানির্ভর পশ্চিম ইওরোপীয় সভ্যতার ধ্বজাধারী। সেই প্রাচ্যবাদী বৈজ্ঞানিকীর নির্ভরেই হোমস *The Sign of Four* উপন্যাসে ভারতীয় রহস্যের ধোঁয়াশা ভেদ করে লন্ডনে হানা দেওয়া ঔপনিবেশিক 'প্রতিহিংসা'কে বাগে আনতে পেরেছিল।

The Sign of the Four ও অন্যান্য একাধিক হোমস-আখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, হোমস প্রত্যক্ষবাদ অর্থাৎ পজিটিভিজম এবং তৎ-প্রসূত নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদের অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিভূ এবং তার স্রষ্টা কনান ডয়েল লিঙ্গ, শ্রেণি ও জাতি সংক্রান্ত বর্গসমূগের উনিশশতকী আদর্শগুলিকেই আখ্যানে ঠাঁই দিয়েছেন।[79] আর তার মধ্য দিয়ে শার্লক হোমস হয়ে উঠেছে সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিকভাবে আধিপত্যকামী এবং প্রতিষ্ঠিত ও মান্য বর্গ-ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক বলে ঘোষণা করে তাকেই টিকিয়ে রাখার উদ্যোগী পুরুষ, যার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে যৌক্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।[80] আবিশ্ববিস্তৃত সেই পুঁজি ও বুর্জোয়া মতাদর্শ ও রাষ্ট্রীয় আধুনিকতার বাহক হয়ে উঠেছিল ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্য।

---

[77] Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland (London : Oxford University Press, 1999), ePub edition.

[78] Anthea Trodd, প্রাগুক্ত, পৃ. xv

[79] Rosemary Jann, 'Sherlock Holmes Codes the Social Body', ELH, Vol. 57, No. 3 (Autumn, 1990), পৃ. ৬৮৫-৭০৮

[80] Mary Russo, *The Female Grotesque: Risk, Excess, and Modernity* (New York: Routledge, 1995), পৃ. ৮

এই বিষয়ে গোয়েন্দা সাহিত্য যেন হয়ে ওঠে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জনগণের/পাঠকের সঙ্গে মুদ্রণ-পুঁজি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মতি বিনিময়ের যোগসূত্র।

বস্তুত, *The Moonstone* কিংবা *The Sign of Four* প্রভৃতি রচনার মতোই ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্য জুড়ে ঔপনিবেশিক প্রতর্কের বিভিন্ন নমুনা ছাড়িয়ে আছে, এবং সেগুলি জাতিবৈরবাদ কিংবা সাম্রাজ্যিক মতাদর্শের আপাত বহিঃপ্রকাশ অতিক্রম করে গভীরে চারিয়ে গেছে। সেখানে ইংরেজ জাতীয়তা বোধ এবং বৈদেশিক অনুপ্রবেশ এই দুই বিপরীত অবস্থানের নির্মাণ করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে পুলিশ-গোয়েন্দা তথা সার্বত্রিক রাষ্ট্রিক নজরদারিত্বের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে, যার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট বিদেশীকে শাস্তি দিয়ে, বহিষ্কার করে শৃঙ্খলা-ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে দুষ্টের দমন ও শান্তিকল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রসঙ্গত জন কালতির মতে, এই আদিপর্বের গোয়েন্দা কাহিনীতে অপরাধকে ব্যক্তি অপরাধীর নিজস্ব বিষয় বলে প্রমাণ করে আদতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক কাঠামোটিকে বলবৎ করা হয়। উপরন্তু, অপরাধীর পরিচয় জানার সমগ্র পদ্ধতিকে রহস্য-রোমাঞ্চ ও ধাঁধা সমাধানের খেলায় পরিণত করার মাধ্যমে একটি গভীর সামাজিক-নৈতিক সমস্যাকে নিছক প্রমোদময় অবসরযাপনের অঙ্গ করে তোলা হয়। অপরাধের বৃত্তান্ত শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক আখ্যানে পরিণত হয়। আদতে বিপজ্জনক ও বিরক্তিকর অপরাধীকে যে গোয়েন্দা কাবু করে ফেলবে, সেই বিশ্বাস পাঠককে আশ্বস্ত করে, রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্থার ভরসা জোগায়। ভারতীয় হীরক, রহস্যময় ব্রাহ্মণ, মনুষ্যেতর আন্দামানবাসী, অত্যদ্ভুত অস্ত্র-শস্ত্র এবং সর্বনাশা নেশা— সবই ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের শান্ত সমৃদ্ধ সুখী গৃহকোণে অপরাধ-চিহ্ন হয়ে হাজির হয়েছে। সেই প্রাচ্যবাদী আক্রমণের আচম্বিত ধাক্কায় বেসামাল হয়ে পড়া প্রতীচ্যকে বাঁচাতেই ইংরেজ গোয়েন্দার আবির্ভাব। তিনিই ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র ও ঔপনিবেশিক আদিমতা-প্রসূত সেই আচমকা উৎপাতকে চিহ্নিত করে তাকে নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিহ্ন করার হদিশ বাতলে দেবেন।[81]

---

[81] John G. Cawelti, *Adventure, Mystery, and Romance : Formula Stories as Art and Popular Culture* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977 [1976]) পৃ. ১০৪-১০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘অন্ধকার’ ব্রিটেন ও ‘ছায়া কালো কালো’

নেশা, ষড়যন্ত্র ও ‘অপরাধী’ নির্মাণের মতাদর্শ

“(T)he novel, as a cultural artefact of bourgeois society, and imperialism are unthinkable without each other. Of all the major literary forms, the novel is the most recent,… its occurrence the most Western, its normative pattern of social authority the most structured; imperialism and the novel fortified each other to such a degree that it is impossible, I would argue, to read one without in some way dealing with the other.

— Edward W. Said[1]

“For me… the reading of detective stories is an addiction like tobacco or alcohol. The symptoms of this are: Firstly, the intensity of the craving,... Secondly, its specificity,… (a)nd, thirdly, its immediacy.

— W. H. Auden[2]

“Inasmuch as the novel's mystery is rooted in the murderousness and treachery of the Indian Mutiny, Holmes’s resolution of the compound mystery… symbolically vanquishes the exotic but violent element of the Orient within Victorian England by means of his unemotional empiricism… Holmes is able to domesticate the fear of the Orient as represented by the Indian Mutiny at the same time that he is able to justify English imperialism in India.

— Jon Thompson[3]

---

[1] Edward W. Said, *Culture and Imperialism* (New York : Vintage, [1993] 1994), পৃ. ৭০-৭১

[2] W. H. Auden, ‘The Guilty Vicarage : Notes on the detective story, by an addict’, in *Harper’s Magazine* (May 1948 Issue). DOI : https://harpers.org/archive/1948/05/the-guilty-vicarage/ 04/09/24, 10:21 PM

[3] Jon Thompson, *Fiction, Crime, and Empire : Clues to Modernity and Postmodernism* (Urbana and Chicago : University of Illinois Press, 1993), পৃ. ৭২

যে বছরে ঔপনিবেশিক ভারতে দেশীয় সংবাদপত্র আইন বা Vernacular Press Act লাগু হয় সেই ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাস করে নেটলিতে যান জন এইচ. ওয়াটসন। মহারানি ভিক্টোরিয়ার আগ্রহে ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (১৮২০-১৯১০) এবং লর্ড পামারস্টোন (১৭৮৪-১৮৬৫)-এর উদ্যোগে নেটলিতে সেনাবাহিনীর জন্য তৈরি হয়েছিল রয়াল ভিক্টোরিয়া হসপিটাল। সেই হাসপাতালে যোগ দেওয়ার পরে পরেই ভারতে গিয়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ হয় ডাক্তার ওয়াটসনের। তাঁর আদত বাহিনী ছিল ফিফথ্ নর্দাম্বারল্যান্ড ফুজ়িলিয়ার্স, যারা ভারতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ দমন করে বিলেতে খ্যাত হয় এবং ডাক্তার ওয়াটসন সম্ভবত যে যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন সেই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-১৮৮০ খ্রি.) জয়েও ঐ বাহিনীর অবদান ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক আফগানিস্তানে অধিকার কায়েম করলেও জন ওয়াটসনের কপালে জুটেছিল বিস্তর দুর্ভোগ। ঔপনিবেশিক প্রজার তৈরি জিজেল বুলেট ও উপনিবেশের 'অভিশাপ' আন্ত্রিক জ্বরের পারম্পরিক ধাক্কায় ধ্বস্ত ওয়াটসন ফিরে আসেন লন্ডনে। ওয়াটসন তাঁর আন্ত্রিক জ্বরকে "curse of our Indian possessions" বলে অভিহিত করেছিলেন।[4]

বস্তুত, ভারতীয় উপনিবেশ যেমন একদিকে ব্রিটেনকে দিয়েছিল অফুরান সম্পদ হস্তগত করার হরেক সুযোগ, তেমনই সেই উপনিবেশায়নের উপজাত ছিল বিভিন্ন সমস্যা, যেগুলি সমকালীন ব্রিটিশ-মননে 'অভিশাপ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই গোত্রে যেমন পড়ত আফিম কিংবা ১৮৫৭-র বিদ্রোহ তেমনই এক 'অভিশাপ' ছিল নানান 'অজানা' জ্বর, যার থেকে নিরাময় সংক্রান্ত গবেষণার জন্য গড়ে উঠেছিল একটি চিকিৎসা শাস্ত্রীয় বিভাগ — ট্রপিকাল মেডিসিন।[5] ওয়াটসনের সঙ্গে ফিরে আসে তাঁর ঔপনিবেশিক স্মৃতি, যে স্মৃতি ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের দোসর। ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের বিখ্যাততম কথক ডাক্তার ওয়াটসনের মতই তাঁর সমকালীন ব্রিটিশ মননে ও স্মৃতি-সত্তায় প্রাচ্যের উপনিবেশের অভিজ্ঞতা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভিক্টোরীয় সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে তৎকালীন ব্রিটিশ মননে যে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়েছিল তার মর্মকথা ছিল এই যে, সমগ্র বিশ্বের নাভিস্থল হল পৃথিবীশ্রেষ্ঠ লন্ডন। ভিক্টোরীয় লেখক ও পাঠকেরা মনে করতেন সাহিত্যে যা কিছু দুষ্ট তা সবই চরিত্রে বিদেশী, ইংরেজ কখনও দোষ করতে পারে না। জনৈক আলোচক ভিক্টোরীয় ইংরেজ সমাজের উগ্র স্বজাত্যবোধ ও সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে:

> Victorians took great pride in being known as Victorian England, a reference to their queen. The sun, indeed, never set on the British Empire. There was a notion among some of the Victorians that people from countries other than Great Britain were ill-mannered and ill-

---

[4] Sir Arthur Conan Doyle, *A Study in Scarlet,* in *The Complete Sherlock Holmes,* Vol. 1, প্রাগুক্ত

[5] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: David Arnold, *Science, Technology and Medicine in Colonial India* (UK: Cambridge University Press, 2000); Biswamoy Pati and Mark Harrison (Ed.), *The Social History of Health and Medicine in Colonial India* (London & New York : Routledge, 2009) — বিশেষত ২, ৬, ১০ ও ১১ অধ্যায়; Ishita Pande, *Medicine, Race and Liberalism in British Bengal : Symptoms of empire* (London & New York : Routledge, 2010) এবং Pratik Chakrabarti, *Medicine and Empire —1600–1960* (UK: Palgrave Macmillan, 2014)— বিশেষত অধ্যায় ৮: 'Imperialism and tropical medicine', পৃ. ১৪১-১৬৩।

> educated ruffians, … should be relegated as servants. Literature reflected those values and frequently characterized the protagonist as an evil foreigner. Victorians took great satisfaction from the notion that the evil in literature could be attributed to a foreigner and not an Englishman.[6]

ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনী এই মনোভঙ্গির প্রধানতম প্রতিফলন ও পৃষ্ঠপোষক। এদিকে গোয়েন্দা সাহিত্যে অন্তত একজন অপরাধী থাকতেই হবে, যে নিরপরাধদের মধ্যে মিশে যাওয়ার হাজার চেষ্টা করলেও অব্যর্থ সূত্রের ভিত্তিতে গড়ে তোলা যুক্তি দিয়ে তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যাবেই। তার জন্য সেই অপরাধীর এমন এক বা একাধিক বিশিষ্ট লক্ষণ থাকতে হবে, যা তথাকথিত 'স্বাভাবিকতা'র ছাঁচে পড়ে না। সেই 'অস্বাভাবিক' ও অপরাধের মধ্যে একরকম আন্তঃসম্পর্ক গোয়েন্দা সাহিত্যে স্পষ্ট এবং সেই অস্বাভাবিকই অপর। সাম্রাজ্যের চিন্তায় মোহিত ইংরেজ লেখক তাই সহজেই সাম্রাজ্যের অপর খুঁজে পেয়েছেন উপনিবেশে, পাশ্চাত্যের অপর প্রাচ্যে, শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার অপর কৃষ্ণাঙ্গ 'আদিমতায়' ; অর্থাৎ সমীকরণটা হয়ে গেছে পাশ্চাত্যের গরীয়ান সাম্রাজ্য বনাম প্রাচ্যের অসভ্য উপনিবেশ। এডয়ার্ড সঈদের মতে, স্ব ও অপরের মধ্যে এই দ্বিত্ববোধ সাম্রাজ্যচিন্তার মজ্জাগত:

> (N)early every nineteenth-century writer…was extraordinarily well aware of the fact of empire: …(i)t will not take a modern Victorian specialist long to admit that liberal cultural heroes like John Stuart Mill, Arnold, Carlyle, Newman, Macaulay, Ruskin, George Eliot, and even Dickens had definite views on race and imperialism, which are quite easily to be found at work in their writing…. Mill, for example, made it clear in *On Liberty and Representative Government* that his views there could not be applied to India… because the Indians were civilizationally, if not racially, inferior.[7]

ঔপনিবেশিক প্রজা যে কেবল আধুনিক সভ্যতার নিরিখে পশ্চাৎপদ তাই নয়, উপরন্তু তার সঙ্গে জড়িত আছে রহস্যাবৃত এমন সব বিষয় যা পাশ্চাত্য যুক্তিসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকতার সঙ্গে খাপ খায় না। প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যে উদ্ভূত ও প্রচলিত সেই বিচিত্র ধ্যান-ধারণার সমষ্টিকেই সঈদ প্রাচ্যবাদ বা ইংরেজিতে ওরিয়েন্টালিজম বলে অভিহিত করে তার চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে লিখছেন:

> Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the Orient—dealing with it by making statements about it, authorizing views of it, describing it, by teaching it, settling it, ruling over it: in short, Orientalism as a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient.[8]

---

[6] Sharon J. Kobritz, *Why Mystery and Detective Fiction was a Natural Outgrowth of the Victorian Period* (University of Maine, 2002). Electronic Theses and Dissertations. 483. পৃ. ৩ https://digitalcommons.library.umaine.edu/etd/483

[7] Edward W. Said, *Orientalism* (New York : Vintage, [1978] 1994), পৃ. ১৪

[8] তদেব, পৃ. ৩।

ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাচ্যবাদের সহগতির বিস্তর নমুনা তৎকালীন সাহিত্যে দেখা যায়।[9] ঔপনিবেশিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃতির ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে সঈদ সাম্রাজ্যিক সাহিত্যে নিহিত ইউরোপকেন্দ্রিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ঐ গোত্রের রচনাগুলিতে ঔপনিবেশিতকে খ্রিস্টীয় ইওরোপের সাংস্কৃতিক ক্ষমতার অধীনস্থ করে তোলা হয়েছে।[10] সেই প্রক্রিয়ায় গোয়েন্দা সাহিত্যের ভূমিকা বহু আলোচক বিশ্লেষণ করেছেন। ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রহস্য-রোমাঞ্চ এবং গোয়েন্দা সাহিত্যের লেখকরা যেভাবে এশীয়, আফ্রিকীয় ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন ব্যক্তিচরিত্র হাজির করেছেন, তা স্পষ্টতই শতাব্দীব্যাপী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারী অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত শ্রেণি ও জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি নেতিবাচক পক্ষপাতদুষ্ট।[11] সেই একপেশে বয়ানের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অনুপুঙ্খভাবে শাসক ও শাসিতের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও যাপনের এক বিপরীতমুখী ও দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্ক হাজির করা হয়েছে। তার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শোষণের তাত্ত্বিক নায্যতা এবং বাস্তবিক শাসনে নিহিত ক্ষমতার বর্বর প্রয়োগের মধ্যে যে গভীর বৈপরীত্য ও সংঘাত তাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। ঔপনিবেশিত 'অপর'কে বর্বর, মনুষ্যেতর, অসভ্য ও নৈতিকভাবে হীন প্রতিপন্ন করতে পারলে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার বাহক ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণকে যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করা যায়। এই কাজে আদিপর্বের ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্য চেষ্টার কসুর করেনি।[12] বলাবাহুল্য যে গোয়েন্দা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। সেখানে গোয়েন্দাপ্রবর প্রাচ্যসম্ভূত বিপদ থেকে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রকে রক্ষা করেন। সেই বিপদ কেবল অজানা বা অচেনা তাই নয়, একই সঙ্গে তা চরিত্রে পাশ্চাত্যের অপর। সেই অপরের পরিচয় রহস্যকুজ্ঝটিকাময়, যা ভেদ করেন গোয়েন্দা জ্ঞানদীপ্তিসঞ্জাত বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও অবরোহী যুক্তিপদ্ধতির প্রয়োগে।

---

[9] " (T)he Oriental is depicted as something one judges (as in a court of law), something one studies and depicts (as in a curriculum), something one disciplines (as in a school or prison), something one illustrates (as in a zoological manual). " তদেব, পৃ. ৪০।

[10] "At the heart of European culture during the many decades of imperial expansion lay what could be called an undeterred and unrelenting Eurocentrism. This accumulated experiences, territories, peoples, histories; it studied them, classified them, verified them; but above all, it subordinated them to the culture and indeed the very idea of white Christian Europe.". দ্রষ্টব্য: Edward W. Said, 'Yeats and Decolonization' in *Nationalism, Colonialism and Literature* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990), পৃ. ৭২.

[11] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দা কাহিনীর মাধ্যমে কীভাবে জাতি ও গোষ্ঠীবিদ্বেষ ও লিঙ্গবৈষম্য তথা সামগ্রিকভাবে পরিচয় নির্মাণের রাজনীতি ও 'অপর' নির্মাণের প্রক্রিয়া চলেছে তার বহুমুখী বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য: Kathleen Gregory Klein (Ed.), *Diversity and Detective Fiction* (Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press,1999).

[12] Abdul R. JanMohamed, 'The Economy of Manichean Allegory' in *The Post-colonial Studies Reader*, ed. by Bill Ashcroft, et al. (London: Routledge, [1995] 2003), পৃ. ২২-২৩।
"(t)he confluence of Orientalism and the mystery story, which from its outset locates the Oriental as a cipher for the irrational… classical detection… an investment in Orientalism… the positivist detective is able to contain the Orientalized threat (as in Poe's "Murders in the Rue Morgue" and Doyle's The Sign of Four)…". দ্রষ্টব্য: Stanley Orr, "Postmodernism, "Noir", and "The Usual Suspects"", Literature/Film Quarterly, 1999, Vol. 27, No. 1 (1999), পৃ. 65-73 (পৃ. ৬৯) https://www.jstor.org/stable/43797759

ডিকেন্স, কলিন্স ও ডয়েলের রচনায় প্রাচ্যের রহস্যময়, ধোঁয়াশা-আচ্ছন্ন ছমছমে আবহ সরাসরি হাজির হয় লন্ডনে। ইংরেজ গোয়েন্দা কেবল রহস্য সমাধান করেন না, তারই সঙ্গে আঠারো-শতকী ইওরোপীয় আলোকদীপ্তির বিস্তারে প্রাচ্যের নিকষ অন্ধকার ভেদ করেন। আলোচকরা মনে করেন যে, আদিপর্বের ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের মাধ্যমে ইংরেজ-জীবনের দৈনন্দিনতায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। নিস্তরঙ্গ শান্ত ইংরেজ-জীবনে উপনিবেশে চলমান সংঘাতের ছায়া পড়ে। কলিন্সের *The Moonstone* তার প্রমাণ। তবে, ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর কয়েকজন আলোচক মনে করেন যে, *The Moonstone*-এর স্বর পুরোপুরি সাম্রাজ্যপ্রণেতার নয়, বরং তার মধ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও সমালোচনার রেশ আছে। যেমন, মার্টিন প্রিস্টম্যানের মতে তিন ব্রাহ্মণের প্রতি কলিন্সের কিছুটা সহানুভূতিশীল মনোভাব ছিল এবং সেই বিচারে প্রিস্টম্যান কলিন্সের আলোচ্য উপন্যাসকে 'প্রবলভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।[13] একইভাবে চার্লস জ়েপকা দেখাতে চান যে, কলিন্স তিন ব্রাহ্মণ ঐন্দ্রজালিকের মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে প্রাচ্যবাদী ভীতির উদ্রেক করলেও আখ্যানের আরেকটি স্তরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা নিহিত আছে।[14] জন রীড খেয়াল করিয়েছেন যে, কলিন্সের মূল আখ্যানের সময়কাল ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ, যে বছর কোম্পানি গায়ের জোরে পঞ্জাব দখল করেছিল এবং অ্যাবেলহোয়াইট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দফতরের লাগোয়া খুন হয়। রীডের মতে, কলিন্স ঐ উপন্যাসে একভাবে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনকেই তুলে ধরে দেখাতে চেয়েছেন যে, ভারতীয় ব্রাহ্মণত্রয় বীর ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা লুঠেরা।[15]

কিন্তু, উপর্যুক্ত আলোচকদের এই যুক্তির বিপরীত স্বর *The Moonstone*-এর আখ্যানে অহরহ শোনা যায়। উক্ত উপন্যাসে ভারত সম্পর্কে একরকমের প্রাচ্যবাদী রহস্যময়তা তৈরি করা হয় এবং যে সমস্ত চরিত্ররা ভারত বিষয়ে কিছুটা ওয়াকিবহাল তারাও সেই নেতিবাচক রহস্যের খাসমহল তৈরির উপাদান জুগিয়ে যায় হরদম। যেমন, মার্থওয়েটও বলে বসে যে, ব্রাহ্মণত্রয়ী যে দেশ থেকে এসেছে সেখানে মানবিকতা ও নৈতিকতার ইংরেজসুলভ আদর্শের চল নেই, বরং ধূমপান করে পাইপ থেকে যেভাবে নির্বিচার অহরহ ছাই ঝাড়া হয় ঠিক সেভাবেই সেই দেশের লোকেরা মানুষ খুন করে এবং তাদের কাছে প্রাণের চেয়ে জাতের দাম বেশি:

> In the country those men came from, they care just as much about killing a man, as you care about emptying the ashes out of your pipe. If a thousand lives stood between them and the getting back of their Diamond—and if they thought they could destroy those lives without discovery—they would take them

---

[13] Martin Priestman, *Crime Fiction from Poe to the Present* (Plymouth: Northcote House, 1997), পৃ. ১৩।

[14] জ়েপকার মতে কলিন্সের আলোচ্য উপন্যাসে আছে "a critique of English imperialism, along with English materialism in general." দ্রষ্টব্য: Charles J. Rzepka, *Detective Fiction* (UK: Polity Press, [2005] 2008), পৃ. ১০২।

[15] John R. Reed, "English Imperialism and the Unacknowledged Crime of The Moonstone," *Clio* 2 (June 1973), পৃ. ২৮১-২৯০।

> all. The sacrifice of caste is a serious thing in India, if you like. The sacrifice of life is nothing at all.[16]

এভাবেই প্রথাগত ইংরেজ নৈতিকতা ও ঐ তিন ব্রাহ্মণের উপরে আরোপিত বিদেশী মতাদর্শের মধ্যে বৈপরীত্য ও উচ্চাবচতার সম্পর্ক তথা ইংরেজ আত্ম ও প্রাচ্যবাদী ভারতীয় অপরের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কটি পাঠকমনে স্থায়ী হয়ে যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে বাড়ন্ত প্রাচ্যবাদী ভীতি ও কল্পনাসমূহ যেন তিন অশুভ ব্রাহ্মণ বাজিকর রূপে শান্ত ইংরেজ গৃহকোণে অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনে। আশিস রায় *The Moonstone*-কে কলিন্সের সাম্রাজ্য-বিরোধিতার আখ্যান বলে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পরবর্তীকালে লিখিত আলোচ্য উপন্যাসে মাতৃ-প্রতিম রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার করতলধৃত ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠায় কলিন্স ব্যগ্র।[17] মাত্র এক দশকের ব্যবধানে রচিত উপন্যাসটি বিদ্রোহ-স্মৃতি-ভীত ইংরেজ পাঠকের মনে যে উপনিবেশের মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা উশকে দেবে তাতে সন্দেহ কী! বস্তুত, *The Moonstone* পরবর্তী কালের ব্রিটিশ অপরাধ তথা গোয়েন্দা সাহিত্যের আদর্শমান বা আদিরূপ হয়ে উঠেছিল, যার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক/ সাম্রাজ্যিক মতাদর্শ এবং তার মেট্রোপলিটান অর্থাৎ মাতৃরাষ্ট্রিক পরিপ্রেক্ষিতকেও সাহিত্যের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গত জনৈক আলোচক খেয়াল করিয়েছেন যে:

> The Moonstone was not merely a significant milestone in the problematic use of the figure of the 'criminal' Indian in British imperial narratives. It also served as a model for British fiction of crime for the rest of the imperial era.[18]

বস্তুতপক্ষে, কলিন্সের উপন্যাসে কর্নেল জন হার্নক্যাসল ভারতের শ্রীরঙ্গপত্তনমে গিয়ে যদি ঐ রত্নটি চুরি না-করতেন ও সেটি রাচেল ভেরিনডারকে দিয়ে না-যেতেন তাহলে সমগ্র আখ্যানটি শুরুই হত না। যতক্ষণ না সেই রত্ন তার বৈধ অধিকারীর কাছে ফিরছে ততক্ষণ 'প্রাচ্যের রহস্যময় অভিশাপ' সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নাগরিককে ঘরের ভেতরেও তাড়া করে বেড়াচ্ছে:

> (T)he main narrative of The Moonstone concerns the disruption of the tranquillity and order of genteel English life by a colonial legacy….This legacy… also signifies the inescapability and pervasiveness of the burden of colonial guilt; even genteel young

---

[16] Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত।

[17] আশিস রায় মনে করেন যে, ভিক্টোরীয় সাম্রাজ্যের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উইলকি কলিন্স— "(B)rings together a semiotic repertoire that demonstrates the structural cohesion the imperial imagination aimed at but could never quite achieve when challenged on issues of morality and reason". দ্রষ্টব্য: Ashish Roy, "The Fabulous Imperialist Semiotic of Wilkie Collin's The Moonstone", *New Literary History*, Vol. 24, No. 3, *Textual Interrelations* (Summer, 1993), পৃ. ৬৫৭-৬৮১।

[18] Upamanyu Pablo Mukherjee, *Crime and Empire : The Colony in Nineteenth-Century Fictions of Crime* (Oxford: Oxford University press, 2003), পৃ. ১৮৮
এই বিতর্কের সবিস্তার আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Melissa Free, ""Dirty Linen": Legacies of Empire in Wilkie Collins's The Moonstone", *Texas Studies in Literature and Language*, Vol. 48, No. 4 (WINTER 2006), পৃ. ৩৪০-৩৭১

> women are implicated in the white man's burden, and the consequences of colonial plunder surface in the English country house.[19]

ভেরিনডার পরিবারের অনুগত ভৃত্য বকমবাই গ্যাব্রিয়েল বেটারেজের মুখে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়:

> (H)ere was our quiet English house suddenly invaded by a devilish Indian Diamond...Who ever heard the like of it — in the nineteenth century, mind; in an age of progress, and in a country that rejoices in the blessings of the British constitution.[20]

উৎসন্ন যাওয়া ভারতকে যে ব্রিটিশ শাসন জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করেছে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ইংরেজ-গৃহভৃত্য বিস্মিত হয়ে দেখে যে, একটি 'শয়তানভরকরা' ভারতীয় হীরকখণ্ডের বৈগুণ্যে ইংরেজ-সমাজের শান্তি-স্থিতি জলাঞ্জলি যেতে বসেছে। বস্তুত, কলিন্স ভেরিন্ডার পরিবারের সুখীগৃহকোণকে যেন ইংল্যান্ডেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে হাজির করেছিলেন।[21] আর এক শয়তান ভারতীয় হীরের কারণে সেই ঘর হতশ্রী হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মহারানির অনুগত প্রজা বেটারিজ এই অধঃপতনে একদিকে মর্মাহত, অন্যদিকে সেই দুর্দশার কারণের প্রতি খড়্গহস্ত:

> When I came here from London with that horrible Diamond … I don't believe there was a happier household in England than this. Look at the household now! Scattered, disunited—the very air of the place poisoned with mystery and suspicion![22]

মহীশূর থেকে চুরি-করা সেই রত্নের পিছু পিছু সুদূর ভারত থেকে তিনজন ব্রাহ্মণ ইংল্যান্ডে হাজির হয়। তাদের ঘিরে রহস্য ধোঁয়াশা। এই তিনটি ভিনদেশী চরিত্র আখ্যানে হাজির থাকার ফলে— প্রথমত, এর মাধ্যমে রহস্যের খাসমহলে পাঠকের চৈতন্য বুঁদ হয়ে থাকবে ও প্রকৃত অপরাধীর পরিচয় সম্পর্কিত সূত্রগুলির দিকে নজর যাবে না এবং দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডে হঠাৎ উদয় হওয়া তিন ভারতীয় ব্রাহ্মণ সাম্রাজ্যিক প্রাচ্যবাদের স্ব বনাম অপর ছকটির সঙ্গে লাগসই। ফলে, পাঠক প্রাচ্যবাদী রহস্যে ও সাম্রাজ্যের মতাদর্শে তুষ্টি লাভ করবে।[23] ভেরিনডারদের শান্ত সুখী গৃহকোণে তিন ভারতীয় ও একটি হিরে যেন এক অভূতপূর্ব ছায়াময়তার জন্ম দিয়েছে, যে 'ছায়া কালো কালো'র আড়ালে পাকিয়ে উঠছে কোনো প্রাচ্যবাদী রহস্যের প্যাঁচ, যার সঙ্গে অন্ধকারে চুপিসাড়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘ কিংবা বিড়ালের মত পশুর সাযুজ্য ধরা পড়ে। কলিন্সের উপন্যাসে বিখ্যাত পর্যটক মার্থোয়েট মনে করিয়ে দেন যে,

---

[19] Lyn Pykett, *The Nineteenth-Century Sensation Novel* (United Kingdom : Northcote House Publishers Ltd, [1994] Revised and expanded second edition 2011), পৃ. ৫০-৫১

[20] Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত

[21] ভেরিনডার পরিবারের পরিচারক প্রধান বেটারিজ সগর্বে জানিয়ে দেয়: "I follow the plan adopted by the Queen in opening Parliament". তদেব।

[22] তদেব।

[23] সঈদ মনে করেন যে: "(T)he novel—or the culture in the broad sense—"caused" imperialism, but that the novel, as a cultural artefact of bourgeois society, and imperialism are unthinkable without each other." তবে একইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, উপন্যাসের কারণে সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটেনি, কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের সাংস্কৃতিকতার প্রতিভূ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপন্যাসের মিথোজীবিতা খেয়ার করা জরুরি। দ্রষ্টব্য: Edward W. Said, *Culture and Imperialism* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১

ঐ তিন ভারতীয় ব্রাহ্মণ: "will wait their opportunity with the patience of cats, and will use it with the ferocity of tigers. How you have escaped them I can't imagine"[24] উপরন্তু, উপন্যাসের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, ভারতের এক সুপ্রাচীন দেবতার আদেশে তিন ব্রাহ্মণ হীরকটিকে সর্বত্র অনুসরণ করবে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই কলিন্সের দেখানো পথে সাম্রাজ্যমদগর্বী ইংরেজ পাঠক ঐ তিনজনকেই অপরাধী ঠাওরাবে এবং ঘরের লোক কোনো ইংরেজকে সন্দেহ করবে না। কারণ, ইংরেজরা কখনই দোষী হতে পারে না। ঔপনিবেশিক হিরের শয়তানি ফন্দি থেকে ইংল্যন্ডকে বাঁচাতে পারে একজনই— গোয়েন্দা, যিনি প্রাচ্যোদ্ভূত কুসংস্কারের ধোঁয়াশা ভেদ করে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন, যা বেটারেজের বুলি অনুযায়ী উনিশ শতকী প্রগতি ও উন্নয়নের যুগোপযোগী মানসিকতা।

কিন্তু, বেটারেজ-বর্ণিত এহেন আদর্শ ইংরেজ সমাজের রাজনৈতিক-অর্থনীতির চালিকা শক্তির একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন— ভারতীয় হীরকের লন্ডনে আবির্ভাবের পিছনেও মূল কারণ শ্রীরঙ্গপত্তনমে লুঠতরাজ। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, রত্নটি নিজে আপদ হয়ে ভারত থেকে ইংল্যন্ডে আসেনি। আদতে সেটি একজন ইংরেজ কর্তৃক চুরি করে আনা। অথচ সেটির পুনরায় চুরি যাওয়াকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত রহস্যের আবরণে সেই আদত চুরির আখ্যানটি চাপা পড়ে যায়। একজন আলোচক খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন যে, গোটা উপন্যাস জুড়ে হীরক নিয়ে সকলে ব্যতিব্যস্ত। অথচ আখ্যানের ইংরেজ কুশীলবদের কেউই খেয়াল করল না যে, আদতে রত্নটি লুঠের মাল — "stolen property, the spoils of British Imperialism", এবং যে পরিবার সেটি আইনত সম্পদ বলে দাবি করছে তাদের কোনো নৈতিক অধিকারই নেই রত্নটির উপরে।[25] অথচ, যে ভারতীয় ব্রাহ্মণত্রয়ী রত্নটির অধিকারী তাদেরই 'চোর' বলে গণ্য করা হচ্ছে। ঔপনিবেশিক প্রভুর দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপনিবেশিতের সম্পত্তি সম্পর্কে এই মনোভাব খেয়াল করা জরুরি। বস্তুত, কারোরই খেয়াল থাকে না যে, প্রথম চুরির ফলে রত্নটি স্থানচ্যুত হয় এবং দ্বিতীয় চুরির ফলে সেটি আবার স্বস্থানে ফিরে যায়। কিন্তু, ভারতীয় হীরক ও তার পিছু-ধাওয়া-করে-আসা হিন্দুত্রয়ীর যুগপৎ 'আক্রমণ' কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সেই আদত আক্রমণের ইতিহাসকে ঢাকা দিয়ে দেয়।

কলিন্সের *The Moonstone* প্রকাশের ঠিক আগের বছরে প্রকাশিত *Capital*-এর প্রথম খণ্ডে (১৮৬৭) মার্কস সেই আদত ঔপনিবেশিক আক্রমণ সম্পর্কে লিখেছিলেন: "The colonies secured… through the monopoly of the market, an increased accumulation. The treasures captured outside Europe by undisguised looting, enslavement, and murder, floated back to the mother-country and were there turned into capital."[26] লুঠের মালকে পুঁজিতে পরিণত করার মধ্যেই শিল্পবিপ্লবপ্রসূত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের চালিকাশক্তি নিহিত ছিল। তাই, কলিন্সের উপন্যাসে গডফ্রে শ্রীরঙ্গপত্তনমে চুরি করা রত্নটি টুকরো টুকরো করে নিতে চায়, লুঠের ইতিহাস

---

[24] Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত

[25] Sandra Kemp, Introduction, Wilkie Collins, *The Moonstone* (London : Penguin, 1998), পৃ. xvi

[26] Karl Marx, *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume I, Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, Edited by Frederick Engels (USSR : Progress Publishers, 1887), ePub edition (2015)

মুছে ফেলে তাকে পরিণত করে ফেলতে চায় বুর্জোয়া মতাদর্শের ভিত্তি পুঁজিতে। কিন্তু, মার্কস তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদের প্রাণ ভোমরা হল জাতীয় ঋণ। সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ দখলের সংঘাত-কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক পুঁজির ভিত্তির উপরে সেই ঋণের সৌধ গড়ে উঠেছে।[27] জাতীয় সম্পদ বলে যে বস্তুটি আধুনিক জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তা আসলে জাতীয় ঋণ বৈ কিছু নয়। তাই যে দেশ যত দেনার দায়ে ডুবন্ত সেই দেশ তত সম্পন্ন।[28]

The Moonstone উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্নভাবে ঋণের জালে আটক। ফ্রাঙ্কলিন ব্লেকের সম্পর্কে সংশয় এই যে, মহাদেশে হয়ত কোনো নারীঘটিত সমস্যায় পড়ে কিংবা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে সে ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছে। আবার রাচেল ভেরিনডারের মত যুবতীরা যে ছোটখাটো ব্যক্তিগত ঋণ নিয়েই থাকে এবং অনেক সময়ে তা স্বীকার করে না তাও বলা হয়েছে। ওদিকে গডফ্রে অ্যাবেলহোয়াইটেরও ঋণ ছিল।[29] আদতে পুঁজির বিশ্বজোড়া বিস্তারের মর্মকথাই হল ঋণের ভুবনব্যাপী ফাঁদ। কলিন্সের আলোচ্য উপন্যাসে ঋণের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব সম্পর্কে একজন আলোচক মন্তব্য করেছেন যে, উৎপাদন কিংবা উপভোগ নয়, আদতে ঋণই চালিকা শক্তি। ঋণ যেন এক অদ্ভুতদর্শন ভদ্রলোক যে বিদেশী টানে ইংরেজি বলে— "speaking English with a foreign accent".[30] বস্তুত, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতির পাকেচক্রেই যেন নৈতিকতার ধ্বজাধারী ইংল্যান্ডের এই হতশ্রী দশা, যেখানে তথাকথিত 'ভদ্রজন' অনেকেই ঋণের চাপে অসৎপথে চালিত হয়ে চোর বনে যাচ্ছে। উন্নত ইংরেজ সন্তানের সেই ঊন্মার্গগামিতার দায় যে হতচ্ছাড়া উপনিবেশের সে নিয়ে জাত্যাভিমানী ইংরেজ বেটারেজের আর সংশয় কী! তাই রবিনসন ক্রুশোর ভক্ত বেটারেজ স্পষ্টই ঘোষণা করে :

> (A) devilish Indian Diamond-bringing after it a conspiracy of living rogues, set loose on us by the vengeance of a dead man… Nobody ever heard the like of it, and, consequently, nobody can be expected to believe it.[31]

আদতে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত লুঠের লোভ ও ঋণের ফাঁদ— এই উভয়ের প্রভাবেই প্রথমত কর্নেল জন হার্নক্যাসেল হত্যা ও চুরির মাধ্যমে উপনিবেশ থেকে রত্নটি হস্তগত করে এবং ঋণগ্রস্থ গডফ্রে অ্যাবেলহোয়াইট তহবিল জালিয়াতি

---

[27] "The system of public credit, i.e., of national debts, whose origin we discover in Genoa and Venice as early as the Middle Ages, took possession of Europe generally during the manufacturing period. The colonial system with its maritime trade and commercial wars served as a forcing-house for it. Thus it first took root in Holland." দ্রষ্টব্য: Karl Marx, *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume I, Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, প্রাগুক্ত

[28] "National debts, i.e., the alienation of the state – whether despotic, constitutional or republican – marked with its stamp the capitalistic era. The only part of the so-called national wealth that actually enters into the collective possessions of modern peoples is their national debt. Hence, as a necessary consequence, the modern doctrine that a nation becomes the richer the more deeply it is in debt. Public credit becomes the credo of capital." দ্রষ্টব্য: তদেব।

[29] Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত

[30] এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Alexander Welsh, *Strong Representations: Narrative and Circumstantial Evidence in England* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992), পৃ. ২৪১-২৩২। উদ্ধৃতিটির সূত্র: দ্রষ্টব্য: Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত।

[31] দ্রষ্টব্য: Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত।

ও অন্যান্য বহুবিধ কারণে ঋণজর্জরিত হয়ে সুযোগ বুঝে রত্নটি দ্বিতীয়বার চুরি করে। খেয়াল করার মত বিষয় এই যে, অ্যাবেলহোয়াইটের বাবা একজন ব্যাঙ্ক পরিচালক। গডফ্রে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে আপাত উদ্ধার পেতে হীরেটি নিয়ে রওনা হয় আমস্টারডামের পথে। পুঁজির বাজার হিসাবে তখন সেই শহরের খুব নামডাক, লন্ডনের পাশাপাশি আবিশ্ব ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের প্রাণকেন্দ্র। অতএব সেথায় গডফ্রের গন্তব্য।[32] ঘটনাচক্রে গডফ্রের আগে সেপ্টিমাস লুকারের কাছেও হীরেটা ছিল এবং লুকারও একজন মহাজন। কিন্তু, গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই গডফ্রে খুন হয় ও হীরেটি নিয়ে তিন ব্রাহ্মণ ভারতে রওনা দেয়। আদতে লুণ্ঠিত সেই রত্নটি উপনিবেশের দেবতার ছিল, তাই তার সঙ্গে প্রাচ্যবাদী রহস্যময়তা জড়িত। সেই রহস্যময়তা বেটারেজের চোখে 'অভিশাপ' বলে মনে হলেও, আধুনিক পুঁজিবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির চোখে সেই পবিত্র হীরে আদতে বাজারজাত একটি রত্ন। বাজারের কাছে পবিত্র-অপবিত্র বলে কিছু নেই, সেখানে সবের মূল্যই প্রতীকী, এমনকী ব্যক্তি চরিত্রের মূল্যও, যে চরিত্র বাজারের প্রয়োজনে অসৎ হতেও পিছপা হয় না। শিল্পবিপ্লব ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সম্মিলনে গড়ে ওঠা নব্য নৈতিকতা সজোরে ঘোষণা করে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনই সমগ্র মনুষ্যজাতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ও সমাপ্তি।[33] সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য-সঞ্জাত ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সেই কর্তব্যপালনে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিভূ গোয়েন্দাও শরিক।

উনিশ শতকব্যেপে পুঁজিবাদ-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ-প্রাচ্যবাদ ও অপরাধের নৃতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিকতার যে আবহাওয়ায় ভিক্টোরীয় সমাজ-মতাদর্শের বাস্তবায়ন ঘটেছিল, সেই জলহাওয়াই কলিন্সের উপন্যাসটিও শাখা-প্রশাখা মেলতে পেরেছিল। গ্রাহাম গ্রীনের মতে, *The Moonstone* উপন্যাসের সঙ্গে শার্লক হোমসের যে উপন্যাসটির রীতিমত মিল আছে, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লিপিনকটের মাসিকপত্রে প্রকাশিত সেই *The Sign of Four*-এও রহস্যের কেন্দ্রে একবাক্স জহরত, যা আবারও এক ব্রিটিশ আধিকারিক ক্যাপ্টেন মর্সটান ভারত থেকেই চুরি করেছিলেন।[34] সেই দলেরই সদস্য মেজর সোল্টো মর্সটানকে হত্যা করে রত্নগুলো হাতিয়ে নেয়। অথচ যখন সেই রত্ন নিয়ে বখেড়ায়

---

[32] "Holland, which first fully developed the colonial system, in 1648 stood already in the acme of its commercial greatness." দ্রষ্টব্য: Karl Marx, *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume I, Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, প্রাগুক্ত।

[33] বাজার তথা পুঁজির ঈশ্বরত্ব প্রসঙ্গে মার্কস লিখছেন: "It was "the strange God" who perched himself on the altar cheek by jowl with the old Gods of Europe, and one fine day with a shove and a kick chucked them all of a heap. It proclaimed surplus-value making as the sole end and aim of humanity." দ্রষ্টব্য : Karl Marx, *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume I, Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, প্রাগুক্ত।

[34] ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জনাথন কেপ ও জন মারের কেপ অ্যান্ড মারে প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত শার্লক হোমসের কাহিনী সংগ্রহে *The Sign of Four*-এর ভূমিকায় গ্রাহাম গ্রীন লিখেছিলেন যে, হোমসের উক্ত উপন্যাসের "subplot… is far too like *The Moonstone* for comfort".
ঘটনাচক্রে, কলিন্সের পুলিশ-গোয়েন্দা কাফের বর্ণনার সঙ্গে ডয়েলের অমর রহস্য সমাধাকারী হোমসের বাহ্যিক গড়নগত মিলও খেয়াল করার মত। *The Moonstone*-এ কাফের অবয়ব "so miserably lean that he looked as if he had not got an ounce of flesh on his bones in any part of him… His face was as sharp as a hatchet... His eyes, of a steely light grey, had a very disconcerting trick, when they encountered your eyes, of looking as if they expected something more from you than you were aware of yourself."
A Study in Scarlet-এ হোমসের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "In height he was rather over six feet, and so excessively lean that he seemed to be considerably taller. His eyes were sharp and piercing… his thin, hawk-like nose gave his whole expression an air of alertness and decision. His chin, too, had the prominence and squareness which mark the man of determination."
কলিন্স ও ডয়েলের রচনার উদ্ধৃতির জন্য যথাক্রমে দ্রষ্টব্য: Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত, এবং Sir Arthur Conan Doyle, *A Study in Scarlet,* প্রাগুক্ত (উভয় ক্ষেত্রেই নজরটান সংযোজিত)।

হোমস ও ওয়াটসন জড়িয়ে পড়ে তখন আদতে যে সেগুলি চুরি করা জিনিস তা নিয়ে উভয়ের মাথাব্যথা দেখা যায় না। ফলে প্রথম চোর মর্সটান (সাম্রাজ্য বিস্তারে নিয়োজিত) কোনো অপবাদের শরিক না-হলেও, দ্বিতীয় চোর তথা হত্যাকারী সোল্টো সাম্রাজ্যের সম্পদ চুরি করার অভিযোগে অপরাধী। সাম্রাজ্যিক কল্পনা ও নেশার আসক্তিগত মানস-কাঠামোর সম্পর্কের এক জটিল বয়ান ফুটে উঠেছে আর্থার ক্যনান ডয়েলের *The Sign of the Four* উপন্যাসে। আর সেই প্রসঙ্গে কলিন্সের মত ডয়েলও ফিরে গেছেন সেই সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবথেকে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা-স্মৃতির কেন্দ্রবিন্দু সেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের তথা ব্রিটিশ সভ্যতার বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' প্রসঙ্গে। উপন্যাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেন শার্লক হোমসের অবয়ব পেয়েছে। ১৮৫৭ সালে বিদেশী প্রজার বিদ্রোহী ষড়যন্ত্র যেমন সমগ্র ব্রিটিশ জাতির রক্তপ্রবাহে বিষবৎ ঠেকেছিল, ঠিক তেমনই প্রাচ্যোদ্ভূত এক মারণ নেশায় হোমস আচ্ছন্ন, যে নেশা তার মন ও শরীরকে ধ্বস্ত করে দিতে পারে, যেমন সাম্রাজ্যের সুস্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল 'মিউটিনি'। কিন্তু, অপর ছাড়া আত্মের প্রতিষ্ঠা যেমন সম্ভব নয়, তেমনই হোমসের "science of deduction"-এর গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাচ্যোদ্ভূত মারণ নেশার দরকার হয়। প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের নিরিখে ঔপনিবেশিক নেশা (আফিম) এবং ঔপনিবেশিক উপপ্লব (১৮৫৭-র বিদ্রোহ)— উভয়ের নিরিখে ঔপনিবেশিক অপরাধীর অবয়ব স্পষ্ট হতে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রজার কালিক ও স্থানিক অবস্থানের আদিমতাই তার অপরাধী হওয়ার সাবুদ। ক্রমশঃ যেন সমগ্র উপনিবেশই হয়ে ওঠে বিচিত্র অপরাধের আঁতুড়ঘর।

উপনিবেশের প্রথম রহস্য: আফিমের নেশা

কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসে হার্নক্যাসেলের হাত ধরেই রত্নটির মত আফিমও উপনিবেশ থেকে ইংল্যান্ডে অনুপ্রবেশ করেছিল। উনিশ শতকে বিভিন্ন নেশার দ্রব্যের আবিশ্ব ব্যবসার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক সেই সমকাল থেকেই বহুল আলোচিত। উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'রত্ন' ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে আফিম চীনে রফতানি করা হত। সেই পণ্যজাত মুনাফার দিকে ব্রিটিশ সরকারের সজাগ নজর ছিল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে চীন অসন্তুষ্ট ছিল এবং চা কিংবা রেশমের পরিবর্তে চীনারা কেবল সোনা গ্রহণ করত। যেই মুহূর্তে বাণিজ্যিকভাবে শুল্ক প্রভৃতি আরোপ করে চৈনিক কর্তৃপক্ষ তাদের বাজারে ভারতীয় আফিমের প্রবাল্য বন্ধ করতে উদ্যোগী হল, তখনই লাভলোভী ব্রিটিশ সরকার আফিমের সেই হৃত বাজার পুনরুদ্ধার করতে চীনের উপরে প্রবল রাজনৈতিক চাপ দিতে থাকে। ব্রিটেনের বিশ্বজোড়া বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসে তার রাজকীয় নৌ-বহর— শুরু হয় পরপর দুটি ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ, যা প্রথম (১৮৩৯-১৮৪২) ও দ্বিতীয়

(১৮৫৬-১৮৫৮) আফিম যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই দুই যুদ্ধের ফলে বিজয়ী ইংরেজ শাসক চীনের বাজারে আফিম বিক্রি এবং সমাজে খ্রিস্টীয় মিশনারিদের অবাধ কার্যকলাপের অধিকার ছিনিয়ে নেয়।[35]

ভারত ও চীনে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন লবণ, আফিম, সুপারি ও কতিপয় অন্যান্য পণ্যের উপরে কোম্পানির বাণিজ্যিক মৌরসিপাট্টা যেন এক অনিঃশেষ সম্পদ আহরণের উৎস। ওয়ারেন হেস্টিংসের সেই (কু)খ্যাত বিচারসভার উল্লেখ করে মার্কস দেখিয়েছেন সুলিভান নামের এক ব্যক্তি কীভাবে কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের সহায়তায় আফিমের দালালি করে ফুলেফেঁপে উঠেছিল।[36] কিন্তু এহেন আফিম যেমন চীনের সমাজে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল, তেমনই পাশ্চাত্য সভ্যতার ও তার ধ্বজাধারী ইংরেজ সমাজেও সেই নেশার প্রভাব নিয়ে বহু চর্চা চলেছিল। বস্তুত, আফিম ও তজ্জনিত নেশাও প্রাচ্যবাদী প্রতর্কের গভীরে নিহিত ছিল। ব্রিটিশ মজুরদের উপরে আফিমের নেশার সর্বনাশা প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কস ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত *Public Health* এর ষষ্ঠ প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের মানুষ আফিমে মজেছে। উদ্ধৃতির শেষে পাদটীকায় মার্কস নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন—এ যেন ইংল্যান্ডের প্রতি ভারত ও চীনের 'প্রতিশোধ'।[37] মার্কসের এই শেষ কথাটি যদি ভেঙে নেওয়া যায়, তাহলে অনায়াসে কলিন্সের হীরক কিংবা ডয়েলের রত্নরাজিকে আফিমের জায়গায় বসিয়ে নেওয়া যায়। ঐ রত্নগুলিও যেন ঔপনিবেশিক শাসকের সুখী গৃহকোণে ঔপনিবেশিত প্রজার প্রতিনিধিস্বরূপ আপদ তথা অভিশাপ।

সেই আপদকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল কলিন্সের উপন্যাসে তামাকসেবী বেটারেজ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যিক অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল তামাক। অবশ্য, তা নেশা হলেও, তাতে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় না। বেটারেজ সেই ইংরেজ কাণ্ডজ্ঞানের প্রতিভূ। কিন্তু, আফিম রহস্যময় প্রাচ্যের সংরূপ, তার সেবনে কর্তব্যাকর্তব্যবোধ লোপ পায়, উপরন্তু ভদ্রলোক ইংরেজের চরিত্রস্খলন ঘটে। নিকোটিন-প্রিয় ব্লেক যেই আফিমে আসক্ত হয়ে পড়ে তখনই তার চারিত্র্যদোষ দেখা দেয়, তার সত্তা ও কর্মের সংগতি নষ্ট হয়। তাই শেষে আফিমের ঘোরে সে তার হবু স্ত্রীর সংগ্রহে সবথেকে দামি ভারতীয় হীরেটি পকেটস্থ করে। আবার সেই আফিমেরই যে চিকিৎসাগত সুফল আছে তা এজ্‌রা জেনিংসের অভিজ্ঞতায় ছিল। ফলে আফিম প্রয়োগ করেই জেনিংস ব্লেকের অবচেতন স্মৃতি ফিরিয়ে এনে রহস্য সমাধানে সাহায্য করে। কলিন্সের উপন্যাসে একটি কেন্দ্রীয় সত্তা যদি হয় উক্ত

---

[35] "After the long struggle to "open" the Chinese market, China's chief imports for mass consumption turned out to be a drug, opium, and a fuel, kerosene." দ্রষ্টব্য: John King Fairbank and Merle Goldman, *China : A New History* (Massachusetts : The Belknap Press, 2006 [2nd. enlarged ed.]),পৃ. ১৬৪

[36] Karl Marx, *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume I, Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, প্রাগুক্ত।

[37] উক্ত প্রতিবেদন থেকে মার্কস পাদটীকায় উদ্ধৃত করেছেন: "In the agricultural as well as in the factory districts the consumption of opium among the grown-up labourers, both male and female, is extending daily. "To push the sale of opiate... is the great aim of some enterprising wholesale merchants. By druggists it is considered the leading article." (l.c., p. 459.) Infants that take opiates "shrank up into little old men," or "wizened like little monkeys." (l.c., p. 460.) শেষে নিজস্ব মত জুড়ে দিয়েছেন: "We see here how India and China have taken their revenge on England." দ্রষ্টব্য: Karl Marx, *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume I, Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, প্রাগুক্ত (নজরটান সংযোজিত)।

রত্ন, তবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই আফিম— এবং উভয়ের উৎসই ভারত। ভারতে উৎপাদিত আফিম ততদিনে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অন্যতম প্রধান পণ্য। আফিমমোদী ইংরেজ লেখকের ভাবনায় প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম লক্ষণচিহ্ন আফিম। আবার সেই আফিম নিয়েই চীনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের কোম্পানির যুদ্ধ। সবমিলিয়ে আফিমই সেই প্রধান পণ্য যা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিশ্বজনীন প্রতিনিধি— উপনিবেশের মতই আফিমও রন্ধ্রে প্রবেশ করে যায়। বস্তুত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিচারিতার প্রতি আঙুল তুলে এমন কথাও বলা হত যে, একদিকে ব্রিটিশরা নিজেদেরকে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের থেকে নৈতিকভাবে উৎকৃষ্ট বলে প্রচার করে বেড়ায়, অথচ অন্যদিকে তারাই আফিমের চোরাচালন করে চৈনিক সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।

আদত কথা পুঁজির প্রসার বড় বালাই, তাই ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার চলে গেলেও, ১৯১৭ সাল পর্যন্ত আফিম বাণিজ্য চালু ছিল। এই নিয়ে ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে বিস্তর বিতণ্ডা চললেও, ব্রিটিশ নৈতিকতার ধ্বজাধারী পুঁজিপন্থীরা সেই দ্বিচারিতায় আমল দেয়নি। লিলিয়ান নায়দার তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছে যে, কলিন্সের উপন্যাসের সমকালীন অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ পাঠকর চোখে আফিম ছিল ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে প্রাপ্ত সবথেকে লোভনীয় পণ্য। সেই পণ্যের মাধ্যমেই চীনের সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক আয়গত ভারসাম্য রক্ষিত হত।[38] তাই জয়া মেহেতা প্রশ্ন তুলেছেন, কলিন্সের উপন্যাসে ব্লেকের লডনাম-আসক্তির উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ কী আদতে উপনিবেশে সাম্রাজ্যিক হিংস্রতার অপরাধ সম্পর্কে বৃহত্তর ইংরেজ সমাজের সাংস্কৃতিক স্মৃতিভ্রংশতার প্রতিফলন?[39] সেই আফিমের ঘোরকেই যেন অজুহাত খাড়া করেন কলিন্স, যার মাধ্যমে তিনি যেন আদতে যে হিংস্র রাজনৈতিক অপরাধের মাধ্যমে রত্নটি হস্তগত হয়েছিল সেই স্মৃতিটি ভুলিয়ে দিতে চান।[40] সাম্রাজ্যিক অর্থনীতির মতই সাম্রাজ্যবাদী চিন্তনেও প্রাচ্যের সঙ্গে এক বিক্ষোভসংকুল সামাজিক সম্পর্কের গভীর প্রভাব ছিল। ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, ভিক্টোরীয় ব্রিটেনে মধ্য ও শেষ পর্বে এমন এক পণ্যরতিনির্ভর সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যে তার একদিকে যেমন শিল্পপতিরা উপনিবেশজাত রেশম ও চায়ের প্রতি লোলুপ ছিল, তেমনই আরেকদিকে ব্রিটিশ উপনিবেশের আবিশ্ব প্রসারের গর্বোদ্ধত সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশও ইংরেজ সমাজে আদৃত হত।[41]

---

[38] Lillian Nayder, *Unequal partners : Charles Dickens, Wilkie Collins, and Victorian authorship* (New York: Cornell University Press, 2010 [2002]) পৃ. ১৭৩-১৭৬

[39] Jaya Mehta, "English Romance: Indian Violence.", *The Centennial Review*, Vol. 39, No. 3 (Fall 1995), পৃ. ৬১১-৬৫৭।

[40] Ronald R. Thomas, "Minding the Body Politic: the Romance of Science and the Revision of History in Victorian Detective Fiction", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৫৪

[41] সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ এবং পুঁজির আত্মসম্পর্ক কীভাবে ব্রিটিশ-গণমনে যশোগাথা হিসাবে চারিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দৈনন্দিনের বাস্তবতায় সাম্রাজ্যের উপস্থিতি ও তার নায্যতা প্রমাণের হরেক উপাদান-উপকরণ-কৌশল ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য কয়েকটি বই দ্রষ্টব্য: John M. MacKenzie, *Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960* (Manchester: Manchester University Press, 1984); Robert Opie, *Rule Britannia: Trading on the British Image* (London:Viking, 1985); Thomas Richards, *The Commodity Culture of Victorian England: Advertising and Spectacle, 1851-1914* (London:Verso, 1991).

প্রাচ্যের প্রতি এই রহস্যপ্রিয় মোহ এমনই জাঁকিয়ে বসেছিল যে, উনিশ শতকের শেষদিকে প্রায় প্রতিটি ভিক্টোরীয় গৃহকোণে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের থেকে আসা টুকিটাকি সামগ্রী জড়ো করা হত। উপনিবেশ বিস্তারে সফল কৃতি পুরুষদের ছবি এবং সাম্রাজ্যিক সাফল্যের নানা ছবি বিভিন্ন পণ্যের মোড়কে ঠাঁই পেয়েছিল। দুধ, শস, তামাকের টিন, হুইস্কির বোতল, বিস্কুট কিংবা মাজন, বেকিং পাউডার, টফির বাক্স— গৃহস্থালীর টুকিটাকি দৈনন্দিন পণ্যসম্ভারের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের যশোগাথা। অ্যান ম্যাক্লিনটক তাঁর অনবদ্য আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, কীভাবে বিজ্ঞাপন সাম্রাজ্যের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। গেরস্থালির টুকিটাকির মধ্যেও ঔপনিবেশিক বিস্তারের অনুষঙ্গ মিশে গিয়েছিল। তিনি একটি কাপড় সাদা করার ক্লোরিনের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাতে যেন মার্কস-কথিত পণ্যরতির আলোচনাই মূর্ত হয়ে উঠেছিল:

> (V)ividly exemplifies Marx's lesson that the mystique of the commodity fetish lies not in its use value but in its exchange value and its potency as a sign: "So far as [the commodity] is a value in use, there is nothing mysterious about it."… the whitening agent of bleach promises an alchemy of racial upliftment through historical contact with commodity culture. The transforming power of the civilizing mission is stamped on the boat-box's sails as the objective character of the commodity itself. More than merely a symbol of imperial progress, the domestic commodity becomes the agent of history itself. The commodity, abstracted from social context and human labor, does the civilizing work of empire, while radical change is figured as magical, without process or social agency. Hence the proliferation of ads featuring magic.[42]

এসবের সঙ্গে ছিল অগণিত উপন্যাস, ছোটগল্প, কাব্য, নাটকসহ বিভিন্ন সাহিত্যিক আখ্যান যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও তার প্রণেতা বীরদের কীর্তি কীর্তিত হত। সেইসব আখ্যানে প্রাচ্যে উৎপাদিত অর্থকরী বিভিন্ন নেশার পণ্যের কথাও থাকত। ফলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিজেই ইংরেজ জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী কল্পনায় বুঁদ করে রাখত, যাতে প্রাচ্যবাদী নেশায় আছন্ন জনতা অপরের উপরে প্রভুত্ব কায়েমের প্রতিটি গাথায় উদ্বাহু হয়ে জয়ধ্বনি দেয়। কিন্তু, সাম্রাজ্যের জয়-প্রগতির একই বয়ান নানান আঙ্গিকে পুনরাবৃত্তি করতে করতে ঐ আখ্যানগুলি ব্রিটিশ সংস্কৃতির অবচেতনে সেই প্রাচ্যবাদী বিষসদৃশ অপরকে এমনভাবে নিহিত করে দিয়েছিল যে, সেই অপরের ভিত্তিতেই আত্ম-কল্পনার সমগ্র সৌধকাঠামো গড়ে উঠেছিল। এই কথাটি যেমন অর্থনীতির দিক থেকেও প্রযোজ্য, তেমনই শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার নৈতিক ও জাতিগত উৎকর্ষের দাবিও এই আত্ম-অপর দ্বন্দ্বেই পুষ্ট হয়েছিল।

কলিন্স যেসময়ে তাঁর উপন্যাসটি লিখছেন সেই ১৮৬০-এর দশকেই ক্রমে অবচেতন মনস্তাত্ত্বিক চর্চার সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সম্পর্ক আলোচিত হতে শুরু করে। কলিন্সের উপন্যাসে হিন্দু দেবতার মাথার মণি, জাদুকরবেশী তিন ব্রাহ্মণ, আফিম— সবই যেন এক রহস্যময় অবচেতনের জগৎ, যার স্থানিক অবস্থান প্রাচ্য। তবে, আফিম সেবনে যে কেবল ক্ষতি হয় তাই নয়, তাতে যে বৌদ্ধিক উদ্দীপনা তৈরি হয় তা নিয়েও ব্রিটিশ সমাজে চর্চা আগেই শুরু হয়ে গেছিল। আফিম নিয়ে ইংরেজ সমাজের এই প্রশ্রয় ও সংশয়ের ইতিহাস ধরে পিছনে গেলে দেখা

---

[42] Anne McClintock, *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest* (New York : Routledge, 1995), পৃ. ২১৯-২২৩

যাবে যে, উনিশ শতকের গোড়ায় শুরুয়াদ হয়েছিল অল্পস্বল্প আফিম সেবন দিয়ে। যেমন, বিখ্যাত আফিমমোদী কবিবর কোলরিজ নাকি সপ্তাহে দুই পাউন্ড দশ শিলিংয়ের আফিম সেবন করতেন।[43] ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে টমাস ডি কুয়েন্সি (১৭৮৫-১৮৫৯) বেনামে দ্য লন্ডন ম্যাগাজিনে *Confessions of an English Opium-Eater* শিরোনামে একটি আত্মজৈবনিক রচনা লেখেন, যা পরের বছরে বই হয়ে বেরোয়। সেই লেখায় ডি কুয়েন্সি সচেতন সত্তা হিসাবেই বিকল্প চেতন-পরিসরের অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য আফিম সেবনে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। উপরন্তু, ইংরেজ আফিমখোর যে অন্যান্য জাতির আফিমসেবীর থেকে উৎকৃষ্ট ও পৃথক, তাও তিনি জানাতে ভোলেননি। তুর্কি আফিমখোর যেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, ইংরেজ ডিকুয়েন্সি কিন্তু আফিম সেবন করেও তেমন কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাননি, বরং তিনি যে কঠোর বৌদ্ধিক চর্চায় মগ্ন থাকার পাশাপাশি মাঝেমধ্যে একটু অবসর যাপনের অঙ্গ হিসাবে আফিম নিতেন সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

উল্টোদিকে, ইংরেজ সমাজে আফিম সেবনের প্রতি যে নানান নেতিবাচক মনোভাব ছিল তার হরেক প্রমাণ আছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আফিমের নেশা যেভাবে সমগ্র চিন্তনকে আচ্ছন্ন করে তার সঙ্গে উপন্যাস বা নভেল পাঠের নেশার একটা তুলনা শুরু হয়েছিল। আলোকবর্তিকা-ধৃত শুশ্রূষাকারিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নিজেই একজন ঔপন্যাসিক হয়েও নভেল পড়াকে আফিম সেবনের মতোই ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর সমালোচনার মূল লক্ষ্য ছিল সেই 'অলস' রমণীরা যাদের 'জীবন আফিম কিংবা উপন্যাসের ভরে কাটত'— "They are exhausted, like those who live on opium or on novels, all their lives-exhausted with feelings which lead to no action".[44] এহেন নভেল-নেশার দাওয়াই হিসাবে নাইটিঙ্গেলের প্রস্তাব ছিল এমন এক কর্মব্যস্ত জীবন যা আকর্ষণীয় হবে এবং সারাক্ষণ আত্মোন্নতিতে মগ্ন থাকবে। বস্তুত, নভেল পাঠের সঙ্গে নেশার তুলনা ঔপনিবেশিক বঙ্গসমাজেও প্রচলিত ছিল। আফিম সম্পর্কে এহেন সমালোচনায় ওয়াকিবহাল ডি কুয়েন্সি লিখেছেন যে, চড়া হারে আফিম সেবন না-করে যদি অবসর যাপনের অঙ্গ হিসাবে আফিম গ্রহণ করা হয় তবে তাতে বেশ উদ্দীপ্ত বোধ হয়: " I took opium at intervals, the day succeeding to that on which I allowed myself this luxury was always a day of unusually good spirits." সেই উদ্দীপনার তূরীয় পর্যায়ে যে বৌদ্ধিক উৎকর্ষের অনুভব হয়— "the great light of the majestic intellect"— তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ডি কুয়েন্সি।[45] আত্মজৈবনিক আখ্যানের মধ্যে ডি কুয়েন্সি যেভাবে ইংরেজ আফিমসেবীর প্রত্যক্ষজ উপলব্ধি ও বৌদ্ধিক ধারণক্ষমতার বৃদ্ধি সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, তার মধ্য দিয়ে ইংরেজ বৌদ্ধিকতার সঙ্গে আফিমের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

---

[43] Hans Derks, *History of the Opium Problem. The Assault on the East, ca. 1600-1950* (Liden & Boston : Brill, 2012), পৃ. ১১৩

[44] Florence Nightingale, *Suggestions for Thought*, Collected works of Florence Nightingale ; V. 11, Ed. Lynn McDonald (Canada : Wilfrid Laurier University Press, 2008), পৃ. ৫৭২

[45] Thomas de Quincey, *Confessions of an English Opium-Eater* (Transcribed from the 1886 George Routledge and Sons edition), ePub edition.

সেই যোগসূত্রের হাতেগরম প্রমাণ কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসে উইলিয়ম বেঞ্জামিন কারপেন্টরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি। ব্রিটিশ চিকিৎসক, প্রাণিবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা বিশেষজ্ঞ কারপেন্টর (১৮১৩ – ১৮৮৫) তাঁর রচনায় ডি কুয়েন্সির বক্তব্য উদ্ধৃত করে আফিম সেবনে স্মৃতি ও নীতির উদ্বোধনের প্রমাণ দিয়েছিলেন।[46] সেই বিশেষজ্ঞ কারপেন্টরের বক্তব্য পেশ করে উপন্যাসের চরিত্র এজরা জেনিংস প্রমাণ করেন যে, ব্লেক আফিমের ঘোরে অসচেতনভাবে ভেরিন্ডার পরিবারের রত্ন কুক্ষিগত করেছিল।[47] খেয়াল করার বিষয়, পুলিশ গোয়েন্দা কাফ নয়, রত্ন-রহস্য আসলে সমাধান করে ইউরেশীয় আফিমসেবী জেনিংস। সেই জেনিংসের মাধ্যমে কারপেন্টরের বক্তব্য পেশ করে কলিন্স ব্লেকের কৃতকর্মের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যেখানে শরীরে উপরে মনের আধিপত্য স্বীকৃত হয়েছে, কারণ মনই পারে সূক্ষ্ম চিন্তা করতে, ভাবতে এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হতে। প্রকৃতপক্ষে, রত্নটির গতিবিধি সংক্রান্ত রহস্যের থেকেও ব্লেকের কাছে তার নিজের অবচেতনের গতিপ্রকৃতির রহস্য মুখ্য হয়ে উঠেছিল। বস্তুত, মন, অবচেতন ও নেশা সম্পর্কে কারপেন্টরের যে তত্ত্ব-কাঠামো তার নিরিখে *The Moonstone* উপন্যাসের বিভিন্ন মনস্তত্ত্বীয় ঘটনাসমূহের বিশ্বাসযোগ্য কার্যকারণ দেখানো যেতে পারে, এবং কলিন্স নিজেও সরাসরি কারপেন্টরকে উদ্ধৃত করার মাধ্যমে সাহিত্যগত ও বৈজ্ঞানিক নানান প্রতর্কের সম্মিলনে মন ও নেশার সম্পর্ক বিষয়ে সামাজিক জ্ঞান নির্মাণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ইউরেশীয় জেনিংসের পরিচিতির মধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং সেই ব্যক্তি পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকতায় দীক্ষিত হলেও রহস্য সমাধান করতে পেরেছিল প্রাচ্যবাদী সম্মোহনের জেরে। জেনিংসের কাজে বাহ্যত বৈপরীত্য থাকলেও, অন্তরে রহস্যভেদ ও সম্মোহন একই জ্ঞানতত্ত্ব-উদ্ভূত যমজ। আবার উল্টোদিকে, কারপেন্টরও তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নৈর্ব্যক্তিক প্রমাণ হিসাবে ডি কুয়েন্সি আত্মজৈবনিক বক্তব্য উদ্ধার করছেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আফিম সেবন ও তার ফলাফল বিষয়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের গাঁটছড়ার মধ্যে দিয়ে সামাজিকভাবে একটি প্রতর্ক গড়ে উঠছিল।

বস্তুত, শতক যত গড়াতে থাকে ততই একদিকে ব্রিটিশ জনসংখ্যা বাড়তে থাকে ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে আফিম সেবনের মাত্রা। তার ফলে, আফিমের দল ও প্রতিপক্ষের মধ্যে রীতিমত কোমরবেঁধে সংঘাতের ভিত তৈরি হতে থাকে। সেই সংঘাতে চিকিৎসাশাস্ত্রীদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। রাজনীতির কারবারি ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের পাশাপাশি ছিলেন নামজাদা চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞের দল। তাঁদের অন্যতম এডিনবরার মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক স্যর রবার্ট ক্রিস্টিসন (১৭৯৭-১৮৮২) স্বয়ং একদা আফিম সেবন নিয়ে গবেষণা করেন ও কোকা চর্বণের সুফল সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু, ক্রমে কেবল এই বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদের চোখেই যে শুধু আফিমের নেশা সর্বনাশা বলে ঠেকতে লাগল এমন নয়। বরং, নবোত্থিত শিক্ষিত ভদ্রবিত্ত শ্রেণির দিক থেকেই

---

[46] William Benjamin Carpenter, *Principles of Mental Physiology* (London: Appleton, 1883), পৃ. ৩৯৩

[47] "Here,… is the physiological principle on which I am acting, stated by no less a person than Dr. Carpenter. Read it for yourself." এই বলে জেনিংস মার্কাদেওয়া বইটি ব্লেকের হাতে দেয়। ব্লেক দেখে সেই বইতে লেখা আছে: "There seems much ground for the belief, that every sensory impression which has once been recognised by the perceptive consciousness, is registered (so to speak) in the brain, and may be reproduced at some subsequent time, although there may be no consciousness of its existence in the mind during the whole intermediate period." দ্রষ্টব্য: Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত

উচ্চাঙ্গের আফিমচর্চায় আঘাত এসেছিল। শহরের শ্রমিক-অধ্যুষিত ঘিঞ্জি মহল্লাগুলিতে গজিয়ে ওঠা আফিমের ঠেক একাধারে স্বাস্থ্য সংকটের সঙ্গে ভদ্রবিত্তের শ্রেণিগত উন্নাসিকতারও রোষে পড়েছিল। ফলে, ব্রিটিশ সরকারের আর চোখ বুজে থাকার উপায় ছিল না। সেই তৎপরতার ফলে ভারতীয় উপনিবেশে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের বছরেই ইংল্যান্ডে বিষ বিক্রির উপরে নজরদারির জন্য একটি সিলেক্ট কমিটি তৈরি হল এবং ঠিক যে বছরে কলিন্স তাঁর উপন্যাসে আফিমের একটু-আধটু যশোকীর্তন করলেন, সেই ১৮৬৮তেই চালু হল ফার্মেসি আইন। সেই আইন মোতাবেক ওষুধ ব্যবসায় নানান নিয়ন্ত্রণ জারি হল, ওষুধ বেচাকেনায় প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্রর মৌরসিপাট্টা জাঁকিয়ে বসল এবং ওষুধ হোক বা বিষ কিংবা আফিম ও আফিমযুক্ত অন্যান্য ওষুধ সবকিছুর বিক্রির জন্যই দোকান নির্দিষ্ট হয়ে গেল।[48]

১৮৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্রিটিশ চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণায় বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে আফিমের পাশাপাশি কোকেনের প্রয়োগ বিষয়েও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকে। ডয়েল নিজে যেহেতু ডাক্তার ফলে ঐসব রচনাদি তাঁর গোচরে থাকা স্বাভাবিক। তিনি নিজেও নাকি ওষুধ নিয়ে নানান পরীক্ষা করতেন। তবে, এরও কয়েক দশক আগে থেকেই কোকেন নিয়ে ইওরোপে বিশেষত জর্মনি ও ইতালিতে বৈজ্ঞানিক চর্চা শুরু হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে জর্মন রসায়নবিদ ফ্রিডরিশ গেয়র্গ কার্ল গেডক (১৮২৮–১৮৯০) প্রথম কোকা পাতা থেকে কোকেনের উপক্ষার বা alkaloid আলাদা করেন ও তার নাম দেন ইরিথ্রক্সিলন (erythroxylon)। এর পাঁচ বছর পরে আরেক জর্মন রসায়নশাস্ত্রী অ্যালবার্ট ফ্রিডরিশ এমিল নিমান (১৮৩৪ – ১৮৬১) কোকেন নামটি দেন। প্রায় একই সময়ে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কোকেন বিষয়ে গবেষণা করেন ইতালির স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিদ ও নৃতাত্ত্বিক পাওলো মানতেগাৎসা (১৮৩১-১৯১০)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোকেন একটি চমৎকার ঔষধ এবং তাঁর 'Sulle Virtù Igieniche e Medicinali della Coca e sugli Alimenti Nervosi in Generale' ('On the hygienic and medicinal properties of coca and on nervous nourishment in general') প্রবন্ধে কোকেনের চেতনা-উদ্দীপক শক্তির গুণগান করেন।

যেইমাত্র কোকেনকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আলাদা করা সম্ভব হল, তখনই তার ব্যক্তিগত ব্যবহার ও তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলতে থাকল। তরুণ বয়সে সিগমুন্ড ফ্রয়েডও (১৮৫৬-১৯৩৯) কোকেন-চর্চায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণা ও রচনার মাধ্যমে কোকেন একটি জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়। কোকেন-কেন্দ্রিক রচনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালের হাউস অফিসার ডাক্তার ফ্রয়েড ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'Über Coca' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখে সোৎসাহে জানান যে, ক্লান্তি, অবসাদ, স্নায়বিক উত্তেজনা ও স্নায়ুর চাপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোকেনের নিরাময়ী ভূমিকা দেখা যায়, উপরন্তু মর্ফিন ও মদের নেশা কাটাতেও কোকেন কার্যকর। বস্তুত, ফ্রয়েডের প্রবন্ধটি মানবশরীরে কোকেনের প্রভাব

---

[48] এই বিষয়ে সবিস্তার আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Virginia Berridge and Griffith Edwards, *Opium and the People: Opiate Use in Nineteenth-Century England* (New Haven and London: Yale University Press, 1987[1981])

সম্পর্কে চূড়ান্ত গবেষণা বলে বিবেচিত হত— "the definitive description of the effects of cocaine in humans". উক্ত প্রবন্ধে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষপাদ পর্যন্ত কোকেন সেবন ও সেই বিষয়ে গবেষণার ইতিহাস আলোচিত হয়েছিল। ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় ফ্রয়েড কোকেন সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করেছিলেন। জানা যায় যে, ১৮৮৪ সালের ২১ এপ্রিল ফ্রয়েড তাঁর প্রেয়সী মার্থা বার্নেসকে লেখা এক চিঠিতে প্রথম কোকেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছিলেন যে তিনি এর মধ্যে একটি আশার সন্ধান পেয়েছেন— "therapeutic project and a hope".[49]

কিন্তু, দ্রুতই আফিমের মত কোকেনের সম্পর্কেও এই উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফ্রয়েডের মতই আরেক জর্মন চিকিৎসক ফ্রিডরিশ অ্যালব্রেখট এরলনমায়ার (১৮৪৯-১৯২৬) প্রাথমিকভাবে কোকেনের নিরাময়ী ভূমিকায় চমকিত হলেও পরবর্তীকালে স্পষ্ট কোকেন-বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং ঘোষণা করেন যে, মানুষের ভোগান্তির তিনটি কারণ— মদ, আফিম ও কোকেন। বস্তুত, তাঁর মতে আফিম ও মদের পরেই কোকেন হল মানব সভ্যতায় তৃতীয় অভিশাপ— 'third scourge of mankind'.[50] এরলনমায়ারের লেখাপত্র ১৮৮০-র দশকের শেষ দিকে ইংরেজি তরজমা হয়ে গেছে, এবং সেখানে তিনি মর্ফিনের নেশা কাটানোর দাওয়াই হিসাবে কোকেনের ব্যবহার ও কোকেন সম্পর্কে ফ্রয়েডের ইতিবাচক লেখাপত্রকে তুলোধনা করেন। ১৮৮৯ সালে এরলনমায়ারের লেখার ইংরেজি তরজমায় অনুবাদক তাঁর মুখবন্ধে লিখছেন যে, মর্ফিন সেবন আধুনিক জীবনযাপন-সঞ্জাত 'অসুখ'। তাঁর মতে, আফিম সেবনের নেশা বহুদিন ধরেই প্রাচ্যে থাকলেও, পাশ্চাত্যে তার প্রসার বিশেষ ছিল না। কিন্তু, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আবিষ্কারের পরেই আধুনিক জীবনযাপনে মর্ফিন সেবনের অসুখ চালু হয়েছে এবং মদের নেশা ছোটোলোকদের মধ্যে যেমন বেশি দেখা যায়, তেমনই উচ্চশ্রেণির লোকেরা মর্ফিন সেবনে আসক্ত।[51]

উনিশ শতকী ইংল্যান্ডে নেশার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, আফিম সম্পর্কে ইংরেজ জনতার দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে বদলে গিয়েছিল। শতাব্দের প্রথমদিকে যথেচ্ছ আফিম সেবন নিয়ে তেমন কোনো নেতিবাচক ধারণা ছিল না তা ডিকুয়েন্সির বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়। কিন্তু, ১৮৯০-এর দশকে অর্থাৎ শতাব্দের একেবারে শেষদিকে ইংরেজ ভিষগবৃন্দ

---

[49] ফ্রয়েডের প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রথম উদ্ধৃতিটির সূত্র: C.V. Dyke, 'Cocaine' in *Substance abuse: Clinical problems and perspectives*, edited by J. Lowinson. & P. Ruia. (Baltimore: Williams and Wilkins, 1981), পৃ. ১৫৯। মার্থা বার্নেসকে লেখা চিঠির উদ্ধৃতির সূত্র: Sigmund Freud, *Cocaine papers,* ed. Robert Byck (New York: Stonehill Publishing Company, 1974) পৃ. ৫। এই উভয় সূত্র, ফ্রয়েডের মূল প্রবন্ধ ও সেই সম্পর্কিত সম্পাদকীয় আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: 'Uber Coca: Freud's Cocaine Discoveries' in *Journal of Substance Abuse Treatment*, Vol. I, 1984. পৃ. ২০৫-২১৭। পাশাপাশি, আফিম ও অন্যান্য নেশার দ্রব্য সম্পর্কে উনিশ শতকীয় ইংরেজ সমাজের ধ্যান-ধারণার বিবর্তন বোঝার জন্য দেখা যেতে পারে: Virginia Berridge and Griffith Edwards, *Opium and the People: Opiate Use in Nineteenth-Century England*, প্রাগুক্ত। এই বইতে আলোচ্য প্রসঙ্গে কোকেন সম্পর্কে বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য পৃ. ২১৫-২২৪

[50] Albrecht Erlenmeyer, 'The morphia habit and its treatment', Journal of Mental Science, 34 (1888-9) পৃ. ১১৬। এই সূত্রটি গৃহীত হয়েছে: Virginia Berridge and Griffith Edwards, *Opium and the People: Opiate Use in Nineteenth-Century England*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

[51] এই প্রসঙ্গের জন্য দ্রষ্টব্য: Albrecht Erlenmeyer, *On the treatment of the Morphine habit* (Michigan, 1889)- বইটিতে অনুবাদকের ভূমিকা অংশটি। প্রসঙ্গত, *The Sign of Four*-এর বর্ণনা মনে পড়তে পারে, যেখানে হোমস তার সযত্নে রাখা মরক্কো খাপ থেকে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করে তার সূক্ষ্ম সূঁচ নিজেই নিজের হাতে ফুটিয়ে দেয়। সেই কথা মনে করে পরে গ্রাহাম গ্রিন লিখেছিলেন: "What popular author today could so abruptly introduce his hero as a drug addict without protest from his public?" গ্রিনের উদ্ধৃতির সূত্র গৃহীত হয়েছে: Alberto Manguel, *A Reading Diary* (Great Britain : Canongate, 2005), পৃ. ৯৪

আফিম ও কোকেনের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। উভয় দ্রব্যকেই অস্বাস্থ্যকর নেশা হিসাবে দেখা হতে থাকে, যে নেশা যেন উপনিবেশের অভিশাপ। এর কারণ পরিবর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গি। ভারত থেকে চীনে আফিম রফতানি সম্পর্কিত বিতর্ক, টেম্পারেন্স আন্দোলনের অভিঘাত,[52] পেশাদারি ঔষধ নির্মাতা ও চিকিৎসকদের সামাজিক প্রভাব-কর্তৃত্বের প্রসার এবং সমাজে নিহিত শ্রেণিগত পক্ষপাতদোষ— এই সমস্ত বিষয়ের সম্মিলনে আফিম ও কোকেনের মত নেশার দ্রব্য বিষয়ে ভিক্টোরীয় সমাজের মনোভাব উনিশ শতকের শেষলগ্নে বদলে গিয়েছিল।[53]

আফিম সেবনের প্রতর্কে প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রিক আইন-শৃঙ্খলার প্রসঙ্গগুলি জড়িয়ে গিয়ে ক্রমে অপরাধের সঙ্গে আফিমের সংযোগ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে *Boston Medical and Surgical Journal*-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ফ্রেডরিক হেনরি জেরিস নামের এক ডাক্তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়ার বদলে তাদের শরীরে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ দিয়ে মর্ফিন ঢুকিয়ে জীবননাশ করার প্রস্তাব দেন ও সেই কাজ কীভাবে করা যেতে পারে তার সবিস্তার খতিয়ান পেশ করেন।[54] আফিমখোরের অপরাধ প্রবণতা নিয়ে নানান চর্চা শুরু হয় এবং আফিম যে বিষ হিসাবে ব্যবহার হতে পারে তাও কথা প্রসঙ্গে আসতে থাকে। এই প্রসঙ্গটি ভাল বোঝা যাবে এর থেকে যে, গণস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ জনৈক ডাক্তার রিচার্ডসন মনে করতেন যে, আফিম ধূমপায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তার ফলে যে কেবল তারা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করে বসবে তাই নয়, সঙ্গে সমগ্র ইংরেজ জাতিকে দূষিত করবে।[55] ফলে, আফিম একটি অপরাধসংঘটনের দ্রব্য হিসাবে নিন্দিত হতে থাকে। ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৮৬৩ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে আফিম, লডনাম, ক্লোরোডাইন, মর্ফিন, কোকেন প্রভৃতি পদার্থ সেবনের ফলে আত্মহত্যা ও অন্যান্য মৃত্যুর হার ক্রমে বাড়ছিল।[56] ফলে, উনিশ শতকের শেষলগ্নে এই দ্রব্যগুলি যারা সেবন ও ব্যবহার করত তারা অপরাধী বলে চিহ্নিত হতে থাকে, কারণ সেগুলি সামাজিক প্রথানুগ নয়। আফিম ও কোকেনের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল এই সাংস্কৃতিক মনোভাবের সঙ্গে এরলনমায়ারের বক্তব্যের এবং ডয়েলের *The Sign of the*

---

[52] টেম্পারেন্স আন্দোলন মদ ও অন্যান্য নেশার দ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ বর্জন করার সামাজিক আন্দোলন। তাঁরা ব্যক্তির শরীরে, মনে, ব্যক্তিত্বে ও পারিবারিক জীবনে মদ্যপানের অপপ্রভাব প্রচার করতেন। উনিশ ও বিশ শতকে মূলত ইংরেজিভাষী কিংবা ইংল্যান্ডের উপনিবেশাধীন বিভিন্ন দেশে টেম্পারেন্স আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতে (মূলত আসামে) ঔপনিবেশিক আমলে আফিম সেবন ও তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা টেম্পারেন্স আন্দোলন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Ved Prakash Baruah, *Addicts, Peddlers, Reformers: A Social History of Opium in Assam, 1826–1947*, (PhD thesis) submitted to the Cardiff University, 2016.

[53] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Virginia Berridge and Griffith Edwards, *Opium and the People: Opiate Use in Nineteenth-Century England*, প্রাগুক্ত (বিশেষত পঞ্চম থেকে অষ্টম অধ্যায়)।

[54] Frederick Henry Gerrish, "The Hypodermic Administration of Morphine as a Substitute for Hanging in the Execution of Criminals", *Boston Medical and Surgical Journal,* Vol. 113, No. 12 (1885): 270-271 https://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJM188509171131203

[55] Hans Derks, *History of the Opium Problem. The Assault on the East, ca. 1600-1950*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

[56] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Virginia Berridge and Griffith Edwards, *Opium and the People: Opiate Use in Nineteenth-Century England*, প্রাগুক্ত (বিশেষত ৩ এবং ৪ নং টেবল দুটি), পৃ. ২৭৫-২৭৭

Four উপন্যাসে হোমসের নেশা নিয়ে ওয়াটসনের সমালোচনার কালিক সাযুজ্য লক্ষণীয়।[57] হোমসের নেশা-আসক্তিতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও হতাশ ওয়াটসন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে আজ কোনটা, মর্ফিন না কোকেন? অতঃপর, ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ওয়াটসন মর্ফিন ও কোকেনের তফাত নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে বলে যে, ঐসব নেশার দ্রব্য সেবনে হোমসের মস্তিষ্ক উদ্দীপিত হলেও আদতে তা স্থায়ী ক্ষতি করবে— "it is a pathological and morbid process which involves increased tissue-change and may at least leave a permanent weakness."[58]

বস্তুত, আফিম ও কোকেন— উভয়ই আদতে ঔপনিবেশিক পণ্য, এবং ওয়াটসনের মনে এই নিয়ে দ্বিধা নেই যে, একজন নেশাগ্রস্ত এই দুটিই যুগপৎ ব্যবহার করতে পারে। এইদিক থেকে ভাবলে স্পষ্ট হয় যে, নেশার প্রাচ্যকরণ প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রাচ্য নামের বর্গে ভারত কিংবা চীন সবই একীভূত হয়ে গিয়েছিল। 'অন্ধকার ব্রিটেন' আফিমের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এমনকী, স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলসও ইস্ট এন্ডের আফিম ঠেকে টুঁ মারেন![59] আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন ব্রিটিশ সমাজ যেন এক খল-ক্রূর প্রাচ্যের অভিশাপপাশে বন্দী। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের জনৈক ইন্সপেক্টর একটি আফিমের ঠেকে হাজির হয়ে দেখেন:

> (C)unning and artful Chinamen' and commented later on this 'oriental cunning and cruelty ... was hall-marked on every countenance ... until my visit to the Asiatic Sailors' Home, I had always considered some of the Jewish inhabitants of Whitechapel to be the worst type of humanity I had ever seen ..[60]

এই যে চীনকে প্রাচ্যের প্রতিনিধি ধরে একটি প্রাচ্যবাদী বয়ান তৈরি হয়েছিল, তার বাস্তব ভিত্তি বিচার করলে দেখা যাবে যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে চৈনিক মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় হাতে গোনা। ১৮৬১ নাগাদ সারা ইংল্যান্ডে মাত্র ১৪৭ জন চীনা বাস করতেন। কুড়ি বছর পরে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৬৬৫ জন। আর যে সময়ে হোমস-ওয়াটসন চতুর্ভুজের রহস্য ভেদ করছে, সেই ১৮৯০-এর দশকে মাত্র ৩০২ জন চৈনিক মানুষ স্থায়ীভাবে

---

[57] Virginia Berridge ও Griffith Edwards আফিমের নেশা সংক্রান্ত এই উদ্বেগ প্রসঙ্গে তাঁদের আলোচনার ভূমিকায় লিখেছেন: "The medical dimension to the "problem" of opium use was more than a case of professional strategy. There is a danger, in stressing the theme of professionalization in connection with narcotics, that doctors come to be seen as some autonomous body, working out their designs on opium in an isolated way. ... For in reality the medical profession merely reflected and mediated the structure of the society of which it was the product. ... This was at its clearest in the new ideological interpretation of narcotic use which began to be established in the last quarter of the century".উনিশ শতকে যেভাবে সমাজের "strict, militant, dogmatic medicalization" হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে মিশেল ফুকোর বিশ্লেষণের খেই ধরে বলা যায় যে, "Homosexuality, insanity, even poverty and crime were re-classified in a biologically determined way. Concepts of addiction ... of "inebriety" or "morphinism" ... were part of this process. These emphasized a distinction barely applied before between what was seen as "legitimate" medical use and "illegitimate" non-medical use ... the "disease model" of addiction arose through the establishment of the medical profession in society ... The "problem" of opium use found a major part of its origin in ... this form of ideological hegemony ... The moral prejudices of the profession were given the status of value-free norms." দ্রষ্টব্য: Virginia Berridge and Griffith Edwards, *Opium and the People: Opiate Use in Nineteenth-Century England*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxix-xxx.

[58] এই মন্তব্যটি *The Sign of Four* উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে আছে, যার শিরোনাম 'The Science of deduction'. দ্রষ্টব্য: Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes,* Vol. 1 (New York: Barnes & Noble, 2003), ePub edition

[59] Hans Derks, *History of the Opium Problem. The Assault on the East, ca. 1600-1950*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[60] তদেব, পৃ. ১১৭-১২০

ইংল্যান্ডে বাস করত, বাকি ২৮০ জনের ছিল স্বল্পমেয়াদি ভিসা। তাই জনৈক আলোচক এই সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে প্রশ্ন তুলেছেন: "Was this racism largely a reproduction of a bad British conscience?[61]

কোকা ততদিনে নেশার দ্রব্য অতএব আফিমের স্বগোত্রীয় হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ্যবইতে ঠাঁই পেয়েছে। তার মাধ্যমে দুই ভিন্ন মহাদেশে উদ্ভূত দুটি ভিন্ন নেশার দ্রব্য ব্রিটিশ উপনিবেশ নামের এক উচ্চতর অভিন্নতায় একীভূত হয়ে গেছে— যার মাধ্যমে একদিকে সে-দুটির জৈব-রাসায়নিক পার্থক্য ও অন্যদিকে তাদের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক তফাত মুছে গিয়ে উভয়েই চারিত্র্যলক্ষণে হয়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক পণ্য, যা সাম্রাজ্যের প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসে থাবা বসিয়েছে, কেবল ব্যক্তি মানুষের শরীরে-মনে নয়, ব্রিটিশ সভ্যতার অন্দরেই। প্রসঙ্গত, হোমসের মধ্যে এক বিষণ্ন নায়কের সন্ধান পেয়েছেন আলবের্তো ম্যাঙ্গোয়েল, যে নায়ক জাগতিকতার বদ্ধতায় হাঁফিয়ে উঠেছে, তার নিজের অস্তিত্বই যেন বেদনাময়। জর্মন দর্শনে একেই বলে ভ্বেলৎসমার্জ (Weltschmerz), যার উদাহরণ হিসাবে ফাউস্টের সঙ্গে হোমসের বক্তব্যের তুলনা করে ম্যাঙ্গোয়েল সেই আস্তিত্বিক প্রশ্নের দিকে নজরটান দিয়েছেন। পাশাপাশি, হোমসের চরিত্রের মধ্যেই ইতি ও নেতির যেন একত্র সন্নিবেশ ঘটেছে, যেখানে ইতির পাল্লা ভারি হলেও, নেতির সম্ভাবনা নিহিত ছিল। তাই, আইনরক্ষক হোমস চাইলে অদ্বিতীয় অপরাধীও হতে পারত। তদন্তের স্বার্থে হোমস মাঝেমধ্যে নৈতিক-অনৈতিকের আপাত বিভাজন ধূসর করে দেয়, মিথ্যে বলে কিংবা ছদ্মবেশে খবর সংগ্রহ করা অথবা চুপিসারে অন্যের বাড়িতে ঢুকে পড়া প্রভৃতি কাজ বাহ্যত নীতিসঙ্গত না-হলেও পাঠক সেগুলি গোয়েন্দাপ্রবরের গুণপনা বলেই বিচার করে। তাই ম্যাঙ্গোয়েল বলেন: "These acts are transgressions of manners more than morals, and Holmes is willing (the reader accepts this) to break the social code."[62] সেই আদিম, সাংঘাতিক প্রাচ্যোদ্ভূত নেশার কবলে পড়ে প্রভু ও প্রজার থাকবন্দী সম্পর্ক যেন উল্টে যাচ্ছিল— ঔপনিবেশায়িত জগতের আফিম বা কোকেনের দাস হয়ে উঠছিল প্রভুত্ব-আরোপী ব্রিটিশ সমাজ।[63] ব্রিটিশ-সমাজ-শরীরে উপনিবেশ বিস্তারের এহেন কুফল ততদিনে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। হোমস-বান্ধব ডাক্তার ওয়াটসনের জবানিতে সেই দুশ্চিন্তাই ব্যক্ত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসকের মাতৃরাষ্ট্রে আফিম নিয়ে এই উদ্বেগ-সংশয়ের প্রভাব উপনিবেশে আদৌ কতটা পড়েছিল সেই দিকটাও বিচার করা দরকার। ১৮৮০-র দশকে কলকাতা ও বোম্বাই থেকে ফি বছরে প্রায় ৫৪০০

---

[61] তদেব

[62] Alberto Manguel, *A Reading Diary*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-১০৫

[63] একই দ্রব্যের যে এই অমৃত/গরলসুলভ দ্বিত্ব একেই দেরিদা একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর "Plato's Pharmacy" রচনায়। সেখানে তিনি এই ঔষধ/গরল দ্বিত্বকেই pharmakon-এর অন্তর্নিহিত চরিত্র বলেছেন। নিরাময়ের উপায় হিসাবে ফার্মাকন শরীরে মিশে গিয়ে পূর্বঘটিত ব্যাধি বা ক্ষত সারিয়ে তোলে। কিন্তু একই সঙ্গে তা ক্রমে শরীরে নিজস্ব কার্যকরতা কমিয়ে শারীরিক স্বনির্ভরতার ঘাটতি তৈরি করে, যে ঘাটতি ঐ ফার্মাকন দিয়েই পূরণ করা হবে। এইভাবে ফার্মাকন আদতে একই সঙ্গে ভাল ও মন্দের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান তৈরি করে, যা নিয়ে সবসময়েই একটা ধন্দ ('ambiguous') থেকেই যায়। তা শরীরে একবার ঢুকতে শুরু করলে সেখানেই স্থায়ী হয়ে যায়। ফার্মাকন আদতে এমন এক বিষ যার উপরে সত্তা ক্রমে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দেরিদা বলছেন: "The pharmakon is that dangerous supplement[46] that breaks into the very thing that would have liked to do without it…"। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Jacques Derrida, 'Plato's Pharmacy' in *Dissemination*, Translated with an Introduction and Additional Notes by Barbara Johnson (Chicago: The University of Chicago Press, 1981) (EPub edition).

মেট্রিক টন আফিম ৯০ হাজার বাক্সবন্দী হয়ে সাগর পাড়ি দিত। তার বিনিময়ে ঔপনিবেশিক শাসকের ভাণ্ডারে বিপুল অর্থ জমা পড়ত, যা মোট রাজস্বের প্রায় ১৬ শতাংশ।[64] এহেন বিপুল আফিম বাণিজ্য নিয়ে ব্রিটেনের ইংরেজ সমাজে যখন গেল গেল রব ওঠে তখন গ্ল্যাডস্টোনের (১৮০৯-১৮৯৮) প্রধানমন্ত্রীত্বে ব্রিটিশ আইনসভা ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে Royal Commission on Opium, অর্থাৎ আফিম বিষয়ে ছানবিন করার জন্য রাজকীয় অনুসন্ধান দল গঠন করে। চীনে আফিম রফতানির ঔচিত্য, বা ভারতে ওষুধ ব্যতিরেকে অন্যক্ষেত্রে আফিম চাষ ও সেবন বন্ধ করার প্রয়োজন— এইসব ছিল ঐ কমিশনের বিবেচ্য।[65] মহারানি ভিক্টোরিয়া-কর্তৃক নিযুক্ত ঐ কমিশনের প্রধান ছিলেন ব্যারন টমাস ব্রাসি (১৮৩৬-১৯১৮)। তাঁর সহযোগী দলে ইংরেজদের পাশাপাশি দুজন ভারতীয়দের নিয়োগ নিয়ে কথা উঠতেই বাংলা প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এ পি ম্যাকডোনেল বড়লাট ল্যান্সডাউনকে বলেন যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের এই কমিশনে নিয়োগ করা উচিত নয়। কারণ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কিংবা রমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বাঙালিরা বিলেতে ওঠা আফিম-বিরোধী ধুয়ো সমর্থন না-করলেও, সেই ধুয়ো তোলা র‍্যাডিকাল ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের চটাতে চান না, কারণ তাঁদের অনেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল।[66] সত্যি বলতে কী, ভারতীয় মালিকানাধীন ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলিতেও আফিম-বিরোধিতা নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছিল। ১৮৯৫-এর ১১ মে *The Madras Hindu* স্পষ্টই ঘোষণা করেছিল যে, "Opium may be a great evil, but national bankruptcy is a greater evil".[67] শেষ পর্যন্ত, ম্যাকডোনেলের পরামর্শে বড়লাট দ্বারভাঙ্গার রাজা ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে (১৮৫৮-১৮৯৮) সদস্য হিসাবে মনোনীত করেন। অপর ভারতীয় সদস্য ছিলেন জুনাগড় রাজ্যের প্রাক্তন দেওয়ান হরিদাস বেহারিদাস দেশাই (১৮৪০-১৮৯৫)।

বিস্তর সাক্ষ্য-সংগ্রহ করে কমিশন ১৮৯৫ সালে তার প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু, খেলা সেখানেই ঘুরে যায়। আফিম নিয়ে ইংরেজ সমাজের একাংশ যতই নেতিবাচক প্রচার করুক না-কেন; পুঁজির ক্ষমতার সামনে সবাই নতজানু হয়ে পড়ে। কমিশনের প্রতিবেদনে স্পষ্ট বলা হয়:

> As the result of a searching inquiry, and upon a deliberate review of the copious evidence submitted to us, we feel bound to express our conviction that the movement in England in favour of active interference on the part of the Imperial Parliament for the suppression of the opium habit in India, has proceeded from an exaggerated impression as to the nature and extent of the evil to be controlled. The gloomy descriptions presented to British audiences of extensive moral and physical

---

[64] John F. Richards, "Opium and the British Indian Empire: The Royal Commission of 1895", *Modern Asian Studies*, Vol. 36, No. 2 (May, 2002), পৃ. ৩৭৫-৪২০।URL: https://www.jstor.org/stable/3876660

[65] John F. Richards, তদেব এবং Amar Farooqui, "Opium as a household remedy in nineteenth-century western India?" in *The Social History of Health and Medicine in Colonial India*, edited by Biswamoy Pati & Mark Harrison (London & New York : Routledge, 2009), পৃ. ২২৯-২৩৭

[66] John F. Richards, তদেব, পৃ. ৩৯১-৩৯২

[67] তদেব, পৃ. ৩৮১

> degradation by opium, have not been accepted by the witnesses representing the people of India, nor by those most responsible for the government of the country.[68]

উইলিয়ম হান্টারের প্রিয়পাত্র, ঔপনিবেশিক গেজেটিয়ার বিভাগের কর্মচারী এবং পরবর্তীকালে কৃষি দফতর ও রাজস্ব দফতরে উচ্চপদাসীন টি এন মুখার্জিকে যখন উক্ত কমিশন আফিম ব্যবহার রদ প্রসঙ্গে মতামত জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি স্পষ্টই বলেন, আফিমের থেকে অনেক বেশি ক্ষতিকর হল মদ। বরং, আফিম গরিব মানুষের প্রাণের আরাম। এই বলে, মুখার্জি তাঁর নিজেরই একটি লেখা কমিশনের সামনে পড়ে বলেন যে, একটা বয়সের পরে আফিম খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বরং মদ ছেড়ে ইংরেজদের আফিম সেবন করাই উচিত, এবং বিলিতি আফিম সংস্কারকদের উচিত তাদের স্বদেশে সকলকে মদের বদলে আফিমসেবী করে তোলা।[69] তাঁর এই প্রস্তাবকে গল্পেও তুলে ধরেছিলেন টি এন মুখার্জি অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাই লুল্লু ও আমীর একযোগে চণ্ডুপান করে, লম্বোদরের ইয়ারবক্সি ফরাশডাঙার নয়নচাঁদ গুলিসেবনে ওস্তাদ।[70] এক্ষেত্রে একই বস্তু আফিম নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিতের সমাজে ভিন্ন মনোভাবের প্রসঙ্গটি খেয়াল করা দরকার। ইংরেজি গোয়েন্দা আখ্যানে আফিম যেভাবে প্রাচ্যবাদী রহস্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রতিফলন সমকালীন শিক্ষিত ঔপনিবেশিক প্রজার মননে একইভাবে পড়েনি। কিন্তু, ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের বীজ যখন উপনিবেশের মাটির গভীরে প্রোথিত হল, ততদিনে জাতীয়তাবাদের আদর্শনৈতিক প্রতর্কে নেশার দ্রব্য ও অপরাধের গাঁটছড়া ঔপনিবেশায়িত মননেও ছাপ ফেলেছে। তাই বিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মেধাজীবী গোয়েন্দার প্রথম তদন্তই শুরু হয় কোকেনের চোরাকারবারিদের নিয়ে, প্রসঙ্গক্রমে সেখানে মর্ফিনও হাজির; তাও আবার শহর কলকাতার চীনেপাড়ার গা ঘেঁষে।[71] এভাবেই পাশ্চাত্যে নেশার ও অপরাধের সংযোগে যে প্রাচ্যবাদী প্রতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা কয়েক দশক পরে ঔপনিবেশিক মননেও প্রতিফলিত হতে শুরু করে।

উপনিবেশের দ্বিতীয় রহস্য: বিদ্রোহের ‘ষড়যন্ত্র’

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ইতিহাসের আখ্যানে ভারতে ঘটা ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সবথেকে আলোড়ন-জাগানিয়া ও আলোচিত ঘটনা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৯৭) জনপ্রিয় ইংরেজ সাহিত্যিক হিল্ডা গ্রেগ *Blackwood's Edinburgh Magazine*-এ ‘The Indian Mutiny in Fiction’ শিরোনামের এক নিবন্ধে লিখেছিলেন যে, এই শতকের (উনিশ) যত

---

[68] তদেব, পৃ. ৩৭৮

[69] তদেব, পৃ. ৪১৯-৪২০

[70] ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রচনাসংগ্রহ, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১)। লুল্লু ও নয়নতাঁদের প্রসঙ্গগুলির জন্য দ্রষ্টব্য ভূত ও মানুষ রচনাটি, পৃ. ১৩৩-২১০।

[71] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সত্যান্বেষী’, ব্যোমকেশ সমগ্র (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৭) পৃ. ২৬-৪২

বিখ্যাত ঘটনা সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে, তার মধ্যে ভারতের সিপাহি বিদ্রোহ গণমানসে গভীরতম প্রভাব বিস্তার করেছিল।[72] তার তুলনায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-১৮৫৬) প্রায় লুপ্তস্মৃতি। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে উপন্যাস, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, 'চাক্ষুষ' বিবরণ, দিনপঞ্জী, স্মৃতিকথা ইত্যাদি হরেকরকম গোত্রের রচনায় ইংরেজি সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, গ্রেগের মতে, গুণের তুলনায় ঐসব রচনার মানে ঘাটতি ছিল। এতদসত্ত্বেও, জরুরি কথা হল ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ব্রিটিশ গণমনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তার প্রসার কেবল সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তথা শাসনপ্রণালীর সামগ্রিকতার উপরে তা গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের মর্মকথা ছিল হিংস্রতা। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অনুরক্ত স্যার ফিলিপ ফান্সিস (১৭৪০-১৮১৮) মনে করতেন, ভারতে ক্ষমতার একমাত্র উৎস তরবারি, এবং সেটি অবশ্যই ব্রিটিশ তরবারি। এমনকী, ফ্রান্সিসের প্রতাপান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়ারেন হেস্টিংসও (১৭৩২-১৮১৮) অন্তত এই বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌম শাসনের আধার হল তরবারি।[73] এহেন অস্ত্রধারী শাসকের হিংস্রতার বিরুদ্ধে যদি প্রজারা হিংস্র হয়ে ওঠে, তখনই গোল বাধে; কারণ এক্ষেত্রে একতরফা উপর থেকে চাপানো হিংসাই কর্তৃত্বের দস্তুর, তার ভাগ হয় না, তার উপরে কেবল শাসকের একাধিপত্য। অতএব, নীচ থেকে তা ফিরে আসার ভাবনা শাসকের চিন্তায় আসে না। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন হিংসার সমস্ত প্রকরণের উপরে শাসকের একচ্ছত্র ও সার্বত্রিক আধিপত্যের নির্ভরেই দাঁড়িয়েছিল। তাই ১৮৫৭-র বিদ্রোহে ঔপনিবেশিক শাসকের হিংসার পাল্টা শাসিতর তরফে হিংসার প্রয়োগ ব্রিটিশ শাসনের কাছে এক গভীর দুঃস্বপ্ন বোধ হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ সভ্যতাগর্বী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-চিন্তনে কৃষ্ণত্বক প্রজার ঠাঁই নীচে। চামড়ার রং-ভিত্তিক এক উচ্চবচতা দিয়ে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্দিষ্ট— সাদা সেখানে উন্নতের প্রতীক, আর কালো হীনতার। সেই দ্বিত্বের সঙ্গে জুড়ে ছিল সভ্য/অসভ্য

---

[72] হিল্ডা গ্রেগ লিখেছিলেন: "Of all the great events of this century, as they are reflected in fiction, the Indian Mutiny has taken the firmest hold on the popular imagination." Gautam Chakravarty, *The Indian Mutiny and the British Imagination* (New York : Cambridge University Press, 2004), পৃ. ১। বস্তুত, ভারতীয় উপনিবেশে ঘটা 'মিউটিনি' সম্পর্কে বহু কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, নীতিকথায় ব্রিটিশ পাঠমহল ছেয়ে গিয়েছিল। সেগুলির মধ্য সাধারণভাবে জাতিবিদ্বেষ ও রাজনৈতিক উদ্বেগ ও অন্যান্য ভাবাগেবের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, রোমাঞ্চজাগানিয়া 'চাক্ষুষ' বিবরণগুলি— যেমন, শ্রীমতী জে. এ. হ্যারিস-এর *Ladys Diary of the Siege of Lucknow* (১৮৫৮), রবার্ট গিবনে-র *My Escape from the Mutineers in Oudh* (১৮৫৮), মোব্রে টমসন-এর *Story of Cawnpore* (১৮৫৯)— পাঠকমহলে বিপুল জনপ্রিয় ছিল। সেগুলির বয়ান লোকে সত্য হিসাবে মেনে নিত। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের লেখাও পরপর প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত চার্লস বল-এর *History of the Indian Mutiny* সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে লেখা হয়েছিল। তুলনায় পরেরদিকে লেখা স্যর জন উইলিয়ম কী-র *Sepoy War in India* (১৮৬৪-১৮৮০) কিংবা টি. রাইস হোমস-এর *History of the Indian Mutiny* (১৮৯৮) বইগুলিতে সরলীকৃত আখ্যানের পরিবরিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জটিল আবর্ত তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছিল। তবে, স্যর জর্জ ট্রেভেলিয়ন-এর *Cawnpore* (১৮৬৫) বইটি যেন এই বিদ্রোহের মহাকাব্য। সুরেন্দ্রনাথ সেন দেখিয়েছেন যে, ট্রেভেলিয়নের মহাকাব্যিক ইতিহাস ভিক্টোরীয় ইংরেজ সমাজে জনপ্রিয় হলেও, কার্যত অনির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সাক্ষ্য-উপাদান ব্যবহার করার ফলে বইটি "spun out of very flimsy material a horror story which surpasses anything in cold cruelty." এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Patrick Brantlinger, *Rule of Darkness : British Literature and Imperialism, 1830-1914* (Ithaca and London : Cornell University Press, [1988] 1990), পৃ. ১৯৯-২২৪ এবং Aishwarya Lakshmi, 'The Mutiny Novel : Creating the Domestic Body of the Empire' in *1857: Essays from Economic and Political Weekly*, ed. by Sekhar Bandyopadhyay (Hyderabad : Orient Blackswan, Reprinted 2011), পৃ. ২২৯-২৫২।

[73] ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে হাউস অব কমন্সে ফিলিপ ফ্রান্সিস মন্তব্য করেন: " There was no power in India but the power of the sword, and that was the British sword, and no other. " উদ্ধৃতির সূত্র ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Ranajit Guha, *A Rule of Property for Bengal : An Essay on the Idea of Permanent Settlement* (Ranikhet: Permanent Black & Orient Blackswn[1963]2016), পৃ. ১৯০-১৯১।

(বর্বর), ভাল/মন্দ, পরিণত মনস্ক/অপরিণতবুদ্ধি প্রভৃতি বিচিত্র রকমফের।[74] কার্যত শ্বেতাঙ্গ প্রভুর চোখে কৃষ্ণাঙ্গ প্রজা প্রায়শ মনুষ্যেতর, পশুবৎ। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে ভিক্টোরীয় ব্রিটেনের প্রায় সব রচনাতেই এই জাতিদ্বেষ স্পষ্ট। তাই ব্রিটিশ গণমনে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের কারণ ও তা দমনে নিয়োজিত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী হিংসার যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে, ১৮৫৭-র আগে ঔপনিবেশিক শাসকের সংস্কারক রূপ বিদ্রোহের পরে হারিয়ে গিয়েছিল। প্যাট্রিক ব্রান্টলিঙ্গার দেখিয়েছেন যে, বিদ্রোহের আগের ঔপনিবেশিক শাসক জাতিবিদ্বিষ্ট ছিল, কিন্তু তারই সঙ্গে এমন একটা ধারণা ছিল যে, চেষ্টা করলে এই 'পশুবৎ, অসভ্য' ভারতীয়দের সভ্যতার আলোর তলায় আনা যেতে পারে। ১৮৫৭-র ঘটনা সেই ধারণাকে ভেঙে দেয়। তারপর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরিখে ভারতকে সভ্যতামুখী করার বদলে শাসন করাই জরুরি বোধ হয়। ব্রিটিশ সাহিত্যের গভীরে নিহিত সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় ১৮৫৭-র বিদ্রোহ পরবর্তী ভারত কুসংস্কার ও হিংসাকুটিল এক পঙ্কিল আবর্ত হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল, যা অনড় এবং অপরিবর্তনীয়। তাই ভারতকে শাসন করা গেলেও তার ইষ্টসাধন সম্ভব নয়।[75]

১৮৫৭-র বিদ্রোহের কারণ নিয়ে সমকাল থেকে তার চরিত্র সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়েছিল।[76] কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটেন বসেও সকলেই ঐ বিদ্রোহকে একই চশমা দিয়ে দেখেননি। এর অন্যতম উদাহরণ ফার্স্ট আর্ল অব বেকন্সফিল্ড, যাঁকে চট করে বেঞ্জামিন ডিজ়রেলি বললেই চেনা যায় (১৮০৪-১৮৮১)। হয়ত কাকতালীয়ভাবেই ঠিক যে বছরে কলিন্সের *The Moonstone* প্রকাশিত হয়, সেই ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দেই ডিজ়রেলি প্রথমবারের জন্য ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। ব্রিটেনের রাজনীতিতে 'আধুনিক রক্ষণশীলতার রাজনৈতিক জনক' বলে খ্যাত এহেন ফার্স্ট আর্ল অব বেকন্সফিল্ডের মতে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়াতেই সিপাহিদের ক্ষোভ বিদ্রোহের চেহারা নিয়েছিল এবং ডিজ়রেলি সেইসব ঔপনিবেশিক কার্যকলাপের— "forcible destruction of native authority", "disturbance of the settlement of property," এবং "tampering with the religion of the people"— বিরোধিতা করেন।[77] রাজনৈতিকভাবে ডিজ়রেলি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর কিন্তু সমকালীন আরেক আলোচক কার্ল মার্কস। মার্কসের রাজনৈতিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি মূলত ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে

---

[74] এই জাতীয় দ্বিত্ব ও যুগ্মপদ ব্যবহারের রাজনীতি ও সংস্কৃতি কীভাবে ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে একমেবাদ্বিতীয় গবেষণা ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য (কলিকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯১)

[75] Patrick Brantlinger, *Rule of Darkness : British Literature and Imperialism, 1830-1914*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০৩।

[76] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক চর্চার সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিদ্রোহের ইতিহাস চর্চার জন্য দ্রষ্টব্য: Sekhar Bandyopadhyay (ed.), *1857: Essays from Economic and Political Weekly*, প্রাগুক্ত এবং Biswamoy Pati (ed.), *The Great Rebellion of 1857 in India: Exploring transgressions, contests and diversities* (London & New York : Routledge, 2010).

[77] ডিজ়রেলির উদ্ধৃতির সূত্র: Patrick Brantlinger, *Rule of Darkness : British Literature and Imperialism, 1830-1914*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রসঙ্গে ডিজ়রেলি মন্তব্য করেন: "The decline and fall of empires are not affairs of greased cartridges. Such results are occasioned by adequate causes, and by an accumulation of adequate causes." উদ্ধৃতির সূত্র: Grace Moore, *Dickens and Empire : Discourses of Class, Race and Colonialism in the Works of Charles Dickens* (London & New York : Routledge, 2004), পৃ. ১৩৫

গড়ে উঠেছিল।[78] সেই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যিক অর্থনীতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বস্তুত, সেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময় থেকেই ইংল্যান্ডের উপরে তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অভিঘাত নিয়ে মার্কস লিখতে শুরু করেন। ১৮৫৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর *New-York Daily Tribune* পত্রিকায় 'The Indian Revolt' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বরে লন্ডনে বসে লিখিত ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত ঐ প্রতিবেদনে মার্কস গোড়াতেই বলেন যে, ভারতে বিদ্রোহী সিপাহিরা যে অত্যাচার ঘটিয়েছে তা নিন্দনীয়।[79] কিন্তু, সেই অকথ্য নিষ্ঠুরতা যে আদতে ভারতে ইংরেজি ঔপনিবেশিক শাসন-উদ্ভূত অবিরাম হিংস্র শোষণের প্রতিক্রিয়া তা মার্কস তাঁর পাঠকের কাছে স্পষ্ট করেছেন।[80] সেই শাসন-শোষণের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস লিখছেন: "To characterize that rule, it suffices to say that torture formed an organic institution of its financial policy."[81] তাছাড়া, বিদ্রোহী সিপাহিদের তরফে নিষ্ঠুরতার উল্টোদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক দমন-পীড়নের কথাটিও তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন: "it would be an unmitigated mistake to suppose that all the cruelty is on the side of the Sepoys, and all the milk of human kindness flows on the side of the English."[82]

কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসে হার্নক্যাসেল যেমন নিজেই সঙ্গে করে বিভীষিকাসদৃশ রত্ন ভারত থেকে ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিল এবং তার পিছুপিছু হাজির হয়েছিল প্রতিশোধস্পৃহ তিন ব্রাহ্মণ, যারা পূর্বঘটিত অপরাধের শাস্তি দিয়ে হীরকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনই মার্কসও ১৮৫৭-র বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, ঔপনিবেশিক শাসিতের তরফে এই হিংস্র প্রতিশোধ আসলে ঔপনিবেশিক শাসকের ঘটানো অপরাধের শাস্তি, যে শাস্তির পটভূমি ঔপনিবেশিক শাসনে নিহিত অন্যায়ের দ্বারাই নির্মিত হয়েছে।[83] শাসকের হিংস্রতা ও তার প্রতিক্রিয়ায় শাসিতের হিংসা এবং পুনরায় তার প্রতিক্রিয়ায় আবারও শাসকের তরফে হিংসার প্রয়োগ যে চক্রাকার আবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করে সেটাই ট্যামার হেলার তাঁর *The Moonstone* সংক্রান্ত আলোচনায় খেয়াল করিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি আধিপত্যের পিছু ধাওয়া করে প্রতিরোধের সম্ভাবনা। আধিপত্য ও প্রতিরোধের চক্রাকার গতিই

---

[78] *Capital* প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশের মুখবন্ধে মার্কস স্পষ্ট লিখেছেন: "What I have to examine in this work is the capitalist mode of production, and the relations of production and forms of intercourse [*Verkehrsverhiiltnisse*] that correspond to it. Until now, their locus classicus has been England. This is the reason why England is used as the main illustration of the theoretical developments I make." দ্রষ্টব্য: Karl Marx, *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume One, Introduced by Ernest Mandel, Translated by Ben Fowkes (London : Penguin, [1976] 1982), পৃ. ৯০

[79] "The outrages committed by the revolted Sepoys in India are indeed appalling, hideous, ineffable"— এই বলে মার্কস আলোচনা শুরু করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: Karl Marx, 'The Indian Revolt', *New-York Daily Tribune*, September 16, 1857. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/09/16.htm

[80] "However infamous the conduct of the Sepoys, it is only the reflex, in a concentrated form, of England's own conduct in India, not only during the epoch of the foundation of her Eastern Empire, but even during the last ten years of a long-settled rule." দ্রষ্টব্য: Karl Marx, 'The Indian Revolt', তদেব

[81] তদেব

[82] তদেব

[83] "There is something in human history like retribution: and it is a rule of historical retribution that its instrument be forged not by the offended, but by the offender himself." তদেব (নজরটান সংযোজিত)

সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের সম্পর্কে নিহিত।[84] ভিক্টোরীয় ইংরেজ সমাজে যে অন্দরের কাঠামো তার প্রতি যেন একরকমের প্রতিরোধের সম্ভাবনা জাগিয়ে রাখেন কলিন্স। সেখানে আধুনিক ইওরোপীয় ইতিহাসচেতনায় নিহিত একরৈখিক প্রগতির ধারণার বিপরীতে এক চক্রবৎ আবর্তিত কালচেতনা ধরা পড়ে, যে চক্রবৎ পর্যায়ে আবারও ভারতে ফেরত যাওয়া হিরেটা লন্ডনে আসতে পারে এবং পুনরায় রহস্য-রোমাঞ্চকর আখ্যানটি সংঘটিত হতে পারে।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের অভিঘাতে ১৮৬০-এর দশকব্যেপে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় সাম্রাজ্যের ধারণা ব্রিটেনে প্রচারিত হতে থাকে। সেই প্রচারে জাতিবিদ্বেষময় কল্পনার ভূমিকা যেমন ছিল, তেমনই এটাও বলা হত যে, প্রায়-হাতছাড়া-হতে-বসা ঐ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই টিকে গেছে। সেই বলপ্রয়োগের যাথার্থ্য ডিকেন্স যেমন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তেমনই ক্যনান ডয়েলও সে বিষয়ে নিঃশংসয়। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ও তার অভিঘাতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আখ্যানের নিটোল বয়ান-সজ্জাটি ভেঙে পড়েছিল। সেই আখ্যানের উপরে শাসকের একচেটিয়া অধিকার চলে গিয়েছিল বিদ্রোহী শাসিতের হাতে। তাই এই প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহ সম্পর্কিত যাবতীয় বাস্তব ও কল্পনাভিত্তিক রচনায় একটাই কথা ফিরে ফিরে এসেছিল— ভারতে শাসক হিসাবে ব্রিটিশজাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতেই হবে এবং বিজেতা ও বিজিতর মধ্যে পার্থক্য-লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। সারা সুলেরি তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, এই পুনরুদ্ধারের প্রকল্প বিভিন্ন প্রতর্কের জন্ম দিয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসক-শাসিত সম্পর্ক-সঞ্জাত "আতঙ্ক" সেই প্রতর্কগুলিতে নিহিত ছিল। সুলেরির মতে সেই প্রতর্কগুলি আদতে উৎকণ্ঠার বয়ান— "narratives of anxiety".[85]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ সাম্রাজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ চিন্তনে যে সর্বনাশা সংশয়ের জন্ম দিয়েছিল তার ছাপ ডিকেন্স, কলিন্স ও ডয়েলের প্রবন্ধ এবং রহস্য-রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা সাহিত্যে পড়েছিল। রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-রহস্যে হাত পাকানোর আগে উইলকি কলিন্সও তাঁর বান্ধব চার্লস ডিকেন্সের মতোই সমকালীন পত্রিকা *Household Words*-এ ১৮৫৭-র বিদ্রোহ বিষয়ে লেখাপত্র ছাপাতেন। ডিকেন্স ইংরেজ গরিবদের সম্পর্কে যতটা সহানুভূতিশীল, ঔপনিবেশিক শোষিত প্রজা সম্পর্কে ঠিক ততটাই খড়্গহস্ত। 'অসভ্য বর্বর'দের যেনতেন প্রকারে মুছে পরিস্কার করাই ডিকেন্সের অভীষ্ট। মধ্য-উনিশ শতকে লন্ডনে আজিবোয়া ইন্ডিয়ান (১৮৪৩), বুশমেন (১৮৪৭) ও জুলু (১৮৫৩) প্রভৃতি মানুষদের নিয়ে প্রদর্শনীতে উৎসাহী জনতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। তাদের গান-নাচ-হস্তশিল্প দর্শকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। ডিকেন্স কিন্তু তাদের সম্পর্কে মোটেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেননি।

---

[84] Tamar Heller, *Dead Secrets : Wilkie Collins and the Female Gothic* (USA: Yale University Press, 1992), পৃ. ১৪২-১৬৩

[85] সুলেরির মতে সেই উৎকণ্ঠার বয়ানগুলি "emerge from such a system are consequently colonial testimonials in which aggression functions as a symptom of terror rather than of possession. Most typically, such terror translates into the ostensible unreadability of the colonized subcontinent". ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সেই দুর্বোধ্যতার ধারণাকে পোক্ত করেছিল। সুলেরির মতে, "(t)his unreadability is of course simply one instance of a discursive transfer of power, which fetishizes a colonial fear of its own cultural ignorance into the potential threats posed by an Indian alterity." দ্রষ্টব্য: Sara Suleri, *The Rhetoric of English India* (Chicago : University of Chicago Press, 1992), ePub Edition.

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে *Household Words* পত্রিকায় লেখা 'The Noble Savage' প্রবন্ধে তিনি বর্বর ও উচ্চতম সামাজিক মর্যাদার সম্মিলনে সন্দেহ প্রকাশ করে স্পষ্ট লিখেছিলেন:

> I beg to say that I have not the least belief in the Noble Savage. I consider him a prodigious nuisance, and an enormous superstition . . . I call him a savage, and I call a savage a something highly desirable to be civilised off the face of the earth.[86]

ফলে, এটা অস্বাভাবিক ঠেকে না যখন ডিকেন্স তাঁর *The Old Curiosity Shop* উপন্যাসে ক্রূর-খল চরিত্র বামন ড্যানিয়েল কুইল্পের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন: "Seated, like an African chief, on one of these pieces of matting…".[87] ডিকেন্সের মতে, দরকারে গণহত্যা ঘটিয়ে 'নিগার' ও 'নেটিভ'দের সাম্রাজ্যিক অনুজ্ঞার অধীনে আনতে হবে। গ্রেস মুর দেখিয়েছেন যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহের আগে ডিকেন্স আফ্রিকীয় 'বর্বরতা' ও ভারতীয় 'সংস্কৃতি'র মধ্যে পার্থক্য করতেন। কিন্তু, সেই তফাত ঘুচে গিয়েছিল ভারতে 'মিউটিনি'র অভিঘাতে।[88] ভারতে বিদ্রোহের 'টাটকা' খবর ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে নিত্য ছাপা হত। ডিকেন্স নিত্য তার হদিশ রাখতেন এবং মূলত বিদ্রোহ সম্পর্কে উইলিয়ম রাসেলের বয়ানে নজর রাখতেন। তাঁর মতে, রাসেলের বয়ান ছিল নির্ভরযোগ্য— "the most scholarly productions of the most deliberate historians".[89] শ্বেতাঙ্গদের উপরে ভারতীয় বিদ্রোহীদের নৃশংসতার কথা পড়ে ডিকেন্সের শরীর-মন ঔপনিবেশিক প্রজার প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে গিয়েছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর বক্তব্যে। ভারতে বিদ্রোহের সম্ভাবনার আগাম আঁচ করতে না-পারার জন্য ইংরেজ প্রশাসকদের তুলোধনা করলেও, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন যে এশীয়দের রাজত্ব থেকে শতগুণে ভাল— "immeasurably superior to any Asiatic rule"— সে বিষয়ে ডিকেন্স নিঃশংসয়।[90] ফলে, 'মিউটিনি'র অভিঘাতে সাম্রাজ্য হারানোর সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন ডিকেন্স ১৮৫৭ সালের ৪ অক্টোবরে এক চিঠিতে লেখেন যে, যদি তাঁর হাতে ভারতের দায়িত্ব থাকত তবে তিনি ভারতীয় জাতিকেই বিদ্রোহকালীন নৃশংসতার অপরাধে সমূলে ধ্বংস করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেন:

> The first thing I would do to strike that Oriental race with amazement (not in the least regarding them as if they lived in the Strand, London, or at Camden Town), should be to proclaim to them, in their language, that I considered my holding that appointment by the leave of God, to mean that I should do my utmost to exterminate the Race upon whom the stain of late cruelties rested.[91]

---

[86] ডিকেন্সের উদ্ধৃতি ও এই প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Leslie Mitchell, "Dickens and Government Ineptitude Abroad, 1854–1865" in *A companion to Charles Dickens*, edited by David Paroissien (USA: Blackwell Publishing, 2008), পৃ. ২৩৪-২৩৫

[87] তদেব

[88] মুরের বইয়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে— "A Tale of Three Revolutions: Dickens's Response to the Sepoy Rebellion" এবং "Containing Cawnpore: The Reinvention and Reinterpretation of the Indian Mutiny"— এই বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য: Grace Moore, *Dickens and Empire : Discourses of Class, Race and Colonialism in the Works of Charles Dickens,* প্রাগুক্ত

[89] ডিকেন্সের উদ্ধৃতির সূত্র: Leslie Mitchell, "Dickens and Government Ineptitude Abroad, 1854–1865", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭

[90] তদেব

[91] তদেব

ভারতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ঘটনার কথা ভেবে লেখা উপর্যুক্ত বয়ানের সঙ্গে যদি পূর্বোক্ত আফ্রিকার জনজাতি সম্প্রদায়গুলির সম্পর্কে ডিকেন্সের মনোভাব মিলিয়ে পড়া যায়, তাহলে স্পষ্ট হবে যে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রতি তাঁর মনোভঙ্গি কেবল 'মিউটিনি'র পরোক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়, বরং তার এক দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। দেশীয় সিপাহিদের 'বর্বর হিংস্রতা' ও ব্রিটিশ শাসকের শহিদত্ব বরণের নানান খোঁজখবর, কিংবা কানপুরের বাজারে ইংরেজ রমণীদের বিক্রি করার কিসসা ইংরেজ গণমনে এক তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্ম দিয়েছিল। সেই প্রতিশোধের মনোভাবে ঘৃতাহুতি দিতে কসুর করেননি ডিকেন্স। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক উপনিবেশের প্রাধান্যে মোহিত এবং ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে খড়্গহস্ত হওয়ার পিছনে সম্ভবত ডিকেন্সের একটি ব্যক্তিগত কারণও ছিল। ডিকেন্সের চতুর্থ সন্তান ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যান্ডর ডিকেন্স (১৮৪১-১৮৬৩) মাত্র ষোল বছর বয়সে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাংলা প্রেসিডেন্সির সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড থেকে রওনা দেয়। ডিকেন্সের বন্ধু ও পরামর্শদাত্রী ব্রুডেট-কাউটস-এর ফার্স্ট ব্যারনেস অ্যাঞ্জেলা জর্জিনা ব্রুডেট-কাউটস (১৮১৪-১৯০৬) বিশেষ চেষ্টা করে ওয়ালটারকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন (এই ব্রুডেট-কাউটসের আরেক বন্ধু ছিলেন টিপু সুলতান ও নেপোলিয়ন-বিজেতা আর্থার ওয়েলেসলি, ওয়েলিংটনের ফার্স্ট ডিউক)। উপনিবেশে পুত্রের পরিস্থিতি বিষয়ে উদগ্রীব ছিলেন ডিকেন্স। কারণ, অত্যধিক ঋণের বোঝায় জর্জরিত ওয়ালটার শারীরিকভাবেও সৈনিকের ধকল সামলাতে পারেনি। কিন্তু, শেষাবধি ভারত থেকে ফিরতে পারেনি ওয়ালটার ডিকেন্স। ১৮৬৩-তে মারা যাওয়ার পরে কলকাতার ভবানীপুর গোরস্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তবে, পুত্র ফিরে না-গেলেও তার বিপুল ঋণের ভার চার্লস ডিকেন্সের উপরে বর্তে ছিল।[92] এই সেই মার্কস-কথিত ঋণ যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে পাকেচক্রে জড়িয়ে ছিল।

লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহী সিপাহিদের বিরুদ্ধে যে লড়াই ইংরেজ নারী-পুরুষরা চালিয়েছিল তাতে মুগ্ধ ডিকেন্স সেই প্রাণপণ সংগ্রামকে ছাপার অক্ষরে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। বিশেষত, ভারতে ইংরেজ রমণীদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাতে উদ্যোগী হন ডিকেন্স। সেই উদ্দেশ্যে লেখা হয় *The Perils of Certain English Prisoners*, যার আখ্যান-পটভূমি এমন হবে যেখানে 'হিংস্র' আক্রমণের মুখে পড়েও ইংরেজরা লড়ে যাচ্ছে: "a few English people – gentlemen, ladies and children – and a few English soldiers, would find themselves alone in a strange wild place and liable to hostile attack".[93] খেয়াল করার বিষয় হল এই যে, ১৮৫৭-র ডিসেম্বরে *Household Words* পত্রিকার খ্রিস্টমাসের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত নভেলা ডিকেন্সের সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছিলেন উইলকি কলিন্স। এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মধ্যে এক

---

[92] ওয়ালটার ডিকেন্স বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: "The Children of Charles & Catherine Dickens: 4", https://victorianweb.org/authors/dickens/family/child4.html

[93] উদ্ধৃতির সূত্র: Leslie Mitchell, "Dickens and Government Ineptitude Abroad, 1854–1865", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

আপাত-অদৃশ্য যোগসূত্র এই লেখায় ফুটে উঠেছিল। লিলিয়ান নায়দার দেখিয়েছেন যে, ডিকেন্স চেয়েছিলেন ভারতের প্রসঙ্গ উহ্য রেখেও এমন একটি পটভূমি তৈরি করতে চেয়েছিলেন যেখানে ভারতে বিদ্রোহের সম্মুখীন ইংরেজ নারীদের বীরত্ব ফুটে উঠবে। তাই *The Perils of Certain English Prisoners*-এ ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সম্রাট দ্বিতীয় জর্জের আমলে মধ্য আমেরিকা উপকূলের এক খনি-বসতির পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সাফাই-গাওয়া নভেলার ছক কষেছিলেন ডিকেন্স, সঙ্গী ছিলেন কলিন্স।[94]

তবে, কলিন্সের বয়ান সর্বদা পুরোপুরি ডিকেন্সের ধারাপাত মেনে চলেনি। ডিকেন্স তাঁর একদা সহচর কলিন্সের প্রতি ক্রমে বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। সেই বৈরূপ্যের অন্যতম প্রকাশ ছিল *The Moonstone* সম্পর্কে প্রথমে উৎসাহী ডিকেন্সের পরবর্তীকালে নেতিবাচক সমালোচনা। তবে, সেই দ্বন্দ্বের বিভিন্ন কারণ আলোচকেরা অনুমান করেছেন। ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে লেখক হিসাবে তুলনামূলক সাফল্য ও জনপ্রিয়তাগত ঈর্ষা— সবেরই নানান পরিমাণে মিশেল ঘটেছিল।[95] কলিন্সের অন্যতম প্রামাণ্য জীবনীকার ক্যাথরিন পিটার্স স্পষ্টতই লিখেছেন যে, ডিকেন্স *The Moonstone*-এর বিপুল জনপ্রিয়তা মেনে নিতে পারেননি, যে সাফল্য এমনকী ডিকেন্সের *Great Expectations* (১৮৬১)-কেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। *The Moonstone*-এর সমালোচনা করে ডিকেন্স লিখেছিলেন: "(t)he construction is wearisome beyond endurance, and there is a vein of obstinate conceit in it that makes enemies of readers".[96]

ডিকেন্স-সুলভ জাতিবিদ্বেষের ছাপ কলিন্সের রচনায় অনুপস্থিত। কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসের হিন্দু ব্রাহ্মণত্রয়ী ডিকেন্স-বর্ণিত হিন্দু তথা ভারতীয়দের মত নয়।[97] বরং, কলিন্সের উপর্যুক্ত উপন্যাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কেন্দ্রে নিহিত হিংসা সম্পর্কে লেখকের সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু, শেষত কলিন্সও সাম্রাজ্য-বিস্তারের পক্ষেই উদারনৈতিক সাফাই গেয়েছেন।[98] আশিস রায়-এর মতে, কলিন্সীয় বয়ানের মূল কথা হল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে পাকিয়ে ওঠা বিদ্রোহের 'অসুখ' থেকে আরোগ্যলাভ, টলায়মান ক্ষমতার পুনরুদ্ধার। মহারানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারতীয় উপনিবেশে শাসকের কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কলিন্স যুক্তি সাজিয়েছেন। সেই কল্পে

---

[94] লিলিয়ান নায়দার মনে করেন যে, ১৮৫৭-র ৪ অক্টোবর ব্যারনেস অ্যাঞ্জেলা জর্জিনা ব্রুডেট-কাউটসকে লেখা সেই (কু)খ্যাত চিঠিতে ভারতীয়দের ধ্বংস করার কথা যেভাবে ডিকেন্স বলেছিলেন তার মধ্যে যেমন উপনিবেশে ঘটা আপদের প্রতিফলন ছিল তেমনই ছিল ইংরেজ সমাজ-রাজনীতিতে ঘটমান অব্যবস্থা। ঘর ও বাহির— ইংল্যান্ড ও উপনিবেশ— উভয় পরিস্থিতির আবর্তে ডিকেন্সের জাতিবিদ্বেষ গড়ে উঠেছিল। দ্রষ্টব্য: Lillian Nayder, *Unequal partners : Charles Dickens, Wilkie Collins, and Victorian authorship*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০৩

[95] তদেব, পৃ. ১৬৩-১৬৬

[96] Catherine Peters, *The King of Inventors : A Life of Wilkie Collins* (New Jersey : Princeton University Press, 1991), পৃ. ৩১০-৩১৩

[97] ডিকেন্সের মতে ভারতীয়রা হীন সারমেয়সুলভ এবং "treacherous, murderous, tigerous villains who despise you while you pay court to them, and who would rend you to pieces at half an hour's notice". ঐ একই লেখায় ডিকেন্স বিদ্রোহী ভারতীয়দের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য লর্ড ক্যানিংকে সমালোচনা করেছিলেন। চার্লস ডিকেন্সের উদ্ধৃতির সূত্র: Grace Moore, *Dickens and Empire : Discourses of Class, Race and Colonialism in the Works of Charles Dickens,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

[98] কলিন্সের জীবনীকার ক্যাথরিন পিটার্স স্পষ্টতই লিখেছেন যে, কলিন্স আদতে "a willing instrument and extension of Dickens". দ্রষ্টব্য: Catherine Peters, *The King of Inventors : A Life of Wilkie* Collins, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

কলিন্স প্রথমেই শাসিতের প্রতি প্রভুসুলভ বৈরভাব— "antagonistic Victorianism"— ত্যাগ করেছেন। ফলে, শাসক–শাসিতর দ্বিত্ববিভাজনের বদলে শাসনের আইনি নায্যতা প্রতিপাদনে বেশি জোর পড়েছে। সেহেতু কলিন্স সাম্রাজ্য-আরোপিত হিংসা গোপন করেননি, বরং শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধ-লুঠ-হত্যা সবই সেই ঔপনিবেশিক হিংসার প্রতিফলন। কিন্তু, ঔপনিবেশিক শাসনের সেই হিংস্রতাকে স্বীকার করে কলিন্স উদারনৈতিক ঔপনিবেশিকতার পক্ষে শাসিতর সম্মতি আদায়ে ব্রতী হয়েছেন।[99] বলা যেতে পারে যে, কলিন্সও সাম্রাজ্যের পক্ষেই সওয়াল করেছেন, কিন্তু ডিকন্সের কর্কশ-রুক্ষ স্বরের বদলে তাঁর স্বর অনেক উদারনৈতিক। ডিকেন্সীয় উচ্চকিত প্রতিশোধস্পৃহার সঙ্গে যদি *The Moonstone* উপন্যাসের মিলিটারি-মেজাজের 'বাজে' পুলিশ সীগ্রেভের তুলনা করা যায়, তাহলে কলিন্সের স্বস্তিবচনে শান্ত, সমব্যথী কিন্তু কর্তৃত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন ইন্সপেক্টর কাফের তুলনা হতে পারে। কাফ বকলমে কলিন্স হিংসক বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী নয়। বরং, ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনে ঔপনিবেশিক প্রজার উপরে (এবং ইংরেজ সমাজেও) একরকমের সংস্কৃত নজরদারি চালানোর মাধ্যমে জনসমক্ষে রাষ্ট্রীয় হিংসার উপকরণগুলিকে লুকিয়ে রাখা যায়, সামনে আসে তুলনায় (সু)যুক্তি-(সু)বুদ্ধি-পরিচালিত গোয়েন্দা-পুলিশ। ১৮৬০-এর দশকে ভারতে বিদ্রোহের ধাক্কা সামলে ঘুরে-দাঁড়াতে-চাওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে সেটিই ছিল অভিপ্রেত পন্থা। কলিন্স সেই পন্থারই পথিক, তাই তিনিই প্রথম সার্থক ইংরেজ গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক।

বস্তুত, কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসের আখ্যানের দুটি উপসংহার আছে বলে মনে করেন ট্যামার হেলার। একটির শেষ হয় ইংল্যান্ডে, অন্যটি ভারতে। সেই দুই উপসংহারের মধ্যে একটি চাপা দ্বন্দ্ব আছে।[100] যা কিছু 'অপর' ও প্রত্যাখ্যাত সেই সবকিছুকে চাপা দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ড-উপসংহারে। ভারতীয়দের হাতে গডফ্রে অ্যাবেলহোয়াইটের হত্যা কার্যত এটাই প্রমাণ করে যে সাহেব যদি উপনিবেশে গিয়ে 'নেটিভ' বনে যায় তবে তার কী দশা হতে পারে। কিন্তু, ঘরোয়া ইংরেজ পরিবেশের পারিবারিক শান্তি থেকে আখ্যানের ভর ক্রমে সরে যায় অন্ধকার, অজানা ঔপনিবেশিক 'অপর'-অধ্যুষিত বিদেশে, যেখানে মন্দিরের দেবতার মাথায় ফিরে যায় একদা-অপহৃত রত্ন। ইংল্যান্ডীয় আখ্যানে যবনিকা টেনে দেয় বেটারেজ, কিন্তু আরেক ইংরেজ মার্থোয়েটের জবানিতে ভারতীয় আখ্যানে একটা পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে, কলিন্স যেন তাঁর পাঠককে সাবধান করে দিতে চান যে, আবারও কোনো 'রত্ন' (পাথর হোক বা ঔপনিবেশিক ভারত) থেকে সাম্রাজ্যের বিপদ ঘনাতে পারে, তাই আত্মতুষ্টির কোনো স্থান নেই, বরং ঔপনিবেশিক প্রভুর মনে সংশয়ী উদ্বেগ জেগে থাকে: "So the years pass, and repeat each other; so the same events revolve in the cycles of time. What will be the next adventures of the Moonstone? Who can tell?"[101]

---

[99] Ashish Roy, "The Fabulous Imperialist Semiotic of Wilkie Collin's The Moonstone", প্রাগুক্ত

[100] Tamar Heller, *Dead Secrets : Wilkie Collins and the Female Gothic*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

[101] Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত

প্রকৃতপক্ষে কলিন্স কিংবা ডয়েল— উভয়ের ক্ষেত্রেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহ এমন এক সর্বজনবিদিত সূচনাবিন্দু, যা একই সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার বিপদ ও সাফল্যকে চিহ্নিত করে। *The Moonstone* উপন্যাসে সেই বিদ্রোহের উপস্থিতি পরোক্ষে থাকলেও, ডয়েলের *The Sign of Four* শুরুই হচ্ছে সেই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ডয়েল ঔপনিবেশিকতার প্রশ্নে অধিকতর আগ্রাসী এবং আলোচ্য উপন্যাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে খোলাখুলি সওয়াল করা হয়েছিল। কারণ, ততদিনে— ১৮৯০-এর দশকে— ঐক্যবদ্ধ জর্মনি ইংল্যান্ডের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু বছর জর্মনির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে বাগে রাখলেও অবশেষে চ্যান্সেলর বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) 'সূর্যের নীচে স্থান' খুঁজতে উদ্যোগী হন। আফ্রিকা মহাদেশ ধরেই সেই জর্মন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। বাস্তবত, বিসমার্ক নিজেই ১৮৮৫-র বর্লিন সম্মেলনের মাধ্যমে আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ তথা নব্য-সাম্রাজ্যবাদ উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন। ১৮৯০-এর পরে বিসমার্কের অভিভাবকত্বহীন সাবালক জর্মন উগ্র সাম্রাজ্যবাদ কাইজ়ার দ্বিতীয় ভিলহেল্মের নেতৃত্বে সেই ঈপ্সিত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বাস্তবে ছুঁতে চেয়েছিল। তারই অবশ্যম্ভাবী আঁচ ইংল্যান্ডের গায়ে লাগে। কারণ, জর্মনি ততদিনে উষ্মা প্রকাশ করেই ফেলেছে যে, সবদিকেই হয় ইংরেজ নয় ফরাসী উপনিবেশ; 'সূর্যের নীচে বাস' করতে হলে জর্মনিরও চাই ঔপনিবেশিক 'যজ্ঞভাগ'। এই নারদ-নারদ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যের পক্ষে স্বর যে কিছুটা উগ্র হয়ে উঠবে তা আশ্চর্য কী! ফলে, সাম্রাজ্য-গর্বী ক্যানান ডয়েল ঔপনিবেশিক 'রত্ন' ভারতে যেকোনো রকম বিরোধিতারই বিপক্ষে; আর কে-না-জানে যে সবথেকে বড় বিরোধিতাই ছিল ১৮৫৭-র বিদ্রোহ। ফলে, হবসন-বর্ণিত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ বা লেনিন যাকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ কিংবা অত্যাধুনিক পর্যায় বলেছিলেন সেই নব্য-সাম্রাজ্যবাদের কালে কনান ডয়েল স্বয়ং মহারানির পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্ভবত সবথেকে বড় প্রতীক শার্লক হোমসের উপরেই ১৮৫৭-র স্মৃতিকে টেমসে বিসর্জন দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[102]

২২১ বি বেকার স্ট্রিটে সেই বিখ্যাত ঘরে মেরি মর্সটান ভারতে তৈরি একখণ্ড কাগজ হোমসকে দেন, যাতে লাল কালিতে 'X' (এক্স) চিহ্ন লেখা ছিল। সেই বিন্দু থেকে হোমস দ্রুতই জনাথন স্মল, মহমৎ সিং, আবদুল্লা খান ও দোস্ত আকবর— এই চতুর্ভুজের অস্তিত্ব ও তার পিছনে সিন্ধুবৎ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে পায়, যে বিপদ-সংক্ষুব্ধ আবহে ঐ চারজন পরস্পর পরিচিত হয়েছিল। তারা চারজনে একজোটে আগ্রায় রক্ষিত একদা কোনো এক উত্তর ভারতীয় শাসকের সম্পদ চুরি করে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারার মন্ত্রণা করে। কিন্তু, তারা ধরা পড়ে যায় ও খুনের অপরাধে শাস্তি পায়। কিন্তু সম্পদ লুকোনো স্থানে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু সেই মহার্ঘ্য ধাতু ও রত্নরাজি উদ্ধার করতে গিয়েই বিপত্তি বাধে, জট পাকিয়ে ওঠে ও রাচেল ভেরিন্ডারের মতই আবারও এক শান্ত-নিরুদ্বিগ্ন

---

[102] এই কালপর্যায়ে পশ্চিম ইওরোপ ও তার নিরিখে পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সংঘাত বিষয়ে বহু আলোচনা আছে। তেমনই এক গভীর ও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য সুবিখ্যাত দুটি বই— E. J. Hobsbawm, *The Age of Capital, 1848-1878* (Great Britain : Weidenfeld and Nicolson, 1975) এবং E. J. Hobsbawm, *The Age of Empire 1875-1914* (Great Britain : Weidenfeld and Nicolson, 1987). হবসন ও লেনিনের আলোচনার জন্য যথাক্রমে দ্রষ্টব্য: John A. Hobson, *Imperialism— A Study* (1902) https://www.marxists.org/archive/hobson/1902/imperialism/index.htm এবং Vladimir Ilyich Lenin, *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism* (1917) https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/index.htm

ইংরেজ রমণী মেরি মর্সটান সেই রহস্যময় আবর্তে পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়ে। বস্তুত কলিন্স ও ডয়েল উভয়ের উপন্যাসেই প্রাচ্যোদ্ভূত সম্পদের মোহিনী ক্ষমতা, তার জন্য সংঘটিত হত্যা এবং শেষাবধি এক ষড়যন্ত্রপূর্ণ রহস্যময় জিঘাংসা প্রহেলিকাসহ সেই সম্পদের ব্রিটেনে আগমন— সবই ঘটছে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পরোক্ষ (কলিন্স ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রসঙ্গ সরাসরি আনেননি) কিংবা প্রত্যক্ষ আবহে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংঘটিত সেই 'মিউটিনি'ই ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্বের মূল ধরতাই, যে বিদ্রোহকে দমন করতে ঔপনিবেশিক শাসকের নাভিশ্বাস উঠেছিল এবং তার বিভিন্ন সত্যাসত্য খতিয়ান পাঠে ব্রিটেনের বাসিন্দারা ছিল উদগ্রীব। স্বভাবতই সেই আকর্ষণের বাজার ধরতে বিদ্রোহ সংক্রান্ত নানান আখ্যানে ছেয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ শিক্ষিতমহল। উনিশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকেও যে ব্রিটিশ পাঠক সমাজে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ইতিহাস ও অন্যান্য গোত্রের রচনার জনপ্রিয়তা ছিল তার প্রমাণ ১৮৬০-এর দশকে প্রথম স্যর জন কে-র লিখিত ও কর্নেল জর্জ ব্রুস ম্যালেসন-সম্পাদিত ও পরিবর্ধিত লর্ড ক্যানিং-এর স্মৃতিতে উৎসর্গকৃত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত *Kaye's and Malleson's History of the Indian Mutiny of 1857-8* বইটির ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের পর ফি বছর পুনঃপ্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ। তাছাড়া, ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে টমাস রাইস এডয়ার্ড হোমস-এর লেখা *A History of the Indian Mutiny* প্রভৃতি ইতিহাস ও বিভিন্ন স্মৃতিকথা-উপন্যাসের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসকের সমাজে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ধাক্কার স্মৃতি সজীব ছিল। সেই 'টাটকা' স্মৃতি ও সে সম্পর্কে উৎসাহই যে গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তার মানসিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল ডয়েলের উপন্যাসই তার প্রমাণ।

উপর্যুক্ত সেই প্রতিটি আখ্যানে নিহিত ছিল একটি উদ্বেগ— ১৮৫৭-র বিদ্রোহের অভিঘাতে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক 'রত্ন' ভারত হাতছাড়া হওয়া।[103] তাই যেকোনো ছুতোয় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কতিপয় প্রাচ্যবাসীর সেই অভূতপূর্ব 'বিশ্বাসঘাতকতা' ও 'খলপূর্ণ ষড়যন্ত্র' বারংবার পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা হতো। *The Moonstone* উপন্যাসের শেষে কলিন্স যে চক্রাকার আবর্তনের সম্ভাবনা জিইয়ে রেখেছিলেন, তাই যেন আবার ডয়েলের *The Sign of Four*-এ ফিরে আসে। শ্রীরঙ্গপত্তনমের দেব-রত্ন আগ্রা-জহরতের নতুন চেহারায় আবারও ফিরে আসে লন্ডনে, রাচেল ভেরিনডারের মতই তা ব্যতিব্যস্ত করে তোলে মেরি মর্সটানের জীবনযাপন। হেলার একেই ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্তন বলেছেন।[104]

উক্ত বিদ্রোহ যে আদতে মহতী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশীয় কিছু সিপাহীদের বিরুদ্ধচারণ সেই কথাটি প্রতিপন্ন করতেই 'মিউটিনি' আখ্যা প্রযুক্ত হয়েছিল। যদিও, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক গবেষণায় স্পষ্ট যে, সিপাহীদের মধ্যে জমাট অসন্তোষ থেকে শুরু হলেও ১৮৫৭-র বিদ্রোহ বাস্তবে মোটেই 'সিপাহী বিদ্রোহ' ছিল না।

---

[103] "In historiographic terms, colonial trauma can be read only in the context of an apocalyptic "end" or "beginning" of empire…" দ্রষ্টব্য: Sara Suleri, *The Rhetoric of English India*, পূর্বোক্ত, ePub Edition.

[104] Tamar Heller, *Dead Secrets : Wilkie Collins and the Female Gothic*, প্রাগুক্ত

বরং, বহুক্ষেত্রে তা একটি বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের আকার নিয়েছিল।[105] কিন্তু, বিদ্রোহের সেই ব্যাপ্তিকে লুকিয়ে রাখতে সাম্রাজ্যিক প্রতর্কের সতত চেষ্টা কার্যত এটাই প্রমাণ করে যে, ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের অভিঘাত ব্রিটিশ সভ্যতার গর্বোন্নত সত্তার ঠাঁই ধরে নাড়া দিয়েছিল, যে ধাক্কায় টলমল হয়েছিল খোদ ব্রিটিশ সমাজ ও তার সুখী গৃহযাপন। অন্ধকার রহস্যময় উপনিবেশের আবহাওয়ায় ভরসা নেই, তা ক্ষণে-ক্ষণে বদলে যায়। ঔপনিবেশিক ভারত এই শান্ত ও নিথর তো পরক্ষণেই জনাথন স্মল দেখে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক প্রভু-সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রায় হাজার খানেক কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় শয়তানের মত এগিয়ে আসছে এবং দেশটা নরকসম হয়ে গেছে।[106] জ্বলন্ত বাংলোবাড়ির আলোয় রাতের আকাশ ঝলসে যায়; ব্রিটিশ রমণীর ছিন্নভিন্ন দেহাংশ খুবলে খায় শেয়াল-কুকুর, ঐ রমণীর স্বামীর শব চাপা পড়ে যায় চারটি মৃত বিদ্রোহী সিপাহির দেহের নীচে, হাতে তাঁর গুলিশূন্য বন্দুক। বিদ্রোহের সেই শিহরণজাগানিয়া স্মৃতি রোমন্থন শেষে স্মল বলে:

> It was a fight of the millions against the hundreds; and the cruellest part of it was that these men that we fought against, foot, horse, and gunners, were our own picked troops, whom we had taught and trained, handling our own weapons and blowing our own bugle-calls.[107]

অর্থাৎ, প্রভুর অস্ত্রই তার দিকে তাগ করে দেয় প্রজা, ঔপনিবেশিকতার পরিসরে সাম্রাজ্য নিজেই নিজের তৈরি অপরের মুখোমুখি হয়। আর তারই অভিঘাত সুদূর ভারতীয় উপমহাদেশের ভূগোল পেরিয়ে সরাসরি এসে পড়ে সাম্রাজ্যের মর্মস্থল লন্ডনে তথা সমগ্র ইংল্যান্ডে। চেনা পরিসর রাতারাতি যেন বদলে যায়, জ্ঞানদীপ্তিময় শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার আলো ঢেকে যায় ঔপনিবেশিকতার মেঘে। লন্ডন শহরের অলিগলি পরিণত হয় মানচিত্রে-হদিশহীন অজানা অঞ্চলে, যেখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে কলিন্স-কথিত তিন ব্রাহ্মণ কিংবা ডয়েল-বর্ণিত টোঙ্গা।[108] উপন্যাসে দুটো রহস্য একসঙ্গে পাকিয়ে ওঠে, যার একটি বাহ্য— লন্ডনে আগ্রার সম্পদ ও টোঙ্গার আগমন এবং অন্যটি অন্তর্নিহিত— ভারতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ, যার আঁচ আগে থেকেও শাসক পায়নি (তাই স্মলের

---

[105] ভারতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কেবল সেনা অভ্যুত্থান বা মিউটিনি ছিল কিনা সে বিষয়ে বিদ্রোহের সমকালেই দ্বিমত প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ সেন, শশীভূষণ চৌধুরী প্রমুখের গবেষণা বিদ্রোহের বহুমুখী বিস্তারের উপরে আলোকপাত করেছিল। তারপরে এরিক স্টোকস, রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়, তাপ্তি রায়, রজতকান্ত রায়, গৌতম ভদ্র প্রমুখ ঐতিহাসিকের বহুমাত্রিক ও মৌলিক গবেষণায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সরলীকৃত কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বিদ্রোহের সুদীর্ঘ সেই ইতিহাস চর্চার ধারাগুলির বিশ্লেষণ এবং বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস হিসাবে দ্রষ্টব্য: Sekhar Bandyopadhyay (ed.), *1857: Essays from Economic and Political* Weekly, পূর্বোক্ত এবং Biswamoy Pati (ed.), *The Great Rebellion of 1857 in India: Exploring transgressions, contests and diversities*, পূর্বোক্ত। এছাড়া, ব্রিটিশ শাসক ও ইংরেজ সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে নানান ধারণা ও তার সাহিত্যিক প্রতিফলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Gautam Chakravarty, *The Indian Mutiny and the British Imagination*, প্রাগুক্ত।

[106] স্মলের জবানি অনুসারে: "Suddenly, without a note of warning, the great mutiny broke upon us. One month India lay as still and peaceful, to all appearance, as Surrey or Kent; the next there were two hundred thousand black devils let loose, and the country was a perfect hell. " দ্রষ্টব্য: Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four,* in *The Complete Sherlock Holmes,* Vol. 1, প্রাগুক্ত।

[107] তদেব।

[108] *The Sign of Four* ও ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করে জয়া মেহতা দেখিয়েছেন যে, হোমস আদতে উক্ত উপন্যাসে যা করেছে তা হল : "a successful purging of the novel's 'wild, dark' Indian elements from its national and narrative borders". দ্রষ্টব্য: Jaya Mehta, 'English Romance: Indian Violence', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

মত প্রায় সকলেই 'হঠাৎ' শব্দটি বারবার ব্যবহার করে) এবং পরেও তার কারণ বস্তুত অধরা থেকে গিয়েছিল। তাই, কারণ না-বোঝার রহস্যময়তাকে আর কোনো প্রশ্রয় না-দিয়ে ঔপনিবেশিক রহস্যের প্রতিমূর্তি টোঙ্গাকে হত্যা করাই শ্রেয় বলে মনে হয় শাসকের। ঔপনিবেশিত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে কোনো রহস্যের শেষ রাখলে চলে না। নৃতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে সব রহস্যের মর্মভেদ করে আবিস্কার করতে হয় উপনিবেশের প্রতিশোধ থেকে শাসিতের সুখীগৃহকোণকে রক্ষার পদ্ধতি-প্রকরণ। রহস্য-রোমাঞ্চময় গোয়েন্দা আখ্যানের মাধ্যমে সেই অর্থে বৃহত্তর ইংরেজ সমাজের পরিধিকে ছোট করে এনে সেখানে শান্ত-স্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে পাঠকের উদ্বেগ নিরসনের চেষ্টা করা হয়। তাই কলিন্সের আখ্যানের শেষে আফিম-আসক্ত শখের গোয়েন্দা ব্লেক সংসারী বনে যায় ও রাচেল ভেরিনডারের গর্ভস্থ সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করে। অন্যদিকে ডয়েলের আখ্যানে চতুর্ভুজের রহস্য সমাধান শেষে ডাক্তার ওয়াটসন মেরি মর্সটানকে গৃহিণী রূপে পেয়ে সুখী হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য পেশাদার গোয়েন্দা হোমসের হাতে থাকে ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রতিভূ— নেশার দ্রব্য— কোকেনের বোতল।[109]

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ভারত ও ব্রিটেনের তথা সমগ্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ এক সুস্পষ্ট বিভাজিকা হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ জনসমাজের একটা অংশে ধুয়ো উঠেছিল যে, দরকারে যথেচ্ছ বলপ্রয়োগ করে 'বর্বর' বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে হবে। যুক্তিটা এমন ছিল যে, যেহেতু বিদ্রোহী সিপাহিরা ইওরোপীয়দের হত্যা করেছে, তাই প্রতিশোধমূলক যেকোনো হিংস্রতাই নৈতিকভাবে যথার্থ।[110] তাছাড়া, যে ভারতীয়রা এমন হিংস্র হতে পারে, তারা সভ্যতার গণ্ডির বাইরে, তাই শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার বাহক ব্রিটিশ শাসন জোরদার করে এহেন 'অসভ্য' ভারতীয়দের 'মানুষ' করতে হবে। ফলে, ১৮৫৭-র পরে আর কোনো যৌথ মূলধনী কোম্পানির হাতে ভারত-শাসন ছেড়ে রাখা যাবে না। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ও স্বয়ং রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া (১৮১৯-১৯০১) শাসক রূপে অবতীর্ণ হবেন। উল্টোদিকে, ভারতীয় মানসেও এই বিদ্রোহ ঢেউ তুলেছিল। ইওরোপীয় সভ্যতার গুণগ্রাহী ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসাদপুষ্ট ও তুষ্ট অনেকেই এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে এই 'আচমকা উৎপাত' অসহনীয় ছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪) বইতে "১৮৫৭ সালের মিউটিনীর হাঙ্গামা"র (অভিধাটি লক্ষণীয়) সমকালীন বাংলার কথা লিখেছেন। এনফিল্ড রাইফেলের টোটা সংক্রান্ত হিন্দু-মুসলমানের ধর্মনাশের বিষয়টি যে "গুজব" সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন যে, "সিপাহীদিগের… অসন্তোষের গভীরতা কত কর্ত্তৃপক্ষ তখন তাহা ধরিতে পারিলেন না"।[111] খেয়াল করার বিষয় এই

---

[109] Jon Thompson, *Fiction, Crime, and Empire : Clues to Modernity and Postmodernism,* প্রাগুক্ত

[110] এই প্রতিহিংসাপরায়ণতা সাধিত না-করার জন্যই ডিকেন্স লর্ড ক্যানিং-এর সমালোচনা করেছিলেন: "I suppose a greater mistake was never committed in the world than this wretched Lord Canning's maudlin proclamation about mercy." ডিকেন্সের উদ্ধৃতির সূত্র: Grace Moore, *Dickens and Empire : Discourses of Class, Race and Colonialism in the Works of Charles Dickens,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

[111] শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৯ [১৯০৪]), পৃ. ১৪১-১৪৪

যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিতের আলোকদীপ্ত অংশের প্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পর্যন্ত একই আখ্যান-ধারা মেনে চলেছিল। কানপুরের হত্যা সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্য খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, সিরাজদৌল্লার সঙ্গে যুক্ত 'অন্ধকূপ হত্যা' ও নানা সাহেবের সঙ্গে যুক্ত 'কানপুরের কূপ হত্যা' যেন এক অনপনেয় হিংসার "অবিনশ্বর কলঙ্কের রেখা" (যদিও শিবনাথ শাস্ত্রী এই তুলনাটা টানেননি)।[112] 'কূপ' যেন এমন এক রূপক, যার অন্ধকারে স্থান-কাল-পাত্রের ঐতিহাসিক ও গাণিতিক যুক্তি তলিয়ে যায়।[113] রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে মন্মথনাথ ঘোষ উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ দমিত হলে পরে ভারতে মহারানির শাসন (১৮৫৮) শুরুয়াদ উপলক্ষ্যে সর্বত্র "ঘোষণাবাণী" প্রচারসহ "মহোৎসব" শুরু হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জুলাই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে "স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া মহারাণীর প্রতি পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।"[114] সেই সভায় ডিরোজিও-শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করে "ব্রিটিশ রাজত্বের সুফল বুঝাইয়া দিয়া পরমেশ্বরের নিকট ভারতবর্ষের ও ভারতেশ্বরীর মঙ্গলকামনা করেন।"[115]

অবশ্য, এই 'রাজভক্তির পুরস্কার' হিসাবে ভারতে কোম্পানির শেষ গভর্নর জেনারেল ও মহারানির আমলে প্রথম ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) লর্ড ক্যানিং "ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত... রাজভক্তিতে অতুলনীয়" দক্ষিণারঞ্জনকে "তাঁহার অবিচলিত রাজভক্তি ও সিপাহী-বিদ্রোহকালে নানাপ্রকার সাহায্যের জন্য সমুচিত পুরস্কার" হিসাবে "তালুক প্রদান করেন এবং তাঁহাকে অতঃপর অযোধ্যা প্রদেশে অবস্থান করিয়া উক্ত প্রদেশে শৃঙ্খলাস্থাপনে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন"।[116] শিবনাথ শাস্ত্রী ঐ একই সময় প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, মহারানি "প্রজাদিগকে অভয়দান করিয়া ভারত সাম্রাজ্য নিজ হস্তে লইলেন;... কলিকাতা সহর আলোকমালাতে মণ্ডিত হইল; চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল।"[117] এই বক্তব্যে 'কলিকাতা' স্থানটির কেন্দ্রীয়তা লক্ষণীয়। লন্ডন ও কলিকাতা— ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দুই কেন্দ্রবিন্দু, সেখানে 'আলোকমালা'ই সভ্যতা ও জ্ঞানদীপ্তি; তার বাইরে সবই কানপুরের অন্ধকূপ, যার কোনো ইতিহাসও নেই, আলোও নেই। উপনিবেশ-প্রসূত পাশ্চাত্য মননের ধারক ও বাহক শিক্ষিত বাঙালী (মূলতঃ বর্ণহিন্দু) সম্প্রদায়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের ইষ্টসাধন ক্ষমতার প্রতি মৃদু সমালোচনামূলক নিষ্ঠার মনোভঙ্গির সঙ্গে উইলকি কলিন্সের আত্ম-সংশয়ী

---

112 তদেব

113 'অন্ধকূপ' ও ঔপনিবেশিক ইতিহাস-আখ্যানে হিংসার ধারণা বিষয়ে অনবদ্য আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Partha Chatterjee, *The Black Hole of Empire : History of a Global Practice of Power* (Princeton & Oxford :Princeton University Press, 2012).

114 মন্মথনাথ ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২২-১২৬

115 তদেব

116 তদেব

117 শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

কর্তৃত্ববাদের মানসিক ও যৌক্তিক নৈকট্য স্পষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই উপনিবেশ যে দেশীয়দের মঙ্গলসাধনে রত— এই স্বতঃসিদ্ধ থেকেই নিজস্ব আখ্যান-যাত্রা শুরু হয়, যার অনিবার্য পরিণতি মহারানির শাসনের প্রতি অটুট বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস বলবৎ রাখতে দেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চেষ্টায় খামতি ছিল না। সেক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী অবস্থানের মধ্যেও স্বরগত মিল দেখা যায়। নব্য-বঙ্গীয় ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারপন্থীদের প্রবল সমালোচক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও (১৮১৩-১৮৫৯) ব্রিটিশ-সম্রাজ্ঞীর গুণগানে বিভোর ছিলেন। তাঁর কাছেও ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল:

সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,
দিয়ে উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে,
বাঙালীকে কাটতে বলে!
রাজভক্ত অনুরক্ত,
তোমার সব বাঙালী ছেলে,
এরা ধর্ম্ম-পথে সদাই রত,
অধর্ম্ম করে না মোলে।
বাজে সাহেব দ্বেষী যারা,
কত কটু কহে তারা মা গো!
কেবল তোমার চরণ, কোরে স্মরণ,
ভাস্‌তে থাকি নয়নজলে।[118]

‘কোম্পানির রাজ’-এর বদলে ‘ভারতের ভার’ স্বয়ং মহারানি গ্রহণ করার খবর তাঁর কাছে ‘শুভ সমাচার’।[119] একাধিক কবিতায় তিনি মহারানি ভিক্টোরিয়াকে মাতৃজ্ঞানে কাতর সম্বোধন করে বাঙালি জাতির মুখপাত্র হয়ে রাজানুগত্য প্রকাশ করেছেন: এই ভারত কিসে রক্ষা হবে, ভেবো না মা, সে ভাবনা।/ সেই "তাঁতিয়া তোপির" মাথা কেটে, আমরা ধোরে দেব "নানা।।"[120] বস্তুত, ইংরেজ-শাসকের চোখে বিদ্রোহী সিপাহীদের থেকে সে আমলের শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা যে সচেতনভাবেই নিজেদের আলাদা করতে সতত চেষ্টা করত তার বহু নজির ঈশ্বর গুপ্তর লেখায় আছে। মহারানির উদ্দেশ্যে তিনি স্পষ্ট বলছেন:

বাঙালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো..[121]

---

[118] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ‘নীলকর’, পঞ্চম গীত, কবিতা সংগ্রহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা : গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৯২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১৬

[119] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ‘নীলকর’, দ্বিতীয় গীত, তদেব, পৃ. ১০৪

[120] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ‘দুর্ভিক্ষ’, দ্বিতীয় গীত, তদেব, পৃ. ১৩২

[121] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ‘নীলকর’, প্রথম গীত, তদেব, পৃ. ১০১

সেই ‘পোষা গরু’ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা যে ব্রিটিশ-বিরোধী নন, সে-কথাটিও খোলসা করে দিয়েছিলেন গুপ্ত-কবি।[122] সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমেও শিক্ষিত বাঙালী শ্রেণি তার রাজভক্তি প্রকাশ করত। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

> বিদ্রোহজনিত উত্তেজনাকালে… হিন্দু পেট্রিয়ট… সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ কেবল কুসংস্কারাপন্ন সিপাহীগণের কার্য্য মাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত যোগ নাই। প্রজাকুল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে।[123]

এখানে খেয়াল করা দরকার যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সমালোচনা করলেও, বাংলায় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা হিন্দু পেট্রিয়ট তথা তার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সরব। অথচ, ১৮৬০-এর দশকের নীলবিদ্রোহ অন্তত তৎকালীন বঙ্গদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় রীতিমত জোরদার সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের রীতিমত আয়োজন করে আন্দোলন দমন করতে হয়। অবশ্য, নীলবিদ্রোহ যখন গণ আন্দোলনে পরিণত হয় ততদিনে ঈশ্বর গুপ্ত মারা গিয়েছেন। কিন্তু, দুটি প্রায় সমকালীন বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালী শ্রেণির বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিটি লক্ষণীয়। অথচ, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বয়ানে সেই বৈপরীত্যগুলি ‘জাতীয়তা’র ‘বড়’ ইতিহাসের আধিপত্যের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। ফলে, সেই আখ্যানে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ এবং নীলবিদ্রোহ, নানা সাহেব কিংবা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সবই ও সকলেই একেকটি বিন্দু, যা জুড়ে জুড়ে ‘জাতীয়’ ইতিহাস নির্মিত হয়।

শিক্ষিত বাঙালি সমাজের তরফে প্রজা ও সিপাহীর মধ্যে এই যে পরস্পরবিপরীত সম্পর্কের নির্মাণ তা এক বিশেষ মনোভঙ্গির প্রকাশ। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের আধিপত্য নির্মাণের অনেক আগেই দেশীয় সমাজে আরেক আধিপত্যের জন্ম হয়েছিল। সেই আধিপত্যের প্রণেতারা ছিলেন উনিশ শতকী আলোকদীপ্তির বাহক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সুফলভোগী ইংরেজি-শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষ, যারা নিজেদের স্বরকেই প্রজার স্বর বলে দেগে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কোম্পানি-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলভোগী, তাই তাঁরা “দয়াময়ী জননীস্বরূপিণী মহারাজ্ঞী” ভিক্টোরিয়ার স্তবগানে অত্যুৎসাহী। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের সদস্য সঙ্গীতজ্ঞ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে “পরম মহিমান্বিতা শ্রীলশ্রীযুক্তা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার “ভারত-রাজেশ্বরী” উপাধি গ্রহণোৎসবোপলক্ষে” ভিক্টোরিয়া-গীতিমালা অর্থাৎ পদ্যে গ্রথিত হিন্দু-সঙ্গীতানুগত ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন। “বঙ্গদেশের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর” স্যর রিচার্ড টেম্পলকে বইটি উৎসর্গ করে শৌরীন্দ্রমোহন লেখেন, “ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ চিরকালই সম্রাটের অধীনেই প্রতিপালিত। পুণ্যবলে ভারতে সেই পূর্ণশশিরূপ সম্রাটের উদয় হইল। পূর্ণিমাচন্দ্রোদয়ে সাগর যেমন উচ্ছলিত হয়,

---

[122] তদেব, পৃ. ১০২

[123] শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

তেমনি মহারাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া এত দিনের পর ভারতে "সম্রাট" এই উপাধি ধারণ করাতে ভারতীয় প্রজাগণের হৃদয়সাগর আনন্দে উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গিত হইতেছে"।[124] তবে, এই সাংগীতিক মহিমাকীর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে সুপ্রজা তৈরি করা। সেই ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে 'ভূমিকা'য়— "তরলমতি বালকগণকে প্রথমতঃ নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক উপদেশ দেওয়াই নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। যাহাতে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও রাজার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়" সেইদিকে নজর দিয়েই এই "ঐতিহাসিক সঙ্গীত গ্রন্থ" লিখেছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন।[125]

অবশ্য, দেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের হরেক আকুতির পরেও, ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ ও ভারতীয় যে দুই পরস্পর-বিরোধী ও দ্বন্দ্বরত সত্তা সেই ধারণা মাতৃরাষ্ট্র বিলেতে বলবৎ হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিতের মধ্যের সেই বিভাজন ও দ্বন্দ্বের স্পষ্ট ছাপ পড়েছিল 'অপরাধী' ধারণা নির্মাণে। সেই দ্বন্দ্বমুখর আবহে ইংরেজ জনগণের চোখে সকল ভারতীয়ই হয়ে উঠেছিল 'অপরাধী'। ডিকেন্স কিংবা কলিন্স হয়ে ডয়েল সেই গণ-মান্য ধারণাকে সাহিত্যিক ভিত্তি জুগিয়েছেন। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রভাবে ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির তরফে ভারতে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্টার সমন্বয়ে ভারতে বিচিত্র 'অপরাধী' নির্মাণ শুরু হয়। পূর্বেকার ঠগী ধারণার এ যেন এক নবরূপ। সেখানে সমস্ত দেশীয় জনগোষ্ঠীই সেই ঠগীর রূপান্তর। সেই নঞর্থক মনোভাবেরই প্রতিফলন ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যে প্রকট হয়েছিল। কনান ডয়েলের *The Sign of Four* উপন্যাসটি সেই মনোভঙ্গিরই গুরুত্বপূর্ণ নমুনা। উপনিবেশের প্রজা মাত্রেই অপরাধী— উনিশ শতকের অন্ত্যভাগে ঔপনিবেশিক শাসকের তৈরি এই ধারণা উপনিবেশে প্রশাসনিকতার বিভিন্ন প্রকৌশলের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। নিকোলাস ডার্কস যাকে 'নৃতাত্ত্বিক রাষ্ট্র' ("the ethnographic state") বলে অভিহিত করেছেন,[126] সেই ঔপনিবেশিক ভারতে যেভাবে জাতি ও অপরাধীর সমীকরণ তৈরি করে তাকে বিভিন্ন বর্গের-গোত্রের খোপে বন্দী করে ফেলা হয়েছিল, সেই অনড় বন্ধনচিহ্নের স্পষ্ট ছাপ ডয়েলের আলোচ্য উপন্যাসটিতে দেখা যায়। ফলে, *The Sign of Four* প্রভৃতি কাহিনীগুলি আর কেবল কল্পিত গোয়েন্দা আখ্যান হয়েই সীমিত থাকে না, বরং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকাঠামোর মর্মস্থিত ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের জনপ্রিয়তম আদর্শমানে রূপান্তরিত হয়। গোয়েন্দা কাহিনী হয়ে ওঠে উপনিবেশ ও মাতৃরাষ্ট্রব্যেপে সাম্রাজ্যের ইতিহাস।

---

[124] শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভিক্টোরিয়া-গীতিমালা অর্থাৎ পদ্যে গ্রথিত হিন্দু-সঙ্গীতানুগত ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (কলিকাতা : পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৭ / ১৯৩৩ সম্বৎ), পৃ. অনির্দেশিত

[125] তদেব

[126] Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind : Colonialism and the making of Modern India* (Princeton & Oxford : Princeton University Press, 2001), পৃ. ৪৩-৬০

তৃতীয় অধ্যায়

‘অপরাধী’র বঙ্গযাত্রা

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ‘অপরাধী’ নির্মাণের ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব

আমরা বাঙ্গালী… চতুর্দ্দিকে যাহা দেখি, কিছুই ভাল করিয়া দেখি না। সব জিনিসই যেন আমরা চোক বুজিয়া দেখি।…একজন ইংরাজকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি প্রত্যেক জিনিসের তন্নতন্ন বর্ণনা করিবেন— একটি খড়িকা পর্য্যন্ত তিনি ছাড়িবেন না।

— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর[1]

লম্ব্রজো সাহেব দেখাইতে চাহেন যে, এই এনার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের অনেকের চেহারা ক্রিমিনাল্‌দিগের হইতে বড় তফাৎ নয়।… এনার্কিষ্ট্‌দিগের আকারপ্রকার ফরাসী বিপ্লবের নরপিশাচগণের সহিত বড় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য।— **রীতিমত ক্রিমিনাল্ ছাঁচ যাহাকে বলে।**

— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর[2]

তোমার **করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।**… খুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন্-ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন্-ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, কন্‌ভল্যুশনের উপর সব নির্ভর করে।…হনু আর চোয়াল উঁচু, মৃদঙ্গ-মুখ, বাঁকা নাক,… ত্বরিতকর্মা, কূটবুদ্ধি, একগুঁয়ে।… তবে মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে—বুদ্ধিমান বলা চলে।… আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো? ষাট আউন্স—তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশি। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাৎ তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাৎ তার চেয়েও বেশি।

— শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়[3]

---

[1] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, “মুখ-চেনা”, প্রবন্ধ-মঞ্জরী, (কলিকাতা: সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, ১৩১২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৫৯। মূল প্রবন্ধটি ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে বালক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে, এই গবেষণা সন্দর্ভে উদ্ধৃত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমস্ত প্রবন্ধের পাঠসূত্র প্রবন্ধ-মঞ্জরী।

[2] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ক্রিমিনাল্ মানবতত্ত্ব”, বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, (সম্পা.) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৫৪-৪৫৫ (নজরটান সংযোজিত)। মূল প্রবন্ধটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রে প্রকাশিত সাধনা-য় সাময়িক সারসংগ্রহ অংশে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে, এই গবেষণা সন্দর্ভে উদ্ধৃত বলেন্দ্রনাথের সমস্ত প্রবন্ধের পাঠসূত্র বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী।

[3] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সীমন্ত-হীরা’, ব্যোমকেশ সমগ্র (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৭ [১৯৯৫]), পৃ. ৭৯। নজরটান সংযোজিত।

সকাল-সকাল নীলমণি সান্যালের টেলিফোন পেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল 'শখের গোয়েন্দা' প্রদোষচন্দ্র মিত্র। সান্যালের বাড়ি পৌঁছে জানা গেল একটা রহস্য জালে আটকে পড়েছে প্রাচীন মিশর থেকে আধুনিক কলকাতা— একদা উভয়ই ছিল ইংরেজ উপনিবেশ। সেই রহস্যের কেন্দ্রে রয়েছে একটা মিশরীয় মূর্তি— আনুবিস, বাংলায় বললে 'শেয়াল দেবতা'। তারপরে রহস্যের সমাধানে বিভিন্ন পথ ঘুরে শেষে প্রদোষচন্দ্র আবারও সেই সান্যালের বাড়িতেই ফিরে আসে এবং দেখা যায় অপরাধী বছর চল্লিশের প্রচণ্ড শক্তিশালী এক বামন বা ডোয়ার্ফ। "পাঁচিলের গায়ে হাতের ছাপ দেখেই" প্রদোষ মিত্তির বুঝতে পারে যে, সেই ছাপ কোনো কিশোর-হাতের নয়, বরং অনেক রেখাযুক্ত ঐ হাত আসলে এক "বেঁটে বামনের"।[4]

বামনের হাতের ছাপ কেবল নীলমণি সান্যালের পাঁচিলেই পড়েনি, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিকতার উপরেও পড়েছিল। বামন যেন এক সৃষ্টিছাড়া, তথকথিত মাথা-লম্বা কিংবা গড়পড়তা উচ্চতার মানুষের ভিড়ে আলাদা। আর যা কিছু আলাদা, তাকে নিয়েই প্রশাসনিকতার সমস্যা বাধে। কোন খোপে পুরে তাকে বিচার করা হবে, কোন বর্গে-গোত্রে সে ঠাঁই পাবে— তা নিয়ে জলঘোলা হতে থাকে। আর সেই ঘোলা জল থেকে উঠে আসে এমন এক খর্বাকৃতি মানুষী অবয়ব, যাকে সহজেই 'অপর' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সেই অপরই ক্রমে হয়ে ওঠে 'অপরাধী'।

এহেন বামন মানুষ বা মনুষ্যেতর প্রাণীকে অপরাধী ঠাওরানোর ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশে শুরু হয়নি। তার শুরুয়াদ আদতে আধুনিকতা ও জ্ঞানদীপ্তির অগ্রদূত শহর লন্ডনে, আরও বিস্তারে বললে পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে। নীলমণি সান্যালের গাড়ির বনেটে লুকিয়ে থাকা ঐ বামনের পূর্বপুরুষ লন্ডনের সেই বামনের সঙ্গে অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিস্তার ও ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রসারের নাড়ির সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক বিচার করলে ঔপনিবেশিক শাসকের ও প্রজার প্রতর্কে ঔপনিবেশিক 'অপরাধী' নির্মাণের প্রক্রিয়াসমূহের আন্দাজ পাওয়া যাবে। উপনিবেশে সেই প্রক্রিয়ার কেন্দ্র ছিল এক স্থানিক ও কালিক 'আদিমতা'র ধারণা, যে আদিমতা সভ্যতার বৈরী এবং সেহেতু 'অপরাধ'-এর আঁতুড়ঘর।

'ঠগী' বাছতে গাঁ উজাড় : ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতা ও দেশজ 'অপরাধী'র জন্মবৃত্তান্ত

তখন ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ পুরোদস্তুর চলছে (১৮৩৮-১৯৪২)। সেই বছরেই মারা গেছেন 'পাঞ্জাব-কেশরী' রণজিৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯)। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশের বাড়-বাড়ন্তের সেই পর্বে নামী প্রকাশক রিচার্ড বেন্টলির ছাপা আপাত সাদামাটা একটি বই লন্ডনের পাঠকমহলে সাড়া ফেলে দিল। আনকোরা, জনৈক 'ক্যাপ্টেন' উপাধিধারী মেডোস টেইলর (১৮০৮-১৮৭৬)-লিখিত সেই বইটির নাম *Confessions of*

---

[4] সত্যজিৎ রায়, 'শেয়াল দেবতা রহস্য', ফেলুদা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০-১১৯।

a Thug, 'সত্য' ঘটনা অবলম্বনে রচিত।[5] টেইলরের জবানি অনুযায়ী স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়া সেই বইয়ের ভক্ত।[6] তিনখণ্ডে সমাপ্ত সেই বই বড়লাট বেন্টিঙ্ক ও বড়লাট অকল্যান্ডকে উৎসর্গ করা হয়।[7] বইয়ের আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে, টেইলর ছিলেন হায়দরাবাদের নিজ়ামের কর্মচারী। আখ্যানটি নাকি আমির আলি নামের জনৈক পাঠান মুসলমান ঠগীর জবানবন্দি। টেইলরের রচনার ১৮৩৯-এর প্রথম প্রকাশের সময়ের মুখবন্ধ এবং ১৮৭৩-এ প্রকাশিত সংস্করণের জন্য লেখা মুখবন্ধের তুলনা করলে আখ্যানটির আদত লেখক সম্পর্কে সংশয় তৈরি হয়। ১৮৩৯-এর মুখবন্ধে লেখক জানাচ্ছেন তাঁর আখ্যান প্রায় সত্য— "almost all true"; কেবল ঘটনাক্রমগুলি জুড়তে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং তাতে আমির আলির "ভয়ানক বৃত্তান্ত" কিছুটা "আর্কষণীয়" হয়েছে। তবে, লেখক লোমহর্ষক আগ্রহে সেই বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। এর থেকে মনে হয়, আখ্যানটি আমির আলির জবানবন্দির শ্রোতা টেইলরের রচনা। কিন্তু, তাঁর মুখবন্ধে তিনি রচনার উৎস হিসাবে ঠগী বিষয়ে স্লিম্যান-রচিত ও অন্যান্য কতগুলি বিবরণের কথাও বলেছেন। ১৮৭৩-এর মুখবন্ধে অবশ্য সেই ধোঁয়াশা রাখেননি। শেষে স্পষ্ট জানিয়েছেন: "I must respectfully refer my readers to the "Confessions,"… without exaggeration, or any suppression of its enormity,—as indeed I myself heard it told."[8] এই দুই ভিন্ন সংস্করণের মুখবন্ধের ভিন্নতা নিয়ে একটি জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন মারি পুভি। তাঁর মতে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ (যদিও পুভি ১৮৫৮ লিখেছেন) ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের হিংস্রতা নিয়ে যে সমালোচনার ধারা তৈরি হয়েছিল হয়ত সেই সমালোচনার হাত এড়াতেই টেইলর ১৮৭৩-এর মুখবন্ধে নিজেকেই আখ্যানের একমাত্র রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন।[9]

---

[5] এই মেডোস টেইলরের পুরো নাম ফিলিপ মেডোস টেইলর। অবশ্য টেইলর ১৮৪৩ সালের আগে ক্যাপ্টেন-ক্যমান্ডার হননি। পরবর্তীতে নামের সঙ্গে 'colonel' জুড়ে গেলেও বাস্তবে নিজামের সৈন্যবাহিনীতে ঐ পদটি ছিল না। দ্রষ্টব্য: Philip Meadows Taylor, *The Letters of Philip Meadows Taylor to Henry Reeve*, Sir Patrick Cadell (ed.) (Oxford: Oxford University Press, 1947) বইতে সম্পাদকের ভূমিকা, পৃ. xxix-xxx.

[6] টেইলরের প্রকাশক নাকি জানিয়েছিলেন যে, খোদ রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া "had directed sheets, as they were revised, to be sent to her – and, having become interested in the work, wished for further supplies as soon as possible." দ্রষ্টব্য: Philip Meadows Taylor, *The Story of My Life*, Ed. by "his daughter" (Edinburgh: William Blackwell & Sons, 1878 [1877]) পৃ. ১০৬

[7] প্রথম খণ্ডে ছাপা হয়েছিল: "To the right honourable George, Lord Auckland, G. C. B. Governor-General of India, who is vigorously prosecuting those admirable measures for the suppression of *Thuggee*, which were begun by the late Lord William Cavendish Bentinck, G. C. B. and G. C. H., his predecessor; these volumes are, by permission, and with great respect, dedicated." দ্রষ্টব্য: Captain Meadows Taylor, *Confessions of A Thug* (London: Richard Bently, 1839).

[8] Captain Meadows Taylor, *Confessions of A Thug* (London: Richard Bently, 1839) এবং Captain Meadows Taylor, *Confessions of A Thug* (London: Kegan Paul, Trench & Co., 1885)

[9] Mary Poovey, "Ambiguity and Historicism: Interpreting "Confessions of a Thug"" in *Narrative*, Vol. 12, No. 1 (Jan., 2004), পৃ. ৩-২১

টেইলরের উপন্যাসের মাধ্যমে 'ঠগী' কাহিনী ব্রিটেনের শিক্ষিতসমাজের অন্দরে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। যদিও, ততদিনে উইলিয়ম হেনরি স্লিম্যান (১৭৮৮-১৯৫৬) ডায়নোসরের জীবাশ্ম[10] আবিষ্কার করে ফেলে মন দিয়েছেন 'ঠগী' নামের বিশেষ ধারার 'অপরাধী'দের কাজকারবার আবিস্কারে। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্লিম্যানের লেখা *Ramaseeana, or a Vocabulary of a Peculiar Language used by the Thugs* প্রকাশিত হয়ে গেছে।[11] ১৮৩০-এর দশকে সংস্কারমুখী ও শৃঙ্খলা-কায়েমপ্রবণ গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) ঠগী-দমন প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে স্লিম্যানের নেতৃত্বে ঠগী ও ডাকাতি দমন বিভাগের প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ) করেন। অতঃপর, সেই ১৮৩৯ সালেই স্লিম্যান সাহেব সেই বিভাগেরই বড়কর্তার— Commissioner for the Suppression of Thuggee and Dacoity— পদে আসীন হন। সেই পদের অধিকারে তিনি যে ঠগীদমনে 'সফল' হয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি দেশীয় ঔপনিবেশিক সমাজেও ছিল। "বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের আমলেই... ঠগী কমিস্যনর দেশে দেশে, নগরে নগরে— এমন কী প্রতি পল্লীর মাদ্রাসা পাঠশালায়" ঘুরে ঘুরে "একটু বনেদি বড়লোকের চালাক ছেলে" পেলেই তাকে দারোগাগিরির পদে নির্বাচন করছেন বলে জেনেছিলেন মুন্সি বাঁকাউল্লা।[12] জনৈক রাজকর্মচারী সেই সময়কে ফিরে দেখতে গিয়ে লিখেছিলেন— "কর্ণেল স্লীমান... প্রভৃতি সাহেব মহোদয়দিগের যত্নে ও পরিশ্রমে" বহু ঠগীর মুণ্ডু গেছিল, অনেকে রাজসাক্ষী হয়ে যায়। "মহাত্মা কর্ণেল স্লীমান, প্রভৃতির প্রযত্নে" ঠগী-দমনের মাধ্যমে একদিকে যেমন "ধন্য ব্রিটিশ পুরুষকার" তেমনি "ধন্য কোম্পানী বাহাদুরের বিক্রম বিস্তার"।[13]

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় ঠগীদমনের কৃৎকৌশলগত যুক্তি। ঠগীদের নৃশংসতা ও তাদের দমনে ঔপনিবেশিক শাসকের নৃশংসতা উভয়ই ব্রিটিশ পাঠকের শিহরণ জাগালেও শেষাবধি তারাও রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের মত শিক্ষিত দেশীয় প্রজার মতোই মনে করেছিল যে, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ন্যায্য। *British and Foreign Review* পত্রিকায় জনৈক নাম-না-জানা আলোচক টেইলরের জনপ্রিয় উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখেন যে, এই উপন্যাস প্রমাণ করে:

> (T)he influence which the energy of our government in India has had in extirpating crimes which appeared to be indigenous in the soil.... [W]herever the power of England

---

[10] কাজের সূত্রে নর্মদা উপত্যকায় থাকার সময়ে স্লিম্যান জব্বলপুরের কাছে বড়া সিমলা পাহাড়ের আশেপাশে খনন করে বিভিন্ন রকমের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। তার মধ্যে কতগুলি ডায়নোসরের জীবাশ্মও ছিল। সেই নুনাগুলি তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে ও লন্ডনে পাঠান। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড লাইডেকার ঐ বর্গের ডায়নোসরের নাম দেন *Titanosaurus Indicus.* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফিলিপ মেডোস টেইলরও ভারতের মেগালিথ বা বৃহদশ্মীয় সংস্কৃতি বিষয়ে চর্চা করতেন।

[11] William H. Sleeman, *Ramaseeana, or a Vocabulary of a Peculiar Language used by the Thugs, With an Introduction and Appendix Descriptive of the System Pursued by that Fraternity ad of the Measures which have been adopted by the Supreme Government of India for its suppression* (Calcutta : O. H. Huttmann, Military Orphan Press, 1836). আখ্যাপত্রে অবশ্য লেখকের নাম ছিল না, মুখবন্ধে স্লিম্যানের নাম ছিল।

[12] সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), বাঁকাউল্লার দপ্তর (কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১৩), পৃ. ২০

[13] রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, পুলিস ও লোকরক্ষা, (সম্পা.) অশোক উপাধ্যায় ও অরিন্দম দাশগুপ্ত (কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ [১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ]), পৃ. ১২-১৩

> extends, we trust that some sufficient marks are discernable of the progress of Christian civilization.[14]

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে খ্যাতনামা গ্রিক-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ফ্রেডেরিক হোম আরও জোর দিয়ে বলেন যে, ঠগীদের কার্যকলাপ বন্ধ করতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন দরকার:

> To the vigilance of the British Government in India, has been due the first complete detection of Thuggee, in its real character of an organized and systematic fraternity; and, if under the same sway, this monstrous hybrid of superstition and cruelty is destined to be finally eradicated, a title will thus be earned to the gratitude of the natives of India, which will alone make the benefits of our later administration more than atone for the injustices and rapacity which marked our early acquisitions of Indian territory.[15]

অতএব, এটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিতর একটা অংশের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ঠগী ও ডাকাত— এই দুই চরিত্রকে ঘিরেই ঔপনিবেশিক অপরাধীর আদিকল্প নির্মিত হয়েছিল। আর তার বিপরীতে আইনের শাসনের প্রবর্তক, আলোকদীপ্ত আধুনিক শৃঙ্খলারক্ষকের ধারণাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঠগীদমন বিভাগের বড়কর্তা ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগী পুলিশ বিভাগের প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট 'মহাত্মা' স্লীম্যান 'মহোদয়'ই হয়ে ওঠেন সেই আলোকদীপ্ত আধুনিক শৃঙ্খলারক্ষক তথা নব্য পুলিশ গোয়েন্দার আদিছাঁচ।

বস্তুত, ঠগী-বৃত্তান্ত ও তার দমনের কৌশল এক নতুন ধরনের আখ্যান-গোত্রের জন্ম দিয়েছিল, যার দ্বারা গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকের আগাম দীক্ষা ঘটেছিল বলা যেতে পারে। দ্রুতভিত্তিতে ঠগীদের চিহ্নিত করা, সেই কাজে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা, অপরাধীদের শাস্তিদানের মাধ্যমে শান্তি ও সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতি বজায় রাখা— ঠগীদমনের মধ্যে ভবিষ্যত গোয়েন্দা আখ্যানের সবকটি বৈশিষ্ট্যের বীজ নিহিত ছিল। আর তাই ঠগীদমনের বৃত্তান্তগুলি রোমহর্ষক উত্তেজনাপূর্ণ পাঠযোগ্য আখ্যান হিসাবে লেখা হতে থাকে ও ইংল্যান্ডে সেগুলির বিপুল জনপ্রিয়তা 'মন্দ' পুলিশের বিপরীতে 'ভাল' পুলিশের ছাঁচ তৈরি করে দেয়, যে ভাল পুলিশ ইংরেজ নৈতিকতার জাতীয় আদর্শ বজায় রেখে উপনিবেশে শান্তি ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

স্বাভাবিকভাবেই, উপনিবেশপ্রেমী ভিক্টোরীয় সমাজের ইংরেজ পাঠকের কাছে স্লীম্যান ও তাঁর সহযোগীদের কার্যকলাপ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিপুল জনপ্রিয় ছিল। ব্রিটেনে ঠগী-দমন-বৃত্তান্তের বাজার ধরতে অনেকেই লিখতে শুরু করেছিলেন। স্লিম্যানের নিজের লেখাতো ছিলই, তার পাশাপাশি এডোয়ার্ড থর্নটনের *Illustrations of the History and Practices of the Thugs: And Notices of Some of the Proceedings of the Government of India, for the Suppression of the Crime of Thuggee* (১৮৩৭), স্লিম্যানের আত্মীয় ও ভারতে চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত হেনরি স্প্রাইয়ের *Modern India* (১৮৩৭), কালেব রাইটের *Lectures on India* (১৮৪৯), চার্লস হার্ভির *Some Records of Crime*

---

[14] উদ্ধৃতির সূত্র: Mary Poovey, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[15] উদ্ধৃতির সূত্র: তদেব, পৃ. ৪

(১৮৯২) প্রভৃতি বইয়ের নাম করা যায়। সমকালীন পত্রিকাগুলিতেও— যেমন, *Edinburgh Review* এবং *Blackwood's Magazine*— ঠগী বিষয়ে বহু লেখা ছাপা হত।[16]

স্লীম্যান বহু পরিশ্রমে ঠগীদের বংশলতিকা তৈরি করেছিলেন। সেই শাখা-প্রশাখার ভিত্তিতে কেবল ঠগীদের ধরলেই চলবে না, তারা যে সত্যই দোষী তার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। তবেই ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত হবে ও সভ্যতামদগর্বী ইংরেজের আইনের শাসন বলবৎ হবে। স্লিম্যানের নাতি ও জীবনীকার জেমস স্লিম্যান লিখেছেন: "with these genealogical trees to work upon, [operated] the machinery for its suppression. . . . [and the] equally arduous task of obtaining the necessary evidence, since . . . even the most notorious Thug had to have a fair trial."[17] স্লীম্যানের অভূতপূর্ব কর্মকুশলতায় ব্রিটিশ জনতার কাঙ্ক্ষিত ন্যায়ের শাসনের সঙ্গে নব্য পুলিশ-কাঠামোর গাঁটছড়া পোক্ত হয়েছিল। ভারতীয় পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করে স্বয়ং স্লীম্যানের বক্তব্য ছিল ভারতে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার প্রসার ও সেই ক্ষমতার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের মধ্যে যে ফাঁক থেকে গেছে তা ভরাট করা দরকার।[18] সেই উদ্যোগের থেকেই ঠগী-পুলিশ বিভাগের পথচলা এবং সেই কাজে উপনিবেশের অগ্রগামী ভূমিকা সমকালে ও পরবর্তীকালেও আলোচিত হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ-শিক্ষিত আই.সি.এস স্যর পার্সিভ্যাল গ্রিফিথ্‌স্ তাঁর বইতে লিখেছেন যে:

> India can fairly claim to have been ahead of Britain in realizing the need for specialist organizations for the investigation of certain forms of crime… In India, 1835 saw the formation of the Thagi and Dakaiti Department, which was in effect a Criminal Investigation Department concerned with particular forms of crime… All the modem organizations… were a natural development from the new and expanded functions of the Thagi and Dakaiti Department… the pattern was logical and resulted from two main facts. First, although the Government of India had an overriding responsibility for law and order, the local or provincial governments were responsible for its administration, and secondly, that the *Government of India and the provincial governments were concerned not only with crime, but also with the collection of information regarding political or social movements which might affect the stability of the country*.[19]

---

[16] Caroline Reitz, *Detecting the Nation : Fictions of Detection and the Imperial Venture*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[17] উদ্ধৃতির সূত্র: তদেব, পৃ. ২৭

[18] জনৈক আলোচক দেখিয়েছেন যে, ভারতে পুলিশ ব্যবস্থা সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করার ক্ষেত্রে স্লিম্যান "our power in India" এবং "the justification of that power"— এই দুয়ের ফারাক নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ. ৩০

[19] Sir Percival Griffiths, *To Guard My People: The history of the Indian police* (London: Ernest Benn Limited & Bombay: Allied Publishers Private Limited, 1972 [1971]), পৃ. ৩৪২ (নজরটান সংযোজিত)

বস্তুত, ভারতে ঠগীদমনে সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে লন্ডনে মেট্রোপলিটান পুলিশ বিভাগে গোয়েন্দা শাখার শুরুয়াদ হয়, যে শাখা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন চার্লস ডিকেন্স।[20] ঠগী-দমন-আখ্যান পড়ে ব্রিটেনের শিক্ষিত জনতা আশ্বস্ত হয়েছিল, ঔপনিবেশিক প্রশাসকরাও ভারতীয়দের ধন-প্রাণের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।[21]

ঔপনিবেশিক প্রজাও নাকি 'কৃতজ্ঞচিত্তে' সেই উদ্যোগের গুণকীর্তন করত। গ্রিফিথ্‌স্ তাঁর পূর্বোক্ত বইতে লিখছেন যে, এমনকী ১৯৪০-এর দশকেও আম ভারতীয় জনতা সেই ঠগী-দমনের স্মৃতি ভুলতে পারেনি:

> In the forties of the present century, the office of the Intelligence Bureau in Simla was known to rickshaw wallahs as the Thagi Daftar and the memory of a great British success in suppressing an odious crime was thus kept alive in the speech of humble folk.[22]

কিন্তু, এহেন জনমোহিনী কার্যকলাপ সত্ত্বেও, ঠগী দমনের পদ্ধতি নিয়ে আগাগোড়া সংশয়-প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল। ঠগীদের ফাঁসির শাস্তিবিধান নিয়ে সমালোচনা ছিলই। উপরন্তু, বলপ্রয়োগ করে স্বীকারোক্তি আদায়ের পদ্ধতি সংস্কার-মনোভাবাপন্ন ব্রিটিশ পাঠকের অনুভূতির সঙ্গে খাপ খায়নি। শারীরিক অত্যাচারের মাধ্যমে দোষ কবুল করানো ও তথ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্টভাবে অপরাধী চিহ্নিত করার মধ্যে যে পরস্পরবিরোধিতা আছে এবং তা যে ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার কিংবদন্তীটিকেই সংশয়ের মুখে ফেলে দেয়, সে সম্পর্কে স্লীম্যানও অবহিত ছিলেন। দুর্ধর্ষ ঠগী থেকে পুলিশের চর বনে যাওয়া ব্যক্তির সাক্ষ্য আদৌ গ্রাহ্য কিনা, তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বুঝেই কীভাবে বিভিন্ন জবানবন্দী মিলিয়ে 'সত্য'-উদ্ধারে ঠগী পুলিশ ব্রতী তার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেছেন স্লীম্যান। ধরা পড়ে যাওয়া ঠগীরা অনুপুঙ্খ বিস্তারে তাদের কার্যকলাপের বিরবণ দিত। কবে, কোথায় তারা প্রতিটি খুন করেছে তা খুঁটিয়ে নথিবদ্ধ করা হত। একইসঙ্গে তাদের দলের বাকিদের নাম-ধাম-জাত প্রভৃতি সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ হত। জেনারেল সুপারিন্টেডেন্টের দফতর থেকে সেই নথি ও কাদের ধরতে হবে তার তালিকা নীচুতলার পুলিশদের কাছে চলে যেত। তাদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনী ও ধরা-পড়া ঠগী-সাক্ষীরাও থাকত।

কিন্তু, কীভাবে বোঝা যেত যে, ধরা-পড়ে-যাওয়া ঠগীরা ঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছে? স্লিম্যানের ঐ সংশয়ের কেন্দ্রে ছিল সাক্ষ্য ও সূত্র এবং তার থেকে নির্বিকল্প প্রমাণে উত্তীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা। 'অপরাধী' ঠগীর স্বীকারোক্তির 'চূড়ান্ত সত্যমূল্য' বিষয়ে চিন্তিত স্লিম্যান সেই বিষয়টি সরাসরি আলোচনাতেও এনেছিলেন:

> Except in the rare instance of a gang being apprehended with stolen property in possession, which the relations of the murdered persons were there to identify, the only witnesses who could ever be brought against them were some of their own fraternity; and

---

[20] Elizabeth Dale Samet, ""When Constabulary Duty's To Be Done": Dickens and the Metropolitan Police", *Dickens Studies Annual*, Vol. 27 (1998), পৃ. ১৩১-১৪৩

[21] লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হরউড মন্তব্য করেছিলেন: "of all the benefits which British Rule has brought to India the suppression of Thuggee must, to the Indian, constitute one of the most outstanding". দ্রষ্টব্য: Caroline Reitz, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[22] Sir Percival Griffiths, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১। বিশেষত বইয়ের দশম অধ্যায়টি প্রাসঙ্গিক — 'The Thagi and Dakaiti Department', পৃ. ১২১-১৩৬

> the evidence of men whose preliminary step must be to confess themselves the most ruthless villains in existence, is naturally received with distrust…[23]

স্লীম্যান এবারে ঠিক গোয়েন্দার মত তথ্যের সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে তুলনা করছেন এবং লিখছেন, যখন একে অন্যের সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং স্থানিকভাবে দূরাগত দুই ঠগী একই ঘটনা ও একই অপরাধীদের বিবরণ দিচ্ছে তখন সেই দুয়ের সাদৃশ্য থেকেই তার সত্যতা নিশ্চিত হচ্ছে। উপরন্তু:

> When a Thug is arrested, he is brought direct to the officers' residence, and placed in a row between unconcerned people. The approvers, who have been detained at the stations, are then sent for singly, and required to point out any individual of the party whom they may know. If they all fix on the same individual, and their statements also agree with those previously made by others, it is impossible that better evidence can be had.[24]

এখানে খেয়াল করা জরুরি যে, দেশীয় সমাজের প্রতিভূ ঠগীর বয়ান আদৌ নির্ভরযোগ্য কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকলেও, ইংরেজ পুলিশের অধিকর্তা স্লিম্যান সাহেব যেভাবে সেইসব ধোঁয়াশাচ্ছন্ন বিবরণ থেকে 'অপরাধী'কে চিহ্নিত করছেন, সেই পদ্ধতি নিয়ে পাঠকের সংশয়ের বিশেষ অবকাশ ছিল না। তাছাড়া, কেবল আদর্শগতভাবে ইংরেজ ন্যায়পরায়ণতা ও আইনের শাসনের বুলি আউড়ালেই চলবে না, তাকে জনসমক্ষে বাস্তবগ্রাহ্য চেহারায় হাজির করতেও হবে। ঠগী-পুলিশ কর্তৃক অপরাধের তদন্ত ও অপরাধী নির্ণয় সম্পর্কিত স্লিম্যান-প্রদত্ত এই বিস্তারিত বিবরণ ও কার্যপদ্ধতি থেকে তাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে সংশয় থেকেই ক্রমে নব্য গোয়েন্দার বিশেষ ছাঁচটি গড়ে উঠেছিল এবং বলাই বাহুল্য, সেই ছাঁচ কতকটা ব্যক্তি-স্লিম্যানের আদল পেয়েছিল। আদতে পুলিশি ব্যবস্থার গা থেকে উপনিবেশের গন্ধ দূর করে তাকে ইংরেজ ন্যায়-নীতিবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার কাজে ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর বড় ভূমিকা ছিল। ফলে, গোয়েন্দা যে একান্তই একটি ইংরেজ চরিত্র, তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ডিকেন্সের লেখা থেকেই স্পষ্ট। পুলিশি গোয়েন্দা ইংরেজ-সুলভ কৌতূহল ও নজরদারির প্রতীক। বস্তুত, কেউ কেউ মনে করেন যে, ঔপনিবেশিক ঠগী দমনে সফল কর্নেল স্লীম্যানের কঙ্কাল ও উপনিবেশের অভিজ্ঞতার অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংসের উপরে সাদা চামড়া চাপিয়ে ইন্সপেক্টর ফিল্ড ও বাকেট প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছিল।[25]

---

[23] William H. Sleeman, *The Thugs or Phansigars of India: comprising a history of the rise and progress of that extraordinary fraternity of assassins; and a description of the system which it pursues, and of the measures which have been adopted by the supreme government of India for its suppression*, Vol. 1 (Philadelphia: Carey and Hart, 1839), পৃ. ৬১

[24] তদেব, পৃ. ৭০

[25] Philip Collins, *Dickens and Crime*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-২১৯ এবং Caroline Reitz, *Detecting the Nation : Fictions of Detection and the Imperial Venture*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪২

‘অপরাধী’ কে? : ‘শিরোমিতি-বিদ্যা’[26] ও ঔপনিবেশিক ‘অপরাধী’র দৈহিকতা

স্লিম্যান ‘সাহেব মহোদয়’ যে সময়ে গলদঘর্ম হয়ে উপনিবেশে ঠগী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেই সময়েই গ্রেট ব্রিটেন ও প্রায় পুরো পশ্চিম ইওরোপেই অপরাধ নির্ণয় ও অপরাধীকে নিশ্চিত করে চিহ্নিতকরণ বা আগাম চেনা কীভাবে সম্ভব তার নানান ফন্দি-ফিকিরকে ‘বৈজ্ঞানিক’ গবেষণার স্তরে উত্তীর্ণ করা হয়। ‘ক্রিমিনাল্’ চেনার সেই খেলায় বহু শিক্ষিতজন ও সাম্রাজ্যপ্রণেতারা বুঁদ হয়েছিল। কোন্ সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষণ-চিহ্ন যার ভিত্তিতে সন্দেহ পরিণত হবে প্রতীতিতে, নিশ্চিত করে চিনে নেওয়া যাবে ‘ক্রিমিনাল্’ কে? সেই প্রশ্নের নিরসনে ক্রমে জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন দৈহিকতার নিরিখে অপরাধীর শনাক্তকরণের বিচিত্রবিদ্যা, যার মধ্যে সবথেকে বেশি চর্চিত ছিল ফ্রেনলজি।[27] মানুষের করোটি অর্থাৎ খুলির বিভিন্ন গড়ন ও পরিমাপ থেকে সম্ভাব্য অপরাধীকে চিহ্নিত করার এক ‘ছদ্ম’বিজ্ঞান। তবে ছদ্ম হলেও ঔপনিবেশিক শাসক ও ঔপনিবেশিক প্রজার মননে-আচরণে তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। সেই করোটি-চর্চার আদি-কাঠামোর উপরেও ছিল ঔপনিবেশিক ‘ঠগী’র ছায়া।[28]

আঠারো শতকের তখন প্রায় শেষ, ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) অভিঘাতে পশ্চিম ইউরোপে ‘পুরাতনতন্ত্র’ প্রমাদ গুনছে। বিপ্লবের ধ্বংসসাধনে কৃতসংকল্প রাজশক্তি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় বসে নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অংশ হিসাবেই ডাক্তার ফ্রাঞ্জ জোসেফ গল (১৭৫৮-১৮২৮) শুরু করেন করোটিবিদ্যার চর্চা। গল নিজে যদিও ফ্রেনলজি পরিভাষাটি ব্যবহার করেননি। ১৭৯০-এর দশকে ডাক্তার গল মূলতঃ অঙ্গসংস্থানবিদ্যা ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। যে বছর ফরাসী বিপ্লবের ‘উত্তরাধিকারী ও ধ্বংসক’ নেপোলিয়ন অস্টারলিৎজ় ও ট্রাফলগারের যুদ্ধে জড়িয়ে ছিলেন এবং রাশিয়া অভিযান শুরু করেন সেই ১৮০৫-এ অনুগামী শাগরেদ য়োহান গাসপার স্পুর্জহাইমকে (১৭৭৬-১৮৩২) নিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা করতে বেরোলেন গল। নিজের ধারণার বাস্তবতা বিচার করতে ঘুরতে লাগলেন জেলখানা ও পাগলাগারদ। ‘অপরাধী’ ও

---

[26] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ফ্রেনলজি’ শব্দের বাংলা পরিভাষা করেছিলেন ‘শিরোমিতি-বিদ্যা’। প্রসঙ্গটি পরে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

[27] ব্রিটিশ সমাজে ফ্রেনলজির ইতিহাস আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: David de Giustino, *Conquest of Mind: Phrenology and Victorian Social Thought* (London : Routledge, 2016 [1975]), Roger Cooter, *The cultural meaning of popular science: Phrenology and the organization of consent in nineteenth-century Britain* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), John van Wyhe, *Phrenology and the Origins of Victorian Scientific Naturalism* (London & New York : Routledge, 2016 [2004], William Hughes, *The Dome of Thought : Phrenology and the nineteenth-century popular imagination* (Manchester: Manchester University Press, 2022). আশ্চর্য এই যে, এই বইগুলিতে ফ্রেনলজির সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বিষয়ে কোনো গভীর আলোচনা নেই! অথচ, ঔপনিবেশিক প্রজার তথাকথিত পশ্চাৎপদতা প্রমাণের ও তার ভিত্তিতে উপনিবেশ প্রসারের যৌক্তিকতা প্রমাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকৌশল ছিল ফ্রেনলজি। সেই পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে কেবল ব্রিটেনের নিরিখে ফ্রেনলজি বিষয়ে আলোচনা ইউরোপ-কেন্দ্রিক একদেশদর্শী ইতিহাস গবেষণার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

[28] ফ্রেনলজির আদিপর্ব ও তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিতত্ত্বের সংযোগ নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: James Poskett, *Materials of the Mind: Phrenology, Race, and the Global History of Science, 1815-1920* (Chicago & London: University of Chicago Press, 2019). ঔপনিবেশিক ভারতে ফ্রেনলজি চর্চার আদিপর্ব নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Shruti Kapila, “Race Matters: Orientalism and Religion, India and Beyond c.1770–1880”, *Modern Asian Studies*, Vol. 41, No. 3 (May, 2007), পৃ. ৪৭১-৫১৩, এবং Kim A. Wagner, *The Skull of Alum Bheg : The Life and Death of a Rebel of 1857* (Oxford: Oxford University Press, 2017) ও “Confessions of a Skull: Phrenology and Colonial Knowledge in Early Nineteenth-Century India”, *History Workshop Journal*, No. 69 (Spring, 2010), পৃ. ২৭-৫১। Poskett-এর বইয়েও ঔপনিবেশিক ভারতে ফ্রেনলজি চর্চা বিষয়ে আলোচনা আছে।

‘পাগল’-এর সম্পর্ক নিয়ে ফ্রেনলজিবিদরা অনেক মাথা ঘামিয়েছিলেন। ১৮০৭-এ গল প্যারিতে থিতু হওয়ার কয়েক বছর পরে বেরোয় তাঁর কয়েকটি বই। সবক্ষেত্রেই সহযোগী লেখক বলাবাহুল্য স্পুর্জহাইম। মাথার ও খুলির প্লাস্টার ছাঁচ এবং জীবন্ত মানুষের করোটির গড়ন প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে গলই কার্যত ফ্রেনলজির ভিত তৈরি করেন।[29]

ফ্রেনলজি আদৌ কতটা বিজ্ঞান তা নিয়ে সমকালেই নানান মতবিরোধ সত্ত্বেও উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার, পশ্চিম ইওরোপে আত্মগর্বী জাতীয়তাবাদী অহংয়ের বাড়বাড়ন্ত এবং তার সঙ্গে জাতি (Race) তত্ত্বের সংমিশ্রণ মানুষের খুলিচর্চার পালে বাতাস জুগিয়েছিল।[30] বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেনলজির চর্চা, সেই সম্পর্কিত গবেষণাপত্র প্রকাশ ও করোটি বা খুলির সংগ্রহশালা গড়ে তোলার ধুম পড়ে যায়। পশ্চিম ইওরোপে কে কত করোটি জড়ো করে ‘বৈজ্ঞানিক’ চর্চা করতে পারে তার প্রায় যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেয়েছিল। গলের গবেষণায় ফ্রেনলজির আদত উদ্দেশ্য ছিল মানবমনের গোপন অলি-গলির হদিশ করা। কিন্তু, ক্রমে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আবহে জাতিগত উৎকর্ষ ও উচ্চাবচতা প্রমাণের ‘ফলিত বিজ্ঞান’ হিসাবে সেই চর্চা ফ্রান্সে, গ্রেট ব্রিটেনে ও পশ্চিম ইওরোপের অন্যত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[31]

বস্তুত, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান-উৎসাহী জর্জ হেনরি লুইস (১৮১৭-১৮৭৮) লেখেন যে, যদিও ফ্রেনলজির আদি উৎপত্তি জর্মনিতে, কিন্তু ইওরোপব্যেপে তার চমকপ্রদ প্রভাব ফ্রান্সের অবদান। মস্তিষ্কের কাজকারবারের শারীরবৃত্তীয় তত্ত্ব ফ্রেনলজিকে মধ্যবিত্তের সামাজিক-দর্শনে পরিণত করার পিছনে ফরাসি বিপ্লবের ভূমিকা ছিল। আদতে ফরাসি বিপ্লবের বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের হাতে পড়ে ফ্রেনলজি আপাত বৈজ্ঞানিকতার আদলে সমাজবিজ্ঞানের ছাঁচ পেয়েছিল। কিন্তু, নেপোলিয়ন-পরবর্তী ফ্রান্সে বুর্বোঁ রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান-প্রসূত রক্ষণশীল আবহে ফ্রেনলজির বিকাশ থমকে গিয়েছিল।[32] সেই পর্যায়েই শিল্পোন্নত নাগরিক উদারনৈতিক রাজনীতির ইংরেজি

---

[29] Francis Joseph Gall & Johann Caspar Spurzheim, *Recherches sur le système nerveux en général, et sur celui du cerveau en particulier; mémoire présenté à l'Institut de France, le 14 mars 1808, suivi d'observations sur le rapport qui en a été fait à cette compagnie par ses commissaires* [*Research on the nervous system in general, and on that of the brain in particular; memoir presented to the Institut de France, March 14, 1808, followed by observations on the report made to this company by its commissioners*] (Paris: F. Schoelle et H. Nicolle, 1809) এবং *Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier. Tome 1 /, avec des observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par la configuration de leurs têtes* [*Anatomy and physiology of the nervous system in general and of the brain in particular. Volume 1 /, with observations on the possibility of recognizing several intellectual and moral dispositions of man and animals by the configuration of their heads*] (Paris: F. Schoelle, 1810)

[30] Neil Davie, “Mapping the Racial Other: Phrenology, Race and Colonial Discourse in Britain, c. 1810-1850” (https://www.researchgate.net/publication/340528400_Mapping_the_Racial_Other_Phrenology_Race_and_Colonial_Discourse_in_Britain_c_1810-1850). মূল ফরাসি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল: “Garder la race en tête: Phrénologie, race et discours colonial en Grande-Bretagne, c.1810-1850”, in Michel Prum (ed.), *Racialisations dans l’aire anglophone* (Paris: L’Harmattan, 2012), পৃ. ১৭-৪৯

[31] ফরাসি সমাজে ফিজিওনমি ও ফ্রেনলজিভিত্তিক জাতিতত্ত্ব নির্মাণ ও সেই অনুযায়ী বিভিন্ন বর্গীয় পরিচয় তৈরির ইতিহাস আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Martin S. Staum, *Labeling People: French Scholars on Society, Race, and Empire, 1815–1848* (Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2003).

[32] Stephen Tomlinson, *Head Masters : Phrenology, Secular Education, and Nineteenth-Century Social Thought* (Tuscaloosa : The University of Alabama Press, 2005), পৃ. xii.

জলহাওয়ায় ফ্রেনলজির দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল; কার্যত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য কায়েমের মতাদর্শগত ভিত্তি হয়ে উঠেছিল ফ্রেনলজি। 'অধঃপতিত বর্বর' কৃষ্ণাঙ্গদের আদিমতার নিকষ অন্ধকার থেকে উৎকৃষ্ট শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার আলোকবৃত্তে আনতে যে 'বোঝা' ফরসা মানুষকে বহন করতে হবে, তার জন্য প্রভুর জান কবুল।[33] সেই কাজে গোড়া থেকেই স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল অন্যতম মূল ঘাঁটি। গল-শিষ্য স্পুর্জহাইমের বক্তৃতার প্রভাবে এডিনবরায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্রিটিশ ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়। তার দুবছর পরে লন্ডনে ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি গড়ে ওঠে (১৮২২)।[34] 'অপরাধী'র করোটির গড়ন চর্চা করে অপরাধের আগাম হদিশ পাওয়া নিয়ে উৎসাহ তখন তুঙ্গে।

প্রভুত্বপরায়ণ গ্রেট ব্রিটেনে উনিশ শতাব্দীর আদিপর্ব থেকেই মহাসমারোহে শুরু হয়েছিল খুলি জমানোর কাজ। ঔপনিবেশিক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল শ্বেতাঙ্গ ইওরোপীয়ের জাতিগত উৎকর্ষ প্রচার, এবং ঔপনিবেশিক প্রজাদের 'আদিম' বলে বর্গীকরণ করা।[35] এডিনবরা থেকে পাশ করা জন উইলিয়ম জ্যাকসন তাঁর *Ethnology and Phrenology, as an Aid to the Historian* (১৮৬৩) বইতে এই উচ্চাবচ বর্গীকরণকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন: "contemplated through the medium of Comparative Anatomy, a Negro is but the *embryonic*, and a Mongol the *infantile* form of the Caucasian or *perfect* man."[36] বস্তুত, আফ্রিকীয় নরখুলি সম্পর্কে জ্যাকসনের মন্তব্য আদতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের আদর্শে নিহিত পিতৃত্বসুলভ কর্তৃত্বের প্রকাশ। তাঁর মতে, 'অসহায় শিশু'সুলভ আফ্রিকার বাসিন্দাদের ইষ্টির জন্য ইওরোপের অভিভাবকত্ব প্রয়োজন। 'কালো'কে 'সভ্য' 'মানুষ' করার জন্য যে প্রাণান্তকর বোঝা শ্বেতাঙ্গরা বয়ে বেড়ায়, তার বিনিময়ে তাদের বস্তুগত লাভের হিসাবও কষেছেন জ্যাকসন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আদত যুক্তি, তার আঁতের কথা যে শোষণ— তাও তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে গেছে:

---

[33] অস্ট্রেলিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রসারের পর্বে ফ্রেনলজির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Alexandra Roginski, *The Hanged Man and the Body Thief: Finding Lives in a Museum Mystery* (Australia : Monash University Publishing, 2015).

[34] Kim A. Wagner, "Confessions of a Skull: Phrenology and Colonial Knowledge in Early Nineteenth-Century India", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[35] কিম ওয়াগনার লিখেছেন: "Race was also a significant element of early phrenology, especially in the colonial context where skulls of 'primitive' people were collected and the scientific examination often made to legitimize colonial policies." তদেব, পৃ. ৩৮

[36] J. W. Jackson, *Ethnology and Phrenology as an aid to the Historian* (London: Trübner & Co., 1863), পৃ. ৩৪ (নজরটান সংযোজিত)। সেই বইয়ের ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের একটি সংস্করণ মহারানি ভিক্টোরিয়াকে দেওয়া হয়েছিল। https://www.rct.uk/collection/1090389/ethnology-and-phrenology-as-an-aid-to-the-historian-with-a-memoir-of-the-author

> We can teach him much more, and it will be in our interest to do so. Tropical Africa must not remain forever a commercial desert. Its products would enrich the world, and as a market, its demand might stimulate the industry of all Europe.[37]

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রে গোটা পৃথিবী থেকে ঔপনিবেশিক প্রজার কাটা মুণ্ডু জড়ো করা হয়। সেই শত শত খুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল 'বৈজ্ঞানিক' নিরীক্ষার মাধ্যমে একটিই প্রশ্নের নিরসন— 'অপরাধী কে?'।

এডিনবরা থেকে পাশ করা কতিপয় অত্যুৎসাহী ডাক্তার ফ্রেনলজিকে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসার ও পোক্তকরণে ব্যবহার করতে বিচিত্র উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এডিনবরার সেই খুলি-সংগ্রহে সাতটি মুণ্ডু ছিল ভারতীয়দের।[38] ঐ সাতজনের ফাঁসির শাস্তি হয়েছিল। সেই দণ্ড কার্যকর হওয়ার পরে 'ঠগী' স্লিম্যানের তুতো-ভাই ও বাংলা প্রদেশের মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাক্তার হেনরি হারপুর স্প্রাই সেই মাথাগুলিকে ধড় থেকে কেটে ভাল করে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ বাক্সবন্দী করে আনুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন (১৮৩৩) ব্রিটিশ সরকারের চিফ সেক্রেটারি জর্জ সুইনটনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন এডিনবরার ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটিতে। ততদিনে, উনিশ শতকের ক্রমপরিণত পর্বে ফ্রেনলজির সঙ্গে জাতি তত্ত্ব জুড়ে গিয়ে এক বিশ্বজনীন বর্গীয় উচ্চবচতার নির্মাণ জোরদার হয়ে উঠেছিল। গ্রেট ব্রিটেনে 'শিরোমিতিবিদ্যা' চর্চার বাহুল্য হতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাটা মুণ্ডু নিয়ে এসে জড়ো করা হয় গবেষণাগারে, এবং তার নিরিখে ককেশীয়, ভারতীয়, আফ্রিকীয় প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর উল্লম্ব বর্গীকরণ শুরু হয়।

করোটির সঙ্গে জাতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্রেনলজি ক্রমে জনমোহিনী চর্চায় রূপান্তরিত হয়। 'জাতিগত করোটি তত্ত্ব' অনুসারে বলা হতে থাকে যে একই জাতির সমস্ত মানুষের প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। বস্তুত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে এধরনের উদ্ভট সাধারণীকরণকে প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল বুঝে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে শিরোমিতিবিদ্যার আদিগুরু জর্জ কুম্ব (১৭৮৮-১৮৫৮) গোয়েন্দার মতই বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের যুক্তি গ্রহণ করেন— যেহেতু ব্যক্তির সমাহারেই জাতি গঠিত হয়, তাই একজন ব্যক্তির চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য থেকেই সমগ্র জাতির চরিত্রের

---

[37] তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮। 'আর্য' কারা তা নিয়েও জ্যাকসনের উৎসাহ ছিল। তাঁর মতে, তিন হাজার বছরের ইতিহাস 'racial conflict'-এর আখ্যান, যা নাকি তাঁর সমকালেও জারি ছিল। সেই জাতিদ্বন্দ্বের সমকালীন নমুনা হিসাবে তিনিও সেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহকেই টেনে এনেছিলেন: "The conquest of India by the English, and that terrible mutiny, —which was intended to restore the effete descendant of the Great Mogul to the imperial throne of his illustrious ancestors, —were but the later incidents of its continuation". দ্রষ্টব্য: J. W. Jackson, "The Aryan and the Semite", *The Anthropological Review*, Vol. 7, No. 27 (Oct., 1869), পৃ. ৩৩৩-৩৬৫

[38] ঔপনিবেশিক প্রশাসকের বয়ান অনুযায়ী সেই সাতটি খুলি ছিল 'Dirgpaul,' 'Gunga Bishun,' 'Soopher Sing,' 'Hosein Alee Khan,' 'Keramut Khan,' 'Buksha,' এবং 'Golab Khan'-এর। খুলিগুলি পাঠানোর সময়ে ঐ সাতজনের 'অপরাধময় অতীত' বিষয়ে ডাক্তার স্প্রাই যে সবিস্তার 'নোট' পাঠিয়েছিলেন সেটিই উপর্যুক্ত শিরোনামে *Phrenological Journal*-এ ছাপা হয়। দ্রষ্টব্য: Henry Harpur Spry, "Some Account of the Gang-murderers of Central India, commonly called Thugs; Accompanying the Skulls of Seven of Them", *The Phrenological Journal and Miscellany*, Vol. III, December 1832 - June 1834, পৃ. ৫১১-৫২৪

হদিশ পাওয়া যাবে।[39] স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তির উদ্ভট মারপ্যাঁচে উদোর পিণ্ডি (বা এক্ষেত্রে মুণ্ডু) বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে আদতে দুটো সারকথা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছিল— প্রথমত, এশীয় ও আফ্রিকীয় জনগোষ্ঠীর তুলনায় ইওরোপীয় জনগোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়ত, সেই শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে নৈতিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের যোগের ভিত্তিতে তথাকথিত ঐ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীগুলির উপরে ইওরোপীয় আধিপত্য তথা উপনিবেশ ও দাসত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত। এহেন অধ্যাপক জর্জ কুম্বের কাছেই বাংলা থেকে স্প্রাইয়ের পাঠানো ঐ সাতটি খুলি পৌঁছেছিল। সেই সব খুলিরই সাধারণ বর্গীয় পরিচিতি ছিল — 'thug' অর্থাৎ ঠগী। ততদিনে প্রশাসনিকতার বিভিন্ন কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে ব্রিটিশ শাসক প্রমাণ করে ছেড়েছিল যে, ঠগীরা একটি 'জাত' এবং সেই জাতের সবাই 'অপরাধী'। প্রজন্মান্তরে বংশপরম্পরায় সেই 'অপরাধের প্রবৃত্তি' তাদের শিরায়-মজ্জায় বয়ে চলেছে।[40] সেই সাতটি মুণ্ডু কেবল যে খুলির চর্চার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়েছিল তাই নয়, ঔপনিবেশিক সমাজে 'ঠগী' দমন করে উপনিবেশে আইনের শাসন বলবতে সফল সাম্রাজ্যবাদের জয়গাথার প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ কর্তিত মস্তক-সপ্তক।[41] ফলে, মাত্র সাতটি খুলির বিচারে ঔপনিবেশিক শাসকের 'বৈজ্ঞানিক' বক্তব্যে অগণিত ভারতবাসী কেবল ঔপনিবেশিক প্রজাই নয়, তার সঙ্গে সম্ভাবনাময় 'অপরাধী' প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, এই সূত্র ধরে বলা দরকার যে, পরবর্তীকালে এই বিষয়ে প্রবল উৎসাহী ছিলেন স্যর হার্বার্ট হোপ রিজ়লে (১৮৫১-১৯১১)। তাঁর হাত ধরেই আপাদমস্তক অপবিজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও একসময়ে নৃদেহ-পরিমাপবিদ্যা বা *Anthropometry* ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। মানবখুলি পরিমাপ ও আনুষঙ্গিক নানান চর্চার বাহ্য-বৈজ্ঞানিকতার আড়ালে আদতে জাতিগত উৎকর্ষের তত্ত্ব প্রমাণ করাই ছিল রিজ়লের অভীষ্ট। ১৮৮৫ সালে বাংলার নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার দায়িত্ব পান তিনি। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রিজ়লের "The Study of Ethnology in India" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং তার মাধ্যমেই ভারতীয় সভ্যতার 'জাতিগত তত্ত্ব' উপস্থাপিত হয়। ১৮৯১ সালেই চার খণ্ডে *The Tribes and Castes of Bengal* প্রকাশ করেন রিজ়লে। সেই চার খণ্ডে যেমন নৃতাত্ত্বিক পরিভাষা ছিল তেমনই ঠাঁই

---

[39] এডিনবরা ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জর্জ কুম্ব-এর *The Constitution of Man, Considered in Relation to External Objects* বইটি ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে এডিনবরা থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটি বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৮৬০ পর্যন্ত কেবল ব্রিটেনেই নাকি দশ হাজার কপি বিক্রি হয়! এমনকী চার্লস ডারউইনের *On the Origin of Species* (১৮৫৯) বইয়ের থেকেও কুম্বের বইটি বেশি বিক্রি হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: Anthony A. Walsh, "George Combe: A portrait of a heretofore generally unknown behaviorist", *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, Volume 7, Issue 3, 1971, পৃ. ২৬৯-২৭৮

[40] প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Radhika Singha, "'Providential' Circumstances: The Thuggee Campaign of the 1830s and Legal Innovation", *Modern Asian Studies*, Vol. 27, No. 1, Special Issue: *How Social, Political and Cultural Information Is Collected, Defined, Used and Analyzed* (Feb., 1993), পৃ. ৮৩-১৪৬ এবং Mark Brown, "Crime, Governance and the Company Raj: The Discovery of Thuggee", *The British Journal of Criminology*, Vol. 42, No. 1 (Winter, 2002), পৃ. ৭৭-৯৫

[41] ওয়াগনার লিখেছেন: "(T)he skulls became *imperial trophies*; a physical sign of the colonial state's omnipotence, they provided incontestable proof that the British were indeed bringing civilization to India and suppressing barbaric practices like 'Thuggee'." অবশ্য, ওয়াগনার এটাও জানিয়েছেন যে, ব্রিটিশ মিউজিয়মে যেমন 'ঠগী' মূর্তি প্রদর্শিত হয়েছিল, তেমন জনসমক্ষে এডিনবরাস্থিত ঐ খুলিগুলি কখনও দেখানো হয়নি। দ্রষ্টব্য: Kim A. Wagner, "Confessions of a Skull: Phrenology and Colonial Knowledge in Early Nineteenth-Century India", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯ এবং অন্ত্যটীকা ৬৫

পেয়েছিল নৃদেহ-পরিমাপ সংক্রান্ত হরেক উপাত্ত।[42] বস্তুত, ক্রিস্পিন বেট্‌স-এর মতে অপবিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতিবৈষম্যবাদের চূড়ান্ত রূপ ঐ চারটি খণ্ড।[43] ভারতীয় জনসমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় নৃদেহ-পরিমাপবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে রিজ়লে অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক ধারণার উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। করোটির গড়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিমাপ ও নাকের গড়নের মাপজোক মিলিয়ে-মিশিয়ে মানুষের বর্গীকরণের যে পন্থা রিজ়লে ঔপনিবেশিক সমাজে চালু করেছিলেন, তার 'বৈজ্ঞানিকতা' নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। খুব বেশি হলে মাত্র একশটি নমুনা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তিনি। আর তার ভিত্তিতেই ভারতীয় উপমহাদেশের জটিল সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সুনিশ্চিত সাধারণীকরণ করেন রিজ়লে। আবার অনেক সময়ে মোটে তিরিশটি করোটির গড়ন পরীক্ষা করেই কোনো কোনো জাত কিংবা জনজাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে তিনি 'শেষ কথা' বলে দেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতার অঙ্গ হিসাবে এই জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তৃত্বের নির্মাণ যেভাবে ছদ্ম-বৈজ্ঞানিকতার আশ্রয় নেয়, সেখানে পরীক্ষার আগেই উপসংহার ঠিক করা থাকে। তাই মাত্র তিরিশটি খুলিই সেক্ষেত্রে যথেষ্ট— বিন্দুই সিন্ধুর সন্ধান দেয়। একদা জর্জ কুম্ব এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন আর পরে সেই পদ্ধতিই শার্লক হোমসের চমৎকারিত্বে 'সায়েন্স অব ডিডাকশন' নাম পায়।

কিছুটা সময় পিছিয়ে আবার ফেরা যাক এডিনবরা-বৃত্তান্তে। সেখান থেকে পাশ করা ডাক্তারদের অন্যতম ছিলেন জর্জ মারি প্যাটারসন। আদতে স্কটল্যান্ডের মানুষ প্যাটারসনের গবেষণার বিষয় ছিল 'মানসিক উত্তেজনা ও হিংস্রতার কারণ'। এডিনবরা ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন তিনি। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশে সার্জন পদে চাকরি পেয়ে বাংলা প্রদেশের চিকিৎসা বিভাগে নিযুক্ত প্যাটারসন বহু খুলি নাড়াচাড়া করে প্রমাণ করতে ব্যগ্র ছিলেন যে, ককেশীয়রাই উৎকৃষ্টতম। এমনকী, তাঁর বক্তব্য ছিল খ্রিস্টান বনে গেলে নাকি মানুষের খুলির গড়ন বদলে গিয়ে অধঃপতিত থেকে উন্নত হয়ে যায়।[44] কলকাতায় এসে প্যাটারসন যুক্ত হন এশিয়াটিক সোসাইটিতে।[45] ১৮২৩ সালে "On the phrenology of Hindostan" শিরোনামে এক সবিস্তার প্রতিবেদন লেখেন প্যাটারসন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ১ মে এডিনবরার ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির সভায় পঠিত ঐ রচনায় প্যাটারসন যেভাবে তাঁর বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার আদল দিতে চাইছিলেন, সেটি লক্ষণীয়:

---

[42] Thomas R. Trautmann, *Aryans and British India* (Berkeley and Los Angeles and London : University of California Press, 1997)

[43] বেট্‌স-এর ভাষায়: "the apotheosis of pseudo-scientific racism." দ্রষ্টব্য: Crispin Bates, "Race, Caste and Tribe in Central India: the early origins of Indian anthropometry", in Robb, Peter (ed.), *The Concept of Race in South Asia* (Delhi: Oxford University Press, 1995), পৃ. ২৩৭

[44] ফ্রেনলজি চর্চার আদিগুরুর অন্যতম স্পুর্জহাইম ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর প্রদত্ত এক বক্তৃতায় একটি খুলি দেখিয়ে বলেন যে, এই করোটির অনুন্নত কপাল দেখেই মালুম হয় যে এই ধরনের 'হতভাগ্য কপালওয়ালা জাতি কোনোভাবেই খ্রিস্টান হতে পারে না"। ফলে, সেই করোটি 'স্বাভাবিকভাবেই' উপনিবেশের কোনো অনুন্নত অখ্রিস্টীয় প্রজার। দ্রষ্টব্য: William Hughes, *The Dome of Thought : Phrenology and the nineteenth-century popular imagination*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

[45] প্যাটারসন প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Shruti Kapila, "Race Matters: Orientalism and Religion, পূর্বোক্ত, এবং James Poskett, *Materials of the Mind: Phrenology, Race, and the Global History of Science, 1815-1920*, পূর্বোক্ত। প্যাটারসনের চিঠিপত্রের সংগ্রহ সম্পর্কে জানার জন্য দ্রষ্টব্য: https://cpparchives.org/repositories/2/resources/965

> By the laws of induction, the comparison of cerebral development with mental manifestation clearly demonstrates, that diversities of faculty and feeling, among the same as well as among different races of the human species, must positively be referred to diversities of cerebral organization… and, for this purpose, to avoid resting in any case merely on probability and conjecture, I shall make use only of the twenty-four organs, which the experience of Phrenology has established.[46]

উক্ত প্রতিবেদনের শেষে কলকাতা-সংলগ্ন 'Insane Hospital' পর্যবেক্ষণ করে নিজের বক্তব্যও জুড়ে দেন প্যাটারসন। অবশেষে, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি। শিরোমিতিবিদ্যার প্রসার ও জনপ্রিয়করণে নিবেদিতপ্রাণ প্যাটারসন ব্যারাকপুরের কাছে মনিরামপুরে ফ্রেনলজিক্যাল স্কুল গড়ে তোলেন, যেখানে এই নিয়ে গবেষণা চালানো সম্ভব। তাঁর সেই গবেষণা সেখানকার ছাত্রদের উপরেও চলত। সেই বৃত্তান্ত তিনি চিঠিতে লিখেছেন:

> On entrance every lad's head was manipulated, measured & registered in a book kept at the school for the purpose, and every month afterwards it was regularly measured again, so that any slightest alteration might be noted with extreme accuracy.[47]

বৈজ্ঞানিক গবেষণার দোহাই দিয়ে ছাত্রদের সম্মতির অপেক্ষা না-করেই তাদের শরীরের উপরে এহেন নজরদারি চালানো আদতে ঔপনিবেশিক জ্ঞান নির্মাণের প্রক্রিয়ায় নিহিত হিংস্রতাকেই চিহ্নিত করে।[48] প্যাটারসনের চোখে ঐ ছাত্ররা মানুষী সত্তাবিযুক্ত, কেবলই জ্ঞান উৎপাদনের 'উপকরণ' মাত্র, কৌতূহল চরিতার্থ করার 'বস্তু'। ঔপনিবেশিক শাসনে নিহিত কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বোধ থেকেই প্রভুর দৃষ্টিতে প্রজার শরীর কেবলই সেই আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বলবৎ করার ক্ষেত্র; প্যাটারসনের শিরোমিতিবিদ্যাচর্চার প্রকল্প তারই অন্যতম নমুনা।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রেনলজি বেশ শক্ত জমিতে থিতু হয়ে পশ্চিম ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায়[49] জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই পর্বেই ইতালিতে ইহুদি-সন্তান ও পেশায় চিকিৎসক সিজ়ার লম্ব্রসো (১৮৩৫-১৯০৯) একটি জরুরি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন— একজন কেন অপরাধ করে? এই প্রশ্নটা যে লম্ব্রসোই প্রথম তুললেন তা নয়। তাঁর আগে আলোকদীপ্তি পর্বের ইতালীয় দার্শনিক ও অপরাধতাত্ত্বিক সিজ়ার বেকারিয়া (১৭৩৮-১৭৯৪) অপরাধ ও শাস্তির আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছিলেন। ফরাসি দার্শনিক ক্লদ আদ্রিয়েন

---

[46] George Murray Paterson, "On the phrenology of Hindostan", *Transactions of the Phrenological Society*, 1824, পৃ. ৪৩০-৪৩৫

[47] James Poskett, তদেব, পৃ. ১৩৯

[48] ঘটনাচক্রে, ফ্রেনলজি-তত্ত্ব মতে নতুন ইশকুলের শ্রেণিকক্ষ আলো-হাওয়াময় খোলামেলা হওয়ার নিদান দিতে গিয়ে এডিনবরার *Phrenological Journal*-এ লেখা হয়েছিল যে, শ্রেণিকক্ষের অবস্থা যেন "কলকাতার অন্ধকূপের মত শোচনীয়" না-হয়। বারেবারেই যে, উপনিবেশের অভিজ্ঞতা মাতৃরাষ্ট্রের সত্তা গঠনে নিহিত থাকে, বিভিন্নভাবে "কলকাতার অন্ধকূপ"-এর প্রসঙ্গ স্মৃতিতে জিইয়ে রাখা তারই অন্যতম প্রমাণ। দ্রষ্টব্য: David de Giustino, *Conquest of Mind: Phrenology and Victorian Social Thought*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯

[49] আমেরিকায় ফ্রেনলজি চর্চা বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: John D. Davies, *Phrenology Fad and Science : A 19th-Century American Crusade* (New Haven: Yale University Press, 1955), Courtney E. Thompson, *An Organ of Murder: Crime, Violence, and Phrenology in Nineteenth- Century America* (New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press, 2021), Anthony A. Walsh, "Phrenology and The Boston Medical Community in the 1830s", *Bulletin of the History of Medicine*, Vol. 50, No. 2 (Summer, 1976), পৃ. ২৬১-২৭৩

হেলভেটিয়ুস-এর (১৭১৫-১৭৭১) পরম অনুরাগী বেকারিয়া সন্দেহের বশে শারীরিক নিগ্রহ করে স্বীকারোক্তি আদায় বা মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি প্রথাকে সমর্থন করেননি। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বেকারিয়ার বিখ্যাত রচনা *Dei delitti e delle pene* (*On Crimes and Punishments*) প্রকাশিত হয়, যার মাধ্যমে আলোকদীপ্তি-যুগের অপরাধতত্ত্ব ও শাস্তিতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা ঘটে। বেকারিয়ার রচনার অনুরাগী ছিলেন ভলতেয়ার।[50]

অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায় সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণার বদল ঘটিয়ে লম্ব্রসো আধুনিক অপরাধীসম্পর্কিত নৃবিদ্যার প্রচলন ঘটান। প্রাক্-লম্ব্রসো অপরাধতত্ত্বে মনে করা হত যে, মানুষী চরিত্রের মধ্যেই অপরাধপ্রবণতা নিহিত আছে, অপরাধ প্রবৃত্তি মানুষের সত্তাগত। লম্ব্রসো সেই বৈচারিকতায় বৈজ্ঞানিকতার আমদানি ঘটান। সমকালীন নানান বিজ্ঞান ও তত্ত্বের— যেমন, শারীরিক গড়ন, মনঃসমীক্ষণ, সামাজিক ডারউইনবাদ প্রভৃতি— মিশেলে তিনি 'জন্মগত অপরাধী'র ধারণা চালু করেন। ফ্রেনলজির মতই একদা গভীর-প্রভাব-বিস্তারী লম্ব্রোসীয় মতবাদও পরবর্তীকালে জাতিবিদ্বেষী, নারীবিদ্বেষী ও বিভেদমূলক বলে সমালোচিত এবং খারিজ হলেও, অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে চর্চায় 'বৈজ্ঞানিক' নীতি ও বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগের ইতিহাসে লম্ব্রসোর ভূমিকা অগ্রগণ্য।[51] লম্ব্রসোর সমকালে বেকারিয়ার অনুসরণে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, দ্রুত, যথাযোগ্য কিছু শাস্তির মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু, লম্ব্রসো চেয়েছিলেন সেই শাস্তিভয়ের কার্যকরতা পরিমাপ করতে। যদিও, সে কাজটি আদৌ কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে তাঁকে বিস্তর যোগ্য সমালোচনা ভোগ করতে হয়েছিল।

১৮৭৮ সালে লম্ব্রসো তাঁর বিখ্যাত বই *Criminal Man*-এ লিখছেন যে, ধ্রুপদী অপরাধতত্ত্বের প্রভাবে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার নজর কেবল অপরাধের চরিত্রের উপরেই আটকে থাকে ও সেহেতু তা একেবারেই কার্যকর নয়। বিশেষত যেখানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ অপরাধী বারংবার অপরাধ ঘটিয়ে চলেছে। অতঃপর, লম্ব্রসো তাঁর তাত্ত্বিক সাধারণীকরণে বলেন, পৌনঃপুনিক অপরাধ করার এই ধাঁচ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অপরাধীরা আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। তাদের মনে দৌর্বল্য কিংবা অসুখ বাসা করে থাকে, যার কুপ্রভাব সারিয়ে তোলা যায় না। তাই বেশিরভাগ অপরাধীরই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন চিত্তবৃত্তি নেই।[52]

লম্ব্রসোর এই বিশ্লেষণী সমীকরণ আগাগোড়াই নির্ধারণবাদী, যেখানে শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও খুঁতকে যুক্তি-বুদ্ধির ব্যর্থতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে সেই পার্থক্য ও ব্যর্থতার সঙ্গে বিবর্তনবাদের তাত্ত্বিক মিশেল ঘটিয়ে এক আদিম, পশ্চাৎপদ, অপরাধমনস্ক ব্যক্তির ধারণা খাড়া করে বলা হতে লাগল যে, ঐ মানুষগুলির ক্ষেত্রে বিবর্তনের স্বাভাবিক ছন্দপতন ঘটার ফলেই তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। এদিকে শুধু

---

[50] Marcello T. Maestro, *Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law* (New York : Columbia University Press, 1942) এবং Matthew P. Unger, Jean-Philippe Crete, George Pavlich, "Criminal Entryways in the Writing of Cesare Beccaria", in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*, (ed.) Ruth Ann Triplett (Chichester: Wiley-Blackwell, 2018), পৃ. ১৩-৩১

[51] Paul Knepper, "Laughing at Lombroso: Positivism and Criminal Anthropology in Historical Perspective", in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*, (ed.) Ruth Ann Triplett (Chichester: Wiley- Blackwell, 2018), পৃ. ৪৯-৬৬

[52] Cesare Lombroso, *Criminal Man*, translated by Mary Gibson and Nicole Hahn Rafter with assistance from Mark Seymour (Durham: Duke University Press, 2006), পৃ. ৪৩

তাত্ত্বিকভাবে বললে লম্ব্রসোর কথা বাকিরা যদি না-মানেন, তাই স্বীয় যুক্তির পক্ষে সাক্ষ্যস্তূপ জড়ো করতে থাকলেন তিনি।

কী সেই সাক্ষ্য? অপরাধীদের খুলির গড়ন ও মাপ, তাদের শরীরের সাধারণ ও বিশেষ মাপ, মুখাবয়বের বৈশিষ্ট্য ও মাপ, তাদের শরীরে যদি উল্কি থাকে তবে তার বিস্তারিত বর্ণনা, তাদের হাতের লেখার নমুনা ও বৈশিষ্ট্য, এমনকী তাদের যৌনাঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গড়ন— সমস্ত কিছু নথিবদ্ধ করলেন লম্ব্রসো। তবে তিনি জানতেন যে, তাঁর 'বৈজ্ঞানিকতা'র ফলিত দিকটিই আসল। আর তাই সেই সংগৃহীত তথ্যরাজির অধিকাংশই কালক্রমে স্থান পেল তাঁর সংগ্রহালয়ে। ১৮৯৯ সালে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হল অপরাধ মনস্তত্ত্ব বিষয়ক লম্ব্রসোর সংগ্রহশালা। সে এক বিচিত্র সংগ্রহ— অপরাধীদের কঙ্কাল, মৃগী রোগী ও অপরাধীদের প্রতিকৃতি, অস্ত্রশস্ত্র ও সেগুলির খাপ, ফিলাডেলফিয়ার ইস্টার্ন স্টেট কারাগারের স্কেল মডেল এবং আরও বিভিন্ন জিনিসপত্র।[53] সেই বিপুল তথ্য ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে লম্ব্রসো তাঁর অপরাধতত্ত্বকে একটা বৈজ্ঞানিকতার ধাঁচে ফেলে সর্বজনীন তত্ত্বের নিদান হাঁকেন— 'জন্মগত অপরাধী'দের শাস্তি দিয়ে শুধরানো যায় না, এবং মোট অপরাধের তিরিশ কিংবা কখনও প্রায় চল্লিশ শতাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অপরাধমূলক আচরণের পিছনে জৈবিক কারণই দায়ী।[54]

খুলির মাপজোক এবং 'জন্মগত অপরাধী': ঔপনিবেশিক সমাজে নিশ্চিতি ও সংশয়

ব্রিটিশ-ভারতে যে গভর্নর জেনারেল ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ-বিরোধী আইন প্রণয়ন করে রামমোহন রায়ের (১৭৭০/১৭৭২-১৮৩৩) নেতৃত্বে শিক্ষিত হিন্দু আলোকপ্রাপ্ত সমাজের অনুরাগভাজন হয়েছিলেন, সেই উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের দুই অধঃস্তন সহযোগী— টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ও উইলিয়ম হেনরি স্লীম্যান ভারতীয় 'প্রজা'র নিরিখে অপরাধ/অপরাধীর নতুন ধারণা নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। ঠগীদের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শাক্ত-আচার-প্রথা ও বংশানুক্রমিকতার জন্য তাদের গায়ে 'বংশগত হিন্দু অপরাধী'র ছাপ পড়ে গিয়েছিল। ১৮৬৩ সালে যখন ব্রিটিশ ভারতে ঠগী ও ডাকাতি দমন বিভাগের ঝাঁপ পড়ে যায়, তখন কেবল কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে তার কাজকারবার জারি ছিল।[55] কিন্তু, ততদিনে ঠগী ও ডাকাত পরিচিতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল 'অপরাধী জনজাতি' ও 'অপরাধী জাত'-এর ধারণা। তাই দেখা যাবে পরবর্তীকালে ১৮৭১-এ প্রণীত *Criminal Tribes Act*-এর সঙ্গে জড়িত জাত ও জনজাতিগুলির বর্গীকরণ করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসন অবধারিতভাবে তাদের পূর্বপুরুষ হিসাবে সেই

---

[53] Paul Knepper, তদেব, পৃ. ৪৯-৬৬

[54] Eric Sandberg, *Studying Crime in Fiction: An Introduction* (New York & London: Routledge, 2024), পৃ. ২৩-২৪

[55] অবশেষে, ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের আমলে ঠগী ও ডাকাতি দমন বিভাগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার জায়গায় তৈরি হয় Criminal Intelligence Department (CID).

ঠগীদেরই টেনে আনছে। পূর্ব বেরারের কমিশনার ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'পেশাগত অপরাধী'দের সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা হল:

> (A) tribe whose ancestors were criminals from time immemorials [sic] who are themselves destined by the usage of caste to commit crime and whose dependents will be offenders against the law, until the whole tribe is exterminated or accounted for in the manner of the thugs.[56]

ঠগীদের মতোই ঐ 'অপরাধী' জনজাতিগুলির মধ্যেও নাকি ছিল এক অন্তর্নিহিত অপরাধপ্রবণতা। যে প্রবণতা উপযুক্ত জল-হাওয়ায় লতায়-পাতায় জীবনযাপনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে থাকে, যে কালে-দিনে তা হয়ে ওঠে 'মজ্জাগত' কিংবা 'বংশগত', তারা তাই বনে যায় পেশাগত 'অপরাধী'।[57]

সঞ্জয় নিগম দেখিয়েছেন যে, এই যে জৈবনিক অপরাধপ্রবৃত্তির ধারণা তাকেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন 'অপরাধী' জনজাতিদের উপরে বংশাবলীর ধারা হিসাবে আরোপ করেছিল। আর যেই-না সেই উদ্ভাবিত আরোপণের সুতোয় ঠগীর অপরাধের বৃত্তান্তের সঙ্গে গিঁট পড়ে গেল 'অপরাধী' জনজাতি সত্তার তখনই তথ্য-উপাত্ত প্রভৃতির গুরুত্ব তরল হয়ে গেল। আলোকদীপ্ত ইংরেজ অহং যতই তথ্যনির্ভর নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিকতার বুলি আওড়াক, আদতে উপনিবেশে তৈরি হল এক অনড় জমাটবদ্ধ 'অপরাধী'র ধারণা, যারা প্রজাতিগতভাবেই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক— "a species of a well-known, dangerous genus".[58] উপনিবেশব্যাপী ছড়ানো-ছেটানো সেই 'অপরাধী'দের উপরে অষ্টপ্রহর নজরদারি করা, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা, শাসন-শৃঙ্খলে বেষ্টিত করে রাখাই ছিল প্রশাসনিকতার মূল উদ্দেশ্য। ফলে, বহুল ব্যবহারের ফলে যখনই 'অপরাধী' জনজাতি ধারণার প্রমিতকরণ সম্পন্ন হল, তখন থেকেই প্রতিটি ঐ ঠগী-সম্পর্কিত অপরাধ ধারণার ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে তার বিশ্লেষণ শুরু হল।[59] 'মহাত্মা' স্লীম্যানের বিপরীতে 'দুরাত্মা' ঠগীর অবয়ব গোয়েন্দা ও অপরাধীর পরস্পর-বিরোধী আদিকল্পের রসদ হয়ে থেকে গেল।

সেই আদিকল্পের সঙ্গে সকলে ঐকমত্য না-হলেও নানান তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার মধ্য দিয়ে উনিশ ও বিশ শতকব্যেপে ফ্রেনলজি ও লম্ব্রসোর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' বিষয়ে প্রতর্কের একটি জনজীবন ঔপনিবেশিক শিক্ষিত সমাজে গড়ে উঠেছিল। সেই প্রতর্কে যেমন বঙ্গীয় নবজাগরণের পুরোধা রামমোহন রায় কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) জড়িয়ে ছিলেন, তেমনই ছিলেন নব্যবঙ্গের প্রাণপুরুষ হেনরি লুই

---

[56] উদ্ধৃতির সূত্র: Sanjay Nigam, "Disciplining and policing the 'criminals by birth', Part 1: The making of a colonial stereotype — The criminal tribes and castes of North India", *Indian Economic Social History Review*, 1990 27: 2, পৃ. ১৩৫

[57] এই যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গে লম্ব্রসোর বক্তব্যের সাযুজ্য লক্ষণীয়।

[58] Sanjay Nigam, তদেব, পৃ. ১৪১

[59] "subsequent phenomenon of large-scale criminality was viewed through the epistemes and policing procedures fashioned to 'account for' the thugs, viewed through the epistemes and policing procedures fashioned to 'account for' the thugs". দ্রষ্টব্য: Sanjay Nigam, তদেব, পৃ. ১৪৭-১৪৮

ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রখ্যাত শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৮৫-১৮৪৩)। আবার যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) ও বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-১৮৯৯) কিংবা রবীন্দ্রনাথ (১৮৪১-১৯৬১) প্রমুখও সেই আলোচনার টানে এসে পড়েছিলেন।

প্রসঙ্গত বলা যায়, মেক্সিকোয় বিংশ শতকের গোড়ায় গোয়েন্দা সাহিত্যের উন্মেষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'criminal literacy' ধারণার অবতারণা করেছেন পাবলো পিকাতো। তাঁর মতে, খবরের কাগজের প্রতিবেদন ও বিভিন্ন জনপ্রিয় কাহিনীর হাত ধরে সাধারণ পাঠকের মনে অপরাধের বৃত্তান্তসমূহ ঠাঁই করে নেয়। তার মাধ্যমে তাদের মনে অপরাধ, শাস্তি, সে-সবের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-প্রকরণ, বিখ্যাত তদন্ত বা বিচার প্রভৃতি সম্পর্কে একরকমের সাধারণ ধারণা তৈরি হয়ে যায়: "basic knowledge about the world of crime and penal law […] eclectic information about institutions, famous cases, everyday practices, and dangerous places".[60] সেই ধারণা থেকেই তারা আধুনিক নাগরিক জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর সঙ্গে লড়াইয়ে পোক্ত হয়ে যায়। বস্তুত, পিকাতোর এই বক্তব্যের ছাঁচটি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রাগিতিহাস বিশ্লেষণেও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।[61] উনিশ শতকের শেষ দশকে যখন পুলিশি গোয়েন্দা কাহিনী বাংলায় লেখা শুরু হচ্ছে, ততদিনে খবরের কাগজ ও হরেকরকম দেশি গণজ্ঞাপন মাধ্যমের পাশাপাশি ফ্রেনলজি প্রভৃতি নিয়ে মান্য পত্রিকায় লেখাপত্র প্রকাশিত হয়ে 'অপরাধ বিষয়ে সাক্ষর' একটি পাঠক শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। তারাই পরবর্তীকালে গোয়েন্দা কাহিনীর উদ্দিষ্ট পাঠক। সব মিলিয়ে, বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনী লেখার আগেই 'অপরাধী' বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা-চর্চার সামাজিক প্রতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে *Transactions of the Phrenological Society*-র যে খণ্ডে জর্জ প্যাটারসনের আগেই আলোচিত লেখাটি ছাপা হয়েছিল, সেই খণ্ডেই ঐ লেখার সঙ্গে একটি চিঠি ছাপা হয়। সেটির বয়ান ছিল:

To Dr. George Murray Paterson

> Dear Sir, I regret that I should have forgotten the commission with which you honoured me, some time ago, and feel ashamed of myself for such an omission. I now have the pleasure of sending you the ten accompanying skulls; and if you find them calculated to answer your purpose, I will, with equal pleasure, send you as many as you may think sufficient for your present researches. If you wish me to procure you skulls of different descriptions, you will have the goodness to particularise them, that I may seek an opportunity of meeting your wishes.
> Owing to a variety of engagements, I have not hitherto been able to fulfil my intention to pay you a visit, an honour which, I hope, I shall be able to do myself, without much delay. In the mean time, I have the honour to remain, dear Sir, yours most obediently,[62]

---

[60] Pablo Piccato, *A History of Infamy: Crime, Truth, and Justice in Mexico* (California: University of California Press, 2017), পৃ. ১৮

[61] এই সূত্রটির প্রতি নজরটান দিয়েছেন উপনীতা মুখার্জি। দ্রষ্টব্য: Uponita Mukherjee, *Colonial Detection: Crime, Evidence, and Inquiry in British India, 1790-1910* (Columbia University, 2022) অপ্রকাশিত পিএইচডি গবেষণাপত্র।

[62] 'The letter of Ram Mohan Roy to Dr Paterson' শিরোনামে এই চিঠিটি প্যাটারসনের প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে মুদ্রিত হয়। দ্রষ্টব্য: George Murray Paterson, "On the phrenology of Hindostan", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪-৪৩৫

চিঠির শেষে তারিখ (১০ মার্চ, ১৮২২) দিয়ে দস্তখৎ করেছিলেন রামমোহন রায়। চিঠির বয়ান থেকে স্পষ্ট যে, ফ্রেনলজি বিষয়ে রামমোহনের আগ্রহ ছিল প্রবল এবং তিনি 'বৈজ্ঞানিক' গবেষণার স্বার্থে নরখুলি সরবরাহ করেছিলেন। এই চিঠি লেখার পরের বছর দেশীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 'আধুনিক পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান' চর্চার জন্য তিনি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছে সওয়াল করে যে চিঠি লিখেছিলেন, সম্ভবত সেই উভয় ভাবনায় নিহিত 'বৈজ্ঞানিকতা' থেকেই ঔপনিবেশিক শাসকের 'বিজ্ঞান' গবেষণায় দেশীয় খুলি সরবরাহ করতে তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল।[63] প্রসঙ্গত, রামমোহন রায় নিজেই যখন ব্রিস্টলে মারা যান তখন তাঁর চিকিৎসক ফ্রেনলজি-আগ্রহী জন এস্টলিনের উদ্যোগে রামমোহনের খুলি সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তার কারণ হিসাবে এডিনবরার সেই *Phrenological Journal*-এই লেখা হয়েছিল যে, এই বিখ্যাত হিন্দু চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যে তাঁর দেশবাসীর থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন— "the character of that distinguished Hindoo,— so different from that of his countrymen in general."[64] রামমোহনের সেই খুলির ছাঁচ পৌঁছে গিয়েছিল জর্জ কুম্বের কাছে।[65]

রামমোহন রায় যেভাবে ফ্রেনলজি-চর্চার উপকরণ যোগানের শরিক হয়েছিলেন, তেমনই ডাক্তার প্যাটারসনের উদ্যোগে ১৮২৫-এর ২৫ মার্চ ক্যালকাটা ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির যাত্রা শুরুর সময়ে যে কার্যনির্বাহী সমিতি তৈরি হয়েছিল তার অন্যতম সদস্য ছিলেন ধর্মতলা অ্যাকাডেমি-খ্যাত ডেভিড ড্রামন্ড। ড্রামন্ড ও রামমোহন পরস্পর শুভানুধ্যায়ী।[66] কিন্তু, ফ্রেনলজি-চর্চায় যোগ দেওয়ার দু-বছরের মাথায় তার 'বৈজ্ঞানিকতা' সম্পর্কে ড্রামন্ডের সংশয় জাগে। ১৮২৭-এর ২৮ জুলাই সোসাইটির সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন তিনি, যার শিরোনাম ছিল—"The

---

[63] ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহন রায়ের চিঠি। সূত্র: Sophia Dobson Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohan Roy*, (Ed.) D. K. Biswas & P. C. Ganguli (Calcutta : Sadharan Brahmo Samaj, 1962 [1900]), পৃ. ৪৫৭-৪৬০। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলেটের এই সংগ্রহে প্যাটারসনকে লেখা রামমোহনের উপরে উদ্ধৃত চিঠিটির উল্লেখ বা বয়ান নেই।

[64] *Phrenological Journal*-এর অষ্টম সংখ্যায় (No. XL) (১৮৩২-১৮৩৪) এই নিয়ে যে লেখাটি মুদ্রিত হয় তার শিরোনাম ছিল— "On the Life, Character, Opinions, and Cerebral Development, of Rajah Rammohun Roy", পৃ. ৫৭৭-৬০৩

[65] এই প্রসঙ্গে শ্রুতি কপিলা সংস্কৃতজ্ঞ হোরাস হেইম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮০৬) ও জর্জ কুম্বের চিঠিচাপাটির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য: Shruti Kapila, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০-৫০১। প্রসঙ্গত উল্লেখ, রামমোহন মারা যাওয়ার মাস দশেক আগে ফ্রেনলজি চর্চার অন্যতম 'গুরু' য়োহান গাসপার স্পুর্জহাইমের মৃত্যু হয় বস্টনে। তাঁর খুলিও সংরক্ষণ করা হয়েছিল। বস্টন ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি স্পুর্জহাইমের খুলির একটি ছাঁচ এডিনবরার সোসাইটিকে উপহার দিয়েছিল। স্পুর্জহাইমের মৃত্যু ও খুলি সংরক্ষণ বিষয়ে দুটি প্রতিবেদনও ঐ অষ্টম খণ্ডেই ছাপা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: *Phrenological Journal*-এর অষ্টম সংখ্যায় No. XXXV, পৃ. ১২৬-১৪৩ এবং No. XXXIX, পৃ. ৫৩২।

[66] ড্রামন্ড নিজেই তাঁর বইতে রামমোহন সম্পর্কে লিখেছেন: "my excellent and valued friend, Rammohun Roy— a man whom no eulogy of mine could elevate". দ্রষ্টব্য: David Drummond, *Objections to Phrenology, Being the substance of a series of papers communicated to the Calcutta Phrenological Society, with additional notes* (Calcutta : Printed for the Author & Sold by Samuel Smith & Co. & William Thacker & Co., 1829), পৃ. ১৯৩ (পাদটীকা)। আবার জাতগত সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সভাসমিতিতে যে হিন্দুরা প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারে না, তাও ড্রামন্ড জানেন: "There are many talented individuals in Calcutta, but the division of Caste, which is almost as strictly observed by Europeans as by Hindoos, is destructive of every attempt at general association". দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ. v ('Introduction').

Phenomena of the Human Mind cannot be accounted for on Phrenological Principles".[67] এক মাসের মাথায় (৩০ অগাস্ট, ১৮২৭) ড্রামন্ডের পাল্টা-যুক্তি দিয়ে প্যাটারসন লেখেন:

> The rest of Mr. Drummond's address is puerile and erratic. I, therefore, must conclude… Phrenology… being a true science, a science founded on the immutable and eternal relations of created things, will be always in the spring of its youth; consequently, ever blooming, and ever exhaling, the sweet odour of that philosophic virtue which quickens it, to the delight of its cultivators, and the recreation of all who approach within the sphere of its fragrance and vitality![68]

ড্রামন্ডও দমবার পাত্র নন। ওদিকে তাঁর কাছে খবর আছে যে, গ্রেট ব্রিটেনে ফ্রেনলজি সম্পর্কিত বইপত্র দেদার বিক্রি হচ্ছে। ফলে, ১৮২৯-এ নিজেই বই ছাপিয়ে ফ্রেনলজির বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ হাঁকলেন তিনি। ড্রামন্ডের মনে হয়েছিল ফ্রেনলজি আদতে বিজ্ঞানের নামে প্রতারণা— "it has long been my conviction that *Phrenology is a gross deception*".[69] প্যাটারসনের খুলিচর্চার প্রকল্পকে সমালোচনা করতে গিয়ে গল, স্পুর্জহাইম, কুম্ব— ফ্রেনলজি-চর্চার আদিগুরুদের কাউকে রেয়াত করলেন না ড্রামন্ড—

> "*I soon became convinced that its foundation was totally insecure;… I have fully proved that this system is altogether inadequate*, and that it throws no new light whatever on this dark and mysterious enquiry. Gall and Spurzheim… have exhibited such ignorance and delusion regarding the science of Mind, as fully justifies the application of the old adage, "Ne sutor ultra crepidam" (Don't let the cobbler go beyond the edge)![70]

স্কটিশ আলোকদীপ্তি-সঞ্জাত যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে যুক্তি-প্রতিযুক্তির তর্কে ফ্রেনলজির তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিকতা'র ভিত ধ্বসিয়ে দিলেন তিনি:

> Subsequently, I learned that anatomists in Europe hold this to be a powerful objection to Phrenology. I collected, therefore, a considerable number of Skulls, (for these are not scarce articles on the banks of the Hoogly,) and sawed them across, immediately above the eye-brows… *on the slightest examination, it will become evident, that any inference regarding the figure or magnitude of the brain, drawn from the convexity or concavity of the outer plate, is a palpable absurdity —an imposition which Phrenologists ought to be ashamed of.*[71]

বিশেষ করে স্পুর্জহাইম এবং কুম্বের বক্তব্য প্রসঙ্গেও সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের পাল্টা যুক্তি তুলে ধরে বিজ্ঞান-শিক্ষিতদের বিচারবোধের উপরে ভরসা করলেন ড্রামন্ড:

> Spurzheim and Combe's plates and also DeVille's bust are now before me; from which it appears, that the situation they have given to certain organs in the occiput embraces part

---

[67] তদেব, পৃ. ১-১১

[68] তদেব, পৃ. ২৫-৪১

[69] তদেব, পৃ. v-vii ('Introduction') নজরটান সংযোজিত

[70] তদেব, পৃ. v-vii ('Introduction') নজরটান সংযোজিত

[71] তদেব, পৃ. ১৯১ (নজরটান সংযোজিত)

> of the cerebrum and part of the cerebellum, although these two portions of the encephalon are completely divided! But has not Bell and Majendie proved that the cerebellum, as a whole, performs one important and independent duty, no less than giving origin to all the nerves of motion? *Let Doctors decide this*. I have no pretensions.[72]

তবে, ড্রামন্ডের বীতরাগ সত্ত্বেও উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সমাজের শিক্ষিত অংশের মধ্যে ফ্রেনলজি চর্চার উৎসাহ যে ছিল তার প্রমাণ কালীকুমার দাশের উদ্যোগে ১৮৪৫-এ আরেকটি ক্যালকাটা ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। প্যাটারসনের সমিতির উল্টো এই নতুন সমিতির সব সদস্যই ছিল বাঙালি হিন্দু। এই সমিতির সদস্যরা একদিকে নব্যবঙ্গীয় ভাবনা ও অন্যদিকে ব্রাহ্ম সংস্কারচিন্তার দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত ছিলেন এবং কালীকুমার ফ্রেনলজিকে "পুনরুজ্জীবনের হাতিয়ার" হিসাবে দেখতেন।[73]

কিন্তু, যাঁকে উহ্য রেখে দেশীয় সমাজের 'অপরাধ/অপরাধী' চিন্তায় ফ্রেনলজির ভূমিকা বোঝা যায় না তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।[74] সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় ফ্রেনলজি, 'অপরাধ'-'অপরাধী' ও সংশোধন পদ্ধতি, 'স্ত্রী-অপরাধী', মুখ ও অন্যান্য বাহ্য অঙ্গসংস্থান দেখে 'লোকচেনা' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে একাধিক প্রবন্ধে তিনি একদিকে ইওরোপীয় তত্ত্বচর্চার যেমন হদিশ দিয়েছেন, তেমনই সমকালীন দেশীয় সমাজে ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক তার প্রয়োগ সম্পর্কে নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছেন।[75] ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদী জ্ঞানতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যা চর্চার প্রসার। তার জন্য দরকার হত ইওরোপীয় ধারণাসমূহের বঙ্গীয়করণ। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তৈরি করে নিলেন ফ্রেনলজির বাংলা পরিভাষা— 'শিরোমিতি-বিদ্যা'। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি শব্দটিকেও বাংলা হরফে ব্যবহার করেছেন। এই ফ্রেনলজি বা শিরোমিতিবিদ্যাকে কেন্দ্র করেই 'অপরাধী' নির্ণয়ের ছক সাজানো হয়েছিল ইওরোপে। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যায় আগ্রহী দেশীয় শিক্ষিতগোষ্ঠী তাতে আকৃষ্ট হয়েছিল। তবে, কেবল ফ্রেনলজি নয়, সামগ্রিকভাবে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' বিষয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল।[76]

---

[72] তদেব, পৃ. ১৯২ (নজরটান সংযোজিত)।

[73] এই বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Shruti Kapila, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬-৫০২

[74] শ্রুতি কপিলার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখ নেই। জেমস পসকেট আবার কেবল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা তরুণ রবীন্দ্রনাথের মাথার ছবির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই ছেড়ে দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য: James Poskett, *Materials of the Mind: Phrenology, Race, and the Global History of Science,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১-২৬২। সম্ভবত, ফ্রেনলজি নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধগুলির ইংরেজি তরজমা না-হওয়াই এই অনুল্লেখের কারণ।

[75] সাধনা পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেমন, "আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি"(আষাঢ়, ১২৯৯), "লোকচেনা"(শ্রাবণ, ১২৯৯/ কার্তিক, ১২৯৯/ ফাল্গুন, ১২৯৯)। তাছাড়া আরও অন্তত দুটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন— "শিরোমিতি-বিদ্যা", "মুখচেনা" (বালক)।

[76] সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল— "স্ত্রী-পুরুষভেদে অপরাধের ন্যূনাধিক্য"(ফাল্গুন, ১২৯৮), "ইংলণ্ডে অপরাধী সংশোধন পদ্ধতি"(চৈত্র, ১২৯৮), "অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা"(বৈশাখ, ১২৯৯), "দারিদ্র্য ও অপরাধ" (পৌষ, ১২৯৯), "বৃত্তিনির্বাচন" (চৈত্র, ১৩০০/ বৈশাখ, ১৩০১) ইত্যাদি।

ইংরেজি-ধারা মেনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ফ্রেনলজির আলোচনা শুরু করেছেন 'আদিগুরু'দের থেকেই: " গল্ ও স্পুরজৈম্ নামক জর্ম্মান পণ্ডিতদ্বয় এই সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশেরই স্বতন্ত্র কাজ আছে "।[77] এই বিষয়ে প্রবল আগ্রহী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফ্রেনলজির ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশার নির্বাচন এবং স্বদেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের খুলি ও মুখ বিষয়েও লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে প্রবন্ধ লেখেন।[78] তাঁর জীবন-স্মৃতি থেকেও জানা যায় যে, তিনি "physiognomy (মুখসামুদ্রিক) ও phrenology (শিরসামুদ্রিক) বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ" লিখেছিলেন: "বালকে" প্রতিকৃতিসহ শিরসামুদ্রিক অনুসারে... রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি মহাত্মাগণের চরিত্রসমালোচনা বাহির হইয়াছিল।"[79]

বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণে গিয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফ্রেনলজি নিয়ে চর্চা করেছেন। একবার গাজিপুরে গিয়ে তিনি জেল দেখে আসতে ভোলেননি। কারণ, কয়েদখানাই যে ফ্রেনলজি চর্চার গবেষণাগার সেই বক্তব্য ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সাহেব-চর্চিত শিরোমিতিবিদ্যা শিখিয়েছিল যে, হাতেগরম অপরাধীদের খুলি দেখেই মালুম করা যেতে পারে অপরাধী কেমন হয়। ফলে, জেলের ডাক্তার রবার্টসন সাহেবের করোটির গঠন দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন তাঁর "চরিত্রবর্ণনা করিয়া, একখানি কাগজে তাঁহার চরিত্রবিবরণ লিখিয়ে দিয়াছিলেন", তেমনই সাহেবের অনুমতি নিয়ে "জেলের সব বেড়ী-পায়ে দাগী বদ্‌মাইস্ কয়েদীদেরও ছবি আঁকিয়া মাথা পরীক্ষা করিয়াছেলন।"[80] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমকালীন শহুরে শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজে ফ্রেনলজি নিয়ে একরকমের উৎসাহ যে ছিল তার প্রমাণ 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে:[81]

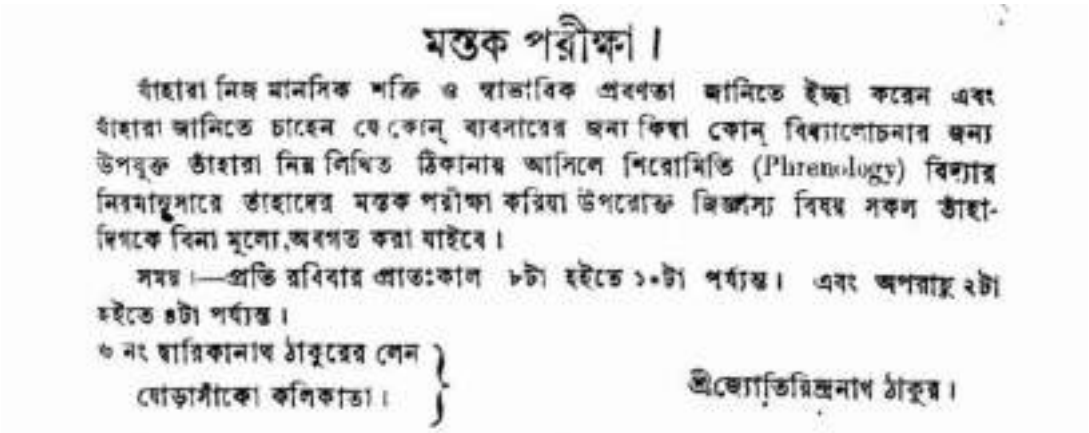

মস্তক পরীক্ষা।

যাঁহারা নিজ মানসিক শক্তি ও স্বাভাবিক প্রবণতা জানিতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহারা জানিতে চাহেন যে কোন্ ব্যবসায়ের জন্য কিম্বা কোন্ বিদ্যালোচনার জন্য উপযুক্ত তাঁহারা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আসিলে শিরোমিতি (Phrenology) বিদ্যার নিয়মানুসারে তাঁহাদের মস্তক পরীক্ষা করিয়া উপরোক্ত জিজ্ঞাস্য বিষয় সকল তাঁহাদিগকে বিনা মূল্যে অবগত করা যাইবে।

সময়।—প্রতি রবিবার প্রাতঃকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। এবং অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত।

৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন
যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

77 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি", প্রবন্ধ-মঞ্জরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫। মূল প্রবন্ধটি ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে সাধনা পত্রিকার আষাঢ়, ১২৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

78 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বৃত্তিনির্ব্বাচন", প্রবন্ধ-মঞ্জরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫-৪০৯। মূল প্রবন্ধটি সাধনা পত্রিকার চৈত্র, ১৩০০ ও বৈশাখ, ১৩০১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

79 বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রণীত), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি (কলিকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৭৪

80 তদেব, পৃ. ১৭৪-১৭৭। বস্তুত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত সেইসব কয়েদি ও ডাক্তার রবার্টসনের মাথার মূল ছবি রবীন্দ্রভারতী-চিত্রশালায় সংরক্ষিত। সেই তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য: সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৬৩), পৃ. ২৩৮-২৭৪

81 ভারতী ও বালক পত্রিকার প্রথম বর্ষের ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার শেষে এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়েছিল।

সেই বিজ্ঞাপনে 'হুজুগ' তুলে লোকে নাকি হাজির হত যোড়াসাঁকোর বাড়িতে। শেষে "এত লোক আসিতে আরম্ভ করিল যে, বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত অনবরত পরীক্ষা করিয়াও" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শেষ করতে পারতেন না।[82] ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন সদস্য যেমন, রবীন্দ্রনাথ, মৃণালিনী দেবী কিংবা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা বাইরের তারকনাথ পালিতসহ দেশীয় সমাজের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির করোটির গড়ন থেকে তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[83] তবে, ইচ্ছা থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের করোটির গড়ন সামনাসামনি দেখে ও ছবি এঁকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ তাঁর হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ফ্রেনলজিচর্চায় নিজের মাথা দেখানোর প্রস্তাবে সম্মত হলেও, তা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তিনি মারা যান।[84] ফলে, তাঁর প্রবন্ধে অন্যের আঁকা ছবিতেই বিদ্যাসাগরের মাথা দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু কিংবা রমেশচন্দ্র দত্ত বা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের করোটি ও মুখমণ্ডলের গড়ন, কপালের গঠন, চোখ এবং ভ্রূ-সংস্থান, নাকের গড়ন প্রভৃতি থেকে তিনি ঐসব ব্যক্তিত্বদের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছিলেন।[85] *The Indian Mirror* পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের মাথা দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'চরিত্র-বিবরণ' বিশেষত রাগের চোটে 'জ্ঞানশূন্য' হওয়ার কথা বলেন, তখন সম্পাদকমশায়ের যে প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় তা যেন একেবারে হোমস সকাশে ওয়াটসনের বিস্ময়তুল্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে কারো থেকে শুনে সেই বর্ণনা লেখেননি, বরং শুধু নরেন সেনের মাথা দেখেই সেই কথা বুঝে ফেলেছেন, তা জেনে "নরেন্দ্রনাথবাবু অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়েছিলেন"।[86]

কিন্তু, বৈজ্ঞানিকতার খোলসধারী শিরোমিতিবিদ্যার সঙ্গে যে বিজ্ঞানের পুরো সদ্ভাব নেই, সে বিষয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ওয়াকিবহাল ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মাথা দেখে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বেশকিছু বর্ণনা মিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। শেষে, কৃষ্ণকমল যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন— "ফ্রেনলজিতে তোমার কি খুব বিশ্বাস?

---

82 ভাইয়ের ফ্রেনলজিপ্রীতি সম্পর্কে দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মজার ছলে লিখেছিলেন: "মাথার তত্ত্ব খুঁজি,/পুঁথি করেন পুঁজি,/ মাথা পেলে আর কিছু চান না।" দ্রষ্টব্য: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২১০-২১৩

83 রবীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল ও করোটির গড়ন, চোখের সংস্থান ও 'নতনেত্রে', 'সহাস্য', 'বিস্ফারিত চক্ষু' প্রভৃতি বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি এঁকে ফ্রেনলজিচর্চা করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে সমাজের নানান অবস্থানের মানুষের মুখমণ্ডল ও মাথার, নাকের, ঠোঁটের গড়ন থেকে তাদের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য 'head study'মূলক ছবি এঁকেছেন তিনি। এই বিষয়ে বিস্তারিত তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য: সুশীল রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৭৪

84 বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২১০

85 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মুখ-চেনা", প্রবন্ধ-মঞ্জরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮-৪৬৮। মূল প্রবন্ধটি ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে বালক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

86 বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭। অবশ্য সুশীল রায়-প্রদত্ত তালিকায় নরেন্দ্রনাথ সেনের ছবির উল্লেখ নেই। দ্রষ্টব্য: সুশীল রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৭৪। প্রসঙ্গত, *A Study in Scarlet* কাহিনীতে ডাক্তার ওয়াটসন যে আফগানিস্তান ফেরত তা হোমস বলে দেওয়ায় ওয়াটসনের হতচকিতভাবের সঙ্গে বোধ হয় ইন্ডিয়ান মিররের সম্পাদকের চমৎকৃত হওয়ার মিল ছিল। এখানেই ফ্রেনলজি ও গোয়েন্দা আখ্যানে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের অবরোহ যুক্তিপদ্ধতিকে 'বৈজ্ঞানিকতা'র আদল দেওয়ার সাযুজ্য ধরা পড়ে।

— ফ্রেনলজির সব কথাই কি ঠিক?", তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংশয়দীর্ণ উত্তর দেন— "আমি ফ্রেনলজিষ্টদের সব কথা বিশ্বাস করিনে, —তবে মোটামুটি কতকটা মেলে— এই মাত্র।" এই উত্তরে সন্তুষ্ট কৃষ্ণকমল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন —"তুমি যে ফ্রেনলজির গোঁড়া ভক্ত নও, এ কথা শুনে ভারি খুসী হলেম।"[87] সেই একই সংশয় বারেবারে ব্যক্ত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধে। কখনও তিনি লেখেন: "তবে, ফ্রেণলজিষ্ট-সম্প্রদায় মস্কিষ্কের যে-যে অংশ যে-যে প্রবৃত্তির আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহার সহিত এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতের ঐক্য হয় না"।[88] আবার সেই অনৈক্যের দিকগুলি সবিস্তার আলোচনা করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে দোটানা ছিল তাঁর:

> ব্যাস্চিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ফ্রেণলজিকে যে একেবারেই উড়াইয়া দেন, তাহাও ঠিক্ নহে— আবার যাঁহারা বলেন ফ্রেণলজির দ্বারা মনুষ্য-চরিত্রের সমস্ত অন্ধি-সন্ধি সম্পূর্ণরূপে জানা যায়, তাঁহাদের কথাও ঠিক্ নহে।... **শুধু মাথার খুলির গঠন দেখিয়া একজনের মস্তিষ্কের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বলা যাইতে পারে না।**... তাই ফ্রেণলজি কতকটা সত্য হইলেও অসম্পূর্ণ।[89]

বস্তুত, শিরোমিতিবিদ্যার "ব্যবহারিক প্রয়োগ", অর্থাৎ "মস্তিষ্কের আয়তন ও গঠন দেখিয়া ব্যক্তি-বিশেষের স্বাভাবিক ও মানসিক প্রবণতা ও শক্তিসকল নির্ণয় করা" বিষয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবল উৎসাহ ছিল।[90] কিন্তু, অবশ্যই বুঝেশুনে তার প্রয়োগ করতে হবে, কারণ: "এই বিদ্যা, কি বিজ্ঞানকল্পে, কি ব্যবহারিক প্রয়োগকল্পে, এখনও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র"।[91] যদিও, ততদিনে ফ্রেনলজির যুক্তিক্রমের সঙ্গে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল এবং ঔপনিবেশায়িত দেশীয় সমাজেও তার ছাপ যে পড়েছল সেই কথাটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় আনেননি।

ফ্রেনলজির পাশাপাশি লম্ব্রসোর অপরাধতত্ত্ব নিয়েও দেশীয় সমাজে যে উৎসাহ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধে। উপনিবেশের আলোকদীপ্ত প্রজা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রিক শাসনতন্ত্র নিয়ে ভাবতে গিয়ে 'অপরাধী'র পরিচয় নির্মাণের প্রকরণ-কৌশল নিয়ে লম্ব্রসোর তত্ত্বে আলোড়িত হয়েছিল।[92] ১২৯৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রে সাধনা-য় প্রকাশিত ""ক্রিমিনাল্" মানবতত্ত্ব" প্রবন্ধের গোড়ায় 'ক্রাইম' ও 'ক্রিমিনাল' ইংরেজি শব্দদুটির

---

[87] বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৭৭

[88] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি", প্রবন্ধ-মঞ্জরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

[89] তদেব, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

[90] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শিরোমিতি-বিদ্যা", প্রবন্ধ-মঞ্জরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৭-৫৫৪

[91] তদেব

[92] লম্ব্রসোর প্রধান বইগুলির ইংরেজি অনুবাদ হতে হতে প্রায় উনিশ শতক শেষ হয়ে এসেছিল: *The Female Offender* (১৮৯৫), *Crime: Its Causes and Remedies* (১৮৯৯) এবং *Criminal Man, According to the Classification of Cesare Lombroso* (১৯১১)। ফলে, স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উক্ত প্রবন্ধ লেখার সময়ে বলেন্দ্রনাথ এই বইগুলির ইংরেজি তরজমা দেখেননি। নির্দিষ্ট উল্লেখ না-করলেও মনে হয় *The Monist* পত্রিকায় প্রকাশিত লম্ব্রসোর দুটি প্রবন্ধের ভিত্তিতেই বলেন্দ্রনাথ আলোচ্য বাংলা নিবন্ধটি লেখেন। সেই প্রবন্ধদুটি হল: "Illustrative Studies in Criminal Anthropology" (Vol. I, No. 2, 1890) এবং "The Physiognomy of the Anarchists" (Vol. I, No. 3, 1890)

বঙ্গীয় রূপ যে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' হতে পারে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলেন্দ্রনাথ। বস্তুত, তাঁর মতে, এই সম্পর্কে ইওরোপীয় প্রতর্ক যেভাবে 'ক্রাইম'কে "অনেক পরিমাণে দৈহিক গঠন ও ঐন্দ্রিয়িক বিকারের ফল" বলে বিবেচনা করছে, তাতে যে দোষীর নৈতিক দায় লঘু হয়ে যায় ও সামাজিক পরিসরের দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল ঘটে।[93] সমকালীন বৈজ্ঞানিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইওরোপে অনেকে যে মনে করেন "যেমন উন্মাদ একরকম রোগ, ক্রাইমও কতকটা সেইরূপ", সেই বক্তব্যের পক্ষে যে গবেষণাগুলির উল্লেখ বলেন্দ্রনাথ করেছেন, বাস্তবে সেগুলি সবই দৈহিক গঠনগত নানান 'বৈশিষ্ট্য', যার থেকে চট করে 'অপরাধী'কে শনাক্ত করা সম্ভব।[94] যেমন, "তেঞ্চিনি সাহেব কতকগুলি ক্রিমিনাল্ শবদেহ লইয়া পরীক্ষা করেন। তাহাতে কনুইয়ের হাড়ে অনেকগুলিরই ছিদ্র দেখা যায়। ইহা ভিন্ন তাহাদের দেহের গঠনে আরও অনেক ছোটখাট অনিয়ম লক্ষিত হয়।"[95] আবার "ডাক্তার অটলেঙ্ঘির পরীক্ষায় জানা যায়, ক্রিমিনাল্দিগের গন্ধবোধ ও স্বাদজ্ঞান সাধারণ লোকের অপেক্ষা প্রায় কিছু কম, চলনের ধরণ একটু স্বতন্ত্র এবং অঙ্গভঙ্গী বিচিত্র। সহজ লোকের দক্ষিণ পদক্ষেপ বাম অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ হয়, ক্রিমিনাল্দিগের তদ্বিপরীত।"[96] অটলেঙ্ঘির আলোচনা থেকে আরও জানা যায় যে, "অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ক্রিমিনাল্দের কপালে এবং কপোলদেশে বিস্তর রেখা পড়ে। আর কপোলের মধ্যস্থলে রেখা ক্রিমিনাল্দিগের সাধারণ লক্ষণ।" এমনকী "পুরুষ ক্রিমিনাল্দের টাক বেশি পড়ে, চুল কম পাকে"।[97]

প্রসঙ্গত, বলেন্দ্রনাথ একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব পেশ করেছেন। সেই হিসাবের ভিত্তি "রসি সাহেব" কর্তৃক একশ জন "ক্রিমিনালের দেহ পরীক্ষা"। প্রবন্ধটি খুঁটিয়ে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে, বলেন্দ্রনাথ কিছুটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতই এইসব 'বৈজ্ঞানিক' পরীক্ষা-উদ্ভূত সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশয়ী। একদিকে যেমন, হরেক সংখ্যাতত্ত্ব ও নিরীক্ষা-প্রসূত 'জ্ঞান'কে তিনি খারিজ করতে চাইছেন না, তেমনই অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঔপনিবেশিক প্রজা হিসাবে তিনি অল্প সংখ্যক নমুনা থেকে গড়ে তোলা সার্বিক সাধারণীকরণের বিপদ সম্পর্কেও বিলক্ষণ ওয়াকিফহাল। তাই প্রবন্ধের শেষে, তাঁর স্পষ্ট কথা— "এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট বোধ হয় না।"[98] সেই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের হালহকিকত বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের অস্বস্তি প্রকট হয় ঐ প্রবন্ধের সংযোজনীতে— "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল্-তত্ত্বের প্রয়োগ"। লম্ব্রসো

---

[93] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ক্রিমিনাল্ মানবতত্ত্ব", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫

[94] তদেব

[95] তদেব। ইতালির লোরেঞ্জো তেঞ্চিনি— Lorenzo Tenchini— (১৮৫২-১৯০৬) অঙ্গসংস্থানবিদ্যা বা Anatomy বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিনিও অপরাধীদের মস্তিষ্কের গঠনরূপ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং অপরাধের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য দুষ্কৃতকারীদের মস্তিষ্ক ও তার মোমের ছাঁচ সংগ্রহ করতেন।

[96] তদেব। ইতালীয় ইহুদি চিকিৎসক ও অপরাধতাত্ত্বিক সালভাতোর অটলেঙ্ঘি— Salvatore Ottolenghi—(১৮৬১-১৯৩৪) ছিলেন সিজ়ার লম্ব্রসোর শিষ্য। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুলিশি কাজের ধারা শেখানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

[97] তদেব

[98] তদেব

ও তাঁর উত্তরসূরীদের এইসব 'বৈজ্ঞানিক' গবেষণার যে একটি ফলিত দিক আছে, তা সম্যক জানেন বলেন্দ্রনাথ। সেই ফলিত বিজ্ঞান যে দুয়ে দুয়ে চার করে দেশীয় সমাজে যত্রতত্র অপরাধীর হদিশ দিতে পারে, তাতে আর আশ্চর্য কী! বিশেষত, রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ঔপনিবেশিক প্রজা যে সহজেই কোনো এক 'বৈজ্ঞানিক' পরীক্ষায় 'ক্রিমিনাল' বনে যেতে পারে সে সম্পর্কে একটা আন্দাজ যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল, সেটা বোঝাই যায় যখন তিনি শেষ কয়েকটি বাক্যে লেখেন— "যাহা হউক, কথাটা উঠিয়াছে বলিয়াই অমনি তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিয়া বসিবার আবশ্যক দেখি না। এখনো বিস্তর সময় আছে। আগে ভাল করিয়া প্রমাণ হউক"।[99]

ফ্রেনলজি ও লম্ব্রসোর তত্ত্ব সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের বক্তব্যগুলি থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গ উঠে আসে— প্রথমত, তাঁরা উভয়েই জানেন যে, ইওরোপ-উদ্ভূত বিচিত্র 'বৈজ্ঞানিক' পরীক্ষা-সঞ্জাত এহেন 'ক্রিমিনাল্' চেনার খেলায় দেশীয় শিক্ষিত সমাজ বুঁদ হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে, ঔপনিবেশিক জ্ঞানরাজি উপনিবেশে চট করে যে 'বিশ্বাস'-এ পরিণত হতে পারে, এবং তা হলে দেশীয় সমাজে 'ক্রিমিনাল' কে বা কারা হতে পারে তার পরিচয়ের রাজনীতি নিয়ে যে আর তর্কের অবকাশ থাকবে না, সেটা তাঁরা স্পষ্ট বোঝেন। দ্বিতীয়ত, খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল এহেন বিভিন্ন দৈহিকতার নিরিখে অপরাধীর শনাক্তকরণ লক্ষণসমূহ "ভাল করিয়া প্রমাণ" করা কী আদৌ সম্ভব? 'মুখচেনা' ও 'লোকচেনা'র নির্ভরে কীভাবে নিশ্চিত করে চিনে নেওয়া যাবে 'ক্রিমিনাল্' কে? মুখমণ্ডল বা অঙ্গসংস্থান কিংবা করোটির গড়ন থেকে মানুষ চেনা, বিশেষত 'ক্রিমিনাল্' চেনার বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির খুড়ো-ভাইপোর মনে সংশয়ের ভাবটা লক্ষণীয়। জাতীয়তাবাদী ঔপনিবেশিক প্রজাকেও যে 'অপরাধী' হিসাবেই বিচার করে উপনিবেশকামী মাতৃরাষ্ট্র, সেই কথাটা নিশ্চিতভাবেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের চিন্তায় ছিল। তাই, বলেন্দ্রনাথের লম্ব্রসো-বিষয়ক লেখা বেরোনোর পরের মাসেই ১২৯৯-এর বৈশাখের সাধনা-য় "অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা" প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্পষ্ট ঘোষণা করেন:

> অপরাধীদিগের তথ্যানুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উহাদের কোন বিশেষ ছাঁচের চেহারা নাই— অর্থাৎ উহারা কোন বিশেষ ছাঁচের চেহারা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তবে যাহারা চিরাভ্যস্ত অপরাধী, যাহারা বারম্বার জেল খাটিয়া আইসে তাহাদের চেহারার একটা বিশেষত্ব ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু, সে বিশেষত্বও লক্ষ্য করা বড় সহজ নহে। **ফলকথা, চেহারা কিম্বা ধরণ-ধারণ দেখিয়া অপরাধীকে চেনা কঠিন— উহা চরিত্রের অকাট্য নিদর্শন নহে।**[100]

ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র ও 'আদিম অপরাধী'র রহস্য : গেজ়েটিয়ার, আন্দামান এবং শার্লক হোমস

ঔপনিবেশিক প্রজার মনে সংশয় থাকলেও ঊনবিংশ শতকী ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পুরোভাগে থাকা ইঙ্গ-ফরাসি জ্ঞানতত্ত্বের হাত ধরে ফ্রেনলজি ও 'অপরাধী'র নানান দৈহিক পরিমাপের মত বিদ্যাচর্চা পশ্চিম ইওরোপের ছাঁচে গড়া

---

[99] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল্-তত্ত্বের প্রয়োগ', বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬

[100] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা", প্রবন্ধ-মঞ্জরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩ (নজরটান সংযোজিত)

এক নতুন 'আদর্শমান' হাজির করেছিল। উনিশ শতকী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রশাসনিকতা-উদ্ভূত জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে অপরাধতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের যে গাঁটছড়া আপাত-বিজ্ঞান ফ্রেনলজির সুতোয় বাঁধা হয়েছিল, তার প্রতিফলন ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্বে সুস্পষ্ট। কিন্তু, সেই প্রসঙ্গের ধরতাই হিসাবে আরেকজনের কথা বলতেই হয়: ফরাসি চিকিৎসক ও অপরাধতাত্ত্বিক আলেকজ়ন্দ্র ল্যাকাসান—Alexandre Lacassagne— (১৮৪৩-১৯২৪)। লম্ব্রসোর প্রবল বিরোধী ল্যাকাসান 'জন্মগত অপরাধী' ও তার সঙ্গে বংশগতির সম্পর্কের ধারণাকে খারিজ করেন। ল্যাকাসান ছিলেন ফ্রেনলজি-পন্থী, এবং ডাক্তার গলের অনুরাগী। সেই কারণেই, অপরাধতত্ত্বের সঙ্গে ফ্রেনলজিকে জুড়ে ভাবতে চেয়েছিলেন তিনি।[101]

কিন্তু, ততদিনে ফ্রেনলজি তার আগের 'বৈজ্ঞানিক' গরিমা হারিয়ে অপবিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। ফলে, ল্যাকাসানও ক্রমে লম্ব্রসোর সঙ্গে পাল্লায় পিছিয়ে পড়েন। অবশ্য, ফ্রেনলজি যে পুরোপুরি অধঃপতিত হয়নি, বরং অপরাধীর দৈহিক নানান চিহ্ন-চরিত্র এবং অবরোহ যুক্তি-নির্ভর বৈজ্ঞানিকতার হাত ধরে ফ্রেনলজির ভূমিকা গোয়েন্দা কাহিনীতে স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। উনিশ শতকের মাঝের পর্বে ইংরেজি ভাষায় গোয়েন্দা কাহিনীর 'আদিপুরুষ' এডগার আলন পো স্পষ্টতই ফ্রেনলজি বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। ১৮৩৬-এর মার্চে *Southern Literary Messenger* পত্রিকায় ফ্রেনলজি বিষয়ে একটি বইয়ের বেশ ইতিবাচক আলোচনা করেন পো। মানুষের কল্পনাশক্তি ও বৌদ্ধিক দক্ষতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রায়শ পো ফ্রেনলজি-প্রদত্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন। এমনকী কবি কোলরিজের রচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কপালের গড়ন সম্পর্কিত আলোচনাও এসে পড়েছিল পো-র প্রবন্ধে।[102] "The Murders in the Rue Morgue" (১৮৪১) গল্পে মঁসিয় দ্যুপাঁ রীতিমত ফ্রেনলজির যুক্তি হাজির করে রহস্য সমাধান করেছেন।[103]

সেই শতকের শেষ পর্বে পো-অনুপ্রাণিত আর্থার কনান ডয়েলের কলমে ফ্রেনলজির পুনর্বাসন ঘটেছিল। অতঃপর, শার্লক হোমসও যে ফ্রেনলজি-মোহিত হবেন ও তার প্রয়োগ ঘটিয়ে তাকে 'Science of deduction'-এর সমগোত্রীয় সম্মান দেবেন, তা আর আশ্চর্য কী! আর শুধু যে ফ্রেনলজিই হোমসের হাত ধরে ফিরেছিল তা নয়, সঙ্গে ছিল সভ্য ও আদিমের প্রথাগত দ্বিত্ব— যেখানে সভ্য মানেই ইউরোপ, আর তার বাইরে সবই 'আদিম'। কনান ডয়েলের *The Sign of Four* উপন্যাসে আন্দামানবাসী টোঙ্গার চরিত্রে সেই 'আদিমতা' ও 'বর্বরতা'র সঙ্গে ফ্রেনলজি ও দৈহিকতাকে মিশিয়ে এক নতুনতর 'অপরাধী'র রূপকল্প হাজির করা হয়েছিল। টোঙ্গার সেই 'আদিম' ও 'বর্বর' রহস্যময় জগতে 'সভ্যতা'র আলো পৌঁছয়নি। সেই আলোর বাহক ব্রিটিশ উপনিবেশ। তাই হোমস এবং ওয়াটসন

---

101 ফরাসি সমাজে ফিজিওনমি ও ফ্রেনলজিভিত্তিক জাতিতত্ত্ব নির্মাণ ও সেই অনুযায়ী বিভিন্ন বর্গীয় পরিচয় তৈরির ইতিহাসে ল্যাকাসানের ভূমিকা আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Martin S. Staum, *Labeling People: French Scholars on Society, Race, and Empire, 1815–1848*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪

102 Brett Zimmerman, "Phrenology", in Kevin J. Hayes (Ed.) *Edgar Allan Poe in Context* (New York : Cambridge University Press, 2013), পৃ. ৩০১-৩১২

103 তদেব

তথা তামাম ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অধীকর্তাদের কাছে সমীকরণটা ছিল এই যে, ভারতীয় মানেই বর্বর, বর্বর মানেই আন্দামানবাসী ও আন্দামান মানেই ভারত।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের ঠিক পরেরর বছরেই মহীয়সী মহারানির শাসন শুরুর পর্বে আন্দামানে তৈরি করা হল দ্বীপান্তরের শাস্তিকেন্দ্র। যে ব্যক্তি তার কৃত অপরাধের জন্য তথাকথিত সভ্যতার সংসর্গে থাকার যোগ্য নয়, তাকে পাঠাতে হবে আরও 'অসভ্য, বর্বর'দের মধ্যে। হয়ত, সেখানে গিয়ে তার বোধদয় হবে যে, মহারানির শাসন কত আলোকদীপ্ত, ইষ্টিময়। এইভাবে উপনিবেশের মধ্যে তৈরি হল আরেক উপনিবেশ, ভারতের প্রশাসনিক সীমানার মধ্যে অথচ এক আরও অচেনা ভূগোল হয়ে থেকে গেল আন্দামান। এডয়ার্ড সঈদ বলছেন, সাম্রাজ্য এতই সর্বত্রগামী ও সর্বব্যাপী যে সেই অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে আলাদা করে দেখা যায় না। বরং, সেই সাম্রাজ্যবাদী আধুনিকতার বাহক হিসাবে উপন্যাস এমন এক সাহিত্য-বাস্তবতার প্রকৌশল হাজির করে যা সেই বয়ানের ছত্রেছত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ হিসাবে সাধারণীকৃত হয়ে যায়। উপন্যাস হয়ে ওঠে এমন এক অন্তর্ভুক্তিকামী ও প্রায় বিশ্বকোষসদৃশ সাংস্কৃতিক উৎপাদন যা ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিসরের উচ্চবচতার নির্ভরে বিশ্বায়িত বিশ্ব-দৃষ্টির জন্ম দেয়, যার কেন্দ্রে আছে আলোকবর্তিকাসদৃশ মহানগর ও দূরবর্তী প্রান্তে আছে রহস্যময়, ধোঁয়াশাআবৃত উপনিবেশ।[104]

সেই উপনিবেশ যখন মাতৃরাষ্ট্রের উপরে ছায়া ফেলে, ঢুকে আসে তার অন্দরে তখন শাসকের চিরচেনা ভূগোলও গুলিয়ে যায়, অন্ধকারে পথের ঠাহর হয় না। অন্ধকার আর উপনিবেশ এক গূঢ় প্রাচ্যবাদের গিঁটে আটকে যায়। ঘরে-বাইরের সেই প্রভেদ যেমন কলিন্স-কথিত ভেরিনডার পরিবারে মুছে গিয়েছিল ভারতীয় হীরের আগমনে, তেমনই কনান ডয়েল-এর *The Sign of Four* উপন্যাসেও আগ্রা-রত্নের রহস্য সমাধানে মিস মর্সটানের সঙ্গে শার্লক হোমস ও ডাক্তার ওয়াটসন যখন থেডিয়াস সোল্টোর আস্তানার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তখন চোখ বেঁধে তাদের জন্য অপেক্ষমান গাড়িতে তুলে দেয় রাস্তার এক আরব; রাতের অন্ধকার-আলোর ছায়াময় লন্ডনের উপান্তের চেনা অলি-গলি কেমন রহস্যময় প্রাচ্যনগরীর আদল পায়।[105] প্রাচ্য এভাবেই যেন প্রতীচ্যকে গ্রাস করে নেয়।

সেই আঁধারে ওয়াটসনের পক্ষে রাস্তার মালুম দুরুহ হলেও, হোমস গাড়িতে বসে বসেই মানচিত্রের মত পথের হদিশ বলতে থাকে। উন্নত শহরের রোশনাইয়ের নীচে চাপাপড়া অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে হোমসের জ্ঞান বিপুল, অথচ একই স্থান-কালে বাস করলেও সেই জগত ওয়াটসনের কাছে যেন অপরিচিত বিদেশ। ফলে, শহুরে গরিব-গুর্বোদের মধ্যে হোমসের অনায়াস বিচরণ, কখনও ছদ্মবেশে তথাকথিত ছিঁচকে অপরাধীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে

---

[104] Edward W. Said, *Culture and Imperialism*, প্রাগুক্ত। প্রধানত দুটি অধ্যায় 'Connecting Empire to Secular Interpretation' এবং 'Narrative and Social Space'.

[105] "We had indeed reached a questionable and forbidding neighbourhood. Long lines of dull brick houses were only relieved by the coarse glare and tawdry brilliancy of public-houses at the corner. Then came rows of two-storied villas, each with a fronting of miniature garden, and then again interminable lines of new, staring brick buildings—the monster tentacles which the giant city was throwing out into the country. At last the cab drew up at the third house in a new terrace. None of the other houses were inhabited, and that at which we stopped was as dark as its neighbours, save for a single glimmer in the kitchen-window." দ্রষ্টব্য: Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes*, প্রাগুক্ত।

খবর সংগ্রহ করে আনা প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় যে, কদর্য বলপ্রয়োগের বদলে জোর পড়ছে নিরন্ধ্র কিন্তু সূক্ষ্ম, আপাত-অদশ্য নজরদারির উপরে। সেই নজরদারি এতই গোপন যে তার মধ্যে মিশে যায় রহস্য-রোমাঞ্চের অনুভব। এরই আরেকটি রূপ ঔপনিবেশিক জ্ঞান/ক্ষমতার কাঠামো, যেখানে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সঙ্গে গোপনে নজরদারি চালানো, সাংকেতিক ভাষার মর্মোদ্ধার, অজানা-অচেনার মর্ম চিরে তাকে পুরোটা বুঝে নেওয়ার উদগ্র বাসনার বিভিন্ন প্রকরণের যৌগপত্য ঘটেছিল। সেইদিক থেকে বিচার করলে, কলিন্স-এর *The Moonstone* উপন্যাসের প্রাচ্যাভিযাত্রী বিখ্যাত ভারত-অভিযাত্রী মার্থোয়েট যেন-বা হোমসের পূর্বপুরুষ, যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে ছদ্মবেশে এমন সব স্থানে গেছেন যেখানে আগে কোনো ইউরোপীয় পৌঁছতে পারেনি। মার্থোয়েটের বর্ণনায় বলা হচ্ছে, তিনি লম্বা, ছিপছিপে, চুপচাপ ধরনের লোক। স্বাভাবিকভাবেই অভিযাত্রীসুলভ তাঁর রোদেপোড়া বাদামি গায়ের রঙ এবং দীর্ঘ অভিযানের ক্লান্তি তাঁর চোখেমুখে ছাপ ফেলেছে। তবে আসল কথা হল, তাঁর স্থির সজাগ দৃষ্টি, যে দৃষ্টিপ্রাখর্য্য ব্যতিরেকে প্রাচ্য-রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়— "(h)e had a… very steady, attentive eye".[106]

হোমসরা পৌঁছলে পরে সোল্টোর বাড়ির দরজা খুলে সামনে দাঁড়ায় হলুদ পাগড়ি মাথায়, ঢিলা সাদা পোশাকের উপরে হলদে কোমরবন্ধনী পরিহিত 'হিন্দু' খিদমৎগার! এমনকী, ভারতীয় মানেই হিন্দু— সেই ঔপনিবেশিক সরলীকরণের ফাঁদ থেকেও ডয়েল ওয়াটসনকে মুক্তি দেননি, অথচ ওয়াটসন ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সুবাদে ভারত সম্পর্কে প্রত্যক্ষত হোমসের থেকে বেশি ওয়াকিবহাল। কিন্তু, সেই ইংরেজ-পরিবেশে এহেন প্রাচ্য-উদ্ভূত চেহারা যে একেবারেই বেমানান সে সম্পর্কে ওয়াটসন নিশ্চিত।[107] সেই বাড়ির ভেতরে আরও চমক অপেক্ষা করছিল। বাড়িটি বাহ্যত ইংল্যান্ডে হলেও, থেডিয়াস সোল্টোর নির্দিষ্ট ঘরটি যেন প্রাচ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কিংবদন্তীসম ঐশ্বর্যের কাল্পনিকতা ও রহস্যময়তার আবরণ জড়ানো প্রাচ্যের যে মানস আদল পশ্চিম ইওরোপে সুপরিচিত ছিল, এখানে ওয়াটসনের জবানিতে তার পুনরাবৃত্তি করেন ডয়েল:

> The richest and glossiest of curtains and tapestries draped the walls, looped back here and there to expose some richly mounted painting or *Oriental* vase… Two great *tiger-skins* thrown athwart it increased the suggestion of *Eastern luxury*, as did a huge *hookah* which stood upon a mat in the corner. A lamp in the fashion of a silver dove was hung from an almost invisible golden wire in the centre of the room. As it burned it filled the air with a subtle and aromatic odour.[108]

---

[106] এহেন ভারত-অভিযাত্রী মার্থোয়েট শান্ত স্বরে রাচেল ভেরিন্ডারকে ভারতে যাওয়া সম্পর্কে সাবধান করে দেন: "If you ever go to India,… don't take your uncle's birthday gift with you. A Hindoo diamond is sometimes part of a Hindoo religion. I know a certain city, and a certain temple in that city, where, dressed as you are now, your life would not be worth five minutes' purchase." দ্রষ্টব্য: Wilkie Collins, *The Moonstone*, ed. John Sutherland, প্রাগুক্ত। মার্থোয়েটের চরিত্রে উইলিয়ম স্লীম্যান ও রিচার্ড বার্টনের ছায়া পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। স্লীম্যান ও বার্টন যথাক্রমে ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে ব্রিটিশ সরকারের হয়ে ছদ্মবেশে গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: Jaya Mehta, "English Romance: Indian Violence", প্রাগুক্ত।

[107] "There was something strangely incongruous in this Oriental figure framed in the commonplace doorway of a third-rate suburban dwelling-house." দ্রষ্টব্য: Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes*, প্রাগুক্ত। অথচ, ততদিনে স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়ার ভারতীয় খিদমতগার আবদুল্লা সম্পর্কে ব্রিটিশ সমাজে যথেষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও, ডয়েল এহেন সরলীকরণ করেন।

[108] তদেব (নজরটান সংযোজিত)

বস্তুত, খিদমৎগারের বিশেষণ হিসাবে 'হিন্দু' শব্দের প্রয়োগ এবং 'Indian', 'Oriental', 'Eastern' প্রভৃতি বিশেষণের সমার্থক ব্যবহার এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

হোমস ও তার সঙ্গীদের যাত্রাপথে রাতের অচেনা লন্ডন আর সভ্যতার আলোকহীন অন্ধকার ভারতে অজানা-অচেনা-আদিম বিপদ ঘাপটি মেরে আছে, যাদের অতর্কিত হানাদারির সামনে 'সভ্য' মানুষের জীবনের মূল্য নেই। কিন্তু যে পথে তাদের যাত্রা সে পথ নির্জন, এমনকী তা আদৌ লন্ডনের কোনো পথ বলেই মনে হয় না। সেখানে যেন প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের, 'সভ্যতা'র সঙ্গে 'বর্বরতা'র, উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রভু ও ঔপনিবেশিকতার অধীন প্রজার, স্ব-এর সঙ্গে অপরের প্রভেদ লীন হয়ে যায়। সমকালীন এক আলোচক প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টীয় অনুজ্ঞাধীন Salvation Army-র প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম বুথ সেই ভূগোলকে 'অন্ধকারতম ইংল্যান্ড' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৮৯০ সালেই *In Darkest England and the Way Out* বইতে বুথ অন্ধকারময় আফ্রিকার অনুষঙ্গ মিলিয়ে সেই আমলের ইংল্যান্ডকে "Darkest England" বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই অন্ধকারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবধান মুছে যায়, স্থানচ্যুতির সংশয় থেকে তৈরি হয় উদ্বেগ— প্রভু ও দাসের, জাতিগত ও জাতীয়তাগত দ্বিকোটি বিভাজনসমূহ লুপ্ত হওয়ার মানসিক ভীতি। সেই ভীতিময় পরিবেশে, সোল্টোর আস্তানায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভাজন লুপ্ত হয়, প্রাচ্য সেখানে পাশ্চাত্যের আধিপত্যে থাবা বসায়। বুথের মতে সেই 'অন্ধকারতম ইংল্যান্ড' যেন প্রাচ্যের যাবতীয় 'নেতিবাচক' অভিজ্ঞানপুষ্ট— "its monotonous darkness, its malaria and its gloom, its dwarfish de-humanized inhabitants, the slavery to which they are subjected, their privations and their misery."[109] এহেন, অন্ধকারে আলোকবর্তিকাসম বৈজ্ঞানিকতা ও অবরোহী যুক্তির আয়ুধ-হাতে হাজির হয় গোয়েন্দা। সেই অন্ধকারতম ইংরেজ-পরিসরে এক প্রাচ্যপন্থী যাপনের আখ্যান তৈরি হয় সোল্টো ও স্মলকে ঘিরে, যা অনেকটা মিখাইল বাখতিন-বর্ণিত 'গ্রটেস্ক'-এর অভিঘাত তৈরি করে।[110]

১৮৫৭-র বিদ্রোহ ব্রিটিশ জনগণকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ঔপনিবেশিক মনোন্নয়নের কাণ্ডারী শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার বাহক ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও, আদতে তারা আইনধ্বংসকারী অর্থনৈতিক শোষক। সেই শোষণের প্রতিক্রিয়ায় সাম্রাজ্যের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে শোষিত প্রজা। সাম্রাজ্যের গায়ে সেই রক্তাক্ত ছাপই এই গোয়েন্দা আখ্যানগুলির পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করেছিল। কলিন্স ও ডয়েলের আলোচ্য উপন্যাস দুটিতেই উপনিবেশের মানুষ লন্ডনে ঢুকে এসে উপদ্রব বাধায়। কিন্তু, শৃঙ্খলা ও শান্তির ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে, তার চেষ্টায় রত গোয়েন্দা বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতায় প্রথমেই সেই উপদ্রবকে চিহ্নিত করেন ও তারপরেই সেটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে প্রমাণ করে তার পিছনে নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা শারীরবৃত্তীয় নানান কারণের

---

[109] William Booth, *In Darkest England and the Way Out* (London: The Salvation Army, [1890] 2001). https://www.canonsociaalwerk.eu/1887_ldhreclassering/1890Boothdarkestengland.pdf

[110] Mary Russo, *The Female Grotesque: Risk, Excess, and Modernity* (New York: Routledge, 1995), পৃ. ৭-১৩

উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে দেন। প্রসঙ্গত মিশেল ফুকোর বিশ্লেষণ স্মরণ করা যেতে পারে। গণপরিসরে সহজলভ্য অপরাধকেন্দ্রিক উপন্যাসের (যার মধ্যে গোয়েন্দা কাহিনীও পড়ে) কাজই হল—

> (T)o show that the delinquent belonged to an entirely different world, unrelated to familiar, everyday life. This strangeness was first that of the lower depths of society…, then that of madness… and lastly that of crime in high society... (T)he detective novel has produced for the last hundred years or more an enormous mass of 'crime stories' in which delinquency appears both as very close and quite alien, a perpetual threat to everyday life, but extremely distant in its origin and motives, both everyday and exotic in the milieu in which it takes place.[111]

আদতে, হোমস-কেন্দ্রিক জগতে সকলেই যেন ফুকো-কথিত "calculable man".[112] আর, হোমসীয় আখ্যানে কেবল অপরাধীর শরীর নয়, সমগ্র সামাজিক কাঠামোকেই নির্দিষ্ট কতগুলি ব্যবহারবিধির অধীনে আনার ছক দেখা যায়। তাই হোমসের আখ্যান-জগতে অপরাধী ও ভুক্তভোগী মক্কেলের জন্য কতগুলি অনড় বিধি চালু আছে। সেই বিধির ভিত্তিই হল আচরণের স্থানুত্ব, যা নির্দিষ্ট খোপে বন্দি, তার পরিবর্তন বা মুক্তি নেই। ফুকো বলবেন, এই আদর্শ আচরণের ছকের মাধ্যমে আরোপিত শৃঙ্খলা আদতে উচ্চ/নিম্নকোটি বিভাজনের প্রক্রিয়া। সজ্জার হেরফের ঘটিয়ে কেবলই তা রূপান্তরের এক খেলা। সেই খেলায় শরীরের উপরে কোনো অনড় স্থানিকতা আরোপ করে তাকে নির্দিষ্ট করে বিচ্ছিন্ন করা হয় না, বরং তাকে এক গুচ্ছ সম্পর্কের আবর্ত-পাকে ফেলে দেওয়া হয়। কলিন্সের উপন্যাসে আফিম ও ডয়েলের উপন্যাসে আন্দামানবাসীর রক্তপিপাসু আদিমতাই ঐ উপদ্রবের কারণ। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ও ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা তথা প্রাচ্যের যে 'উপদ্রব' ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের উপরে অরাজকতার ছায়া ফেলেছিল তাকে নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির জোরে শেষাবধি দূর করতে সক্ষম হয় গোয়েন্দাপ্রবর। ডেভিড মিলার দেখিয়েছেন যে, গোয়েন্দার সর্বোৎকৃষ্ট দূরদর্শিতার জোরে এক সার্বত্রিক ভয়াবহ চূড়ান্ত নজরদারির সম্ভাবনা তৈরি হয়।[113]

উনিশ শতকী ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যে সেই ঔপনিবেশিক উপদ্রবের উৎকৃষ্টতম নমুনার ভৌগোলিক অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই আন্দামান। আর সেই আদিম বর্বরতার প্রতিভূ জনাথন স্মলের পার্শ্বচর, তার 'রহস্যাবৃত সহকারী' আন্দামাননিবাসী টোঙ্গা। দ্বীপবাসী টোঙ্গাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে দেয় স্মল। সেই ইস্তক টোঙ্গা যেন স্মলের অনুরক্ত 'কুকুর'টি, সর্বদা তাকে অনুরসরণ করে। বস্তুত, টোঙ্গাকে কখনও পৌরাণিক 'নরকের কুকুর', কখনও 'বর্বর', কখনও 'নরমাংসভোজী' ইত্যাদি অনুষঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে।[114] এই বিষয়েও ওয়াটসন দ্বিমত পোষণ করেনি। মিশেল ফুকোর বক্তব্য উদ্ধৃত করে সঈদ যে প্রাচ্যবাদী "classification" বা বর্গীকরণ প্রক্রিয়ার হদিশ

---

[111] Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

[112] তদেব, পৃ. ১৯৩

[113] মিলারের মতে, সেখানে: "everything would be known, incriminated, policed." দ্রষ্টব্য: D. A. Miller, *The novel and the police,* প্রাগুক্ত।

[114] কেবল টোঙ্গা নয়, এমনকী আবারও সেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রসঙ্গ আসা মাত্রই জনাথন স্মলের জবানিতে বিদ্রোহীরাও "rebel dogs" বলেই উল্লিখিত হয়। দ্রষ্টব্য: Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes,* প্রাগুক্ত।

দিয়েছেন, তা আদতে আঠারো শতকী পশ্চিম ইউরোপীয় সংস্কৃতির গর্ভজাত ও উনিশ শতকে ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যে তার ব্যাপক ও গভীর প্রভাব দেখা যায় । সেখানে প্রাচ্যকে জাতি, বর্ণ, উৎপত্তির বিভিন্ন গোত্রে বর্গীকরণ করে সাজিয়ে নিতে হয় পাশ্চাত্যের জ্ঞানতত্ত্বের আদলে।[115] সেই বর্গীকরণের প্রকৃষ্ট কাঠামো ডয়েল হাজির করেছেন 'আদিম' টোঙ্গার বর্ণনায়:

> It straightened itself into a little black man—the smallest I have ever seen—with a great, misshapen head and a shock of tangled, dishevelled hair. … He was wrapped in some sort of dark ulster or blanket, which left only his face exposed, *but that face was enough to give a man a sleepless night. Never have I seen features so deeply marked with all bestiality and cruelty.* His small eyes glowed and burned with a sombre light, and *his thick lips were writhed back from his teeth, which grinned and chattered at us with half animal fury*.[116]

এহেন 'আদিম, বর্বর বিকৃত মনুষ্যেতর প্রাণী'কে দেখামাত্রই যে হোমস ও ওয়াটসনের হাতে বন্দুক উঠে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কী! ঔপনিবেশিক 'আপদ' যদি সাম্রাজ্যের মহানগরীতে হানা দেয় তখন আগ্নেয়াস্ত্রই আত্মরক্ষার উপায়। তবে শুধু বন্দুকধারী হলে যে জ্ঞানদীপ্ত সংস্কারক ইংরেজের কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। তাই আখ্যানে যেই-না হোমস পায়ের ছাপের ভিত্তিতে সমগ্র রহস্যের সঙ্গে এক বিশেষ শারীরিক গঠনের কারো যোগ আন্দাজ করেছে তখনই সে সাম্রাজ্যের হয়ে উপনিবেশের মানুষকে বর্গীকরণের/সাধারণীকরণের খোপে বন্দী করে ফেলেছে:

> Some of the inhabitants of the Indian Peninsula are small men, but none could have left such marks as that. The Hindoo proper has long and thin feet. The sandal-wearing Mohammedan has the great toe well separated from the others because the thong is commonly passed between. These little darts, too, could only be shot in one way. They are from a blow-pipe. [117]

কিন্তু, হোমসের চিন্তা হল এহেন ব্লো-পাইপ-ধারী 'বর্বর'-এর অনুসন্ধান কীভাবে সম্ভব? সেই প্রশ্নে ওয়াটসনের মাথায় দক্ষিণ আমেরিকার ভূগোল উঁকি দেয়, কারণ পাশ্চাত্যের জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে 'অসভ্য বর্বর আদিমতার' তিনটি স্থানিক পরিচিতি— ভারত, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। বন্ধুর ভুল ভাঙাতে হোমস ঝটিতি তার দিকে এগিয়ে দেয় এক ঢাউস গেজেটিয়ারের প্রথম খণ্ড। সেই বই ঘেঁটেই ঐ দূরস্থিত স্থানের সম্পর্কে অবগত হয়েছে গোয়েন্দাপ্রবর :

> Andaman Islands, situated 340 miles to the north of Sumatra, in the Bay of Bengal…. The aborigines of the Andaman Islands may perhaps claim the distinction of being the smallest race upon this earth,…*They are a fierce, morose, and intractable people, though capable of forming most devoted friendships when their confidence has once been gained…. They are naturally hideous, having large, misshapen heads, small fierce eyes, and distorted features*. Their feet and hands, however, are remarkably small. So intractable and fierce are they, that *all the efforts of the British officials have failed to win them over in any degree*. They have always been a terror to shipwrecked crews, braining the survivors with their

---

[115] Edward W. Said, *Orientalism*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২১

[116] Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes*, প্রাগুক্ত (নজরটান সংযোজিত)

[117] তদেব

> stone-headed clubs or shooting them with their poisoned arrows. *These massacres are invariably concluded by a cannibal feast.*[118]

স্বাভাবিকভাবেই, আন্দামানের বাসিন্দাদের সম্পর্কে যে বর্ণনা আখ্যানে উত্থাপিত হয়েছে তা যে কেবল অতিশয়োক্তি তাই নয়, প্রাচ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বের অভূতপূর্ব নমুনা। উপনিবেশে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য গেজেটিয়ার ছিল অপরিহার্য। ম্যাথু এডনি লিখেছেন যে, ১৮২০ সালে উইলিয়ম হ্যামিল্টন ঔপনিবেশিক ভারতের আদিপর্বের অন্যতম গেজেটিয়ার তৈরি করেন। তার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশীয় ভৌগোলিকতার রহস্যভেদ।[119] সেইসব গেজেটিয়ার কিনতে পাওয়া যেত ও সেগুলির সাহায্যে লন্ডন কিংবা ভারতে বাসকারী যেকোনো শিক্ষিত ইংরেজ ব্যক্তি উপনিবেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করতে পারত।[120] তাই আধুনিক শিক্ষিত ইংরেজ হোমসও লন্ডনে নিজের ঘরে বসেই আন্দামানের হদিশ পেয়ে যায় গেজেটিয়ার থেকে, যে বইয়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব সংশয়াতীত: "It may be looked upon as the very *latest authority*."[121] এই দিক থেকে বিচার করেই বার্নার্ড কোন ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের নির্মাণ বিষয়ক আলোচনায় একইসঙ্গে বর্গীকরণ ও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠানিকীকরণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন:

> An investigative modality includes the definition of a body of information that is needed, the procedures by which appropriate knowledge is gathered, its ordering and classification, and then how it is transformed into usable forms such as published reports, statistical returns, histories, gazetteers, legal codes, and encyclopedias.[122]

দ্বীপবাসীরা 'সভ্যতার আলো' থেকে বহু যোজন দূরে বাসকারী হিংস্র পশুবৎ, যারা মানুষকে নাগালে পাওয়া মাত্রই নরমাংসভোজী হয়ে ওঠে। 'মনুষ্যেতর' এহেন 'আদিম জন্তু' যদি ইংল্যান্ডে ঢুকে পড়ে তাহলে সাম্রাজ্যগর্বী গোয়েন্দার অবশ্যকর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধার অবকাশ থাকে না। ডয়েল-সৃষ্ট শার্লক হোমসের চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদ, প্রাচ্যবাদ ও বৈজ্ঞানিকতার সংমিশ্রণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এডয়ার্ড সঈদ ক্ষমতা ও জ্ঞানের সমন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন— "a union of power and knowledge".[123] শ্বেতাঙ্গ, ব্রিটিশ পুরুষ হোমস এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আইনরক্ষায় সচেষ্ট এবং সেই কাজে তিনি বৈজ্ঞানিকতানির্ভর বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করেন।[124] সঈদ মনে করেন,

---

[118] তদেব, নজরটান সংযোজিত

[119] "to reduce the Geography of Hindostan to a more systematic form than has yet been attempted". দ্রষ্টব্য: Matthew H. Edney, *Mapping an Empire: The Geographical construction of British India, 1765-1843* (Chicago and London : University of Chicago Press, 1997), পৃ. ৩২৪

[120] "the educated British in both India and London could find any place of importance within the confines of the imperial space of Company India."দ্রষ্টব্য: Matthew H. Edney, তদেব

[121]: Sir Arthur Conan Doyle, তদেব, নজরটান সংযোজিত

[122] Bernard S. Cohn, *Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India* (New Jersey: Princeton University Press, 1996), পৃ. ৫

[123] Edward W. Said, *Culture and Imperialism*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

[124] সঈদ বলেছেন, জীবন সম্পর্কে হোমসের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিশে ছিল "a healthy respect for, and protection of, the law allied with a superior, specialized intellect inclining to science". দ্রষ্টব্য: তদেব

সাম্রাজ্যিক কার্যকলাপের উপরে জ্ঞানের যে আবরণ তৈরি করা হয়, সেটাই প্রাচ্যবাদী প্রতর্কের কেন্দ্রীয় চরিত্র। একজন গোয়েন্দা বা বুদ্ধিজীবী কিংবা পর্যটক (হোমস কিংবা মার্থোয়েট) প্রাচ্যের ভূগোল সম্পর্কে তখনই সম্যক ওয়াকিবহাল হতে পারে যদি সে সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের শরিক হয়। আদতে গোয়েন্দার ক্ষমতার উৎস, তার বিশিষ্ট জ্ঞান এবং সেই বিশিষ্ট জ্ঞান নির্মাণ-প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি সাম্রাজ্যবাদ, "…whose unorthodox style of operation is rationalized by new fields of experience turned into quasi-academic specialties. Colonial rule and crime detection almost gain the respectability and order of the classics or chemistry."[125]

'সভ্য' (শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক) বনাম 'আদিম' (ঔপনিবেশায়িত কৃষ্ণাঙ্গ প্রজা)-এর এমন বৈপরীত্য আখ্যানে যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে, তা পাঠকের সন্তুষ্টিবিধানেও সফল হয়। ঔপনিবেশিক 'অপর' নির্মাণ ও সেই অপরের উপরে অপরাধের দায় চাপিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার যে কথন ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যে নির্মিত হয়েছিল, তা একভাবে শ্রেণি ও বর্গান্তরে ইংরেজ পাঠকের মনে এক জাতীয়তার বোধ সঞ্চারিত করেছিল। তাই উপনিবেশবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যাশক্রফ্ট, গ্রিফিথ্স ও টিফিন লিখেছেন:

> In Britain… by the end of the nineteenth century a domestic programme for the function of Empire could be clearly discerned, as Victorian society faced increasing internal dissension and division… *Empire became the principal ideological unifier across class and other social divisions in Britain... An other (the colonized) existed as a primary means of defining the colonizer and of creating a sense of unity beneath such differences as class and wealth and between the increasingly polarized life of the industrialized cities* that developed the wealth and that of the traditional countryside to which its beneficiaries retreated or retired.[126]

প্রসঙ্গত বলা যায়, আলোচ্য উপন্যাসে হোমস উল্লিখিত গেজেটিয়ারের সম্বন্ধে বিশদে না-বললেও সালতামামি থেকে যদি ধরা হয় যে, সেটি ১৮৮১তে লন্ডনের ট্রুবনার অ্যান্ড কোম্পানির ছাপা ও তৎকালীন ভারত সরকারের 'Director-General of Statistics' ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যের সহযোগী (C.I.E. : The Companion of the Indian Empire) উইলিয়ম উইলসন হান্টার কর্তৃক সম্পাদিত এবং যুগধর্ম অনুযায়ী ইংল্যান্ডের রানী ("Queen of England") ও ভারত-সম্রাজ্ঞী ("Empress of India") "Her most gracious Majesty" ভিক্টোরিয়ার চরণকমলে উৎসর্গীকৃত *The Imperial Gazetteer of India*-র প্রথম খণ্ড, তাহলে দেখা যেতে পারে সেখানে আন্দামান সম্পর্কে কী বিবরণ হাজির করা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত আন্দামান কতগুলি দ্বীপের সমষ্টি। সেই দ্বীপপুঞ্জে সবথেকে স্পষ্ট তার পার্বত্যরেখা, যার সর্বোচ্চ মাত্রা প্রায় তিনহাজার ফুট। প্রাচীন গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমির রচনায় নিশ্চিত করে এই দ্বীপমালা সম্পর্কে বলা না-হলেও পরবর্তীকালে স্কটিশ প্রাচ্যবাদী ভৌগোলিক কর্নেল স্যর হেনরি ইয়ুল *Encyclopedia Britannica*-র নবম সংস্করণে লিখেছেন যে তাঁর মনে হয় খুব সম্ভবত আন্দামান নামটি সুপ্রাচীন— "is traceable in

---

[125] Edward W. Said, তদেব

[126] Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, *Postcolonial Studies: The Key Concepts* (London & New York : Routledge, 2013 [2000]), পৃ. ৫৬ (নজরটান সংযোজিত)

the Alexandrian geographer", এবং নবম শতকে ভারত ও চীন সম্পর্কিত আরবি বিবরণে স্পষ্টভাবে আন্দামান নামটি পাওয়া যায়।[127] প্রাচীন আরব ভৌগোলিকদের গল্পে ও ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলোর— যিনি ঐ বাসিন্দাদের 'কুকুরমুখো নরমাংসভোজী' বলে উল্লেখ করেছিলেন— আখ্যানে বলা হয়েছিল যে সেই দ্বীপবাসীরা জীবন্ত মানুষভোজী বর্বর— "*savages who eat men alive*; black, with woolly hair; in their eyes and countenances something frightful; who go naked, and have no boats—if they had, they would devour all who pass near."[128]

ইউরোপীয় আলোকদীপ্তির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ফরাসী বিপ্লবের বছর অর্থাৎ ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যখন বাংলার সরকার দ্বীপান্তরের সাজা দিতে বন্দীদের ঐ দ্বীপে পাঠিয়ে দিতে শুরু করে। কিন্তু, ম্যালেরিয়ার প্রাবল্যে সেই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে পড়ে।[129] পরবর্তী প্রায় অর্ধ-শতক জুড়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বিষয়ে লেখাপত্রে কেবলই নরমাংশাসী দ্বীপবাসীদের বর্ণনা দেখা যায়:

> Andamans appear… only as a cluster of cannibal islands, peopled with fierce fish-eating tribes, who promptly killed the savant we had sent to study their natural history, cut off stragglers from two troop-vessels that had gone ashore, and murdered shipwrecked crews.[130]

এইসব অত্যাচার রুখতে বাধ্যত ঔপনিবেশিক সরকার আবার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অধিকার কায়েম করে এবং ১৮৫৭-র বিদ্রোহে জড়িত অভিযুক্তদের দ্বীপান্তরের সাজা হিসাবে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু, সাজাপ্রাপ্তদের জীবনও সেখানে দুর্বিষহ। কারণ তাদের ঘিরে থাকত:

> (S)avages of a low and ferocious type, who decorated themselves with red earth, mourned in a suit of olive-coloured mud, used *crying* to express the emotions of friendship or joy, bore only names of common gender which they received before birth, and whose sole approach to the conception of a God was that of an evil spirit who spread disease.[131]

প্রায় পাঁচ বছর ধরে দ্বীপপুঞ্জের আদি বাসিন্দারা প্রবলতম শত্রু হিসাবে নানাভাবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে: "'repulsing all approaches with treachery, or by showers of arrows,' murdering

---

[127] W. W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. I, Abar To Benares (London : Trübner & Co., 1881), পৃ. ১৯৪-১৯৮। এই খণ্ডটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণে আন্দামান বিষয়ক নিবন্ধে কয়েকটি সংযোজন ঘটে, যদিও মূল কাঠামো অপরিবর্তিতই ছিল। তবে, দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিত হওয়ার ফলে পৃষ্ঠাঙ্কে বদল ঘটেছিল। দ্রষ্টব্য: W. W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. I, Abar To Balásinor (London : Trübner & Co., 1885, Second Edition), পৃ. ২৮১-২৮৭।

[128] W. W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. I, Abar To Benares , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬। নজরটান সংযোজিত

[129] অবশ্য গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হয়েছে যে, ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে বিপর্যস্ত আন্দামানের 'আদিম' বাসিন্দারা হলে কুইনিনের কদর করতে শুরু করেছে— "recently begun to appreciate the value of quinine." দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ. ১৯৮

[130] তদেব, পৃ. ১৯৬

[131] তদেব, নজরটান মূলে

every one who strayed into the woods, and plotting robberies and arsons of a merciless sort.[132] অথচ, এর পরেও শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার আবিশ্ববাহক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যপ্রণেতা ব্রিটিশ শাসককুল কখনও গরমে কখনও নরমে সেই 'বর্বর'দের মধ্যে 'আধুনিক' প্রশাসনিকতার সুফল বিলিয়েছেন:

> By degrees, however, the British officers persuaded them to a better mind, by stern reprisals on the guilty, and by building homes near the settlement for the less hostile-sheds where they might be protected from the tropical rains, and receive food and medicines. Latterly an orphanage has been established for their children, under the care of European matrons.[133]

ঘটনাচক্রে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে আন্দামান ও নিকোবরের সমগ্র দ্বীপপুঞ্জকে যথাযথ শাসনের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকার একজন Chief Commissioner and Superintendent নিয়োগ করে, এবং সেই বছরেই ৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনে গিয়ে এক প্রাক্তন আফগান সৈন্য ও বন্দী শের আলি আফ্রিদির হাতে খুন হন। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পরে এই ঘটনা আবারও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আলোড়িত করে।[134]

কিন্তু, সবথেকে সমস্যা হল এহেন আন্দামানের আদি বাসিন্দাদের উৎপত্তির সূত্র নির্ণয়। ঠিক যেভাবে হোমসের কথা শুনে ওয়াটসনের মনে দক্ষিণ আমেরিকার কথা এসেছিল, কিংবা হোমস স্বয়ং যেভাবে টোঙ্গার পায়ের ছাপ দেখে ধন্দে পড়েছিল ঠিক সেইভাবে আন্দামাননিবাসী এই মানুষগুলির উদ্ভব নিয়ে সংশয়ী আলোচক বিষয়টিকে একটি 'নৃতাত্ত্বিক সমস্যা' তথা 'ধাঁধা'য় পরিণত করেন, যে ধাঁধার রহস্য গোয়েন্দা হোমস ভেদ করেছিল প্রাচ্যবাদী জ্ঞানের প্রয়োগে। প্রসঙ্গত, হোমসের জবানি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> When first I saw signs of strange weapons I was inclined to think so, but the remarkable character of the footmarks caused me to reconsider my views. Some of the inhabitants of the Indian Peninsula are small men, but none could have left such marks as that. The *Hindoo* proper has long and thin feet. The sandal-wearing *Mohammedan* has the great toe well separated from the others because the thong is commonly passed between. These little darts, too, could only be shot in one way. They are from a blow-pipe.[135]

বস্তুত, ভারতীয়দের হিন্দু ও মুসলমান— এই দুই বর্গে বিচার করার প্রবণতা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-প্রসূত জ্ঞানতত্ত্বের মজ্জাগত, জেমস মিলের ইতিহাসচিন্তা কিংবা শার্লক হোমসের ভারতীয়দের শারীরবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা, সর্বত্র সেই দ্বিকোটি বিভাজনের অবাধ গতি। ঘটনাচক্রে, বাস্তবের জেমস মিল ও কাল্পনিক শার্লক হোমস সশরীরে কখনও ভারতে আসেননি (পরশুরামের 'নীলতারা' কাহিনী বাদ দিলে)। অথচ পরোক্ষ উপাদান-নির্ভর জ্ঞানের নিরিখেই

---

[132] তদেব

[133] তদেব, পৃ. ১৯৬

[134] আলোচ্য গেজেটিয়ারে সেই ঘটনাকে আন্দামানের ইতিহাসে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা হয়েছিল: "The most memorable event in the history of the Andaman Islands". দ্রষ্টব্য: তদেব। গেজেটিয়ারের দ্বিতীয় সংস্করণে সেই হত্যাকাণ্ডের স্থানও নির্দিষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে — "at the foot of Mount Harriet". দ্রষ্টব্য: W. W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. I, Abar To Balásinor, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

[135] Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes*, প্রাগুক্ত (নজরটান সংযোজিত)

উপনিবেশের সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করতে উভয়েরই দ্বিধা হয় না।[136] হোমসের ঐ 'নৃতাত্ত্বিক সমস্যা'র যে বর্ণনা গেজেটিয়ারে আছে, তা হল:

> The aborigines of the Andamans are of a very low type apparently Oriental negroes, *whose origin is involved in obscurity. Their origin has been the subject of much discussion, and remains a curious and very interesting ethnographical problem*. Their skin is very black, and they are of small stature, very few of them exceeding 5 feet in height, while many are much shorter… . They go naked and live in leaf dwellings, or rather enclosures, which cannot be called huts; their food, which consists chiefly of turtle, wild roots and fruits, honey, fish, and when they can get it, hog, is always cooked…. They are good archers, making their own bows and arrows, and they shoot and spear fish with great dexterity.[137]

অতএব, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশ ও প্রাচ্যবাদ— এই ত্রিবেণীসঙ্গমে যে জ্ঞান ও ক্ষমতার জন্ম হয়েছিল তারই প্রয়োগিক প্রতিফলন দেখা যায় *The Imperial Gazetteer of India*-য় এবং *The Sign of Four*-এ। সেই বিচারে এই উভয় আখ্যানকে একে অন্যের পরিপূরক এবং প্রতিচ্ছবি হিসাবেও বিচার করা যায় এবং বোঝা যায় যে, কীভাবে ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনী প্রাচ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্ব এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও তার নানা প্রকরণের বাহক ও নায্যতা প্রতিপাদনের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। রোনাল্ড টমাসের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে: "how a designated figure of social authority—the literary detective— gains the power to discover "the truth" by acquiring the right to tell someone else's story against his or her will".[138]

বস্তুত, অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার আখ্যান তৈরি করা ও সেটিকে কর্তৃত্বের বলে আরোপ করাই উপনিবেশের মূল কথা। সেই আখ্যানের একটি রূপ ভারতের ইতিহাস, যা জেমস মিল আদি ব্যক্তিদের স্বকপোলকল্পিত ও উপনিবেশের মানুষের চিন্তনে আরোপিত, আর তারই আরেকটি রূপ গোয়েন্দা কাহিনী, যেখানে টোঙ্গার হয়ে কথা বলে জনাথন স্মল, কিংবা আন্দামানবাসীর হয়ে কথা বলে গেজেটিয়ার। টোঙ্গার তথা ভারতীয়দের অর্থাৎ উপনিবেশের মানুষের নিজস্ব আখ্যানের অধিকার নেই।[139] ঔপনিবেশিক প্রভুর সৃষ্ট ঐ সমস্ত আখ্যানেই প্রাচ্য তথা ভারতীয় উপনিবেশ সম্পর্কে নিঃশংসয় 'সত্য' জ্ঞান উৎপাদন ও বণ্টন করা হয়, কখনও তা ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে, কখনও 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' সম্পর্কে।

---

136 এই নির্দ্বিধ কর্তৃত্বময় জ্ঞানের সঙ্গে সাম্রাজ্যের যৌগপত্যই সঈদ ব্যাখ্যা করেছেন।

137 Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes*, প্রাগুক্ত (নজরটান সংযোজিত)। উদ্ধৃতির নজরটান দেওয়া অংশটির সঙ্গে যদি হান্টারের গেজেটিয়ারে আন্দামানবাসীদের কথা মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানেও বলা হয়েছে যে, ঐ দ্বীপবাসীদের—"conception of a God was that of an evil spirit who spread disease." দ্রষ্টব্য: W. W. Hunter, *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. I, Abar To Benares , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭। বাংরবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে *'devil-worshippers', 'evil spirit'* যুগ্মপদগুলির ব্যবহারের রাজনীতিটা খেয়াল করা দরকার।

138 Ronald R. Thomas, "The Fingerprint of the Foreigner: Colonizing the Criminal Body in 1890s Detective Fiction and Criminal Anthropology", *ELH*, Vol. 61, No. 3 (Autumn, 1994), পৃ. ৬৫৬

139 প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় সঈদের *Orientalism* বইয়ের শুরুতেই *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (১৮৫২) রচনা থেকে সংগৃহীত কারেল মার্কসের উদ্ধৃতিটি— "They cannot represent themselves; they must be represented." দ্রষ্টব্য: Edward W. Said, *Orientalism*, প্রাগুক্ত

ডয়েলের আলোচ্য গল্পের শেষে হোমসের গুলির আঘাতে টেমসে সলিলসমাধি হলো 'পিশাচমুখো সেই দ্বীপবাসী' 'অর্ধ-পশু ভিনদেশী' টোঙ্গার। আন্দামান থেকে লন্ডনে 'আসাটাই কাল' হয়েছিল তার। কিন্তু, আগ্রার রত্ন ও আন্দামানবাসী টোঙ্গার আবির্ভাব ছাড়া কনান ডয়েল কীভাবেই-বা সাম্রাজ্য-প্রণীত ঔপনিবেশিকতার হিংসাকে যাথার্থ্য দিতেন? *The Sign of Four* উপন্যাসের মাধ্যমে টোঙ্গার বর্ণনাকে কেন্দ্র করে 'আদিম' 'পশুবৎ' 'নরমাংসভোজী' প্রভৃতি অনুষঙ্গ হাজির করেছেন এবং আগ্রা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে সেটি ঝাঁকেঝাঁকে ধর্মোন্মাদ, নৃশংস শয়তানের পুজারী— "fanatics and fierce *devil-worshippers*"— পরিবেষ্টিত শহর।[140] উপনিবেশের মানুষ ও সেখানকার ভূগোল সম্পর্কে এই নেতিবাচক মনোভাব থেকেই ঔপনিবেশিক আধিপত্য কায়েমের নায্যতা প্রতিপন্ন করা হয়। সেই কারণেই ডয়েলের পূর্বসূরী কলিন্সকেও শ্রীরঙ্গপত্তনমের রত্ন ও হিন্দু ব্রাহ্মণত্রয়ের আমদানি ঘটাতে হয়েছিল। ১৮৬০-এর দশকে কলিন্স 'প্রাচীন সভ্যতা'র প্রতিনিধি হিন্দু ব্রাহ্মণত্রয়ীকে ভারতে ফিরে যেতে দিলেও, ১৮৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে 'প্রায়-পাশবিক বর্বর' টোঙ্গার জন্য ডয়েল বরাদ্দ করেছেন মৃত্যু ও টেমসে সলিলসমাধি। লন্ডনের নদীর পবিত্র জলনিমজ্জিত হয়ে টোঙ্গার মৃতদেহ হয়ত-বা 'বর্বরতার কলুষ'মুক্ত হবে।

বস্তুত, এই ধরণের প্রতর্কের মাধ্যমে ব্রিটিশ গণমানসে ঔপনিবেশিক শাসনে সংঘটিত আধিপত্যকামী হিংসার মতাদর্শ সম্পর্কে সমীহ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তৈরি করা হয়েছিল।[141] জয়া মেহতা দেখিয়েছেন যে, ১৮৪১-এ প্রকাশিত অ্যাডগার অ্যালেন পো-র 'The Murders in the Rue Morgue' গল্পের খুনে ওরাংওটাংকে নাবিক বোর্নিও থেকে প্যারিতে নিয়ে গিয়েছিল বেচে দেবে বলে। কিন্তু, সেই ওরাংওটাংকে সে বাগে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং সেই প্রাণীই মানুষ খুন করে।[142] পো-র গল্পের সেই প্রাণীর সঙ্গে ডয়েল-এর কাহিনীর আন্দামানবাসী টোঙ্গার বর্ণনা মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসকের দৃষ্টিতে ওরাংওটাং ও টোঙ্গার মধ্যে আদতে কোনো তফাতই নেই। দ্যুপাঁ যেভাবে ওরাংওটাং সম্পর্কে জর্জ কুভিয়েরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ঠিক তেমনই হোমস গেজেটিয়ার খুলে টোঙ্গার সম্পর্কে ধারণা পায়। উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে এনে গোয়েন্দাগিরিকেও বৈজ্ঞানিকতায় উন্নীত করা হয়। দুটি আখ্যানেই ঔপনিবেশিকতার হিংস্রতা ঢেকে রেখে 'আদিম-বর্বর' প্রাচ্যের হাতে 'আধুনিক-সভ্য' পাশ্চাত্য কীভাবে আক্রান্ত তারই খতিয়ান পেশ করা হয়েছে। নিরুদ্বেগ ইংরেজ সভ্যতার ভিত্তিতে আঘাত করে টোঙ্গার উপস্থিতি, যার ফলে মেরি মর্সটানের মত ভদ্রমহিলার জীবনে অশান্তি বাধে। সেই টোঙ্গাকে হত্যা করে হোমস শান্তিপুনঃস্থাপনায় সফল হয়।

---

[140] Sir Arthur Conan Doyle, *The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes*, প্রাগুক্ত (নজরটান সংযোজিত)

[141] রোনাল্ড টমাসের মতে হোমস-কাহিনীগুলি— "helped to transform reluctant approval, indifference, and direct criticism for imperial policies into general reverence, enthusiasm, and even hysteria in the British popular imagination". দ্রষ্টব্য: Ronald R. Thomas, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৮

[142] Jaya Mehta, "English Romance: Indian Violence", প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪২

প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্ব থেকেই টোঙ্গার মত অগণিত প্রাচ্যবাদী সাম্রাজ্যিক মতাদর্শ-প্রসূত বিপদ ইংল্যান্ডের পথে-প্রান্তরে ওৎ পেতে ছিল। ঘটনাচক্রে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানাভাবে আন্দামানে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসার ঘটিয়ে তার স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করা হয় এবং সেহেতু দ্বীপবাসী টোঙ্গা ভৌগোলিক বিচারে কার্যত ভারতবাসী না-হয়েও ইংরেজ শাসকের চোখে ভারতীয় হিসাবেই প্রতিভাত হয়। খেয়াল করার বিষয় এই যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহীদের সম্পর্কেও টোঙ্গার মতই 'হিংস্র, বর্বর, অসভ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন' ইত্যাদি বিশেষণ বারংবার ফিরে ফিরে আসে। জনাথন স্মল একদিকে টোঙ্গাকে বলে: "little hell-hound", "little devil", "little bloodthirsty imp" প্রভৃতি, আর অন্যদিকে বিদ্রোহী সিপাহিদের বলে: "black devils", "black fiends", "rebel dogs" — এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কিংবা টোঙ্গার খুনে আচরণ সবই একই ছকে ফেলে দেন কনান ডয়েল, এবং সেটি জাতিগত হীনতার ছক, যেখানে পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রাচ্যজাতিসমূহের থেকে 'উন্নত ও উচ্চস্থানীয়', এবং উন্নত পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের কর্তব্য ঐ 'অনুন্নত' প্রাচ্যজাতিগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের মাধ্যমে তাদের সভ্যতার আলোয় দীপ্ত করে তোলা।

এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধব্যেপে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উপস্থিতি প্রবলভাবে অনুভূত হয় সাম্রাজ্যিক রহস্য রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারধর্মী ও গোয়েন্দা-আশ্রিত ইংরেজি রচনাসমূহে, এবং তার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে এমন এক ব্রিটিশ সত্তা, যা প্রধানত সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতার নির্ভরে দাঁড়িয়ে থাকে।[143] সেই সত্তারই জনপ্রিয়তম প্রতিফলন শার্লক হোমস, যাকে নির্দ্বিধায় 'গুরু' মেনে নেয় উত্তর-উপনিবেশের 'সত্য'সন্ধানী মেধাজীবী গোয়েন্দা। ঔপনিবেশিক 'আদিম' টোঙ্গার উত্তর-ঔপনিবেশিক 'আদিম' সংস্করণ হয়ে ওঠে নীলমণি সান্যালের অপকর্মের সহচর বামন। উনিশ শতকের ধাপ বেয়ে শিরোমিতিবিদ্যা, লম্ব্রোসীয় অপরাধতত্ত্ব, 'অপরাধ' ও 'অপরাধী'র সঙ্গে যুক্ত ঔপনিবেশিক আদিমতার ধারণা, অপরাধীর দৈহিকতা, আন্দামান— ঔপনিবেশিক-শাসন-প্রসূত সমস্ত ধারণারাজি যেন ন্যায্যতা পায় উপনিবেশের প্রজা-কর্তৃক ঔপনিবেশিক আধুনিকতার কৃতার্থ গ্রহণে। অতঃপর দেখা দরকার বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য তার আদিপর্ব থেকেই আখ্যানের কেন্দ্রীয় দুটি চরিত্র— অপরাধী ও গোয়েন্দা— নির্মাণের ক্ষেত্রে কীভাবে সেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতা-সঞ্জাত ঐ ধারণাসমূহ গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণ করেছিল।

---

[143] প্রসঙ্গত বলা যায়, গৌরী বিশ্বনাথন তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ জাতীয় সংস্কৃতি ও সত্তা আদতে ঔপনিবেশিক নির্মাণের নির্ভরেই থিতু হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: Gauri Viswanathan, *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India* (New York : Columbia University Press, 2015 [1989]). ইংরেজ গোয়েন্দা চরিত্র ও ইংরেজি গোয়েন্দা আখ্যান সম্পর্কেও যে বিশ্বনাথনের ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যায়, সেটা উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়

‘সত্য’ অন্বেষীর বঙ্গ-বিজয়

‘ক্লু’-র ‘সত্য’মূল্য ও গোয়েন্দা পরিচয় নির্মাণের ঔপনিবেশিক আবহ

> They’re not called murder victim stories. They’re not called criminal stories. They’re called detective stories. There’s a reason for that.
>
> — Anthony Horowitz[1]

> আমাদের দেশে ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভাব আছে।… যিনি ভাবীকালে বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে।। এই বিবেচনায়… **ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকদিগের সাহায্যের উদ্দেশে, এই দেশের দস্যুদিগের কীর্ত্তিকলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব পুলিশের কার্য্যপ্রণালীর যতদূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।**
>
> — গিরিশচন্দ্র বসু[2]

> আসলে আমি খুব জটিল কেস হ্যান্ডেল করে অভ্যস্ত। এটা কেমন যেন বেশি সরল বলে মনে হচ্ছে। এটা আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা, তাই সেটাকে সহজে গ্রহণ করতে পারছি না।’ ‘এ আবার আপনার বাড়াবাড়ি মশাই… আমরা সহজ কেস হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, আর আপনার দেখছি তার ঠিক উলটো। **এইখানেই পুলিশ আর শখের গোয়েন্দার তফাত**’।
>
> — সত্যজিৎ রায়[3]

উইলকি কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসের শেষে ভারতে ফিরে গিয়েছিল বখেড়াসম হীরক। কিন্তু, প্রত্যাবর্তনের চক্রে আবারও তা আগ্রা-রত্ন রূপে লন্ডনে ফিরে আসে ডয়েলের *The Sign of Four* উপন্যাসে। কলিন্সের কাহিনীতে হিন্দু ব্রাহ্মণত্রয়ী ভারতে ফিরে গেলেও, উপনিবেশ আবারও টোঙ্গা রূপে ডয়েলের আখ্যানে লন্ডনে হানা দেয়। কিন্তু, টোঙ্গার আর ফেরা হয় না। ব্রিটিশ শাসনের আলোকচ্ছটায় সংস্কৃত ঔপনিবেশিক প্রজা ‘বর্বরতা’র যাবতীয় অভিজ্ঞান ত্যাগ করে সভ্যতাপ্রসারী শাসকের দানে মোহিত হয়ে থাকে। কিন্তু, শত হলেও টোঙ্গা সেই আন্দামানবাসী

---

[1] Anthony Horowitz, *The Word Is Murder* (Great Britain : Century, The Penguin Random House, 2017), ePub edition.

[2] গিরিশচন্দ্র বসু, সেকালের দারোগার কাহিনী, অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় (সম্পা.) (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৩ [১৮৮৮]), পৃ. ২

[3] সত্যজিৎ রায়, দার্জিলিং জমজমাট, ফেলুদা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ, ২০০৫ [১৩৯৩ বঙ্গাব্দ]), পৃ. ৩৬৬-৩৬৭

‘বর্বর’— এবং ‘বর্বরতা’র ‘শাস্তি’ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক প্রভু কিংবা আধুনিকতামোদী শিক্ষিত প্রজার মনে তিলমাত্র সংশয় নেই। টোঙ্গার টেমস-সমাধি-প্রাপ্তির (১৮৯০) শতকপূর্তিতে (১৯৯০) একটি তদন্তের স্বার্থে লন্ডনে যান প্রদোষচন্দ্র মিত্র। টোঙ্গাকে গুলি করে নিকেশকারী শার্লক হোমসের কাল্পনিক বাড়ির বাস্তব পাড়ায় দাঁড়িয়ে ইংরেজ গোয়েন্দা শিরোমণিকে স্মরণ করে প্রদোষচন্দ্র গদগদ স্বরে বলেন— “আজ আমার লন্ডন আসা সার্থক হল”।[4] একদা আবিশ্ব ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু লন্ডন থেকেই যে গোয়েন্দা কাহিনীর ক্ষমতা/জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল, তার নেতিবাচক হিংস্র ইতিহাস আলোকদীপ্ত সংস্কারের প্রলেপে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ধারক-বাহকের স্বীকৃতি হয়ে লন্ডনেই ফিরে এলো, এও এক প্রত্যাবর্তন। সেই আবর্তনে লন্ডন ও কলকাতা— ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতার দুই কেন্দ্রবিন্দু বারেবারেই জুড়ে যায়। সেই সংযোগটি আবারও স্পষ্ট করে দেন প্রদোষচন্দ্র।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক প্রাচীনত্বের মহিমা কিংবা আভিজাত্যের ছোঁয়া কলকাতা শহরে নেই। তা আদতে ঔপনিবেশিক শাসকের তৈরি শহর। কিন্তু, ইংরেজিশিক্ষিত আলোকদীপ্ত দেশীয় বুদ্ধিজীবী ঠিক যেভাবে একসময়ে ১৮৫৭-র বিদ্রোহী নেতৃত্বের সমালোচনা করে সেই ‘হাঙ্গামা’ থেকে দূরে সরে নিজেদের ব্রিটিশভক্তির ঘোষণায় ব্যগ্র ছিলেন, তেমনই কলকাতা শহর ও ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সুফলভোগী প্রদোষচন্দ্র মিত্র বলেন:

> একটা সাহেব মশা মাছি সাপ ব্যাঙ বন-বাদাড়ে ভরা মাঠের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে বসে ভাবল এখানে সে কুঠির পত্তন করবে, আর দেখতে দেখতে বন-বাদাড় সাফ হয়ে গিয়ে সেখানে দালান উঠল, রাস্তা হল, রাস্তার ধারে লাইন করে গ্যাসের বাতি বসল, সেই রাস্তায় ঘোড়া ছুটল, পাল্কি ছুটল, আর একশো বছর যেতে না যেতে গড়ে উঠল এমন একটা শহর যার নাম হয়ে গেল সিটি অফ প্যালেসেজ।[5]

পরে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে শাসকের গোঁসাবশত সুয়ো থেকে দুয়োরানি হওয়ায় সেই স্বপ্নময় শহর যতই হৃতগৌরব হোক, তার গায়ে একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর গৌরব-গন্ধ উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়েও লেগে আছে। অবশ্য, উপনিবেশোত্তর স্বাধীন নাগরিক এ বিষয়ে সচেতন যে, “সাহেবরা তাদের সুবিধের জন্যই এত সব করেছিল”।[6] কিন্তু যদি তারা সেই ‘আধুনিকতার’ সুফল ভাগ না-করে একলষেঁড়ে হয়ে থাকত, তাহলে মেকলে-কল্পিত — বাহ্যে বঙ্গ কিন্তু অন্তরে ইঙ্গ— দেশীয় সমাজ গড়েই উঠত না। তাহলে কীভাবেই-বা তৈরি হত নিত্য-নতুন পেশা ও সেই পেশায় আধিপত্য জমে উঠত ইংরেজিশিক্ষিত দেশীয় উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবীর? ভাবলেই শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নামে যে, ঔপনিবেশিক আধুনিকতা না-থাকলে— “প্রদোষচন্দ্র মিত্র, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর—ঘাড় গুঁজে কলম পিশছে কোনও জমিদারি সেরেস্তায়, যেখানে ফিংগার প্রিন্ট বললে বুঝবে টিপসই”![7] কিন্তু, ‘প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর’ যে কীভাবে শুধু কলমপেষা সামন্ততান্ত্রিকচিহ্নবাহী জমিদারি সেরেস্তা-কর্মচারী নয়, এমনকী

---

[4] সত্যজিৎ রায়, লন্ডনে ফেলুদা, ফেলুদা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫ [১৯৯২]), পৃ. ৫৮৭

[5] সত্যজিৎ রায়, গোরস্থানে সাবধান, ফেলুদা সমগ্র, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫ [১৯৭৯]), পৃ. ৫৮৮

[6] তদেব।

[7] তদেব।

পুঁজিবাদী কাঠামোর অধীনে কলমজীবী পাতি-বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানিও হল না, বরং 'সত্য'র মেধাজীবী কারবারি হয়ে উঠল এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট বলতে বুঝল অন্য এক বাচনের হদিশ, তার ইতিহাসে পৌঁছতে হলে আরও গভীরে ঔপনিবেশিকতার ক্ষমতার প্রতাপে নির্ধারিত সূত্র বা ক্লু-র সত্যমূল্য প্রতিষ্ঠা এবং সেই সূত্র ধরে 'অপরাধী'র সুনিশ্চিত পরিচয় নির্ধারণ করা এবং সেই 'সত্য'-সন্ধানে-ব্রতী মেধাজীবী গোয়েন্দার সঙ্গে প্রচলিত ঔপনিবেশিক দারোগা ব্যবস্থার সংঘাতের চরিত্র বিচার করতে হবে।

এলিস-গ্যালটন-বের্তিয়ঁ : 'ক্লু'-এর 'সত্য'মূল্য[৪]

উনিশ শতকী ইওরোপে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, অপরাধীরা শারীরবৃত্তীয়ভাবে 'বিকৃত' বা 'অধঃপতিত'। সেই শতকেই ইওরোপ জুড়ে ফ্রেনলজি চর্চার যে প্রসার ঘটেছিল, তার প্রভাবে করোটি, মস্তিষ্ক ও সামাজিক আচরণের আন্তঃসম্পর্ক এবং তার সঙ্গে অপরাধ প্রবণতাকে মিলিয়ে বিচার করার ধারা তৈরি হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের হাত ধরে 'বিপজ্জনক শ্রেণি' ও 'অপরাধী শ্রেণি' প্রভৃতি ধারণা উপনিবেশে হাজির হয়েছিল। সাধারণত সমাজের প্রান্তিক গরিবদেরই এই বর্গে ঠাঁই হত। পেটের দায়ে রোজগারের তাগিদে স্থানান্তরে ঘুরে-বেড়ানো ঐ দরিদ্র লোকেদের চরণিকতাই ছিল প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের শিরঃপীড়ার কারণ। বিশৃঙ্খলা ও অপরাধের সঙ্গে এই ভ্রামণিক মানুষগুলির অস্তিত্ব যেন এক হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গেই ক্রমে জুড়ে গিয়েছিল 'অপরাধী শ্রেণি' বা 'criminal class' সম্পর্কিত ধারণা। 'নীতিবোধবর্জিত', 'বিপজ্জনক', 'হিংস্র' প্রভৃতি বিশেষণে জর্জরিত ঐ মানুষগুলি সম্পর্কে মনে করা হত যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবনের চৌহদ্দিতে তারাই অমঙ্গলকর বিশৃঙ্খলার বাহক, এক ভিন্ন প্রজাতি যেন।

বস্তুত 'আইনের শাসন' বলবৎ রাখতেই ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে সদাসর্বদা নজরদারি চালাতে হত, বিশেষ করে 'জন্মগতভাবে অপরাধপ্রবণ' ব্যক্তিদের নিয়ে ছিল আসল মাথাব্যথা। দেশীয় জনসমাজ ও ব্রিটিশ প্রশাসন উভয়ের নিরিখেই অপরাধ নির্ণয় ও অপরাধী দমনে পটুত্বই ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি। ১৮৬৯-এর দশকে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন বিষয়ক প্রতিনিধি স্যর হেনরি সামার মেইন (১৮২২-১৮৮৮) মনে করতেন যে, প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে কোনো আইনের বালাই ছিল না।[৯] বরং, 'প্রাচ্যের স্বৈরশাসক'ই

---

[৪] 'ক্লু' সম্পর্কে কার্লো গিনজ়বার্গের মৌলিক প্রবন্ধ চিন্তার উপকরণ জুগিয়েছে। প্রবন্ধটির দুটি ভিন্ন সংস্করণই উল্লিখিত হল: Carlo Ginzburg, "Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method", *History Workshop*, No. 9 (Spring, 1980), পৃ. ৫-৩৬। এই প্রবন্ধের আরেকটি সংস্করণ পরে "Clues: Roots of an Evidential Paradigm" শিরোনামে গিনজ়বার্গের প্রবন্ধ সংকলনে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য: Carlo Ginzburg, *Clues, Myths, and the Historical Method* (Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 1989), পৃ. ৯৬-১২৫

[৯] ১৮৬০-এর দশকে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন বিষয়ক সদস্য স্যর হেনরি মেইনের মতে, ব্রিটিশ আগমনের আগে ভারতে কোনো আইনই ছিল না ("a country singularly empty of law.")। দ্রষ্টব্য: Vinay Lal, "Criminality and Colonial Anthropology", UCLA Social Sciences, *MANAS, https://southasia.ucla.edu/history-politics/british-india/criminality-colonial-anthropology/*

ছিলেন সমস্ত দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু আধুনিকতার বাহক ব্রিটিশ শাসক ভারতে 'আইনের শাসন' ও তার মধ্য দিয়ে 'সভ্যতা'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী, সেই উদ্যোগই ঔপনিবেশিক শাসনের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করবে। এই মনোভাবটি খেয়াল করলে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে সিভিল কোড, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিনাল কোড এবং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে যুগপৎ কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (অ্যাক্ট ১৫) ও পুলিশ অ্যাক্ট (অ্যাক্ট ১০)— মাত্র তিন বছরের মধ্যে লাগু হওয়া উপরিউক্ত আইনগুলির পরিপ্রেক্ষিতটি বোঝা যায়। আর সেই ধারারই অনুসারী দশ বছর পরে চালু হওয়া ক্রিমিনাল ট্রাইব্স অ্যাক্ট (১৮৭১)।

'অপরাধপ্রবণ' জাতি সংক্রান্ত ঐ আইন লাগু করায় প্রবল উৎসাহী ছিলেন জেমস ফিৎসজেমস স্টিফেন (১৮২৯-১৮৯৪)। *Indian Code of Criminal Procedure* রচনায় মন্ত্রণাদাতা হিসাবে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন স্টিফেন।'অপরাধপ্রবণ' জাতি ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৮৭১ সালে তিনি এক কালিক পরিসরবিহীন অনৈতিহাসিকতার নির্ভরে (অপ)যুক্তি সাজালেন:

> If we only keep this in mind when we speak of "professional criminals," we shall then realize what the term really does mean. It means *a tribe whose ancestors were criminals from time immemorial, who are themselves destined by the usages of caste to commit crime, and whose descendants will be offenders against the law, until the whole tribe is exterminated or accounted for.*[10]

বস্তুত, স্টিফেনের বক্তব্য থেকেই বিবর্তনের তত্ত্ব, অপরাধ সম্পর্কিত নৃতত্ত্ব ও নজদারির নানান কৃৎকৌশলের (যেমন বের্তিয়ঁ পদ্ধতি, আঙুলের ছাপ সংগ্রহ কিংবা ফটো তুলে রাখা) মধ্যে পারস্পরিক সংযুক্তির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। ডেভিড আর্নল্ড দেখিয়েছেন যে, অপরাধপ্রবণ জাতি সম্পর্কিত আইনের গভীরে আদতে নিহিত ছিল বিভিন্ন ছোট জনগোষ্ঠীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা:

> The Act was used in similar fashion against other, smaller, communities—wandering gangs, nomadic petty traders and pastoralists, gypsy types, hill- and forest-dwelling tribals, in short, against a wide variety of marginals who did not conform to the colonial pattern of settled agriculture and wage labor. Paradoxically, the "criminality" of these peoples often stemmed from, or had been intensified by, economic changes associated with the inroads of colonialism itself… in cases such as these "crime" and "criminality" were convenient colonial pseudonyms for inconvenient or "unproductive" lifestyles: they provided crude justification for the implementation of far-reaching police measures to reshape and "reform" them.[11]

বস্তুত, এই সমস্ত আইনগত প্রশাসনিকতার অন্যতম মুখ্য বিষয়ই ছিল 'অপরাধী'র পরিচিতি নির্ধারণ। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে— লন্ডন কিংবা কলকাতা— শারীরবৃত্তীয় চিহ্নিতকরণের সুবিস্তৃত কৃৎকৌশল ও প্রকরণসমূহের মাধ্যমে

---

[10] বস্তুত, এই 'অনাদি-অনন্ত কাল' রূপকটি 'অপরাধপ্রবণ জনজাতি' সম্পর্কে বারেবারে বিভিন্ন লেখায় ফিরে আসতে দেখা যাবে। এই বিষয়ে আলোচনা ও স্টিফেনের উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য: Rachel J. Tolen, "Colonizing and Transforming the Criminal Tribesman: The Salvation Army in British India," in Jennifer Terry and Jacqueline Urla, eds., *Deviant Bodies: Critical Perspectives on Difference in Science and Popular Culture* (Bloomington: Indiana University Press, 1995), পৃ. ৭৮-১০৮

[11] David Arnold, "Crime and Crime Control in Madras, 1858–1947," in Anand A. Yang, ed., *Crime and Criminality in British India* (Ann Arbor: Association for Asian Studies, 1985), পৃ. ৮৫

এই ধারণাগুলিই চারিয়ে গিয়েছিল। পরিচিতি নির্মাণ ও নির্ধারণের সেই ক্ষমতাভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্বই ক্রমে গোয়েন্দা কাহিনীরও কেন্দ্রীয় ভিত্তি হয়ে উঠেছিল।[12]

যে বছরে ক্যনান ডয়েলের *The Sign of Four* উপন্যাস প্রকাশিত হয় সেই ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে হ্যাভেলক এলিস (১৮৫৯ - ১৯৩৯) একটি বই লেখেন— *The Criminal*, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ পাঠকের সামনে অপরাধের নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক চর্চার ফিরিস্তি তুলে ধরা ("a critical summary of the results of the science now commonly called criminal anthropology")।[13] সেই বইয়ের আলোচ্য বিষয় ছিল অপরাধী কে? এবং কী সেই সব বৈশিষ্ট্য যার নিরিখে তাকে চেনা যাবে? এলিসের মতে, অপরাধী শনাক্তকরণ কেবল যে বৈজ্ঞানিকতার বিষয় তাই নয়, তার সঙ্গে জাতীয় প্রগতির ধারণাও লেপ্টে আছে। এলিসের রচনায় ইংল্যান্ডের অন্দরের অপরাধী যেন বাহিরে ওৎ পেতে থাকা ঔপনিবেশিক প্রজার সগোত্রীয়।[14] অন্দর-বাহিরে সাম্রাজ্যের সেই 'বিপদ' মোকাবিলা করা তখনই সম্ভব হবে যখন তার হাড়হদ্দ জানা সম্ভব হবে।[15] বস্তুত, এইভাবেই জাতিগত ও লিঙ্গগত নানান নেতিবাচক মনোভঙ্গির এবং ঔপনিবেশিক প্রজার শোষণের বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা নির্মাণের ক্ষেত্রে অপরাধীর শারীরবৃত্তীয়তা সম্পর্কিত ধারণাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এলিসের মূল লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিকভাবে অপরাধীকে অনুধাবন করা।

এলিসের উক্ত বইয়ের দুই বছর পরে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে (যেই সময়ে ঔপনিবেশিক বঙ্গে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'অভিজ্ঞতা'ভিত্তিক দারোগার দপ্তর ফি মাসে বেরোতে শুরু হয়েছিল) ইংল্যান্ডে চার্লস ডারউইনের বৈমাত্রেয় খুড়তুতো ভাই স্যর ফ্রান্সিস গ্যালটন (১৮২২-১৯১১) *Finger Prints* বইটি প্রকাশ করেন।[16] গ্যালটনের বইয়ের মূল বিবেচ্য ছিল অপরাধী সম্পর্কিত তথ্যরাজি নথিভুক্ত করার নবীনতম ও কার্যকর পদ্ধতি। এখানে খেয়াল করার বিষয় হল ১৮৯০-এর দশকেই কীভাবে ইংরেজ সমাজে এলিস, গ্যালটন প্রমুখের ইংরেজি রচনা এবং শার্লক

---

[12] মিশেল ফুকোর খেই ধরে জনৈক আলোচক মন্তব্য করেছেন যে: "The centrality of the detective narrative for the nineteenth century is based on its crucial role in the process of making and monitoring the modern subject." দ্রষ্টব্য: Ronald R. Thomas, *Detective Fiction and the Rise of Forensic Science* (UK: Cambridge University Press, 2003 [1999]), পৃ. ৮

[13] Havelock Ellis, *The Criminal* (London : Walter Scott, 1890), পৃ. ১

[14] রোনাল্ড টমাস দেখিয়েছেন যে, এলিসের আলোচনায় উপনিবেশের ছায়াপাত ঘটেছিল: "For, as his book will show, the criminal figure inside the gates is rather like the colonial figure outside them. Both require a distinctively English response to properly advance research in the field and to ensure the safety and integrity of the English body politic at the same time." দ্রষ্টব্য: Ronald R. Thomas, "The Fingerprint of the Foreigner: Colonizing the Criminal Body in 1890s Detective Fiction and Criminal Anthropology", *ELH*, Vol. 61, No. 3 (Autumn, 1994), পৃ. ৬৬১

[15] "…we cannot deal wisely with the social factor of crime, nor estimate the vast importance of social influences in the production or prevention of crime, unless we know something of the biology of crime, of the criminal's anatomical, physiological, and psychological nature." দ্রষ্টব্য: Havelock Ellis, *The Criminal*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

[16] Francis Galton, *Fingerprints* (London & New York : Macmillan, 1892). বইটির আখ্যাপত্রে শিরোনামের নীচে গ্যালটনের দশ আঙুলের ছাপের ছবি মুদ্রিত ছিল। ডারউইনের প্রভাবে গ্যালটন *Eugenics* সম্পর্কিত আধুনিক চর্চার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক থেকে ম্যাকমিলান কর্তৃক প্রকাশিত *Inquiries into Human Faculty and Its Development* বইতে তিনিই প্রথম *Eugenics* পরিভাষার প্রয়োগ ঘটান। 'বিজ্ঞাননির্ভর' জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় জাতিবৈর মনোভাবের পিছনে ইউজেনিক্সের চর্চার মৌলিক প্রভাব ছিল।

হোমসের কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে ও তার সমকালেই ঔপনিবেশিক দেশীয় সমাজে সাধনায় প্রকাশিত হচ্ছে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ।[17] আবার সেই একই দশকে প্রায় গা-ঘেঁষে ছাপা হচ্ছে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর (১২৯৯ বঙ্গাব্দ/১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) এবং দশকের শেষ লগ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে গোয়েন্দা চরিত্র ও গোয়েন্দা কাহিনীর সম্পর্কে শ্লেষ-ব্যঙ্গ ফুটে উঠছে 'ডিটেকটিভ' গল্পে (১৩০৫ বঙ্গাব্দ, ভারতী, আষাঢ়)।[18] বস্তুত, এভাবেই বিভিন্ন গোত্রের হরেক বয়ান থেকে তাত্ত্বিক-প্রশাসনিক ও শিক্ষিত জনপরিসরে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' ধারণাগুলি প্রসারিত হচ্ছিল। ১৮৯০-এর দশকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দুই প্রধান কেন্দ্রে— লন্ডন ও কলকাতা— মুদ্রণ-পুঁজির হাত ধরে স্পষ্টতই অপরাধ-নৃতত্ত্ব এবং অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার বহু তত্ত্ব ও লব্জ গণগ্রাহী হয়ে উঠেছিল, যার সবথেকে বাণিজ্যসফল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল গোয়েন্দা কাহিনী নামের পণ্যটির মাধ্যমে।[19]

বিভিন্ন বাচনিক প্রকরণের মাধ্যমে একজন পেশাজীবী— নৃতাত্ত্বিক, অপরাধতাত্ত্বিক ও গোয়েন্দা— মানব শরীরের হাড়হদ্দ থেকে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণ করার 'বৈজ্ঞানিক' কৌশল প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত, আইনের শাসন জারি রাখাই গোয়েন্দা আখ্যানের অভীষ্ট। সেই ছাঁচ উপনিবেশেও যে গ্রাহ্য হয়ে উঠছে দারোগার দপ্তর-এর জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। লন্ডন ও কলকাতা— ব্রিটিশ উপনিবেশের দুই কেন্দ্রকে মিলিয়ে বিচার করলে গোয়েন্দা কাহিনীর মত গণমোহিনী আখ্যান, অপরাধী শনাক্ত করে 'আইনের শাসন' প্রয়োগের পদ্ধতিসমূহ এবং সেই বিষয়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষিত জনসমাজের বৈচারিক প্রতিক্রিয়া — সবই একই কালিকতায় মিশে যাচ্ছে এবং রচনার গোত্রভেদব্যেপে সবেরই কেন্দ্রীয় বিষয় অপরাধ— অপরাধী নির্ণয় ও তার বিচার তথা শাস্তিবিধান। উপরন্তু, মিশে আছে এক বৈশ্বিক নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিকতাসিদ্ধ অবরোহী যুক্তিক্রমের ধারণা, যার দ্বারা নিঃসংশয়ে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যাবে অপরাধীকে। বৈজ্ঞানিকতা ও অপরাধী নির্ণয়ের ক্ষমতার রাজনীতি সেখানে মিলেমিশে যায়। এলিসের বইয়ের মূল প্রশ্ন ছিল অপরাধী কে? এবং কোন সেই একমেবাদ্বিতীয় চিহ্ন যার মারফৎ তাকে নিশ্চিত করে চেনা যাবে? সেই প্রশ্নের উত্তরই যেন দিলেন গ্যালটন। বললেন, আঙুলের ছাপ চর্চা করার উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে এমন এক অনড়, অচল রূপ দেওয়া, যার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের

---

[17] সাধনা পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'অপরাধ/অপরাধী' বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

[18] ১২৯৯ বঙ্গাব্দে (১৮৯২, মতান্তরে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ) সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার থেকে বাণীনাথ নন্দীর তত্ত্বাবধানে দারোগার দপ্তর প্রকাশ শুরু হয়। সুকুমার সেন লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ যে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র দেব, মণীন্দ্রনাথ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ পাল, পাঁচকড়ি দে ইত্যাদির রচনা পড়েছিলেন তারই প্রতিক্রিয়ার ফল" 'ডিটেকটিভ' গল্পটি। দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি (কলকাতা: আনন্দ, ১৯৮৮), পৃ. ১৩৫। বস্তুত, সাধনা পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের প্রথম ভাগে (অগ্রহায়ণ ১৩০১ - বৈশাখ ১৩০২ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালীনই 'গ্রন্থ সমালোচনা' অংশে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দুটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধনায় ছাপা হয়েছিল:

> **অর্থই অনর্থ**। দারোগার দপ্তর। শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা।
> **ঠগী কাহিনী**। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।
> রোমহর্ষণ গল্প অনেকের ভাল লাগে, তাঁহাদের জন্য উপরি-লিখিত গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছে। (সাধনা, পৃ.৯৬)

[19] জনৈক আলোচকের মতে: "The detective fiction of the 1890s, like the new theories of criminal anthropology and the innovations in the practices of criminal justice." দ্রষ্টব্য: Ronald R. Thomas, "The Fingerprint of the Foreigner: Colonizing the Criminal Body in 1890s Detective Fiction and Criminal Anthropology", পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮০

একটি অদ্বিতীয় পরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব। এমন এক ব্যক্তি-পরিচয় নির্ধারণ করা, যার উপরে চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যাবে।[20] যে সময়ে গ্যালটন এই ধন্দহীন পরিচয় নির্ধারণের যুক্তিকাঠামো সাজাচ্ছিলেন সেই সমকালেই একবার বিপদ ঘটেছিল এই চোখ বন্ধ করে ভরসা করার যোগ্য 'ক্লু' নিয়েই। আর তার কেন্দ্রে ছিলেন যিনি, তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতেই বহুকাল 'অপরাধী'কে শনাক্ত করা হত। তিনি আলফোঁস বের্তিয়ঁ (১৮৫৩-১৯১৪), যাঁকে বাংলায় 'বার্তিলঁ' বলে উল্লেখ করেছিলেন স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়।[21]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের পরে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রে পুলিশি পদ্ধতিতে 'দুষ্কার্যকারী'র ফটোগ্রাফ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু, মুশকিল হল সেই ছবি-স্তূপ থেকে প্রয়োজনমাফিক ঠিক ছবিটি সহজে বের করার উপায় কারো জানা ছিল না। সেই উপায় বের করলেন বের্তিয়ঁ। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন যার মাধ্যমে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিস্তারিত শারীরিক মাপজোকের তথ্যাদিসহ তাদের বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণগুলির লিখিত রূপ এবং ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডলের পার্শ্বিক ও সম্মুখভাগের ফটোগ্রাফ (mug shot) একটি কার্ডের মাধ্যমে ফাইলে সংরক্ষিত করা সম্ভব। বের্তিয়ঁ নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে সেই পদ্ধতির নামকরণ করলেন। ক্রমে ইউরোপ ও তার মারফৎ ঔপনিবেশিক পুলিশি ব্যবস্থায়ও বের্তিয়ঁ পদ্ধতির প্রসার ঘটতে থাকে। তাছাড়া, ক্যামেরা ব্যবহার করে নিহত ব্যক্তির লাশ ও অকুস্থলের ছবি তোলা ও তার পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন বের্তিয়ঁ। সাহিত্যের গোয়েন্দার মতই তিনি মনে করতেন— "প্রতিটি মাপজোকের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অপরাধীর কার্যকলাপের ধারা স্পষ্টতর হয়। সযত্ন পর্যবেক্ষণ ও ধৈর্যশীলতাই ক্রমে সত্যের উন্মোচন ঘটায়"।[22]

এইসব কৌশলের-ফলে-বিখ্যাত বের্তিয়ঁর ডাক পড়েছিল দ্রেফুস মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে অভিযোগ ওঠে যে, ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন ইহুদি বংশোদ্ভূত আলফ্রেদ দ্রেফুস (১৮৫৯-১৯৩৬) সামরিক বাহিনীর গোপন কথা প্রতিপক্ষ জর্মনদের বলে দিয়েছেন। 'দেশদ্রোহী' দ্রেফুসের মামলায় ফরাসি সমাজের একটা অংশে নিহিত ইহুদি-বিদ্বেষ প্রকট হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মামলাটির বিচার চলাকালীন দ্রেফুসের লেখা বলে চিহ্নিত একটি চিঠির হাতের লেখা সত্যিই তাঁর কিনা তা নির্ণয় করতে বের্তিয়ঁকে তলব করা হয়। যদিও বের্তিয়ঁ গ্রাফোলজিস্ট বা হস্তলিপিবিশারদ ছিলেন না এবং ঐ কাগজের লেখার সঙ্গে দ্রেফুসের হাতের লেখার বিশেষ মিল ছিল না, তবুও বের্তিয়ঁ এক নতুন তত্ত্বের অবতারণা করে ঐ লেখা দ্রেফুসের বলেই মত প্রকাশ করেন।

---

[20] আঙুলের ছাপ সম্পর্কে গ্যালটন লিখছেন: "They have the unique merit of retaining all their peculiarities unchanged throughout life, and afford in consequence an incomparably surer criterion of identity than any other bodily feature." দ্রষ্টব্য: Francis Galton, *Fingerprints*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[21] ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে) লিখিত 'সীমন্ত-হীরা' গল্পে দিগিন্দ্রনারায়ণ রায় ব্যোমকেশ বক্সীকে বলেছিলেন: "দেখ ব্যোমকেশবাবু, তুমি মনে কর তোমার ভারি বুদ্ধি— না? তোমার মত ডিটেক্‌টিভ দুনিয়ায় আর নেই? **তুমি বাংলাদেশের বার্তিলঁ?**" দ্রষ্টব্য: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সীমন্ত-হীরা', ব্যোমকেশ সমগ্র (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৭ [১৯৯৫]), পৃ. ৮০। খেয়াল করার বিষয় হল বেসরকারি গোয়েন্দাকে হোমসের সঙ্গে তুলনা না-করে বের্তিয়ঁর সঙ্গে তুলনা এবং ঐ গল্পেই ব্যোমকেশের ফ্রেনলজিক্যাল বর্ণনা। নজরটান সংযোজিত।

[22] "Every measurement slowly reveals the workings of the criminal. Careful observation and patience will reveal the truth." Alphonse Bertillon-র উদ্ধৃতিটি "Criminal Identification: The Bertillon System" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। উৎস: https://www.clevelandpolicemuseum.org/historical/criminal-identification-the-bertillion-system/Published 07 A

বের্তিয়ঁর বক্তব্য ছিল, দ্রেফুস নানাভাবে নিজের স্বাভাবিক হাতের লেখার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন ঐ চিঠিতে, এবং এই তত্ত্বকে আবারও এক আধা-বৈজ্ঞানিকতার ভিত্তিতে নামকরণ করা হয়েছিল 'self-forgery'.

কিন্তু, বের্তিয়ঁ বৈজ্ঞানিকতার মোড়কে এই 'self-forgery'-র তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও তা যে পুরোদস্তুর অপবিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ অঁরি পয়েঁকার (১৮৫৪-১৯১২)। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্রেফুস মামলায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে মত দিয়ে তাঁর প্রতিবেদনে সম্ভাব্যতার গাণিতিক বিচারে বের্তিয়ঁ কী কী ভুল করেছেন সেসব আলোচনা করে উপসংহারে পয়েঁকার লেখেন:

> The absurdity of Bertillon system is so evident that one will explain with difficulty the length of this discussion…As for the application over the words of the pieces of comparison our examination proves that Mr Bertillon made a completely arbitrary choice from the very numerous words that he had at hand. It is then, either he had the desire of proving the guilt, or, which we prefer to believe, that he committed a serious method error.[23]

অর্থাৎ, সযত্ন 'মাপজোক' ও 'সধৈর্য্য পর্যবেক্ষণ' যে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী'র মত ব্যক্তিক বিষয়কে নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক সেহেতু বিশ্বজনীন সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, সেই কথাটা বের্তিয়ঁর বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে পয়েঁকারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। ঘটনাচক্রে, ক্রমে আঙুলের ছাপ থেকে 'অপরাধী' নির্ধারণ পদ্ধতির প্রসার ঘটায় বের্তিয়ঁ পদ্ধতির জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু, এই উভয় পদ্ধতির মূল ভিত্তি *Anthropometry* অর্থাৎ নৃদেহপরিমাপবিদ্যা বহাল তবিয়তে নানান আঙ্গিকে প্রসারিত হয়েছিল। সেই প্রসারণের একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল ঔপনিবেশিক বাংলা।

হে 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' তুমি কার? : আঙুলের ছাপ ও ঔপনিবেশিক সমাজে 'ক্লু'র জ্ঞানতত্ত্ব

"ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনের ইতিহাসটা" ভাল করে পড়ে তবেই প্রদোষচন্দ্র গোয়েন্দাগিরিতে নেমেছে কিনা সেটা বাজিয়ে দেখার জন্য সিদ্ধেশ্বর বোস প্রশ্ন করেছিলেন— "এই যে আঙুলের ছাপ দেখে ক্রিমিন্যাল ধরার পদ্ধতি, এটার আবিষ্কর্তা কে?" প্রদোষচন্দ্র ওরফে ফেলু মিত্তির উত্তরটা জানা থাকলেও বয়োজ্যেষ্ঠ সিধু জ্যাঠাকেই তা বলার সুযোগ করে দেন। সিধু জ্যাঠা বলেন:

> জিজ্ঞেস করলে অনেকেই দেখবে ফস করে বলে বসবে আলফোঁস বোর্তিয়োঁ। কিন্তু সেটা ভুল। কারেক্ট নামটা হচ্ছে হুয়ান ভুকেটিচ। মনে রেখো। আর্জেন্টিনার লোক। বুড়ো আঙুলের ছাপের ওপর ইনিই প্রথম জোরটা দেন। আর সে ছাপকে চারটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করেন উনিই। অবিশ্যি তার কয়েক বছর পরে ইংল্যান্ডের হেনরি সাহেব আরও মজবুত করেন এই সিস্টেমকে।[24]

---

[23] পয়েঁকারের প্রতিবেদনটির উৎস: https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/dreyfus/dreyfusenglish.pdf

[24] সত্যজিৎ রায়, সোনার কেল্লা, ফেলুদা সমগ্র, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ, ২০০৫), পৃ. ১৯২

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এই তথ্য জানানোর তিন বছর পরে ১৯৭৪-এ আবারও সিধু জ্যাঠার সঙ্গে ফেলু মিত্তিরের এই বিষয়কে ঘিরেই কথা চালাচালি হয়। কিন্তু, এইবারে জ্যাঠার প্রশ্ন ছিল: "উইলিয়ম জেমস হার্শেল কে ছিল?" এবং ফেলু মিত্তির নিজেই উত্তর দেন: "ইংলিশম্যান, আইসিএস, একসময়ে বাংলাদেশে পোস্টেড ছিলেন। ১৮৮০ সালে ইংল্যান্ডের *Nature* পত্রিকায় তাঁর একটা চিঠি বেরোয়। আঙুলের ছাপ থেকে যে অপরাধী ধরার একটা উপায় হতে পারে, এই চিঠিতেই সেটা প্রথম জানা যায়"।[25] অর্থাৎ, মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে সিধু জ্যাঠার বয়ানে বের্তিয়ঁ ('বোর্তিয়ঁ') এবং ভুকেটিচ হঠে গিয়ে চলে এলেন হার্শেল!

শুরু করা যাক উইলিয়ম জেমস হার্শেল থেকেই, কারণ হাতের এবং আঙুলের ছাপ সংগ্রহ বিষয়ে তিনিই প্রাচীনতম ইংরেজ প্রশাসক এবং তাঁর পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের অকুস্থল ছিল ঔপনিবেশিক বাংলা। উইলিয়ম জেমস হার্শেল-এর পিতামহ ফ্রেডেরিখ উইলিয়ম হার্শেল (১৭৩৮-১৮২২) একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ এবং ইউরেনাস গ্রহের অস্তিত্ব প্রথম পর্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং পিতা স্যর জন ফ্রেডেরিখ উইলিয়ম হার্শেল (১৭৯২-১৮৭১) বহুবিদ্যাবিশারদ। এহেন পরিবারে জন্মেও কিছুটা উড়নচণ্ডী হার্শেল যৌবনের শুরুতেই (নির্দিষ্ট সন-তারিখ অজানা) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরে হিসাবে ভারতে হাজির হন। কিন্তু, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসকের সব হিসাব-নিকেশ বদলে দেয়। বিদ্রোহ দমিত হয়, কোম্পানি-শাসনের দিন ফুরায়, শুরু হয় মহারানি ভিক্টোরিয়ার শাসন। অবশ্য, হার্শেলের মত দক্ষ লোকের নতুন আমলেও কদর ছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রশাসক নিযুক্ত হন। বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা শ্বেতাঙ্গ শাসকের চোখে সকল দেশীয় প্রজাকেই কার্যত অবিশ্বাসের পাত্র করে তুলেছিল। সেই আবহে একবার জঙ্গিপুরের জঙ্গল কেটে নতুন রাস্তা তৈরি করার জন্য আহূত দরপত্র জমা দিয়েছিলেন নিস্তা গ্রামের রাজ্যধর কোনাই। ঠিকার কাজে না-ঠকানোর কড়ারসহ বাণিজ্যিক চুক্তিপত্রে লিখিত দস্তখত করতে উদ্যোগী রাজ্যধরকে হঠাৎ থামান হার্শেল এবং সইয়ের বদলে রাজ্যধরের ডান হাতে কালি লাগিয়ে কাগজে সেই ছাপ নিয়ে রাখেন: "I stopped him in order to read it myself; and it then occurred to me to try an experiment by taking the stamp of his hand, by way of signature instead of writing."[26] বস্তুত, ঔপনিবেশিক বাংলায় টিপসইয়ের রেওয়াজ সম্পর্কে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল ছিলেন হার্শেল এবং রাজ্যধরকে খানিক ভয় দেখাতেই এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি; যাতে কোনাই পরে চুক্তিলঙ্ঘনের সাহস না-পায়।

---

[25] সত্যজিৎ রায়, সোনার কেল্লা, ১৯৭৪-এ সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়। https://youtu.be/aLhF9IemSYU?si=u9cAZfg_ny_BRL50 (২১.৫৪ মিনিট থেকে ২২.১৫ মিনিট)।

[26] দ্রষ্টব্য: William J. Herschel, *The Origin of Finger-Printing* (London : Oxford University Press, 1916), পৃ. ৮। হার্শেলের বইতেই রাজ্যধর কোনাইয়ের হাতের ছাপসম্বলিত চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছিল (পৃ. ৮ ও ৯-এর মাঝখানে)।

১৮৬০-এর দশকে নীল বিদ্রোহের সমকালেই নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট পদে বহাল হন হার্শেল। নীল বিদ্রোহের অভিঘাতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ, মোকদ্দমা, জাল-জুয়াচুরি ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানের বাড়-বাড়ন্ত।[27] সেই পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মর্যাদা রক্ষার্থে হার্শেল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করতে শুরু করেন।[28] তবে, সরকারিভাবে নিয়ম না-থাকলেও, ব্যক্তিগত উৎসাহে তিনি সাধারণ প্রজা কিংবা প্রতাপশালী দেশীয় ব্যক্তিবর্গ বা ইউরোপীয় কর্তাব্যক্তিদের হাতের ছাপ জমানোর কাজ চালিয়ে গেলেন। ১৮৬৩ সালে চাকরি থেকে সাময়িক ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান হার্শেল। ভারতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা আঙুলের ছাপ সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবে রাজি না-হলেও স্বদেশে গিয়ে সেই বিষয়ে আবারও উৎসাহী হয়ে ওঠেন তিনি। ইংল্যান্ড ও ভারতে বেশ কয়েকবার যাতায়াতের ফলে সেই উৎসাহ ক্রমে বাড়তে থাকে। ১৮৭৭ সালে মঙ্গোলিয়া নামের জাহাজে হার্শেলের সহযাত্রী ছিলেন আলফ্রেড লায়াল (১৮৩৫-১৯১১)। লায়ালের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করেন হার্শেল। অনেক পরে ১৯০৮-এ

---

[27] তদেব, পৃ. ১১। প্রসঙ্গত, হার্শেল এখানে স্পষ্টতই ১৮৬০-এর নীল বিদ্রোহের ("The Indigo disturbances") কথা বলেছেন। কিন্তু, আঙুলের ছাপের ইতিহাস বিষয়ে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক সাইমন কোল সেটিকে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। দ্রষ্টব্য: Simon A.Cole, *Suspect Identities : A History of Fingerprinting and Criminal Identification* (Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2002 First Harvard University Press paperback [2001]), পৃ. ৬৪

[28] "I was driven to take up finger-prints now with a definite object before me, and for three years continued taking a very large number from all sorts and conditions of men." দ্রষ্টব্য: William J. Herschel, তদেব, পৃ. ১১

আবারও লায়ালের আঙুলের ছাপ নেন তিনি এবং দুই ভিন্ন সময়ে নেওয়া ছাপের ছবি তুলনার জন্য ছেপে দেন নিজের পুস্তিকায়।[29]

১৮৭৭-এ হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট আর কালেক্টরের দায়িত্ব পান হার্শেল। ফলে হুগলির জেল, আদালত, রেজিস্ট্রেশন অফিস— সর্বত্রই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের তত্ত্বকে আইনি ও প্রশাসনিক কাজে লাগাতে শুরু করলেন। জেলবন্দিদের কাছ থেকে হাতের ছাপ জোগাড় করলেন। সেই সময়ে বন্দিদের একাংশের নাম ভাঁড়িয়ে তার হয়ে অন্য কেউ জেল খাটতেন। আঙুলের ছাপ নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেই লোকদের চিহ্নিত করা। পাশাপাশি আদালতে অনেকে নাম ভাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিত। তাই সাক্ষীদের হাতের ছাপ রাখার নির্দেশ দিলেন জেমস। একই ভাবে সম্পত্তি কেনা-বেচার সময়ে দলিলে হাতের ছাপ রাখাও চালু করলেন। কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ছাপও নিলেন।[30] এ ভাবেই তাঁর হাতের ও আঙুলের ছাপের যে বিপুল তথ্যভান্ডার হার্শেল গড়ে তুলেছিলেন তা গ্যালটনের তত্ত্বের প্রায়োগিক সাফল্যের ভিত্তি হিসাবেও কাজ করেছিল।

কিন্তু, গোল বাধল ১৮৮০-র অক্টোবরে। *Nature* পত্রিকায় ছাপা এক চিঠিতে স্কটিশ ডাক্তার, ধর্মপ্রচারক ও বিজ্ঞানী হেনরি ফল্ডস (১৮৪৩-১৯৩০) দাবি করেন যে, তিনিই হাতের ছাপ থেকে ব্যক্তিকে শনাক্ত করার পদ্ধতির উদ্ভাবক। হার্শেলের সমকালেই স্কটিশ চার্চের মেডিক্যাল মিশনারি হিসাবে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে দুবছরের জন্য ফল্ডস বঙ্গদেশেই দার্জিলিং শহরে দরিদ্র-হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ১৮৭৪-এ লন্ডন থেকে জাপান পৌঁছন ফল্ডস। ঘটনাচক্রে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফল্ডস যখন লন্ডন থেকে জাপানযাত্রার তোড়জোড় করছিলেন, সেই সময়েই ইংরেজ-সমাজ তোলপাড়কারী টিচবোর্ন মামলার শুনানি চলছিল। ফল্ডস সেই বিচারের কথা সম্যক জানতেন। বস্তুত, টিচবোর্ন মামলার মূল প্রশ্নই ছিল একজন ব্যক্তির পরিচয় কোন উপায়ে নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা সম্ভব। ফল্ডস পরে লিখেছেন যে, সেই থেকেই আইনের চোখে পরিচয় নির্ধারণের সর্বজনীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে তিনি ভাবিত হন: "From that time the question of identification as a pressing scientific problem in medical jurisprudence was never long absent from my mind."[31]

জাপানে একবার হাসপাতালে এক চুরির ঘটনায় অকুস্থলে প্রাপ্ত 'অপরাধী'র ও অভিযুক্তর আঙুলের ছাপের তুলনা করে তিনি দেখান যে উভয়ের মিল নেই। সেই প্রমাণের ভিত্তিতে ঐ ধৃত ব্যক্তি খালাস পায়।[32] অতঃপর, ফল্ডস সরাসরি চার্লস ডারউইনের শরণাপন্ন হন। তাঁর গবেষণা-চিন্তা-চর্চার কথা জানিয়ে লেখেন ডারউইনকে। কিন্তু সেই বিষয়ে অনুৎসাহী ডারউইন ফল্ডসের সমস্ত লেখাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফ্রান্সিস

---

[29] তদেব, পৃ. ১৭

[30] তদেব, পৃ. ১৮-২৭

[31] Colin Beavan, *Fingerprints: The Origins of Crime Detection and the Murder Case that Launched Forensic Science* (New York : Hyperion, 2001), পৃ. ৬০

[32] তদেব, পৃ. ৬৬-৭২

গ্যালটনকে।[33] অর্থাৎ, হার্শেল এবং ফল্ডস— উভয়েরই যোগসূত্র গ্যালটন। তবে, অনেকে বলেন ফল্ডসের লেখাপত্র গ্যালটনও প্রথমে গুরুত্ব দেননি অথচ প্রায় আট বছর পরে যখন গ্যালটন নিজে আঙুলের ছাপ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন তখন ফল্ডসের চিঠিচাপাটির কোনো উল্লেখ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

এদিকে *Nature* পত্রিকায় ফল্ডসের দাবি পড়ে হার্শেল পাল্টা সেখানেই লিখলেন যে, তিনি ১৮৬০ সাল থেকেই অপরাধী শনাক্তকরণে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে আসছেন। সাহেবদের মধ্যে তিক্ত সংঘাত লাগল উদ্ভাবনের কৃতিত্ব নিয়ে।[34] গ্যালটন তাঁর লেখায় হার্শেলকে কৃতিত্ব দিলেন। আর গ্যালটনের প্রভাবে ও বাংলা পুলিশের বড়কর্তা এডোয়ার্ড রিচার্ড হেনরি (১৮৫০-১৯৩১)-র উদ্যোগে হার্শেলের নামই জুড়ে থাকল ঔপনিবেশিক বঙ্গ তথা ভারতে আঙুলের ছাপ থেকে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার পদ্ধতির সঙ্গে। এখানে খেয়াল রাখা দরকার যে, হার্শেল প্রাথমিকভাবে অপরাধী চিহ্নিত করার জন্য আঙুলের ছাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু, বিভিন্ন বিদ্রোহজনিত অস্থিরতার সময়ে ঔপনিবেশিক সমাজে রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার কাজে আঙুলের ছাপ নেওয়ার চল শুরু হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় প্রজা সমাজকে সন্দেহর চোখে দেখা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন কিংবা অপরাধ সংঘটন সর্বত্রই নজরদারি চালাতে থাকে। সেই নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম পন্থা হয়ে উঠেছিল আঙুলের ও হাতের ছাপ সংগ্রহ। তবে, আঙুলের ছাপের সঙ্গে নিজের নামের যোগ সুদৃঢ় করতে হার্শেল যে প্রভূত উৎসাহী ছিলেন তার প্রমাণ ১৯১৬ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *The Origin of Finger-printing* বইটির উৎসর্গপত্র:

DEDICATION

TO SIR EDWARD HENRY, G.C.V.O., K.C.B., C.S.I.

Commissioner of the Metropolitan Police.

> I am offering you this old story of the beginnings of Finger-printing, by way of expressing my warm and continuous admiration of those masterly developments of its original applications, whereby, first in Bengal and the Transvaal, and then in England, you have fashioned a weapon of penetrating certainty for the sterner needs of Justice.

June, 1916. W. J. HERSCHEL.[35]

অন্যদিকে, সাহেবি আকছাআকছির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল সিধু জ্যাঠা-বর্ণিত ভুকেটিচের নাম। হুয়ান ভুকেটিচ কোভাচেভিচ (১৮৫৮-১৯২৫) আদতে ডালমেশিয়ার লোক হলেও পরে আর্জেন্টিনায় চলে যান। ১৮৯০-এর দশকেই— যখন বের্তিয়ঁর পদ্ধতি সবই বহুল প্রচারিত এবং গ্যালটনের বই প্রকাশিত— ভুকেটিচও উভয়

[33] তদেব, পৃ. ৭৩-৭৫

[34] এই বিতর্কে দুধরনের মত আছে। সে জন্য মূল সূত্র হিসাবে দ্রষ্টব্য: গ্যালটন ও হার্শেলের পূর্বোক্ত দুটি বই ও সঙ্গে Henry Faulds, *Guide to Finger Print Classification* (Hanley : Wood, Mitchell and Co.),1905. পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Colin Beavan, প্রাগুক্ত এবং Gavan Tredoux, "Henry Faulds: The Invention of a Fingerprinter", December, 2003, https://galton.org/fingerprints/faulds.htm . অবশ্য, বেভানের ঝোঁক যেমন গ্যালটন-বিরোধিতা, তেমনই ত্রেদুর লেখাটি কিঞ্চিৎ গ্যালটনপন্থী।

[35] William J. Herschel, প্রাগুক্ত, উৎসর্গপত্র

পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান এবং পুলিশ বিভাগে আঙুলের ছাপ থেকে ব্যক্তি চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া (Dactyloscopy) চালু করেন। বস্তুত, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালটনের বই বেরোনোর বছরেই একটি খুনের মামলায় ভুকেটিচের পদ্ধতি প্রয়োগ করেই অকুস্থলের একটি দরজায় লেগে-থাকা রক্তাক্ত আঙুলের ছাপ মিলিয়ে সাব্যস্ত করা হয় যে, ফ্রানথিস্কা রোখাস স্বয়ং তাঁর সন্তানদের হত্যাকারিণী। রোখাসও জেরার মুখে সেই অপরাধ স্বীকার করেন। এই মামলা বের্তিয়ঁ পদ্ধতি তথা নৃদেহপরিমাপবিদ্যার বদলে আঙুলের ছাপের ভিত্তিতেই ব্যক্তি শনাক্তকরণের পদ্ধতির সাফল্য তুলে ধরেছিল। কিন্তু, দূর আর্জেন্টিনার ঘটনায় ব্রিটিশ উপনিবেশে নৃদেহপরিমাপবিদ্যার প্রভাব তখনও কমেনি।[36] বাংলা প্রদেশে আঙুলের ছাপ থেকে অপরাধী শনাক্ত করতে পুলিশকে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তবে, আবারও খেয়াল করা দরকার যে, ১৮৯০-এর দশকেই কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে পুলিশ-প্রশাসকরা ক্রমে আঙুলের ছাপকেই ব্যক্তির নির্দ্বিধ শনাক্তকরণ চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ-প্রয়োগ-প্রতিষ্ঠা করছেন এক বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতার আদলে। সেই দশকেই ক্রমে গোয়েন্দা সাহিত্যেও জরবদস্ত 'ক্লু' হিসাবে আঙুলের ছাপের 'সত্য'মূল্য প্রকট হয়ে উঠবে।

১৮৭১-এর অপরাধপ্রবণ জনজাতি সম্পর্কিত আইন স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, ঔপনিবেশিক প্রশাসক, নৃতাত্ত্বিক ও আইন প্রণেতারা সকলেই শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ সভ্যতার ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব প্রচারের কাজে বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যবহারে বিশ্বাসী। পাশাপাশি, সন্দেহভাজন দেশীয় জনসমাজকে সর্বদা চোখে চোখে রাখা, তাদের গতিবিধি নথিভুক্ত করা ও নিয়ন্ত্রণ করার নানান কৌশল নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক ভাবিত। সেই ভাবনাকেই প্রায়োগিক রূপ দিয়েছিলেন এডোয়ার্ড রিচার্ড হেনরি। যে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্যারি শহরের পুলিশ দফতর বের্তিয়ঁর পদ্ধতির প্রচলন করছিল সেই একই বছরে দূর ব্রিটিশ-উপনিবেশে বিহারের চম্পারনে ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি সাহেব 'অপরাধপ্রবণ জনজাতি' হিসাবে চিহ্নিত মাঘিয়া ডোমদের পতিত জমিতে স্থায়ী ঠাঁই করে দিয়েছিলেন, যাতে সেই চরণিক 'অপরাধী'রা ক্রমে চাষেবাসে 'নিরপরাধ' প্রজা হয়ে ওঠে।[37]

হেনরির সেই চেষ্টা শেষত ব্যর্থ হলেও 'অপরাধী'র চলনশীলতাকেই যে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেই কথাটা তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন। সেই কাজে পুনর্বাসন নয় নজরদারিই উপায়। পরবর্তীকালে জেমস হার্শেল এহেন এডোয়ার্ড হেনরি সাহেবই নিজের খুঁটি ঠাওরে ছিলেন। সিধু জ্যাঠা কিন্তু প্রথমে হার্শেলের কথা বলেননি, হেনরির কথাই বলেছিলেন। হেনরি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রদেশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে বহাল হন আর তার পরের বছরেই (১৮৯২) বের্তিয়ঁ পদ্ধতির একটি সংস্করণ বাংলার পুলিশি কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়।[38] ব্যক্তির

---

[36] Colin Beavan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৬

[37] Simon A.Cole, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

[38] হেনরি লিখেছেন: "In March 1892 anthropometry was introduced into the large Province of Bengal, where, as the outcome of much experimenting, it was found desirable to modify the system by taking only six instead of ten measurements, not noting the eye colour, there being little variation in the pigment of the iris amongst Orientals." দ্রষ্টব্য: E. R. Henry, *Classification and Uses of Finger Prints* (London : George Routledge & Son, 1900), পৃ. ৬২-৬৩

চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বহুদিন যাবৎ অসমাধিত একটি সমস্যা বের্তিয়ঁ পদ্ধতিতে নিহিত 'বৈজ্ঞানিকতা' দিয়ে সমাধিত হল বলেই মনে করেছিলেন হেনরি:

> It represents a scientific solution of what had long been deemed an insoluble problem, and is obviously an enormous improvement upon all rough-and-ready means previously adopted, one of the best known and most successful of which was that of indexing persons according to tattoo marks.[39]

কিন্তু, প্রচলনের পরে অভিজ্ঞতা থেকে হেনরি বুঝতে পারেন যে, বের্তিয়ঁ পদ্ধতি তথা নৃদেহপরিমাপবিদ্যার প্রয়োগ যেভাবে ফরাসি তথা ইউরোপীয় শরীরে করা হয়েছে, তা ঔপনিবেশিক প্রজার শরীরে একই আঙ্গিকে প্রয়োগ করায় নানাবিধ সমস্যা আছে। ঔপনিবেশিক শাসকের চোখে সমস্ত শাসিত প্রজাই বাহ্যত অভিন্ন। তাদের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা-পরিচিতি ছিল না। তাহলে কীভাবে বের্তিয়ঁ পদ্ধতি অনুসরণ করে 'অভিন্ন' দুই প্রজার মধ্যে ভিন্নতা চিহ্নিত করা সম্ভব? উপরন্তু, বের্তিয়ঁ পদ্ধতি যেহেতু মূলত শরীরের বাহ্য মাপজোকের উপরে নির্ভরশীল ছিল, তাই মাপ নেওয়ার সময়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা সম্ভব হত না। ফলে মাপের যন্ত্রপাতির পরিচালক ভেদে মাপের ফলাফলে হেরফের হত।

বের্তিয়ঁ স্বয়ং মাপের ফলাফলের তারতম্যের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বস্তুত, ঔপনিবেশিক প্রজাদের ক্ষেত্রে মাপের হেরফেরে তারতম্যের মোট পরিমাণ এত বিপুল হত যে বের্তিয়ঁ কার্ড পদ্ধতিতে সেই সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করে রাখা ছিল বাস্তবত দুরূহ। হেনরি তাই এমন এক নিখুঁত পদ্ধতির খোঁজ করছিলেন, যার মধ্যে মাপজনিত তারতম্যের সমস্যা থাকবে না। আঙুলের ছাপের কৃৎকৌশল সেই উপায় বাতলে দিয়েছিল। ১৮৯৭ সালে বাংলা-সরকারের কাছে পাঠানো এক প্রতিবেদনে হেনরি বিশদে জানান যে, তিনি আঙুলের ছাপ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর মতে সেই ছাপ সহজে সামান্য খরচে যেমন সংগ্রহ করা সম্ভব তেমনই ঐ ছাপ একজন ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণ ও সুনিশ্চিত করার যথার্থ উপায়।[40]

হেনরির কথামত ঔপনিবেশিক ভারতের সরকার অ্যানথ্রোপোমেট্রিক পদ্ধতি ও আঙুলের ছাপের পদ্ধতির প্রয়োগ ও যাথার্থ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে মতামত পেশ করার জন্য তৎকালীন ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল চার্লস স্ট্র্যাহান (১৮৪৩-১৯৩০) ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আলেকজান্ডার পেডলার[41] (১৮৪৯-১৯১৮)-কে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করে। ১৮৯৭ সালের মার্চে সেই কমিটি সরকারকে প্রদত্ত প্রতিবেদনে জানায় যে:

---

[39] তদেব, পৃ. ৬২। ট্যাটু বা উল্কি যে 'অপরাধী শ্রেণি'র অন্যতম পরিচয়-চিহ্ন সে কথা হেনরি উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়েই গভীর বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য: Clare Anderson, *Legible Bodies : Race, Criminality and Colonialism in South Asia* (UK : Berg, 2004)

[40] E. R. Henry, তদেব, পৃ. ৬৩

[41] এই পেডলার সাহেবের ছাত্র ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ওঁর অবদান ছিল। একদা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ পেডলার পরে বঙ্গদেশের আবহাওয়া দফতরের প্রধান ও বাংলার শিক্ষা-অধিকর্তা Director of Public Instruction হয়েছিলেন। উপরিউক্ত কমিটিতে যোগ দেওয়ার সময়ে তিনি শেষোক্ত পদে ছিলেন।

> In conclusion, we are of opinion that the method of identification by means of finger prints, as worked on the system of recording impressions and of classification used in Bengal, may be safely adopted as being superior to the anthropometrics method—(1) in simplicity of working; (2) in the cost of apparatus; (3) in the fact that all skilled work is transferred to a central or classification office; (4) in the rapidity with which the process can be worked; and (5) in the certainty of the results.[42]

এরই ভিত্তিতে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন ভারত-সরকার আঙুলের ছাপের পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। কিন্তু, সেখানেও একটা সমস্যা ছিল: আঙুলের ছাপের নানান উপবিভাগকে বের্তিয়ঁ-উদ্ভাবিত কার্ড পদ্ধতির মত করে এমনভাবে বর্গীকরণ করার দরকার ছিল, যাতে প্রয়োজনমত ঈপ্সিত কার্ডটি দ্রুত পাওয়া সম্ভব হয়। অবশেষে সেই বর্গীকরণ সম্ভব হয় ও সেই পদ্ধতিটি পুলিশ-কর্তা হেনরির নামেই প্রচলিত হয়। আঙুলের ছাপের বর্গীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব বিভিন্নভাবে হেনরি দাবিও করেছেন, অন্তত পুরো বৃত্তান্তটা খোলসা করেননি।[43] বস্তুত, ঔপনিবেশিক প্রজা যদি সহকারী কিংবা সহযোগী হয়, তাহলে সেই কথাটা লুকিয়ে রেখে সভ্যতা-প্রচারক শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ তথা ইউরোপীয়ের তরফে উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের কৃতিত্ব নেওয়ার ঘটনা বারেবারেই দেখা যাবে।[44] হুগলিতে হার্শেলের সঙ্গে আঙুলের ছাপ সংগ্রহের কাজ করছিলেন স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।[45] কিন্তু, নিজের বইতে হার্শেল রামগতির কোনো উল্লেখ করেননি। একইভাবে হেনরিও তাঁর দুই বিশিষ্ট অধঃস্তন সহকারী কাজি আজিজুল হক (১৮৭২-১৯৩৫) ও হেমচন্দ্র বসু (১৮৬৭-১৯৪৯)-র উল্লেখ নিজের লেখায় করেননি।

পরবর্তীকালে অবশ্য হেনরির নামে প্রচলিত আঙুলের ছাপ বর্গীকরণ পদ্ধতিতে হক ও বসুর অবদান কতটা ছিল তা নিয়ে বহু বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বস্তুত, কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, ঐ বর্গীকরণে ব্যবহৃত গাণিতিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ আদৌ হেনরির ছিল না। বস্তুত, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব হকের বলেই অনেকে দাবি করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা আজিজুল হকের কথা কলেজের অধ্যক্ষই হেনরিকে জানিয়েছিলেন। হেনরি তখন গণিত ও রাশিবিজ্ঞানে পারদর্শী সহকারী খুঁজছিলেন। কলিন বেভান লিখেছেন যে, বের্তিয়ঁ বা গ্যালটনের পদ্ধতিতে হক নাকি সন্তুষ্ট হননি। নিজের গরজেই তিনি বর্গীকরণের একটি গাণিতিক সমাধানসূত্র নির্ণয় করেন যেখানে আঙুলের ছাপের সমস্ত উপবিভাগকে কার্ডের মাধ্যমে ৩২টি উল্লম্ব ও অনুভূমিক সারিতে ১০২৪টি খোপে সাজিয়ে ফেলা সম্ভব।[46] ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হকের ক্যাবিনেটে আঙুলের ছাপ-সংবলিত

---

[42] E. R. Henry, তদেব, পৃ. ৬৭

[43] এই পুরো বিতর্কটি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন G. S. Sodhi and Jasjeet Kaur, "The forgotten Indian pioneers of fingerprint science", *Current Science*, Vol. 88, No. 1 (10 January 2005), পৃ. ১৮৫-১৯১

[44] প্রসঙ্গত, এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা মাপা বিষয়ে রাধানাথ শিকদার ও জর্জ এভারেস্ট বিতর্ক কিংবা হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার বিষয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জন মার্শাল বিতর্ক মনে পড়ে যায়। রেডিও-সংক্রান্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও মার্কনি বিতর্কে অবশ্য শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার প্রতিনিধি মার্কনি ঔপনিবেশিক প্রভু ছিলেন না।

[45] সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলী বসু (সম্পাদিত), সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০), পৃ. ৬০৬ (হেমচন্দ্র বসু প্রসঙ্গে আলোচিত)।

[46] Colin Beavan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৪২

কমবেশি প্রায় সাত হাজার কার্ড জমা হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত, বের্তিয়ঁ-কার্ডের তুলনায় হকের কার্ড চটজলদি গোছান ও খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ এবং তাতে মাপজোকের বিশেষ বালাই নেই, তাই ভ্রান্তির অবকাশ অনেক কম। বস্তুত, হার্শেলের প্রশাসনিক কৌতূহল ক্রমে হকের গবেষণার ফলে ঔপনিবেশিক আইনের শাসন রক্ষার অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠল। দেওয়ানির পাশাপাশি ফৌজদারি মামলাতেও আঙুলের ছাপ হয়ে গেল অন্যতম প্রধান 'ক্লু', ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তার 'সত্য'মূল্য সর্বজনীন বলে ঘোষণা করে দিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র।

আজিজুল হকের মস্তিষ্কপ্রসূত পদ্ধতি অবশ্য হেনরির হাত ঘুরে যখন ঔপনিবেশিক সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হল তখন হকের নাম কোথাও ছিল না। পুরো কৃতিত্ব বড়কর্তা হেনরিই নিলেন। হেনরির বর্গীকরণ পদ্ধতি নামেই গোটা পৃথিবীতে আঙুলের ছাপ সংগ্রহের ঐ ব্যবস্থা প্রসারিত হল।[47] বিনয় লাল মনে করেন, যদি হেনরি ঐ পদ্ধতির কেবল 'বিস্তৃতিসাধন' করে থাকেন তবে হয়ত এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্য কেউ সেটির উদ্ভাবক। আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি নিজেই স্ব-আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতির 'বিস্তৃতিসাধন' করেছিলেন।[48] ক্রমে হেনরি বলতে শুরু করলেন যে, একদিন ট্রেনে যেতে যেতে হঠাৎ এক ঝলকে তাঁর মাথায় নাকি পদ্ধতিটি খেলে যায়; এমনকী হাতের কাছে কাগজ না-থাকায় শার্টের হাতার কাফ-এ তিনি নিজের ভাবনা লিখে ফেলেছিলেন।[49]

প্রসঙ্গত, ছন্দক সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক প্রশাসন ক্রমে এই বিষয়ে অবহিত হয়েছিল যে, হেনরির কৃতিত্বের আড়ালে হক ও বসুর নাম ও ভূমিকা চাপা পড়ে গেছে। প্রসঙ্গত, ১৯৬০-এর দশকে *The Times* পত্রিকায় দুটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে উভয় লেখক ঔপনিবেশিক ভারতের পুলিশ-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত দুই উচ্চপদস্থ কর্তা হেনরি পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব একা এডোয়ার্ড হেনরিকে দিতে চাননি।[50] কিন্তু, জরুরি কথা হল, তার মানেই কি হেনরি তাঁর দুই ভারতীয় সহকারীকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেছিলেন? প্রসঙ্গটি একটু বিস্তারিত করেছেন ছন্দক সেনগুপ্ত। তাঁর মতে, চটজলদি হেনরি কর্তৃক ঘটিত 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্বে বিশ্বাস না-করে যদি খেয়াল করা যায় যে, হক ও বসু দুজনেই যথাক্রমে প্রথমে (১৯১৩) খান সাহেব ও রায় সাহেব এবং পরে (১৯২৪) খান বাহাদুর ও রায় বাহাদুর উপাধি এবং পাঁচ হাজার টাকা করে সাম্মানিক পেয়েছিলেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই হেনরির প্রশংসাসূচক সমর্থন ছিল, তাহলে শাসকের তরফে প্রজাকে 'ঠকানো' গোছের সরলীকৃত আখ্যানটি বোধ হয় একটু জটিল হয়ে পড়ে। অবশ্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের আলোচকরা 'শোনা' কথায় গুরুত্ব দিয়েছেন।[51] বাস্তবে, আজিজুল

---

[47] এই প্রসঙ্গে বিনয় লাল লিখেছেন যে, হেনরি ফল্ডসের কৃতিত্বের দাবির বিপক্ষে নিজের কৃতিত্ব ঘোষণা করে হেনরি লিখেছিলেন: "In 1897 I had *elaborated* the system of classification in use in India and now in use everywhere and I had never heard of Mr. Fauld's name or labour in this field of research." দ্রষ্টব্য: দ্রষ্টব্য: Vinay Lal, "Criminality and Colonial Anthropology", প্রাগুক্ত।

[48] তদেব

[49] Colin Beavan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

[50] Chandak Sengoopta, *Imprint of the Raj: How fingerprinting was born in colonial India* (London: Macmillan. 2003), পৃ. ১৪৩-১৪৪

[51] সোধি ও কৌর উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক আলোচক লিখেছেন: "Haque is alleged to have muttered to confidants that Henry could not even un derstand the system when it was patiently explained to him." দ্রষ্টব্য: G. S. Sodhi and Jasjeet Kaur, "The forgotten Indian pioneers of fingerprint science", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

হক বা হেমচন্দ্র বসু হেনরির উল্টোদিকে কোনো কথাই বলেননি। বরং, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে হেনরি নাকি খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তির জন্য হককে অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য করেন যে, উপাধির সঙ্গে তাঁকে জায়গির দিলে আরও ভাল হত।[52] ১৯২৫ সালে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ও পুলিশের অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে অবসর নেওয়া খান বাহাদুর কাজি আজিজুল হক বিহার সরকারের কাছে ৩ মার্চ বিনীত আবেদন জানান:

> Your humble memorialist's prayer is that in consideration of his loyal services, especially in the matter of the adaptation of the Finger Print System to practical use...Your Excellency's benign Government may consider your humble memorialist's case with a view to the grant of jagir.[53]

অধিকন্তু, অবসর গ্রহণের মাত্র দেড় বছর আগে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হওয়ার ফলে হক সাহেবের পেনশন যথেষ্ট মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল না। তাই সেটিও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির দরখাস্ত করার সময়েই ১৯২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি *The Statesman* পত্রিকায় প্রকাশিত "Indian affairs in London" শিরোনামের একটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষ তিনি উল্লেখ করেন। ঐ প্রতিবেদনে লেখা ছিল যে, আঙুলের ছাপের বর্গীকরণের ক্ষেত্রে একজন মুসলমান সাব-ইন্সপেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, কিন্তু তিনি এখনও উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি।[54] ফলে, সরকারের প্রজা হিসাবে খান বাহাদুর আজিজুল হক তাঁর বিনীত নিবেদনটুকুই পেশ করেছেন, এডোয়ার্ড হেনরির কৃতিত্বকে প্রশ্ন করেননি।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে বছরে লন্ডন থেকে উইলিয়ম জেমস হার্শেল-এর বইটি ছাপা হয় সেই ১৯১৬ সালেই কলকাতা থেকে রায় সাহেব হেমচন্দ্র বসু-র *Hints on Finger-prints with a Telegraphic Code for Finger Impressions* বইটি ছাপা হয়।[55] হক চলে গিয়েছিলেন বিহার প্রদেশে। হেমচন্দ্র ছিলেন বাংলায়। আঙুলের ছাপ ও সেই সংক্রান্ত সমস্ত নথি কীভাবে আবিশ্ব পুলিশের সঙ্গে দরকার অনুসারে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা যায় সেই পদ্ধতি নিয়ে হেমচন্দ্র বসু গবেষণা করেছিলেন। তাই বইয়ের আখ্যাপত্রে তাঁর পরিচয় ছাপা হয়েছিল 'আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞ, বাংলা প্রদেশ' ('Finger-Print Expert, Bengal'), এবং তার নীচে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ ছিল যে, তিনি 'লন্ডনের কমিশনর অব পুলিশ এবং ভারতে আঙুলের ছাপের মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা স্যর এডোয়ার্ড হেনরির ছাত্র'।[56] অর্থাৎ, হকের মতোই বসুও কোথাও হেনরির কৃতিত্বে ভাগ দাবি করেননি। তবে, এমনও হতে পারে যে, ঔপনিবেশিক প্রজা হিসাবে শ্বেতাঙ্গ বড়কর্তার পাল্টা কথা বলে শাসকের বিরাগভাজন হতে চাননি হক

---

[52] তদেব

[53] তদেব

[54] তদেব। উক্ত প্রতিবেদনে লেখা ছিল: "A Muhammaden Sub-Inspector played an important and still insufficiently acknowledged part (in fingerprint classification)".

[55] Hem Chandra Bose, *Hints on Finger-prints with a Telegraphic Code for Finger Impressions* (Calcutta & Simla : Thacker, Spink & Co., 1916)

[56]"(Pupil of Sir Edward Henry, Commissioner of Police, London, and Founder of the Finger-Print System of Identification in India)". দ্রষ্টব্য: তদেব, বইটির আখ্যাপত্র।

ও বসু। অবশ্য, এসবই সম্ভাব্যতার প্রশ্ন। বরং, যেটা বেশি আশ্চর্যকর ও সেই কথাটি এতদিন কোনো আলোচকই উল্লেখ করেননি, তা হল স্বয়ং হেমচন্দ্র বসু তাঁর বইয়ের ভূমিকায় বিভিন্ন ইংরেজ বড়কর্তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন; এমনকী বাংলা ইন্সপেক্টর এন সি মুখার্জি যে ১৯০৩ সালে আঙুলের ছাপ টেলিগ্রাফে পাঠানোর কোডের খসড়া তৈরি করেছিলেন ও তারই সংস্কার সাধন করেছেন হেমচন্দ্র সেই কথাটাও স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু গোটা বইতে কোথাও একবারের জন্যও আঙুলের ছাপের বর্গীকরণ প্রসঙ্গে আজিজুল হকের উল্লেখ করেননি তিনি! বরং, হেনরির লেখা থেকে বহু উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন এবং আঙুলের ছাপের চতুর্বর্গীকরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "As an outcome of much experimenting this fourfold classification is recommended by Sir Edward Henry as it meets all requirements while greatly reducing the number of gradational cases."[57] অর্থাৎ, কেবল যে হেনরি কোথাও তাঁর লেখায় বা বক্তৃতায় হক ও বসুর নাম বা ভূমিকার উল্লেখ করেননি তাই নয়, হক কিংবা বসু নিজেরাও কোথাও একে অন্যের নামোল্লেখ করেননি।

এই বিতর্কের নিষ্পত্তি না-হলেও, আঙুলের ছাপ যে অপরাধীকে শনাক্ত করতে পারে তার হাতেগরম নমুনা বাংলা প্রদেশেই পাওয়া গিয়েছিল। সালটা ১৮৯৭, অগাস্টের ১৬ তারিখের রাতে ভুটানের লাগোয়া কাঠালগুড়ি চা বাগানের (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা) ম্যানেজার হৃদয়নাথ ঘোষকে তারই বাংলোয় কেহ বা কাহারা নেপালি কুকরি দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে। ঘোষের একটি কাঠের হাতবাক্স ছিল, যার থেকে মোটা রকমের টাকা লোপাট হয়। একাধিক সন্দেহভাজন ছিল— হৃদয়নাথের কর্মচারীরা, পাচক, ঘোষের 'সঙ্গিনী'র আত্মীয়রা এবং একদল কাবুলি, যারা ঐ চত্বরে ঘুরছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসকের চোখে কাবুলিরা ততদিনে 'অপরাধপ্রবণ জনজাতি'। আর নিহত ব্যক্তির এক পুরাতন ভৃত্য ছিল, নাম কাঙালীচরণ। ততদিনে সে 'প্রাক্তন' হয়ে গিয়েছিল, কারণ একদা ম্যানেজার ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতেই চুরির অপরাধে কাঙালীচরণের হাজতবাস হয় এবং বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে সে ভৃত্যের কাজ থেকেও বরখাস্ত হয়েছিল।

এহেন কাঙালীচরণ ঐ খুনের কিছুদিন আগেই হাজত থেকে ফেরত আসে এবং সে হৃদয়নাথের থেকে শোধ নেওয়ার কথাও নাকি বলে বেড়িয়েছিল। ফলে অনেক লোকের উপরেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। অতঃপর পুলিশ ঐ ঘরে একটি পাঁজির উপরে বাদামি ছাপ দেখতে পেয়ে সেগুলি রক্তমাখা আঙুলের ছাপ সন্দেহে কলকাতায় কেন্দ্রীয় দফতরে পরীক্ষার জন্য পাঠায়। ওদিকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহারানি ভিক্টোরিয়ার শাসনের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময়ে কাঙালীর বন্দিত্ব-মুক্তি ঘটে। ছাড়া পাওয়ার সময়ে তার আঙুলের ছাপ সংগৃহীত হয়েছিল। এবারে বহু পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে ঐ রক্তমাখা বুড়ো আঙুলের ছাপের সঙ্গে কাঙালীচরণের আঙুলের ছাপ গেল মিলে। ওদিকে কাঙালী ততদিনে অকুস্থল থেকে বীরভূমে চলে গিয়েছিল এবং গ্রামে ফিসফাস শোনা যাচ্ছিল যে হঠাৎই নাকি তার অবস্থাও কিঞ্চিৎ শুধরেছে। ফলে, একে আর্থিক উন্নতি উপরন্তু আঙুলের ছাপের মিল — ফলে, হৃদয়নাথ ঘোষের হত্যা ও তার তবিল থকে চুরির অভিযোগে কাঙালীচরণকে বীরভূম থেকে গ্রেফতার

[57] তদেব, পৃ. ১০

করা হল। এই দিক থেকে বিচার করলে আঙুলের ছাপ থেকে 'অপরাধী' শনাক্ত করার এই ঘটনায় ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ব্রিটেনের বড়কর্তাদেরও টনক নড়ে। হেনরির পদ্ধতি যে কেবল তাত্ত্বিক-গাণিতিক নকশা নয়, বরং প্রশাসনিকতার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্ভব— সেই কথাটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[58]

কিন্তু, আঙুলের ছাপ মিলে গেলেও গল্প তখনও কিছুটা বাকি ছিল। ১৮৯৮ সালে আঙুলের ছাপের ফরেন্সিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রথম ফৌজদারি মামলা শুরু হল। ততদিনে মাদ্রাজে একটি আঞ্চলিক আঙুলের ছাপ সংক্রান্ত দফতর (১৮৯৫) চালু হয়ে গেলেও সেই ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দেই পৃথিবীতে প্রথম আঙুলের ছাপ সংক্রান্ত জাতীয় সরকারি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়, লালবাজারে পুলিশের প্রধান দফতরে। কিন্তু, আদালতে হেনরির নামাঙ্কিত আঙুলের ছাপ নথিভুক্তকরণ পদ্ধতি তথা অবরোহ যুক্তি পদ্ধতিই কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। শার্লক হোমস একবার ওয়াটসনকে বলেছিল: আমার এক চলতি লব্জ আছে, যখন তুমি অসম্ভবকে বাদ দিয়ে দেবে তখন যা পড়ে থাকবে তা যতই অসত্য মনে হোক সেটাই সত্য।[59] একদিন সকালে ব্যোমকেশ বক্সীও অজিতকে বলেছিল:

> আরে, অনুমানই তো আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বৈ আর কিছুই থাকে না। আইনে যে circumstantial evidence বলে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কি? অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারই জোরে কত লোক যাবজ্জীবন পুলিপোলাও চলে যাচ্ছে।[60]

খেয়াল করতে হবে, হোমসের মুখে ডয়েল কথাটি বসিয়েছিলেন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। এনথ্রোপোমেট্রিক কার্ড ও আঙুলের ছাপের সেই আদিপর্বে। কিন্তু, তারপরেও ব্রিটেনেতো নয়ই এমনকী ঔপনিবেশিক ভারতেও আঙুলের ছাপ থেকে অপরাধী চিহ্নিতকরণের পদ্ধতির 'সত্য' সাক্ষ্য হিসাবে কোনো আদালতি মূল্য ছিল না। আঙুলের ছাপের মিলঘটিত অভিন্ন পরিচয় তত্ত্বে সাধারণীকরণের মূল ভিত্তি ছিল একটি পূর্বানুমান: কোনো দুজন ব্যক্তির আঙুলের ছাপ হুবহু সমরূপ হতে পারে না। মুশকিল হল, পৃথিবীর সমস্ত জীবিত মানুষের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে ও মিলিয়ে দেখে এই সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। ফলে, এই 'বৈজ্ঞানিকতা'র প্রায়োগিক দিকটি ঐ অবরোহমূলক দার্শনিক যুক্তি বা পূর্বানুমানের উপরেই নির্ভরশীল ছিল এবং সেক্ষেত্রেও যদি নমুনার সংখ্যাগত বিস্তার বিচার করা হয় তাহলে তার ব্যাপ্তি খুব বেশি ছিল না। হকের ক্যাবিনেটে হাজার সাতেক ছাপ সংগৃহীত হয়েছিল। আবার, অকুস্থল থেকে সম্পূর্ণ আঙুলের ছাপও যে সবসময় পাওয়া যেত তা নয়। অস্পষ্ট বা আংশিক ছাপ থেকেও ঐ অবরোহ যুক্তি প্রয়োগ করেই এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছানো হত যে, এই জগতে এমনকী

---

[58] E. R. Henry, *Classification and Uses of Finger Prints,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫৪

[59] "when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth." এইটি শার্লক হোমসের সম্ভবত প্রিয়তম উক্তি। *The Sign of Four* (১৮৯০) উপন্যাসে দু-বার হোমস কথাটি বলেছে। পরেও, প্রায় হুবহু কথা হোমসের মুখে শোনা যায় অন্তত তিনটি গল্পে "The Beryl Coronet"(১৮৯২), "The Bruce-Partington Plans" (১৯০৮) এবং "The Adventure of the Blanched Soldier" (১৯২৬)।

[60] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথের কাঁটা', ব্যোমকেশ সমগ্র (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৭), পৃ. ৪৫। গল্পটির প্রথম প্রকাশ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

আঙুলের আংশিক ছাপও প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র, দুজনের ছাপ সর্বদাই ভিন্ন হবে। ফলে, সর্বত্রই এই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে ছাপ মিলিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ফরেন্সিক আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞদের দস্তুর ছিল।[61]

এই দস্তুরটিই কাঙালীচরণের মামলায় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। বহু বিচারে পুলিশের বিশেষজ্ঞরা সাব্যস্ত করেন যে, পাঁজির উপরে রক্তমাখা আঙুলের ছাপের সঙ্গে কাঙালীচরণের আঙুলের ছাপের মিল আছে। কিন্তু, ঔপনিবেশিক ভারতে প্রচলিত ব্রিটিশ-আইন মোতাবেক সেই সাযুজ্য বিচারকের কাছে প্রমাণ তথা সত্য হিসাবে কতটা গ্রাহ্য তাই ছিল প্রশ্ন। মনে রাখতে হবে, তখনও আঙুলের ছাপের সাক্ষ্য বিচারের জন্য কোনো 'বিশেষজ্ঞ'কে আদালতে ডেকে মতামত নেওয়া হত না।[62] বিচারকই স্ব স্ব দক্ষতা অনুসারে সেই মিলিয়ে দেখার কাজটি করতেন। এক্ষেত্রে বহু পর্যবেক্ষণের পরে ঐ আঙুলের ছাপ কাঙালীচরণের বলে গ্রাহ্য হলেও কেবল সেই প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক হৃদয়নাথের হত্যার দায় কাঙালীর উপরে চাপাননি। বিচারক মন্তব্য করেন:

> No doubt the brown finger-impressions on the Bengali almanac are strong presumptive evidence, if believed, to consider the defendant to be present in the room, and he having touched the blood had stained his fingers with it; but, beyond that, I do not see how that can connect the defendant with the actual murder, or even of its abetment. It will not only be unsafe to hold the defendant guilty of such a crime, but it will be unfair and unjust to presume him to have murdered the deceased without any direct evidence, or even indirect evidence, to connect him with the commission of murder.[63]

বিচারকের মতে, ঐ রক্তমাখা আঙুলের ছাপ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ঐ ঘটনার রাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহতের ঘরে ঢুকে তার বাক্স ও কাগজপত্র, পাঁজি ইত্যাদি নাড়াঘাঁটা করেছিল। কিন্তু, পাশাপাশি এর থেকে এটা নিশ্চিত করে প্রমাণ হয় না যে, অভিযুক্তই খুন করেছে বা আদতে ঐ হত্যার সঙ্গে জড়িত। অতএব বিচারক কাঙালীচরণকে লুকিয়ে ঘরে ঢুকে চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করলেও, হৃদয়নাথকে খুনের অভিযোগ থেকে তাকে মুক্তি দেন।[64] বস্তুত, এই মামলার পরের বছরেই ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চম আইন *(Act V)* অনুসারে ১৮৭২-এ প্রণীত দ্য ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টকে সংশোধন করে আঙুলের ছাপকে আদালতে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯০৪ সালে ঔপনিবেশিক ভারতে একটি মামলায় সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে আঙুলের ছাপের 'সত্য' মূল্য ঘোষণা করে আদালত

---

[61] "Forensic fingerprint identification, therefore, rests in part upon the far more ambitious premise that there are no two identical single fingerprints anywhere in the world. And ultimately it rests upon the still more ambitious premise that no two partial prints are alike, or that fragmentary areas of papillary ridge detail of a certain size (exactly what size is unclear) can be matched to one and only one finger, to the exclusion of all other fingers in the world." Simon A.Cole, *Suspect Identities : A History of Fingerprinting and Criminal Identification*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[62] "In the otherwise obscure 1896 case of Queen Empress v. Fakir Mahomed Sheikh, Arshad Ali Shaha and Sitanath Das, it was realized that this definition of expert witness excluded the police expert on fingerprint identification." Chandak Sengoopta, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫

[63] Simon A.Cole, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০

[64] তদেব

অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে।[65] উপরন্তু, আঙুলের ছাপ যে চিহ্নিতকরণের প্রমাণ হিসাবে উৎকৃষ্টতর সে-কথাও আদালত জানায়:

> Our identification evidence has hitherto been of a rough and ready kind. We have for the most part depended on the oral evidence of witnesses speaking from memory; upon handwriting; upon photographs; upon clothes: and so on. The chances of being misled to a wrong judgment by such evidence are not inconsiderable. The witnesses may be wilfully false or honestly mistaken; the hand-writing may be a deliberate forgery or an innocent and accidental imitation; the photograph may present a deceptive likeness; the clothes may for many obvious reasons be equally misleading. Yet this is the evidence upon which identity has been held proved or disproved, men have suffered sentence of death, and valuable property has passed from one person to another. The weakness of the system was realised many years ago, and anthropometry found birth. But the danger of depending on a system of measurements was soon, more or less, realised, owing to the obvious possibility of an approximation in the measurements of two individuals being so great as to make differentiation doubtful, upon the theory that it must be due only to defective measurement; and this weakness prevented any general adoption of the system, until now its gradual abandonment in favour of "Finger prints" may be regarded as certain. It is only in very recent years that we have discovered our possession, literally at our finger-ends, of what seems to be an absolutely certain mode of identification, wherever the material for its application are present.[66]

বস্তুত, ঐ মামলায় বিচারক স্ট্যানিয়ন প্রায় হোমস-সুলভ পদ্ধতিতে 'সত্য'-এ উপনীত হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন:

> Where the Court has present to it for selection two different explanations of the same thing—two different alleged causes of the same effect—the Court will accept that which is so much more probable than the other as to convince a reasonable mind of its being the truth.[67]

আবার পরিচয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'circumstantial evidence' প্রসঙ্গেও তাঁর মতামত ব্যোমকেশ-সুলভ:

> In dealing with the question of the identity of human beings all evidence of a disputed identity must be dealt with in this way; and circumstantial evidence plays a very large part in the process. It may happen that circumstantial evidence of overwhelming completeness will sometimes lead to a mistaken judgment but,… (a) Judge has to find, not upon what he personally knows to be certain, but upon what he believes to be true and his belief comes when the probability in favour of a particular fact rises to a point where, in accordance with human experience, it reaches the level of practical certainty; that is, when the chances in favour of its being true are so many as to be irresistible, and the chances against its being true are so few as to be unworthy of consideration by a reasonable mind.[68]

আর সেই যৌক্তিক বৈচারিকতার উপরেই আস্থা জ্ঞাপন করে বিচারক জানান:

> The process in our system of justice of identifying persons necessarily calls into use the well established fact that, as far as human experience goes, there are no two human beings in the

---

[65] *Emperor v. Sahdeo,* Madhya Pradesh High Court Jul 5, 1904 Case No. Criminal Appeal No. 46 of 1904. Judges H.J Stanyon Esq. C.I.E Additional Judicial Commissioner Central Provinces

[66] তদেব

[67] তদেব

[68] তদেব

> world who exactly resemble one another in every single detail. Resemblances caused by heredity, or even by what we would regard as pure chance, are common; and cases have no doubt occurred where the resemblance has been so considerable as to lead to mistakes in identity, especially where the individuals resembling one another have been seen at different times and places, But this has been due rather to defects of observation than to any real difficulty in differentiating under proper observation. I do not believe that it would be impossible, or even difficult, for the most casual observer to notice well established points of difference in two individuals, however much alike, if they were placed side by side, so as to allow of ocular comparison.[69]

১৮৯৮ সালে কাঙালীচরণের মামলায় যে সাধারণীকরণের ভিত্তিতে আঙুলের ছাপ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল তার মূলস্থিত সেই পূর্বানুমানকেই— কোনো দুজন ব্যক্তির আঙুলের ছাপ হুবহু সমরূপ হতে পারে না— 'মানব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তথ্য' বলে দাগিয়ে দিলেন সহদেও মামলার বিচারক স্ট্যানিয়ন। গ্যালটনকে সাক্ষ্য মেনে তিনি এই সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত যে, এই জগতে এমনকী আঙুলের আংশিক ছাপও প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র, এবং তার ফলে, সর্বত্রই এই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে ছাপ মিলিয়ে 'সত্য' সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই যায়:

> But finger impressions can be compared under infinitely more advantageous circumstances. By those who have made a study of the subject, though they have classifications of finger impressions into divisions and sub-divisions of types and patterns presenting general features of resemblance, there has never yet been found any case in which the pattern made by one finger exactly resembled the pattern made by any other finger of the same or of any other hand.[70]

এইভাবেই, হেনরি পদ্ধতির গলায় উপনিবেশে 'আইনের শাসন' বলবৎ ও রক্ষায় পটুত্বের জয়মালা পরানো হল।

হেনরি ফিরলেন ইংল্যান্ডে, সঙ্গে আবারও শুরু করলেন সেদেশে আঙুলের ছাপকে মান্যতা দেওয়ার আবেদন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রর পক্ষে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতাকে নাকচ করা আর সম্ভব হয়নি। হার্শেল-গ্যালটন-হেনরি— আঙুলের ছাপ-ত্রয়ীর হাত ধরে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা মাতৃরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। আবার অন্যদিকে ঔপনিবেশিক প্রজা তথা সমাজের সম্পর্কে তথ্য আহরণ ও পরিচিতি নির্ণয়ের 'নির্ভরযোগ্য' পদ্ধতি হিসাবে ক্রমেই ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রশাসনিকতার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল আঙুলের ছাপ।[71] কিন্তু, সেই ছাপ সংগ্রহে দেশীয়দের মেধা-শ্রম-অধ্যবসায় থেকে গিয়েছিল অস্বীকৃত। ঔপনিবেশিক শাসকের নামে বই ছাপা হবে, উদ্ভাবন-কৃতিত্বের অধিকারী তিনিই; দেশীয় অধঃস্তন কেবলই জ্ঞান-যজ্ঞের সমিধ জোগাড় করে দেবে। সেইটিই ঔপনিবেশিক ভারতে নৃদেহপরিমাপবিদ্যা কিংবা আঙুলের ছাপ সংগ্রহ তথা নৃতাত্ত্বিক চর্চার মূল প্রকরণ ছিল। বার্নার্ড কোন দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ জ্ঞানতত্ত্বের অটল প্রত্যয় ছিল যে, দৈবিকতা-প্রসূত জগতের সবকিছুই নৈর্ব্যক্তিকভাবে জানা সম্ভব।

---

[69] তদেব

[70] তদেব

[71] "In India the British entered a new world that they tried to comprehend using their own forms of knowing and thinking. There was widespread agreement that this society, like others they were governing, could be known and represented as a series of facts. The form of these facts was taken to be self-evident, as was the idea "that administrative power stemmed from the efficient use of these facts."" Bernard S. Cohn, *Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India* (New Jersey: Princeton University Press, 1996), পৃ. ৪

জাগতিক সমস্ত রহস্য নিরসনে বিজ্ঞানের চাবিকাঠিই আসল, যে বিজ্ঞানের মারফত সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করা যাবে। সেই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই জগতের চালক, আর পৃথিবীর ভিতরে যা কিছু আছে সব জীব ও জড়ও সেই নিয়মাবলীর অধীন।[72] প্রকৃতপক্ষে, উপনিবেশ নামের নতুন পরিসরকে বাগে আনতে হলে এমনসব 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি যা অসমসত্ত্ব প্রজা-সমাজের সাধারণীকরণে সহায়ক হবে। তাই ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতা ও জ্ঞানতত্ত্বের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে বর্গীকরণ, এবং অ্যানথ্রোপোমেট্রি হোক কিংবা আঙুলের ছাপ— সবই সেই বর্গীকরণের ভিন্ন প্রকার মাত্র।[73] বস্তুত, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নজরদারির প্রকরণসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন দেখিয়েছেন যে, বিচিত্র জনগোষ্ঠীর সমাহারে গঠিত দেশীয় সমাজকে, বিশেষত 'অপরাধ' করার 'সম্ভাবনাময়' গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করাই শাসকের কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে উঠেছিল। সেই সমস্যার সমাধানে ফরাসি বের্তিয়ঁ কিংবা ইংরেজ হার্শেল, এলিস, গ্যালটন, হেনরি বা ফল্ডস কিংবা সহদেও মামলার বিচারক স্ট্যানিয়ন (তাঁর বক্তব্যে বারংবার 'Our', 'We' প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহার লক্ষণীয়) — সকলেই চেষ্টা করেছিলেন কীভাবে এমন কতগুলি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত, নথিভুক্ত ও বর্গীকরণ করা যায় যার মারফত ব্যক্তির পরিচিতি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। আঙুলের ছাপ সম্পর্কিত হেনরি-পদ্ধতি সেই পরিচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিতে জাগতিক ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনিবার্যতার মতই এক 'বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিকতা'র ছাঁচে ফেলে সেটিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তথা জ্ঞানতত্ত্বের বাহক ও শরিক করে তুলেছিল।[74]

দারোগা ও তার দপ্তর : বাঙলা গোয়েন্দা সাহিত্যে 'অপর' নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রাগিতিহাস

আঙুলের ছাপ থেকে অপরাধী ধরার কৌশল হোক বা গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত্তিমূলক অভিজ্ঞতা— উভয়ই উপনিবেশ থেকে মাতৃরাষ্ট্র ইংল্যান্ডে গিয়ে আবার উপনিবেশে ফেরত এসেছিল। উপনিবেশে সেই প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে তার গায়ে লেপ্টে ছিল ইউরোপীয় আধুনিকতার চিহ্ন। সেই চিহ্ন-পরিচয়ের আত্তীকরণে উৎসাহী ছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতাজাত ইংরেজি শিক্ষিত প্রজাপুঞ্জ, যারা প্রভুর ছাঁচে নিজেদের গড়ে নিতে উদ্যোগী। বস্তুত, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্যতম লক্ষণই ছিল সেই অনুকৃতি। সেই আবহে উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক বাংলায় একটি বিশেষ সামাজিক-বৌদ্ধিক দ্বন্দ্বের পরিসর তৈরি হয়েছিল। উপনিবেশে মুদ্রণ-পুঁজির বিস্তারের ফলে পত্র-পত্রিকা হোক বা নানান কিসিমের সাহিত্যে ছাপার অক্ষরে সেই দ্বন্দ্বের প্রতর্কগত বহিঃপ্রকাশের আখ্যানরূপ দেখা যায়, যার প্রধান

---

[72] তদেব, পৃ. ৫ এবং ৫৩

[73] প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের কৃৎকৌশল প্রসঙ্গে ভবানী রমন দেখিয়েছেন যে, কোম্পানি-শাসনে স্বাক্ষর বা নাম সই করার পদ্ধতিকে প্রশাসনের দস্তুর বলে গণ্য করা হলেও সেই স্বাক্ষর নিয়েও নকল, জালিয়াতি ও দুর্নীতির নানান অভিযোগ উঠেছিল। দ্রষ্টব্য: Bhavani Raman, *Document Raj: Writing and Scribes in Early Colonial South India* (Chicago & London : The University of Chicago Press, 2012), পৃ. ১৪৭-১৪৯

[74] Bernard S. Cohn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

লক্ষ্য ছিল পুলিশের দারোগা। বস্তুত, পুলিশ-কর্তা তথা দারোগাদের প্রতি 'শখের' গোয়েন্দাদের যে অনুকম্পামিশ্রিত ঠেস বাংলা সাহিত্যে বহুল প্রচলিত, তা আদতে ঐ বিশেষ মনোভাবের প্রতিফলন, যা কাল্পনিক জগতের ছায়ায় বাস্তবের লড়াই। সেই লড়াই অবশ্য মাতৃরাষ্ট্র ইংল্যান্ডেও ছিল। যে-কারণে হোমস সর্বক্ষণ লেসট্রেড কিংবা গ্রেগসনের বৌদ্ধিক স্তর নিয়ে বিদ্রূপ ও সমালোচনা-মুখর। তবে, ঔপনিবেশিক বাংলায় শ্রেণির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল সম্প্রদায়গত পরিচয়। ফলে, দেশীয় সমাজে দারোগার সঙ্গে কল্প-গোয়েন্দার সেই লড়াইয়ের তলায় লুকিয়ে থাকে ঔপনিবেশিক পরিসরে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকের সুবিধা আদায়ের মারপ্যাঁচ। এহেন মারপ্যাঁচের তত্ত্বতল্লাশ করলে দেখা যাবে শখের গোয়েন্দার বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বাতন্ত্র্য দিতে হলে দারোগার থেকে ভাল রসিকতার উপকরণ আর কিছু হত না। তবে, সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-রসিকতার বাস্তব ভিত্তি গণমানসে আগে থেকেই তৈরি ছিল এবং তার গ্রহণযোগ্যতা নিহিত ছিল মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে। এই যে দারোগাদের সমালোচনা কিংবা ব্যঙ্গ করে বেসরকারি গোয়েন্দারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করেছিল এর সামাজিক ইতিহাসের সূত্র নিহিত আছে সেই অভিজ্ঞতার গণসম্মতি নির্মাণের প্রক্রিয়ায়।

বস্তুত, নবাবী আমলে প্রশাসনিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও আইনি লব্জের সঙ্গে পরিচিতির সুবাদে কোম্পানি শাসনেও গোড়া থেকেই দারোগা পদে মুসলমানরাই বেশি বহাল হত। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দশটি জেলায় নিযুক্ত দারোগাদের মোট সংখ্যা ছিল ২০০, যার মধ্যে ৬৬ জন খেতাবধারী এবং ৫৩ জন খেতাবহীন মুসলমান ছিলেন। বিশেষত নবাবী শাসনের কেন্দ্র ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় খেতাবধারী মুসলমান দারোগার প্রাধান্য ছিল। তবে ঐ একই তথ্য থেকে এটাও বোঝা যায় যে, সংখ্যায় কম হলেও হিন্দুরাও দারোগা পদে বহাল হত।[75] ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে *'Regulations for the Police of the Collectorship in Bengal, Bihar and Orissa'*-র প্রচলন হয়। তার মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ (কার্যকাল ১৭৮৬ -১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলায় একটি পুলিশ-প্রশাসনের কাঠামো তৈরি করেন। চলতি লব্জে তাকে থানাদারি পদ্ধতি বলা হতো। কলেক্টরশিপ বা নতুন তৈরি করা জেলাগুলিকে কয়েকটি থানার আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং থানাপিছু একজন দারোগা বহাল করা হয়।

ক্রমে, ঐ দারোগা ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি স্পষ্ট হতে থাকে— বিশেষত, দারোগাদের আর্থিক দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার। দেখা যায় যে, ১৮৩০-এর দশক থেকে ঔপনিবেশিক পুলিশি-ব্যবস্থার সমস্যা তথা মূলতঃ দারোগাদের দুর্নীতি নিয়ে পত্র-পত্রিকাগুলি প্রবলভাবে সরব হয়ে ওঠে। মফস্বলী পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার করার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকার ১৮৩৬ সালে একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন W. W. Bird, এবং তাঁর নামেই চলতি লব্জে ঐ কমিটিকে বার্ড কমিটি (Bird Committee) বলা হত। ঐ কমিটি দু-বছর ধরে পুলিশ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পদাধিকারী, সমকালীন মান্য ব্যক্তিত্ববর্গ অনেকের সঙ্গে কথা বলে বেশকিছু

---

[75] Basudeb Chattopadhyay, *Crime and Control in Early Colonial Bengal 1770-1860* (Calcutta: K. P. Bagchi, 2000), পৃ. ৫৫-৫৭। বাঁকাউল্লার আখ্যানেও আছে যে, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বড়কর্তারা গ্রামে-মফঃসলে ঘুরে চালাক-চতুর, মোটামুটি ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন যুবকদের দারোগা পদে বহাল করত। দ্রষ্টব্য: সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), বাঁকাউল্লার দপ্তর (কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১৩), পৃ. ২০

সংস্কার প্রস্তাব করেন।[76] কমিটির প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুলিশি-দুর্নীতির বিভিন্ন নজির উঠে আসে এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তিত্বদের তরফে দারোগা ব্যবস্থার সমালোচনায় ঐ শ্রেণি-সম্প্রদায়গত দিকটিও ফুটে উঠেছিল।[77] বার্ড কমিটির সমকালেই ১৮৩৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর (১৮ পৌষ, ১২৪৩ বঙ্গাব্দ) জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে জানাচ্ছে যে, দারোগাদের অসততার নমুনা মহামান্য সরকার বাহাদুরের গোচরে আনতেই ঐ লেখার অবতারণা:

> পোলীসের দারোগারা চুরি ডাকাইতির এবং মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের আজ্ঞাপ্রামাণিক তদারকের উপার্জনভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন… আমরা তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি এবং আমারদিগের বোধ হয় মফঃসলের পোলীসের যে নূতন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইয়াছে তাহা স্থির হইলে এই সকল মন্দ প্রকরণ দূর হইবেক।[78]

অতঃপর 'হরকরা'য় প্রকাশিত একটি চিঠির সূত্র ধরে দারোগাদের বেতন ও উপরি উপার্জনের সবিস্তার খতিয়ান দিয়ে উপর্যুক্ত প্রতিবেদক দেখিয়েছেন যে, দারোগার মাসিক বেতন ২৫ টাকা ধরে বছরে আয় ৩০০ টাকা। কিন্তু বেতনের উপরি নানান উপার্জন যোগ করলে সেই আয় হয়ে যায় বাৎসরিক ২৪৫০ টাকা।[79] এতো টাকা পেলেও দারোগারা যে কাজের কাজ মোটেই করে না, তা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল। পাশাপাশি, একথাও উঠছিল যে, পুলিশ-দারোগা ব্যবস্থার নতুন বন্দোবস্তের ফলে একদিকে অপরাধ বেড়েছে এবং অন্যদিকে অত্যাচারিত ব্যক্তি আরও বেশি হেনস্থা হওয়ার আশঙ্কায় থানায় নালিশ করতে চায় না। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ অগাস্ট (২৩ শ্রাবণ, ১২৪৩) 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই সম্পর্কে স্পষ্টই লেখা হয়:

> যে অবধি পোলীসের নূতন বন্দোবস্ত মত কর্ম্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে চুরি না হয় এমত দিন নাই যে সকল গৃহস্থের বাটীতে পিপীলিকাদি কীট পতঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে নাই সে সকল বাটীতে অনায়াসে সিঁধ দিয়ে চুরি করিয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে কলিকাতার সিঁধালচোরের ভয় কোনকালে ছিল না।[80]

---

[76] *Bengal Police (Bird) Committee 1837-38: Report, appendices and evidence.* [Calcutta, 1838], British Library, Asian and African Studies Collection, IOR/V/26/150/1. [রিপোর্টটির একটি কপি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। এই প্রবন্ধে সেটিই ব্যবহার করা হয়েছে অধ্যাপক ছন্দক সেনগুপ্তর সৌজন্যে]

[77] তদেব, পৃ. ৩১-৩৯

[78] বিস্তারিত প্রতিবেদনটির জন্য দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪২), পৃ. ৩১১

[79] তদেব

[80] তদেব, পৃ. ৩১০-৩১১
উপর্যুক্ত হিসাব যে মনগড়া নয়, তার নজির ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত মিয়াজান দারোগার জবানিতেও পাওয়া যায়। সেখানে বলা হচ্ছে চৌকিদার পিছু ১ টাকা নজরানা দেওয়ার রীতি বেশ প্রচলিত ছিল। দ্রষ্টব্য: অরিন্দম দাশগুপ্ত (অনূদিত), মিয়াজান দারোগার একরারনামা (কলকাতা : চর্চাপদ, ২০০৯) পৃ. ২৯-৩০

বার্ড কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ভদ্রলোকেরা ঠারেঠোরে কিংবা স্পষ্টতই এই দুর্নীতির কথা খোলসা করে দিলেন। প্রসন্নকুমারের মত ছিল দারোগা ব্যবস্থা অসার, তার বিলুপ্তিই শ্রেয়। ১৮৩৭ সালের ৪ নভেম্বর বার্ড কমিটির প্রশ্নের উত্তরে তিনি সোজাসাপটা বলেন:

> *If the jurisdictions are made small, then the Darogahs might be abolished*, and a Jemadar and a certain number of Burkandazes would be suficient for each Thanuah. *The Chokeedars as they are now are totally useless*, tho' they are nominally elected by the ryots, they are really appointed by the Darogah and the Gomastah of the Zumeendar; they seldom attend to their duty from two reasons; first, they are labourers, like others, and never keep watch; secondly, there is one Chokeedar to every thirty-two houses. It sometimes happens that these thirty-two houses are scattered in two or three villages, in which case even if they be desirous of doing their duty, they cannot perform it. I would suggest that the Chokeedaree tax be collected by the proprietor of each village, and would make it incumbent on him to pay this money to the deputy local Magistrate. I would abolish the nominal elective system and allow the Deputy Magistrate to appoint them and also to pay their salary, by which you will secure the services of a regularly paid officer.[81]

প্রশ্নোত্তর চলাকালীন এক জায়গায় ঔপনিবেশিক শাসকের প্রশ্ন ছিল, পুলিশ ব্যবস্থার প্রতি দেশীয়দের মনোভাব কেমন? প্রসন্নকুমার স্পষ্ট জানান, চলতি ব্যবস্থার যা হাল তা মোটেই দেশীয়দের চোখে ভালো ঠেকে না। তারপরে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বাবু প্রসন্নকুমার যে দারোগা পদ তুলে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিচ্ছেন, সেখানে বেতন বৃদ্ধি ও পদাধিকারের পরিবর্তন ছাড়া আদৌ কি কোনো প্রকৃত বদল ঘটবে? এর উত্তরে প্রসন্নকুমার যা বলেন, তা ইংরেজি জ্ঞান ও তার উপজাত সামাজিক-আর্থিক কৌলীন্যের অধিকারী শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী সম্প্রদায়ের দিক থেকে মূলতঃ মুসলমান-অধ্যুষিত দারোগা ব্যবস্থার প্রতি শ্রেণি ও সম্প্রদায়গত কটাক্ষের প্রকৃষ্ট নমুনা: "The *class of people I would employ* as Deputy Magistrates *would not be such as those who now accept and hold* the office of Darogahs."[82] যারা দারোগা হয় তারা যে সমপংক্তিভুক্ত নয়, বরং 'অপর' এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার যোগ্যতা যে তাদের নেই, তা প্রায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রসন্নকুমার। এমনকী, তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কার যদি বাস্তবায়িত হয়, যদি দারোগা পদ তুলে দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকেই করা হয় স্থানীয় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাহলে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলভোগী ঔপনিবেশিক শাসকানুগত জমিদার শ্রেণি তার সমর্থনে দাঁড়াবে, সে বিষয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিশ্চিত। বর্তমান দারোগা ব্যবস্থার সঙ্গেও জমিদাররা সহযোগিতা করে, কারণ আসলে তা ঔপনিবেশিক প্রভুরই শাসন; কিন্তু সেই সহযোগিতা কার্যত দায় থেকে উদ্ভূত, বরং সদিচ্ছামূলক সহযোগিতা হবে তখনই, যখন দারোগা পদ বিলুপ্ত হবে। কমিটির জিজ্ঞাসার জবাবে প্রসন্নকুমার বলছেন:

> 259. Under the system, you have proposed could we expect any assistance from the Zumeendars? —I do not think it would give dissatisfaction, and I believe you would obtain as much assistance from the landholders as you do now.

---

[81] *Bengal Police (Bird) Committee 1837-38: Report, appendices and evidence.* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৪

[82] তদেব

> 260. Do they at present give assistance to the Police? —They afford such assistance as they are compelled to, but it is not cordial.[83]

প্রসন্নকুমারের চারদিন পরে ৮ নভেম্বর (১৮৩৭) উক্ত কমিটি দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতামত গ্রহণ করেছিল। সেখানে দ্বারকানাথ গোড়াতেই স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি মনে করেন দারোগা থেকে নীচু তলার পিয়ন— পুলিশি ব্যবস্থায় যুক্ত সকলেই ঘুষখোর, কাঠামোটাই আগাগোড়া দুর্নীতিগ্রস্ত।[84] উপরন্তু, প্রসন্নকুমারের মত দ্বারকানাথও মনে করেন যে, যারা দারোগা পদে আছে তারা সব শ্রেণিগতভাবে হীন ও চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত— "(T)he appointment of the Darogahs taken from such a *low class of people, who have no regard for character*.[85] ফলে, প্রজার ইষ্টসাধনে রত শাসকের সব শুভ ইচ্ছাই 'ভ্রষ্ট' দারোগারা নষ্ট করে দিচ্ছে।[86] ফলে, দ্বারকানাথের কাছে সমগ্র দেশীয় সমাজ ব্যবস্থাটাই কয়েকটি দ্বিত্বের উপরে দাঁড়িয়ে আছে— ঘুষখোর ও সৎ এবং কলকাতা ও মফস্বল:

> 287. Then you divide the whole community into those who give bribes and those who take them? —Yes, I do not know that any man in the Mofusil would hesitate to give a bribe if he could get his business done by it.[87]

কিন্তু, দ্বারকানাথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পুলিশি ব্যবস্থার ঐ 'ব্যর্থতা'র দায় একান্তভাবে দেশীয় দারোগাদেরই, সভ্যতা-বাহক ইউরোপীয়রা সেই অসততায় কিছুমাত্র জড়িত নয়: "278. Do you believe that the European Magistrates connive at the corrupt proceedings you have, stated ? —Not at all."[88]

দারোগাদের দুর্নীতিগ্রস্ততার যে যুক্তিটা শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের প্রতিনিধিরা তুলে ধরেছিলেন তাতে মূলত শ্রেণি ও সম্প্রদায়গত উন্নাসিকতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, সেই দুর্নীতির ভিন্ন একটি কারণ উঠে এসেছিল খোদ দারোগাদের জবানিতে। বার্ড কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিকে কয়েকজন দারেগাকেও ডাকা হয়েছিল এবং ঘটনাচক্রে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মুলমান ও হুগলি জেলার বিভিন্ন থানার দারোগা। সম্ভ্রান্ত বাবুদের আলাদা আলাদা দিনে ডাকা হলেও, সাধারণ দারোগাদের সকলকেই একইদিনে (১৮৩৭-এর ২ নভেম্বর) ডাকা হয়েছিল। ডাক পেয়েছিলেন হুগলি জেলার হরিপাল থানার দারোগা আব্দুল হাকিম খান। তিনি ততদিনে পঁচিশ বছর দারোগার চাকরি করে ফেলেছেন— প্রথম দু-বছর মুর্শিদাবাদে, পরবর্তী তেইশ বছর হুগলিতে। হুগলি জেলার সদর

---

[83] তদেব

[84] তদেব, পৃ. ৩৫। এই প্রসঙ্গটি ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন রোসিঙ্কা চৌধুরী। দ্রষ্টব্য: Rosinka Chaudhuri, *India's First Radicals : Young Bengal and the British Empire* (India : Penguin Random House, 2025), পৃ. ১১৩-১১৪

[85] *Bengal Police (Bird) Committee 1837-38: Report, appendices and evidence.* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬ (নজরটান সংযোজিত)

[86] তদেব

[87] তদেব, পৃ. ৩৭

[88] তদেব, পৃ. ৩৮

থানার দারোগা মৌলভী মুস্তেনানও ততদিনে প্রায় বারো বছর পদাধিকার সামলেছেন। ওয়ালি মহম্মদ ১৮১২ সালে চুঁচুড়া থানায় প্রথম চাকরিতে বহাল হয়ে একটানা পঁচিশ বছর ঐ পদে ছিলেন।[89]

উক্ত তিনজন দারোগার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, সেই সময়ে দারোগার যে ২৫টাকা মাসিক বেতন ছিল তা একেবারেই 'ভদ্র' জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। বিশেষত, যাদের আর কোনো উপার্জনের উৎস নেই, তাদের পক্ষে ঐ বেতনে সাংসারিক ব্যয় সামলানো মুশকিল। আব্দুল হাকিম খান প্রশ্নোত্তরে বলেন: "614. Could you live upon your pay? —Those who have nothing else are obliged to live upon it, but I have, in addition, some small means of my own."[90] কিন্তু, খেয়াল করার বিষয় এই যে, আব্দুল হাকিম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, দুর্নীতি আদতে চারিত্র্যদোষ। সেই দোষ থাকলে হাজার টাকা মাইনে পেলেও দারোগা ঘুষ নেবে। আর সম্মাননীয় চরিত্রের দারোগা যদি যথেষ্ট ও উপযুক্ত বেতন পায় তাহলে দুর্নীতি করবে না।[91] ফলে, পুলিশি ব্যবস্থা উন্নত করতে তাঁর প্রস্তাব ছিল: "I think if *men of good character* were selected and entrusted with criminal jurisdiction in small cases in Thannahs, situated at a distance from the Sudder Station, it would be beneficial for the people.[92]

মৌলভী মুস্তেনানও স্পষ্ট বলেন যে, দারোগার মাইনে পঞ্চাশ টাকা করা উচিত। কিন্তু, দারোগা যদি ভদ্রসন্তান —"*men of respectability*"— না-হয়, তাহলে বেতন যাই হোক সে দুর্নীতি করবেই।[93] ওয়ালি মহম্মদের বয়ানে ভিন্ন মত উঠে এসেছিল। তিনি মূলত, পঁচিশ টাকা বেতনকেই সমস্যার মূল বলে ঠাহর করেছিলেন:

> 638. Can you live on that? —Since the introduction of the new currency there is a reduction of twenty-five annas, we cannot live on it.
> 639. What salary could you live on decently? —*If the salary was fixed at 100 rupees, a Darogah could live with comfort, and not act in any way dishonestly*.
> … 646. Can you suggest any improvements in the Police Departments ? —I think the increase of salary will be beneficial to the Police.[94]

বস্তুতপক্ষে, দারোগাদের মধ্যেও যে স্বরবৈচিত্র্য ও মনোভঙ্গির তারতম্য ছিল, সেই কথাটা কলকাতাবাসী শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের প্রতিনিধিদের সেভাবে মনে আসেনি। সেক্ষেত্রে চারিত্রিক সততার প্রসঙ্গে শ্রেণি ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে দৃষ্টিভঙ্গিগত মিল ও তফাতের বিষয়টি লক্ষণীয়। প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথের চোখে সব দারোগাই ভ্রষ্ট, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মূলত তারা নীচু শ্রেণির লোক। আবার আব্দুল হাকিম নিশ্চয় নিজেকে সেই ঘুষখোর দারোগার

---

[89] তদেব, পৃ. ৯৭-১০০

[90] তদেব, পৃ. ৯৭-৯৮

[91] তদেব

[92] তদেব (নজরটান সংযোজিত)

[93] তদেব, পৃ. ৯৯ (নজরটান সংযোজিত)

[94] তদেব, পৃ. ১০০ (নজরটান সংযোজিত)

দলে ফেলেননি। অথচ, দুর্নীতি যে হয় তা অস্বীকারও করেননি। ফলে, তিনিও ভদ্র চরিত্রের লোকদেরই দারোগা পদে বহাল করার পক্ষপাতী।

ভদ্রলোক হিন্দু বাবু ও মুসলমান দারোগা ছাড়া আরও ভিন্ন সামাজিক বর্গের দু-জন ব্যক্তির জবানি পাওয়া যায় উক্ত কমিটির নথিতে— হুগলির বাসিন্দা দুই জমিদার বাবু ছকু রাম সিং (সাক্ষ্যের তারিখ— ৬ ডিসেম্বর, ১৮৩৭) ও রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সাক্ষ্যের তারিখ— ৯ ডিসেম্বর, ১৮৩৭)। রামনারায়ণের মতে, দারোগাদের মাইনে বাড়িয়ে দিলেই তাদের পক্ষে ভদ্রভাবে জীবন যাপন সম্ভব হবে ও তার ফলে হয়ত দুর্নীতি-প্রবণতা কমে যাবে। দারোগার ভদ্রজন-সুলভ যাপনের জন্য খরচের ফিরিস্তিও দিয়েছেন তিনি:

> The pay of the *Darogahs should also be increased to about 125 rupees a month, which is the least they can respectably live upon*. A Darogah must keep a set of bearers with a palanquin, or a horse, which will cost him from 25 to 30 rupees a month, a khidmutgar upon 4 rupees, and a cook on 4 rupees, his eating expenses must be at least 8 annas a day, being 15 rupees per month, he must also be dressed respectably, and have the means of keeping up a decent appearance.[95]

মফস্বলের জমিদার হিসাবে রামনারায়ণের সঙ্গে কলকাতাবাসী গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বদের স্বরের তফাতটি লক্ষণীয়। রামনারায়ণ এক কথায় দারোগা ব্যবস্থা খারিজ করছেন না, বরং তাদের মনোন্নয়নের একটা ছকের হদিশ দিচ্ছেন। অন্যদিকে বাবু ছকু রামের মতে, কোনো সম্মাননীয় ভদ্রসন্তান পুলিশের দারোগাগিরি করতে যায় না। কারণ, সমাজে দারোগাকে চৌকিদারের থেকে একটু উঁচু নজরে দেখা হয় মাত্র। ফলে, দারোগার মাইনে যদি মাসিক একশ টাকাও করা হয়, তাহলেও ভদ্রসন্তান ঐ চাকরি করতে চাইবে না। তখন বাবু ছকু রামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যদি দারোগাদের মাইনেও বাড়ানো হয়, অবসরের পরে পেনশন দেওয়া হয় এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি ছাড়া তাদের বরখাস্ত না-করা হয়, তাহলেও তাতে লোকে চাকরি করতে প্রলুব্ধ হবে না? জবাবে ছকু রাম বলেন: "I do not think it would, as they are considered by the community a species of head watchmen; but with some trouble perhaps such persons might occasionally be found, *especially Mussulmen*."[96] স্পষ্ট বোঝা যায় দারোগার চাকরির সঙ্গে মুসলমানদের এই যোগের বিষয়টি সম্প্রদায়গত পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিল। ফলে, দারোগা ব্যবস্থার সমালোচনা কেবল প্রশাসনিক বৃত্তে আটকে ছিল না। বরং, দেশীয় সমাজের বৃহত্তর পরিসরে সেই সমালোচনা তা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লক্ষণাত্মক পরিচয়ে পরিণত হয়েছিল।

বস্তুত, দেশীয় দারোগাদের সমালোচনার এই ধারা পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। আলোকপ্রাপ্ত ব্রিটিশ-শাসনের অধীনে দারোগা-কর্তৃক পদাধিকার ও ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত অসততা যে কাম্য নয়, তা নিয়ে ১৮৪০-এর দশকেও কথাবার্তা চালু ছিল। প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথের ঐ বক্তব্যের কয়েক বছর পরে হিন্দু কলেজে ডিরোজিও শিষ্যগোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (Society for the Acquisition of General

---

[95] তদেব, পৃ. ১০৯-১১০ (নজরটান সংযোজিত)

[96] তদেব, পৃ. ১০১-১০২ (নজরটান সংযোজিত)

Knowledge)-র এক অধিবেশনে (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৩) বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন প্রসঙ্গের খেই ধরে দারোগা ব্যবস্থার কথা উঠে এসেছিল।[97] সেখানে দক্ষিণারঞ্জনও ঔপনিবেশিক শাসনের 'আলো'র নীচে অত্যাচার ও দুর্নীতির আখড়া দারোগা ব্যবস্থার 'অন্ধকার' নিয়ে কথা বলেছিলেন।[98] এইভাবেই, ১৮৩০-'৪০-এর দশক থেকেই শিক্ষিত ভদ্রলোকের জবানিতে দারোগারা হয়ে উঠল দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা, লোভী, শোষক, অত্যাচারী; এবং প্রধানত মুসলমান। জীবিকা হিসাবে দারোগাগিরি 'ছোটলোকের যোগ্য' বলে ঘোষিত হতে থাকল। তাতে উপার্জন ভালোই। উপরি পাওনা আরও সরেস, এবং রোয়াব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। ফলে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বিভিন্ন গোত্রের লেখাপত্রে স্পষ্ট হয় যে, শিক্ষিত ভদ্রলোক দারোগাকে অস্বীকার করতে না-পারলেও সমালোচনা করছে।

ভদ্রলোক না দারোগা? : দারোগা চরিত্রের সাহিত্যগত প্রতিচ্ছবি

ক্রমে নকশা ও প্রহসন জাতীয় সাহিত্যে দারোগা ও ভদ্রলোককে দুটি পরস্পর-বিরোধী পরিচয় হিসাবে তুলে ধরে দারোগার সমালোচনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬১); সচিত্র গুলজারনগর (১২৭৮ বঙ্গাব্দ); 'দারগা মশাই' প্রহসন (১৮৭২) প্রভৃতি লেখাগুলি। হুতোম প্যাঁচার নকশা-র প্রথম ভাগের প্রথম রচনাটি "চড়ক"। সেখানে হুতোম লিখছেন:

> পুলিষের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট, পরিপূর্ণ—… অনেকের মনের মত হয় নাই বলে… মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেছেন, কাল সকালেই এক জন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন—…[99]

হুতোমের অনুসরণে সমকালীন সমাজ-শাসন-সংস্কৃতির সমালোচনা করতে গিয়ে 'ভাঁড়' নামের আড়ালে ঔপনিবেশিক প্রভু ও প্রজার বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরে হিন্দু কলেজের ছাত্র (যদিও পুরো পাঠ শেষ করতে পারেননি)

---

[97] দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ জানিয়েছেন আলোচ্য প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল "Present condition of the East India Company's Courts of Judicature and Police under the Bengal Presidency". সেই প্রবন্ধপাঠ-সভার বিস্তারিত বর্ণনাসহ একটি প্রতিবেদন ১৮৪৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় ছাপা হয়। মন্মথনাথের বর্ণনা ও বেঙ্গল হরকরার প্রতিবেদনের জন্য দ্রষ্টব্য: মন্মথনাথ ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, (কলিকাতা: ১৩২৪ বঙ্গাব্দ), ৬৯-৭৫ এবং Gautam Chattopadhyay (Ed.), *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century (Selected Documents)* Vol.1 (Calcutta: Progressive Publishers,1956), পৃ. ৩৮৯-৪০০। সম্প্রতি, এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গটি ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিতে বিশদে আলোচনা করেছেন রোসিঙ্কা চৌধুরী। দ্রষ্টব্য: Rosinka Chaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১২৬

[98] দক্ষিণারঞ্জনের ঐ প্রবন্ধ পাঠ নিয়ে উক্ত সভায় রীতিমত বিতর্ক বেধে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছিল। সেই পুরো বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: মন্মথনাথ ঘোষ, প্রাগুক্ত; Gautam Chattopadhyay (Ed.), প্রাগুক্ত এবং Rosinka Chaudhuri, প্রাগুক্ত

[99] অরুণ নাগ (সম্পাদিত), সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা (কলকাতা: আনন্দ, ২০১০), পৃ. ৪৬-৪৭। নজরটান সংযোজিত। 'নিরীহ ভদ্র সন্তান' বিশেষণের প্রয়োগে হুতোম 'ভদ্রলোক'-এর চোখে দারোগা, জমাদারের সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

হাটখোলার কেদারনাথ দত্ত লেখেন সচিত্র গুলজারনগর (১২৭৮ বঙ্গাব্দ)। সেই নকশার দশম পরিচ্ছদের শিরোনামই "পুলিশ"। সেখানে কেদারনাথ শুরুয়াদেই স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন:

> স্থাবরজঙ্গমে যত বিকটাকার ও ভয়ানক জীব কি ভয়ানক বস্তু আছে, পুরাণে নরকের যেরূপ ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা আছে, পুলিশ তাদের সমান ভয়ানক স্থল। এর নামে ঠেঁটাম, অতিবুদ্ধি, লুকাচুরি, ও ধড়ীবাজী বেরিয়ে পড়ে, ভদ্র লোকের পক্ষে পুলিশে হাজির হওয়া মৃত্যুর সমান, সেকেলে বুড়রা সে জন্যে পদেপদে ক্ষতি স্বীকার কোরেও পুলিশে পা দিতেন না। পুলিশের গায়ে যেন যত রকম ভয়ানক জুআচুরি, ঘুষ, বাটপাড়ী, বব্বলেম, গঙ্গাজলি, অবিচার, চোরের ভাল, সাধের দায়, ইতরমি ও অত্যাচার লেখা আছে।[100]

এর পরেই কেদারনাথ শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকের সেই আঁতের কথাটি হাটের মাঝে প্রকাশ করলেন:

> ভদ্রলোকের ১০ টাকা চুরি গেলে তারা প্রমাণ করাতে, আগাগোড়া ঘুষ দিতে, **হাড়ীমুচী ও নেড়ের** পায়ে তেল দিতে, আর না খেয়ে হাজির থেকে, বেশীর ভাগ গলাধাক্কা খেতে, প্রাণান্ত হয়, তাতে বাদী ফেঁসে গেলে (তা প্রায় সহজেই যায়) তাঁর নাকালের শেষ থাকে না।[101]

'হাড়ীমুচী ও নেড়ে' শব্দগুলি খেয়াল করলে বোঝা যাবে, নিচু জাত ও মুসলমানের প্রতি এই ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোকের প্রায় মজ্জাগত বা লক্ষণাত্মক লব্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দারোগা যে কিছুতেই ভদ্রলোক হতে পারে না তা নিয়ে এই শহুরে ভদ্রলোক বর্গ একেবারে নিশ্চিত। আর এই 'হাড়িমুচী ও নেড়ে'র যেখানে আধিপত্য সেখানে যে সভ্যতার বোলচাল ও সংস্কারের চেষ্টা আদতে ভষ্মে ঘি ঢালা তা নিশ্চিত। তাই "যেখানে শামুবাঁদরুর মেলা, যেখানে ভদ্রলোক বাঁদরুর হুকুমেহুকুমে ফিরে চোরের অধম ও হাড়ীর হেঁজ হয়ে থাকেন", সেই নরকসম থানা ও দারোগার সংস্পর্শ "ঘৃণাকর"।[102] সেই ১৮৩০-এর দশকে দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমারদের সময় থেকেই যুক্তিক্রমটা ছিলো ছকে-বাঁধা: মুসলমান ও নীচু জাত থেকেই দারোগা হয় > তারা স্বভাবতই অশিক্ষিত> তাই তাদের ন্যায়-অন্যায় তারতম্যের ভেদ নেই> তাই চারিত্র্যবলহীন সেই লোকগুলি একইসঙ্গে লোভী ও অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ, ভ্রষ্ট। কোথাও দৈবাৎ এর ব্যতিক্রম হলে তা বিস্ময়উদ্রেককর হত। কেদারনাথের প্রণম্য হুতোম স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, হরহরিবাবু গোস্বামীর অপকীর্তির নালিশ রুজু করতে "থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন"। কিন্তু, এখানেই হুতোম থামেননি, একই বাক্যে মোক্ষমভাবে টিপ্পনী কেটেছেন: "দারোগা ভদ্দর লোক ছিলেন"। আর

---

[100] কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়), সচিত্র গুলজারনগর, প্রথম প্রকাশ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ। এই বইটি প্রথম প্রকাশের সময় লেখকের নামের বদলে, 'ভাঁড় সংকলিত' উল্লেখ ছিল। বইটি সম্পর্কে সমকালীন ও পরবর্তীকালের কিছু উল্লেখ-আলোচনায় রচয়িতা হিসাবে কেদারনাথ দত্তের নাম পাওয়া যায়। এখানে বইটির চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়), 'সচিত্র গুলজারনগর', (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৬৫), পৃ. ৯৩ (নজরটান সংযোজিত)

[101] তদেব, ৯৩

[102] তদেব, ৯৩-৯৪

বাক্যের শেষে প্রথম বন্ধনীতে হুতোম স্বীয় অভিজ্ঞতা জুড়ে দিয়েছেন যে, ভদ্রলোক দারোগা অতিবিরল; হুতোমিভাষায়— "(অতি কম পাওয়া যায়)"।[103]

অর্থাৎ, মোটের উপর ভাবটা এমন যে, দারোগার রোয়াব-প্রতিপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু তিনি মোটেই সম্মাননীয় নন। বরং, ক্ষমতাপুষ্ট দারোগা মানেই ভ্রষ্ট, ঘুষ নিতে বদ্ধপরিকর এবং নিরপরাধ লোকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নাজেহাল করতে সিদ্ধহস্ত। তার ওপরে শিক্ষিত ভদ্রলোক-সমালোচক ধরেই নিত যে আর পাঁচটা ভদ্রলোকে দারোগা হতে যায় না, বরং যারা যায় তারা প্রকৃতিগতভাবেই নিষ্ঠুর, অসৎ এবং লোভী। সেই কারণেই দারোগা যদি মুসলমান হত তাহলে অবশ্যম্ভাবী আঙুল উঠত তার ধর্মীয় পরিচয়ের দিকে, সমীকরণটা যেন-বা— মুসলমান = নিষ্ঠুর-লোভী-অসৎ। 'ভদ্রলোক' সমাজের তরফে দেশীয় দারোগাদের সমালোচনার এই ধারা পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। ক্রমে জাতীয়তার চেতনাবাহী গোয়েন্দা গল্পের লেখকরাও ঔপনিবেশিক শাসন ও শাসককে ছাড়পত্র দিয়ে দেশীয় দারোগাদের অসৎ, লোভী, ঔদরিক, অপটু বলে দাগিয়ে দিয়েছে। সেই ছাঁচই দিনেকালে ইন্সপেক্টর ভরদ্বাজ কিংবা সুন্দরবাবুদের বর্গীয় পরিচয় হয়ে উঠেছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পরে লর্ড ক্যানিং ১৮৬০ সালে পুলিশি ব্যবস্থা আমূল সংস্কারের জন্য এইচ. এম. কোর্টের নেতৃত্বে একটি পুলিশ কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে একটি খসড়া বিল তৈরি হয় এবং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৫ নং পুলিশ আইন (*Police Act of 1861*) হিসাবে পাশ হয়। সেই আইন মোতাবেক পুলিশের ক্ষমতা, নিয়োগ ও কার্যকাল সম্পর্কিত নানান নীতি, তদন্ত পদ্ধতি, গোয়েন্দা কার্যকলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন যে, ১৮৬১ সালের ঐ আইন ও তার সাংগঠনিক আকার বস্তুতপক্ষে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিকল্পের কাজ করেছিল।[104] একজন আলোচক খেয়াল করিয়েছেন, বাস্তব জীবনে পুলিশ হিসাবে কর্মরত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ডিটেকটিভ পুলিস (১৮৮৭) বইটি বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এমনকী সমকালীন মান্য পত্রিকাতে বইটির সপ্রশংস পাঠ প্রতিক্রিয়াও ছাপা হয়েছিল।[105] কিন্তু, সার্বিকভাবে দেশীয় দারোগার যে অসৎ, নিষ্ঠুর ও উৎকোচ-গ্রহণে উৎসাহী ছাঁচটি সমাজে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে খবরের কাগজ থেকে উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সবেতেই বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকের ঐকমত্য প্রকট।

---

[103] অরুণ নাগ (সম্পাদিত), সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, প্রাগুক্ত, ৮৬-৮৭

[104] ইংরেজি ও বাংলায় বেশ কয়েকটি এমন বই প্রকাশ পায় যাকে police procedures বলা যেতে পারে। সুকুমার সেন একধরণের আখ্যানগুলিকে 'ফাঁড়িদারোগা' ও 'থানাপুলিশ' জাতীয় রচনা বলে অভিহিত করেছেন। সেগুলিতে মূলত কোনো দারোগা বা পুলিশ-ডিটেকটিভ কীভাবে অপরাধী নির্ণয় করে তাকে পাকড়াও করছেন তারই বর্ণনা আছে। পরবর্তীকালে মেধাজীবী শখের গোয়েন্দাদের কীর্তি গল্পের আকারে বলার যে ধাঁচ তৈরি হবে তার থেকে এগুলি আলাদা। এগুলিতে স্বয়ং দারোগা বা পুলিশ-ডিটেকটিভ তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেই ব্যক্ত করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। ইংরেজিতে লেখা *The Confession of Meajahn, Daroga of Police* (১৮৬৯), *Every Man His Own Detective* (১৮৮৭) কিংবা বাংলায় লেখা সেকালের দারোগার কাহিনী (১৮৮৮), দারোগার দপ্তর (১৮৯২), বাঁকাউল্লার দপ্তর (আনু. ১৮৯৬), ইত্যাদি বইগুলি সেই গোত্রের। দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৭২

[105] ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি *Indian Mirror* পত্রিকায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ডিটেকটিভ পুলিস প্রসংশিত হয়েছিল: "We have also read with attention another book composed by the same author, and styled. '*Detective Police*'. The book has also been written by following the story of a man who was actually tried by the High Court of Calcutta on the most serious charges and is up to date undergoing the term of punishment in the criminal jail of Alipore." দ্রষ্টব্য "রোমাঞ্চন", পাঁচকড়ি দে রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), (কলকাতা: করুণা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪

একটি পেশায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে তারতম্যহীন অনড় পরিচয়ে দাগিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়া বারেবারে বিভিন্ন গোত্রের আখ্যানে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) রজনী (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) ও কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) — উপন্যাস দুটিতে দারোগা ও ডিটেকটিভ চরিত্রের আমদানি করেছেন। উভয়ক্ষেত্রেই মনোভাব কটূব্যঙ্গাত্মক ও সমালোচনামূলক। রজনী-র দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় কাশীতে অমরনাথ ও গোবিন্দকান্তের আলাপের বিষয় 'পুলিসের অত্যাচার'। সেখানে হাজির বাকিরাও তাতে যোগ দিলে পরে পুলিশের বিষয়ে নানা বাস্তব-অবাস্তব কথা চলতে থাকে। গোবিন্দকান্তের জবানিতে দারোগার অত্যাচারের বিস্তারিত আখ্যান পেশ করেছেন বঙ্কিম। "দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয়' এসেই মৃতের 'ঘটী বাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন"। তারপরে কিছু না-বুঝেই নিরপরাধ "গোবিন্দকান্তকে আসামি ঠাহর করে চালান দেওয়ার উদ্যোগ" নিলে বাধ্যত "গোবিন্দকান্ত সমস্ত গয়না "দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে" অর্পণ করে উপরন্তু পঞ্চাশটাকা নগদ জরিমানা দিয়ে নিষ্কৃতি পায়"। হরেকৃষ্ণর মেয়েকে ঠকিয়ে "বলা বাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন"।[106] দারোগা যে স্বভাবতই দুর্নীতিপরায়ণ তা বোঝানোর জন্যই 'বলা বাহুল্য' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে সরাসরি দারোগা ও পুলিশ-গোয়েন্দা— উভয়ের দেখা পাওয়া যায়। আখ্যানের দ্বিতীয় খণ্ডে রোহিণীর দিকে পিস্তল তাক করে ফেরার হয়ে যায় গোবিন্দলাল। সেই রাতেই থানায় খবর যায় "প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে"। পরদিন সকালে দারোগা হাজির। প্রথমিক কর্তব্য করে, স্নান-ভোজন সেরে যখন তিনি নিশ্চিন্তে অপরাধীর খোঁজ করেন, ততক্ষণে গোবিন্দলাল বহুদূরে। একে-তাকে জেরা করেও যখন গোবিন্দলালের হদিশ পাওয়া গেল না, তখন দারোগা "আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন"। কিন্তু, তদন্ত চাপা পড়ল না। যশোহর থেকে "সুদক্ষ ডিটেকটিব ইন্সপেক্টর" ফিচেল খাঁ হাজির হল।[107] ডিটেকটিভ নানা চেষ্টা করে, ছদ্মবেশে ঘুরে-বেড়িয়েও গোবিন্দলালের হদিশ পেল না।

প্রাথমিকভাবে ব্যর্থ ফিচেল কয়েক বছর পরে বৈরাগীর ছদ্মবেশে বৃন্দাবনবাসী গোবিন্দলালকে পাকড়াও করে যশোহরে নিয়ে গেল বিচার জন্য। কিন্তু জবরদস্ত সাক্ষীর অভাবে ফিচেল নগদ ঘুষ দিয়ে তিনজন জাল সাক্ষী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করে। শেষ পর্যন্ত উচ্চতর আদালতে জাল সাক্ষীরা আরও বেশি টাকার লোভে জজের সামনে তাদের কুকর্ম স্বীকার করে এবং ফিচেলের থেকে টাকা নেওয়ার কথা বেমালুম চেপে গিয়ে তারা বলে ফিচেল মারধর করে তাদের দিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দিইয়েছিল। তার ফলে— "..জজ সাহেব.. ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাবেহকে উপদেশ করিলেন।"[108]

---

[106] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রজনী, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত) (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১৭), পৃ. ৪৪৭

[107] 'ফিচেল' শব্দটির মধ্যে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রতিফলিত তা লক্ষণীয়। উপরন্তু, সে মুসলমান! একেবারে আর্কিটাইপ বা আদর্শ ছাঁচ।

[108] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭-৫৪১

বঙ্কিমী-ভাষ্যে দারোগা স্বভাবতই দুর্নীতিপরায়ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) একদিকে সিভিল সার্ভেন্ট এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী সংস্কারক। ফলে, দারোগা-ব্যবস্থার গরমিল নিয়ে তিনিও যে ভাববেন সেটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *The Peasantry of Bengal* রচনায় রমেশচন্দ্র স্মরণ করেছেন সেই সদ্য-বিগত অতীতকে যখন দারোগার অত্যাচারে সকলে তটস্থ থাকত।[109] সেই পীড়নমূলক ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে ১৮৬১ সালের অ্যাক্ট ফাইভ প্রবর্তিত হয়। কিন্তু সেই আইন জারি হওয়ার প্রায় দেড় দশক পরে রমেশচন্দ্র সখেদে লিখছেন জমাদাররাতো দুর্নীতিমগ্ন বটেই এমনকী ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টরদের মধ্যেও সৎ ব্যক্তি বিরল ("among inspectors and sub-inspectors *an honest man is an exception*")।[110]

এখন প্রশ্ন হলো এই অধোগতির কারণ কী? রমেশচন্দ্রের স্পষ্ট মত এই যে, একজন ব্যক্তির সততা নানান পরিস্থিতির উপরে নির্ভরশীল, কিন্তু একটি গোষ্ঠীর সততা সবসময়েই প্রলোভনের ব্যস্তানুপাতিক। যত বেশি লোভ দেখানো হবে ততই অসততা বাড়তে থাকবে। আর পুলিশি ব্যবস্থায় অসৎ কর্মচারীকে ধরার, শাস্তি দেওয়ার কোনো সম্ভাবনাই কার্যকর নয় বলে সকলেই ক্ষমতার জোরে যত বেশি সম্ভব দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এই ঘুণ-লাগা ব্যবস্থার সংস্কারে দত্ত-দাওয়াই স্পষ্ট। তা হলো, জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ তুলে দিয়ে সেই দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হোক ইন্সপেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের অধঃস্তন ও কেরানিদের মধ্যে। আর সবশেষে পুলিশদের ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে নিয়ে এসে কার্যত পুলিশ ও বিচার বিভাগ এক করে দেওয়া হোক, যাতে আদতে প্রতি দুয়ারে আদালত এসে দাঁড়ায় এবং লোকে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ন্যায় বিচার লাভ করে।[111]

অর্থাৎ, দেশীয় লোকের দুর্নীতি রুখতে ব্রিটিশ সভ্যতার গৌরববাহী আইনের শাসনে আস্থা রাখছেন রমেশচন্দ্র দত্ত, যিনি স্পষ্টতই ওয়াকিবহাল যে ঔপনিবেশিক শাসন কার্যত ভারতীয় অর্থনীতির হাঁড়ির হাল করে ছেড়েছে। তবুও, কোনো এক আদর্শায়িত ব্রিটিশ সুশাসনের প্রতি শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোকের অনড় আস্থা বারেবারেই দারোগা-পুলিশি-ব্যবস্থার সমালোচনার তলেতলে উঁকি দিয়ে যায়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনে উঁচুপদাধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র প্রমুখের অবস্থান এখানে স্পষ্ট। আখ্যানের বয়ানে, দারোগার হালচাল বর্ণনায় বা গোয়েন্দার নাম বাছার ক্ষেত্রে সর্বত্র বঙ্কিম যেমন শ্রেণিগত ও সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক-সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তেমনই রমেশচন্দ্রের বিশ্লেষণ ও বিশেষত দারোগার পরিবর্তে ম্যাজিস্ট্রেটের উপরে দায়ভার অর্পণ করার প্রস্তাব যেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ধারা বহন করেছে। বস্তুত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কিংবা রমেশচন্দ্র দত্ত— ১৮৩০-এর দশকে থেকে পরবর্তী চার দশকে ঔপনিবেশিক

---

[109] "Time was when the police of Bengal was the dread of the land, when a dacoity was doubly dreaded because a police investigation was to follow; and up to the present day the traditions of Bengal are replete with police oppression remembrances." Romesh Chunder Dutt, *The Peasantry of Bengal* (Calcutta : Thacker, Spink & Co. & London : Trübner & Co., 1874), পৃ. ১০৬

[110] তদেব। নজরটান সংযোজিত। প্রসঙ্গত, হুতোমের "ভদ্দরলোক", বঙ্কিমের "বলা বাহুল্য" এবং রমেশচন্দ্রর "exception" প্রয়োগগুলি যেন একে অন্যের তরজমা।

[111] তদেব, পৃ. ১০৬-১১০

শাসকের প্রতি এই বর্গের মনোভাব বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। বস্তুত, জাতীয়তাবাদী গণ-রাজনীতির আবির্ভাবের আগে এই বর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক প্রচলিত ছিল। এমনকী জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরেও— তথাকথিত নরমপন্থী পর্ব— ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়।

১৮৭৫-এর সোমপ্রকাশ-এর একটি প্রতিবেদন দেখে মনে যেন কার্যত রমেশচন্দ্রর বক্তব্যের তরজমা।[112] ভারত সংস্কারক হোক কিংবা হিন্দু রঞ্জিকা রাজনৈতিক অবস্থান ও মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য থাকলেও পত্রিকাগুলি এক বিষয়ে সহমত— দারোগারা অসাধুতা করতে পটু এবং এই পেশায় গুটিকয় শিক্ষিত, সুভদ্র মানুষ আছেন আর ভালো লোকেও এই পেশার পাকেচক্রে অসৎ হয়ে যায়। মূলত অশিক্ষিত মুসলমান ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণি তথা নীচু জাতের লোকেরাই দারোগা হয় এবং তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য রোজগার ও পদোন্নতি।[113] বার্ড কমিটির সামনে বাবু প্রসন্নকুমার-প্রদত্ত বয়ানের সঙ্গে চার দশক পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের বর্ণনা কিংবা এই পত্রিকা-প্রতিবেদনগুলির বয়ানের তুলনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায়, স্বদেশীয় কিন্তু প্রধানত মুসলমান ও নীচু জাত-অধ্যুষিত সাংস্কৃতিক-কৌলীন্যহীন দারোগা ও গোয়েন্দা সম্পর্কে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐকমত্য। বাস্তবে ব্যক্তি দারোগার দুর্নীতি এভাবেই একটি সম্প্রদায়ের অনড় পরিচয়ে পরিণত হয়েছিল।

দারোগা-ব্যবস্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে মুসলমান জনসমাজের প্রতি এই একতরফা কটুকাটব্যের উল্টোদিকে শিক্ষিত ভদ্র মুসলমান সমাজে ঔপনিবেশিক দারোগার প্রতি মনোভাব ধাঁচ বোঝা যায় যখন জমিদার দর্পণ (১৮৭৩) নাটক এবং বিষাদসিন্ধু উপন্যাস (১ম খণ্ড: ১৮৮৫; ২য় খণ্ড: ১৮৮৭; ৩য় খণ্ড: ১৮৯১) প্রভৃতির লেখক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭/১৮৪৮-১৯১১) লেখেন যে, ভদ্র মুসলমান সমাজ দারোগার দফতরকে মোটেই অবজ্ঞার চোখে দেখত না। বরং, তাদের কাছে ঔপনিবেশিক চাকরি/ক্ষমতার অন্যান্য সুযোগ কমে যাওয়ায় যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার মধ্যে দারোগার পদটি বেশ মনের মতো।[114] নিজের আত্মকথায় মশাররফ হোসেন জানিয়েছেন যে, বিদ্যাশিক্ষা গোড়ার পর্বে লাহিনীপাড়ার কাছেই পাহাড়পুর গ্রামের মুনশি জমিরদ্দীনের কাঁঠে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল। দীর্ঘদেহী উক্ত মুনশি সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল তিনি "হাতে খড়ী দিলে তাহার দরোগাগিরী চাকুরী না পাওয়া যায় না"।[115] এখন প্রশ্ন এই যে, মশাররফ হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গি কি সমস্ত মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে? এই উত্তর— অবশ্যই না। কিন্তু, তাঁর মতামত পুরো খারিজ করাও যায় না। কারণ, অনেক উচ্চবর্গের মুসলমানের

---

[112] প্রতিবেদনটির জন্য দ্রষ্টব্য: প্রতিভা বিশ্বাস, হুজুর দর্পণ (কলিকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০), পৃ. ১৫

[113] তদেব, পৃ. ১৪৮-১৫০

[114] মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : মুনসী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৭

[115] তদেব, পৃ. ৯১-৯২। প্রসঙ্গত, এমনই এক মুন্সীসাহেবের কথা বাঁকাউল্লাও বলেছেন। দ্রষ্টব্য: সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), বাঁকাউল্লার দপ্তর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির আদত উৎসই ছিলো দারোগাগিরি। কিছুটা সেই কারণেই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দারোগা ব্যবস্থার সমালোচক এবং ঐ পদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে থাকে।

এই পর্বের মুসলমান দারোগারা কেউ আত্মজীবনী বা তাঁদের অভিজ্ঞতা লিখেছেন কিনা তা এখনও অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু, প্রসঙ্গত সহজলভ্য দুটি রচনার কথা বলা যেতে পারে। দুটি বইয়েরই লেখক পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও অন্তত ছাপার হরফে সেগুলি দুইজন মুসলমান দারোগা-পুলিশের জবানি বলে পরিচিত— মিয়াজান দারোগার একরারনামা এবং বাঁকাউল্লার দপ্তর। মিয়াজান দারোগার স্বীকারোক্তি আদতে ইংরেজিতে ছাপা বই, নাম— *The Confession of Meajahn, Daroga of Police Dictated by him and Translated by a Mofussilite.* ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার স্ট্রিটের Whyman & Co. Publishers বের করেছিল সেই বই। আখ্যান থেকে মনে হয় প্রকাশকালের প্রায় তিন দশক আগের অর্থাৎ ১৮৩০-এর পরবর্তী সময়ের কথা সেখানে বলা হয়েছে। বাঁকাউল্লার নামে প্রকাশিত বইটিও নিশ্চিত কবে প্রথম প্রকাশিত হয় তা জানা যায় না। তবে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুসারে বইটির প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৭ নম্বর ঈশ্বর মিল লেনের নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার প্রকাশক। বইটিতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা প্রায় মিয়াজানের আখ্যানের সমসাময়িক— ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় পুলিশি-ব্যবস্থার গোড়ার আমল। এই দুইটি আখ্যানের একটি মূল ধরতাই আছে, তা হলো মুসলমান দারোগার দৃষ্টিভঙ্গি। এই দারোগাদের ভদ্রলোক হওয়ার বাসনা ও দায় নেই। তারা নিজেদের ভদ্রলোক প্রতিপন্ন করার বদলে আখের গুছিয়ে ইহকালে ভাল থাকতেই চায়।

মিয়াজান গোড়াতেই স্পষ্ট বলেছেন তিনি চাষার সন্তান, লেখাপড়ার বিশেষ তালিম নেই, তবে দস্তখত করতে পারেন আর দেখতে-শুনতে চালাক-চতুর। ঘটনাচক্রে তাঁর এক সুন্দরী বোনের বিয়ে হয় জেলার কালেক্টর সাহেবের আর্দালি পিওনের সঙ্গে। কিন্তু ক্রমে কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সেই বোনের গূঢ় অন্তরঙ্গতার ফেরফারে মিয়াজানের কপাল গেলো খুলে। কালেক্টরের মেহেরবানিতে মিয়াজান ক্রমে দারোগা বনে যান। জবানবন্দিতে মিয়াজান জানিয়েছেন দারোগার হরেকিসিম উপরি রোজগারের ফন্দিফিকির। কিন্তু, সে জন্য মিয়াজান লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নন। তাঁর কাছে এসবই দারোগা পদমর্যাদার আনুষঙ্গিক বিষয়। সেই পদমর্যাদা যতদিন আছে ততদিন তার সুযোগ না-নিয়ে নৈতিকতার যুক্তি দেওয়া মিয়াজানের কাছে বেকুবি, কারণ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, লক্ষ্মী যে চঞ্চলা। মুরুব্বির আশ্রয় সরে যাওয়ার ফলে মিয়াজানের বোলবোলাও একদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। শেষ জীবনে তাঁর দিন কাটত আল্লার নাম করে, মক্কায় তীর্থভ্রমণে।[116]

অন্যদিকে, বাঁকাউল্লার বয়ান অবশ্য কোনো একরারনামা নয়। তিনি নিজের ও সহকর্মীদের রোমাঞ্চকর অতীত অভিজ্ঞতার ঝাঁপি পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন। লোকে সে-কথা আগ্রহভরে তো শোনেই, উপরন্তু বাঁকাউল্লার মনে হয় পুলিশের লোকেও সেসব আখ্যান শুনলে তাদের হুনুর বৃদ্ধি পাবে। মশাররফ হোসেন যেমন

---

[116] অরিন্দম দাশগুপ্ত (অনুবাদক), মিয়াজান দারোগার একরারনামা (কলকাতা : চর্চাপদ, ২০০৯)

মুনশি জমিরদ্দীনের কথা লিখেছেন, তেমনই বাঁকাউল্লার দাবি হলো ঠগি-দমনের জন্য কমিশনর স্লিম্যান হরেক মাদ্রাসায় ঘুরে ঘুরে উপযুক্ত লোক বাছাই করতেন— "একটু বনেদি বড়োলোকের চালাক ছেলে পাইলেই, — কমিস্যনর বাহাদুর তাহাদিগকে দারগাগিরি দেবেন"।[117] এখানে চাষির-ছেলে-প্রায়-নিরক্ষর মিয়াজানের সঙ্গে বাঁকাউল্লার অবস্থানগত পার্থক্য খেয়াল করার মতো। বরং মীর মশাররফ হোসেন যাঁদের কথা বলেছেন বাঁকাউল্লা অনেকটা তাঁদের সমগোত্রীয়।[118] তাই মিয়াজানের তথাকথিত নির্লজ্জ স্বীকারোক্তির থেকে বাঁকাউল্লার বয়ান কিছুটা আলাদা। কিন্তু, বয়ানের সুরগত পার্থক্য ছাড়া দারোগা পদের আনুষঙ্গিক প্রতিপত্তি ও উপরি রোজগার বিষয়ে মিয়াজানের মতোই বাঁকাউল্লা সমান সচেতন— "কোম্পানির শাসনাধীন দারগাগিরি বড় হইতেও বড় পদ। হাকিমত্ব হাকিম হইতেও অধিক। কি খ্যাতি প্রতিপত্তিতে, কি শাসনে জুলুমে, মানে সম্ভ্রমে থানার দারগা জেলার বড় হাকিম হইতেও বড়।"[119] বাঁকাউল্লার মতো 'চালাক চতুর ছোকরা'র জন্য 'এ বড় সুসময়'। দারোগার উপরি আয় নিয়ে অভিযোগের সারবত্তা বাঁকাউল্লাও মেনে নিয়েছেন— "মানে সম্ভ্রমে বা ক্ষমতা প্রতিপত্তিতে এ পদটি যে অদ্বিতীয়, তারা দেশের বালবাচ্ছা সকলেই জানে; পয়সাও প্রচুর। ঘুষ-ঘাসের একটা সত্য মিথ্যাময় অপবাদ পুলিশের চরিত্রে চিরদিনই আছে সত্য, তথাপি সৎ পথেও পয়সার অভাব ছিল না।"[120]

চৌহারা হাফেজ শেষ করে সরিফের তাবৎ বয়েৎ কণ্ঠস্থ করা বিশ-পেরোনো যুবক বাঁকাউল্লার মধ্যে দারোগার ন্যায়সংগত আয় ও দুর্নীতির উপার্জন নিয়ে যে নৈতিক দ্বন্দ্বের রেশ দেখা যায় মিয়াজানের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তার মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার কোনো ফুরসত নেই। খেয়াল করার বিষয়, প্রায়-নিরক্ষর কৃষক-সন্তান মিয়াজানের ক্ষমতার ভিত্তি যেখানে তার সুন্দরী বোনের সঙ্গে ক্ষমতাবান উচ্চপদস্থ সাহেবের বিশেষ সম্পর্ক, সেখানে বাঁকাউল্লার সাফল্যের ভিত্তি তার শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা। মুসলমান সমাজে দারোগাবৃত্তির প্রতি ঔৎসুক্য থাকলেও মনোভঙ্গির বিচিত্রতা ছিল। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকের চোখে সেই বৈচিত্র্য ধরা দেয়নি, বরং তাদের লেখায় কেবলই এক 'অত্যাচারী', 'অসৎ', 'অশিক্ষিত' মুসলমান দারোগার প্রতিরূপ ফুটে উঠেছিল।

এবারে উপর্যুক্ত রচনাদুটির লেখক-পরিচয় নিয়ে একটু বিস্তারে আলোচনা করা দরকার। মিয়াজান কিংবা বাঁকাউল্লার বক্তব্যে যে একধরনের সাযুজ্য আছে, তা সহজেই নজরে পড়ে। এই রচনাগুলির লেখক প্রকৃতই কি উল্লিখিত ব্যক্তিরা, নাকি অন্য কেউ এঁদের নামের আড়ালে নিজেদের মত-অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন?[121] প্রসঙ্গত

---

[117] সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), বাঁকাউল্লার দপ্তর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[118] মীর মশাররফ হোসেনের শিক্ষক জমীরউদ্দিনের মতই বাঁকাউল্লার শিক্ষক মুন্সিসাহেবের মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি-উর্দুপাঠরত ছাত্রদের মধ্য থেকে দারোগা পদে যোগদানের বিষয়টি লক্ষণীয়। বাঁকাউল্লার শিক্ষক জেলার মীরমুন্সী পদাধিকারী ছিলেন, সেই আমলে আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় ও ইসলামি শাস্ত্রে অধিকারী মাদ্রাসা-শিক্ষকদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সংযোগের বিষয়টিও খেয়াল করার মত।

[119] সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), বাঁকাউল্লার দপ্তর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[120] তদেব, পৃ. ২০-২১

[121] মিঞাজান নামের এক ব্যক্তির উল্লেখ প্যারীচাঁদ মিত্রর লেখাতেও পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন রোসিঙ্কা চৌধুরি। হতে পারে, মুসলমান সমাজে চলতি নাম হিসাবে সেটি প্রচলিত ছিল। বিশেষত 'মিঞা' শব্দটি মুসলমান ব্যক্তির লক্ষণাত্মক। প্যারীচাঁদের প্রবন্ধটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Rosinka Chaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩১

উল্লেখ্য, মিয়াজান ও বাঁকাউল্লার বক্তব্যের সঙ্গে বার্ড কমিটির প্রতিবেদনের মিল নজরে পড়ার মত। উভয় ক্ষেত্রেই দারোগারা যেভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, জনগণকে সন্ত্রস্ত করে ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয় তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, মিয়াজান বা বাঁকাউল্লা কেউই ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচক নন। বরং, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনে উভয়েই তৎপর। তাছাড়া এই জাতীয় রচনার মধ্যে যে একধরনের আপাত আত্মসমালোচনার সুর আছে, সেটিও লক্ষণীয়। যদি মিয়াজান কিংবা বাঁকাউল্লা চরিত্রগুলি কাল্পনিক হয়, তাহলে আত্মসমালোচনার ছদ্মবেশে দারোগা ব্যবস্থার বিচ্যুতিগুলির দিকে নজরটান দেওয়াই ঐজাতীয় রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই কাজে আড়ালে থেকে সমালোচনা করার জন্য মিয়াজান কিংবা বাঁকাউল্লার মত চরিত্র সৃষ্টি করা ছিল দরকারি। তাদের উদাহরণ সামনে রেখে ভবিষ্যত দারোগাদের কী করণীয় তারই একরকমের সহজলভ্য পাঠ দেওয়া হয়েছে এই রচনাগুলিতে। তাই এমনটাও হতে পারে যে, মুসলমান-অধ্যুষিত দারোগা ব্যবস্থার প্রবল সমালোচক কোনো শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক উচ্চপদস্থ সংস্কারক-লেখক মুসলমান দারোগার নামের আড়ালে থেকে গেছেন।

মিয়াজান দারোগার একরারনামা বইটি মূলতঃ ইংরেজিতে রচিত। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী বইটির নাম : *The Confession of Meajahn, Daroga of Police, dictated by him, and translated by a Moffussilite*. বইটির স্বত্ত্বাধিকারীর উল্লেখ নেই। ৫, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত বইটির প্রকাশক সংস্থা ছিল কলকাতার ১ এ, হেয়ার স্ট্রিটের মেসার্স ওয়েমান অ্যান্ড কোম্পানি। ঐ ক্যাটালগ অনুসারে ১৪৮ পৃষ্ঠার বইটির প্রথম প্রকাশের তারিখ ১০ এপ্রিল, ১৮৬৯। ঐ বছরের ৭ জুন দ্য হিন্দু পেট্রিয়ট দু-পৃষ্ঠা জুড়ে বইটির আলোচনা ছাপে।[122] বাঁকাউল্লার পরিচয় নিয়ে তুলনায় বেশি বিতর্ক আছে।[123] প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে E. J. Lazarus & Co. থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *The Revelations of an Orderly* নামের একটি বই। লেখক হিসাবে মুদ্রিত ছিল Paunchkouree Khan. মফস্বলি আদালতের দুর্নীতির বিচিত্র হকিকত এই লেখায় ধরা পড়েছিল এবং প্রাথমিকভাবে ১৮৪৯ সালে কয়েক কিস্তিতে লেখাটি বেনারস রেকর্ডার-এ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, প্রশ্ন ছিল কে এই আর্দালি পাঁচকড়ি খান? এক আলোচনায় উক্ত বইটির বঙ্গানুবাদক অরিন্দম দাশগুপ্ত সমকালীন একটি অন্য বইয়ের সূত্র ধরে দেখেছেন যে, পাঁচকড়ি খান ছদ্মনামের আড়ালে আসলে ছিলেন বেনারসের ডেপুটি কালেক্টর জর্জ ওয়েট। ১৮৬৬ সালের আগেও বইটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[124] ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্বোক্ত E. J. Lazarus & Co. বেনারস থেকেই আরেকটি বই প্রকাশ করে যার শিরোনাম *Confessions of a Constable*. বইটির লেখক মিঞা মিঠু খান। বইটি বেনারসের কমিশনরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এবং লেখক বইয়ের মুখবন্ধেই

---

[122] পুরো 'রিভিউ'র জন্য দ্রষ্টব্য: অরিন্দম দাশগুপ্ত (অনুবাদক), মিয়াজান দারোগার একরারনামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৫২।

[123] সেই বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য: "কিসসা বাঁকাউল্লা-কা", সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), বাঁকাউল্লার দপ্তর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫

[124] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: অরিন্দম দাশগুপ্ত (অনূদিত ও সম্পাদিত), আর্দালি পাঁচকড়ি খানের ঝাঁকিদর্শন (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯), সাত-তেরো।

জানিয়েছেন তিনি 'সরকার বাহাদুর'-এর অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রজা এবং তাঁর উদ্দেশ্য পুলিশ ব্যবস্থার অসংগতিগুলি তুলে ধরা। তবে ঐসব অসংগতি-অত্যাচারের দায় কোনওভাবেই ঔপনিবেশিক শাসকের নয়।[125] উপরের সূত্রগুলি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এই জাতীয় স্বীকারোক্তি গোত্রের রচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রচলিত হয়েছিল। সেগুলির প্রকৃত লেখক নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, দুটো বৈশিষ্ট্য খেয়াল করা দরকার— প্রথমত, এই জাতীয় যে চারটি রচনা উল্লিখিত হল তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাপার হরফে নাম আছে একজন মুসলমান ব্যক্তির, যিনি কর্মসূত্র ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত এবং সেহেতু অনেক আঁতের খবর নখদর্পণে। দ্বিতীয়ত, এই লেখকদের বাস্তব পরিচয় নিয়ে সংশয়। বেশ কয়েকটি বিতর্ক থেকে মনে হয়, এই মুসলমান নামগুলির আড়ালে একদিকে যেমন জর্জ ওয়েটের মত ইংরেজ প্রশাসক আছেন তেমনই হয়ত কোনো রচনার পিছনে কোনো ভারতীয় তথা বাঙালী প্রশাসক বা শিক্ষিত ভদ্রলোক— প্যারীচাদ মিত্রের মত কেউ ?— থাকতে পারেন।

খেয়াল করার বিষয় হল, এই গোত্রের রচনাগুলি স্মৃতি-অভিজ্ঞতাধর্মী হলেও আত্মজীবনীমূলক নয়, বিশেষত প্রায় সমকালীন গিরিশচন্দ্র বসু (১৮২৪/১৮২৬-১৮৯৮)-লিখিত সেকালের দারোগার কাহিনী (১৮৮৮) বইটির সঙ্গে তুলনা করলেই মেজাজ ও ধাঁচগত তফাত নজরে পড়বে। কারণ, ততদিনে ভদ্রলোক ও দারোগা এই দুই সত্তা যে দ্বান্দ্বিক তা শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী সমাজে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে, যদি কোনো ভদ্র হিন্দু বাঙালী সন্তান দারোগা বনে যায় তবে তাকে নিজের কাজ-কারবার গ্রহণীয় করে তুলতে হলে কেমন অতিশায়ী যুক্তি হাজির করতে হয় তার প্রকৃষ্ট নমুনা গিরিশচন্দ্র বসুর লেখায় আছে। ১৮৫০ ও '৬০-এর দশকে নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে দারোগা পদে বহাল ছিলেন গিরিশচন্দ্র।[126] তিনি নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন প্রায় তিন দশক পরে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত নবজীবন পত্রিকায় গিরিশচন্দ্রের লেখাটি কিস্তিতে কিস্তিতে প্রায় দু-বছর ধরে ছাপা হয়। দু-বছর পরে ঢাকা থেকে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[127]

গিরিশচন্দ্রের আর্থ-সামাজিক অবস্থান মিয়াজানের থেকে-তো আলাদা বটেই, এমনকী বাঁকাউল্লার সঙ্গেও তার তুলনা হয় না। ডেভিড হেয়ারের স্নেহধন্য গিরিশচন্দ্র হিন্দু কলেজে রামতনু লাহিড়ীর কাছে ইংরেজি শিখেছেন, তিনি পড়াশোনার জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র, আবার কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখের সম্পাদনায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা-ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপত্র প্রকাশ করেছেন।[128] এহেন শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী ভদ্র সন্তান যদি দারোগার পদে বহাল হয় তখন দেখা দেয় মুশকিল। ততদিনে এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, যত দারোগা তার প্রায় সবাই 'অশিক্ষিত', 'ছোটলোক' 'হাড়ীমুচী' কিংবা 'নেড়ে'। আর যদি কোনো ভদ্রসন্তান সেই পথ মাড়ায় তবে সঙ্গদোষে তার

---

[125] ".. therefor, for the acts of oppression recorded in these pages, the *Sarkár bahádúr* is not to blame,.." দ্রষ্টব্য: Miya Mithu Khan, *Confessions of a Constable* (Benaras : E. J. Lazarus & Co., 1875), পৃ. iii-vi (নজরটান মূলে)

[126] ঘটনাচক্রে সেই সময়েই উইলিয়ম জেমস হার্শেলও নদীয়াতে ছিলেন।

[127] গিরিশচন্দ্র বসু, সেকালের দারোগার কাহিনী, অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৩ [১৮৮৮])

[128] "সম্পাদকের ভূমিকা", তদেব, পৃ. ১৬-১৮

উচ্ছন্নে যাওয়া নিশ্চিত। অথচ হিন্দু কলেজের বৃত্তিধারী কায়স্থ-ঘরের ছেলে সেই পথে পা বাড়ালে তাকে কোন বর্গে ফেলা হবে, কোন আদিকল্পের ছাঁচে ঢালা হবে তার জলদি রফা-নিষ্পত্তি করা যায় না। তখন এক নতুন বয়ান হাজির করতে হয়, সেই বয়ান মিয়াজানের স্বীকারোক্তি নয়, বাঁকাউল্লার কিসসাও নয়, সেই বয়ান দস্তুরমতো আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথা।

অর্থাৎ, উনিশ শতকব্যেপে আত্মজীবনীকেন্দ্রিক রচনার যে চল আলোকপ্রাপ্ত সংস্কারমতি শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক সমাজে দেখা যায় তার খোপে পড়ে গেলো গিরিশচন্দ্রের রচনা, সেটা তখন ইতিহাসের উপাদান, যা "ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকদিগের সাহায্যের উদ্দেশে" লেখক বর্ণনা করছেন।[129] হিন্দু কলেজি গিরিশচন্দ্র বইয়ের ভূমিকায় যে যুক্তি হাজির করেছেন তাতে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনা-সম্পর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্তাবগুলির অনুরণন স্পষ্ট।[130] মিয়াজান কিংবা বাঁকাউল্লাদের মত সামাজিক-সাংস্কৃতিক কৌলীন্যহীন দারোগার ভাবী ইতিহাস-নির্মাণ-যজ্ঞের সমিধ-সংগ্রহে সামিল হওয়ার কোনো বাসনা নেই। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন নেশন নির্মাণের উচ্চাবচতার স্থান তখনও নেই। অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের রচনা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক তখন একদিকে ঔপনিবেশিক প্রভুর প্রসাদ-পুষ্ট ও অন্যদিকে নতুন নেশনের স্বপ্নে বিভোর। সেই নেশনের কল্পনায় জাত ও সম্প্রদায়ের পরিচয়ে যারা তথাকথিতভাবে খাটো তাদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। সেই নেশন-কল্পনার চাহিদা এমন একটি উচ্চাবচ কাঠামো যাতে কলির-শাসনে-মাথায়-চড়ে-বসা মুসলমান ও নীচু জাতের ক্ষমতা খর্ব হবে এবং এমন একটি ক্ষমতার ধারা তৈরি হবে, যার শীর্ষে শ্বেতাঙ্গ সাহেব থাকলেও তার অব্যবহিত নীচেই থাকবে ঔপনিবেশিক-প্রসাদপুষ্ট শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোক। গিরিশচন্দ্রের রচনা নবজীবন পত্রিকায় বেরোবার কয়েক বছর আগেই বঙ্কিমচন্দ্রর আনন্দমঠ (১৮৮২) প্রকাশিত হয়েছে।[131] শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকী জাতীয়তাবাদের আগ্রাসী চেহারার ভ্রূণ ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। এহেন পটভূমিতে গিরিশচন্দ্র যে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করবেন— "নীচ জাতীয় লোক দ্বারা ডাকাইতের দল গঠিত হয়। মুসলমান, বাগদি, কাওরা, চণ্ডাল, মুচি এবং গোয়ালারা সাধারণতঃ এই অপকার্য্যে অধিক রত"— এতো স্বতঃসিদ্ধ।[132]

---

[129] তদেব, পৃ. ২

[130] এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধ: "বাঙ্গলার ইতিহাস" (১২৮১ বঙ্গাব্দ) ও "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" (১২৮৭ বঙ্গাব্দ)। দ্রষ্টব্য: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১৭), পৃ. ২৮৫-২৮৭ এবং ২৯০-২৯৩

[131] ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় আনন্দমঠ ছাপা হয়। বই আকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে।

[132] গিরিশচন্দ্র বসু, সেকালের দারোগার কাহিনী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

সুকুমার সেন ইংরেজি ডিটেকটিভের বাংলা প্রতিশব্দ করেছিলেন ‘হুনুর’।[133] কিন্তু, সেই শব্দটি একেবারেই চলেনি। বরং, ডিটেকটিভ শব্দের বাংলা হিসাবে ‘গোয়েন্দা’ শব্দেরই ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। মূল ফারসি ব্যুৎপত্তি হিসাবে অভিধানভেদে বানান ও উচ্চারণগত তারতম্য মাথায় রাখলে গোয়িন্দাহ/ গোয়নদহ/ গোইয়ান্দা প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ‘গোয়েন্দা’ বিশেষ্য পদটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, “গুপ্তচর, পুলিসকে গোপনে অপরাধের ও অপরাধীর সংবাদদাতা”।[134] অর্থাৎ, দারোগার সঙ্গে গোয়েন্দার সংযোগ বিষয়ে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার প্রতিফলন সুবলচন্দ্রের চিন্তায় পড়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ‘গোয়েন্দা’ শব্দের অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে দারোগা বা পুলিশের কথাই তোলেননি। তাঁর কাছে গোয়েন্দা মানে এককথায় “গুপ্তচর”, আর বিশদে বলতে গেলে “আপনাকে অজ্ঞাত রাখিয়া যাহারা অপরের গৃহসন্ধান করে”।[135] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে দাশরথি রায়ের পাঁচালী, বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের রচনা থেকে ‘গোয়েন্দা’ শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন।[136] এসবের থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয় যে, সাহিত্যে শখের গোয়েন্দা চরিত্রগুলি হাজির হওয়ার আগেই দেশীয় সমাজে গোয়েন্দা পেশা সম্পর্কিত ধারণা হামেহাল হাজির ছিলো। কিন্তু, সেই গোয়েন্দা বলতে তিন শাব্দিকই ‘গুপ্তচর’ বুঝিয়েছেন, এবং দরকারে ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে spy লিখেছেন, detective ব্যবহার করেননি। তাহলে কারা ছিল এই গোয়েন্দা?

প্রকৃতপক্ষে, গোয়েন্দা নামে পরিচিত একদল ব্যক্তি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ গোড়া থেকেই বাংলায় ঔপনিবেশিক পুলিশি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। থানার সঙ্গে জড়িত থাকত তিন ধরনের খবর সরবরাহকারীর দল, যাদের থেকে দারোগা অপরাধ সম্পর্কিত তথ্যাদি পেতো— চৌকিদার, বরকন্দাজ ও গোয়েন্দা। তবে, এদের কারোরই নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সুনাম ছিল না। পেশাগতভাবে গোয়েন্দারা আনাচ-কানাচ ঘুরে অপরাধ ও অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত ও তথ্যই যেহেতু তাদের মূলধন তাই সেই তথ্য সরবরাহ করেই জীবিকা উপার্জন করত। দারোগাদের সঙ্গে খাতিরই ছিলো গোয়েন্দা হিসাবে যুক্ত থাকার চাবিকাঠি। কখনও-বা ম্যাজিস্ট্রেটের কৃপাধন্য গোয়েন্দার হাতে তুলে দেওয়া হতো গ্রেফতারি পরোয়ানা। কিন্তু, গোয়েন্দার বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ ছিলো। প্রসঙ্গত বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসকের বিভিন্ন প্রতিবেদনেও গোয়েন্দা পেশায় যুক্ত লোকেদের দুর্নীতির কথা আলোচিত হতো।[137]

---

[133] সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১,৩৩,৪৭ ইত্যাদি

[134] সুবলচন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, সপ্তম সংস্করণ (কলিকাতা : নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৩৬ [১৯০৬]), পৃ. ৪৮২

[135] জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (এলাহাবাদ : ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫২৭

[136] “গোই(য়ে)ন্দা [ফারসি গোইন্‌দহ্‌] গুপ্তভাবে সন্ধান লওয়ার নিমিত্ত নিযুক্ত ব্যক্তি; গুপ্তচর (spy)”। দ্রষ্টব্য: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড (নিউ দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৬), পৃ. ৮১৪

[137] Chandak Sengoopta, *Imprint of the Raj: How fingerprinting was born in colonial India,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

বিবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও গোয়েন্দা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক পুলিশ-প্রশাসনের ছত্রছায়ায় প্রসারিত হতে থাকে। এমনকী দুই কিসিমের গোয়েন্দার কথাও পাওয়া যায়— একদল ক্ষণস্থায়ী, তারা কখনও-কখনও খবর এনে দেয়; অন্যদল পেশাগতভাবেই সর্বক্ষণের গোয়েন্দা। দ্বিতীয় ভাগে যারা পড়ে তারাই ঔপনিবেশিক কর্তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কোথাও অপরাধ ঘটলে বিশেষত ডাকাতি হলে এই পেশাগত গোয়েন্দারাই হাজির হতো এবং নিজের কাঁধে মামলা সমাধানের দায়িত্ব নিয়ে অপরাধীকে দোষ কবুল করানোর ফিকির ভাঁজতো। তবে, দুর্নীতির প্যাঁচ এখানেই ছিলো। গোয়েন্দা আসল দোষীর নাম জানতে পারলেই তার কাছে হাজির হতো। শুরু হতো দর কষা। আদালতি জোয়াল ঘাড়ে নেওয়ার থেকে গোয়েন্দাকে ঘুষ গিয়ে রফা করাই অপরাধীর কাছে উপযুক্ত বিবেচিত হতো। তবে, অপরাধীর যদি ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতা না-থাকতো তখন দারোগার সামনে তথ্য নিয়ে পৌঁছে যেতো গোয়েন্দা। তবে দারোগার বখরায় গোয়েন্দা যে ভাগ বসায় সেই কথাটা গোপন ছিলো না। তাই দারোগা ও গোয়েন্দার সম্পর্কে টানাপোড়েন চলতো। দারোগার নামে সদরের কর্তাদের কাছে গোয়েন্দার তরফে নালিশ রুজু করার তথ্যও পাওয়া যায়। আবার টিকটিকিপনা রুখতে দুর্ধর্ষ ডাকাতের হাতে গোয়েন্দা-হত্যার ঘটনাও ঘটতো। অর্থাৎ, মোটের উপর ঔপনিবেশিক পুলিশি-ব্যবস্থায় দারোগার মতোই গোয়েন্দারও ভূমিকা ছিল এবং উভয়েই সমালোচনার পাত্র ছিল।

ঔপনিবেশিক বঙ্গে দারোগার দপ্তর ও ইংল্যান্ডে স্যর ফ্রান্সিস গ্যালটনের *Finger Prints* প্রকাশের বছর সেই ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দেই কলকাতার ১০১, তালতলা লেন থেকে প্রকাশিত হয় বংশ-কৌলীন্যে সুপরিচিত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮২৯-১৯১৪) পুলিস ও লোকরক্ষা।[138] জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস জানাচ্ছেন যে, রামাক্ষয় একদিকে ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, অন্যদিকে কর্মজীবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধীনে ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ পদ পেয়ে বর্ধমান ও নদীয়া জেলার মডেল স্কুলগুলির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এহেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরে আরও পদোন্নতি হয় এবং তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পান।[139] নব্যভারত পত্রিকা উক্ত বইয়ের পরিচিতি দিতে গিয়ে জানাচ্ছে, "রামাক্ষয়বাবু একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ, পেন্সন-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। এ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের আছে"।[140] সেই অভিজ্ঞতা থেকে রামাক্ষয় তাঁর বই লিখেছেন। বস্তুত তিনি সরাসরি পুলিশের কাজে কখনও যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু, যেহেতু তিনি ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চপদস্থ হিন্দু ভদ্রলোক সেহেতু তিনি "বেঙ্গল, বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে.. ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর কাল পুলিসের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া এবং দোষগুণ

---

[138] রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, পুলিশ ও লোকরক্ষা, সংকলন ও সম্পাদনা অশোক উপাধ্যায় ও অরিন্দম দাশগুপ্ত (কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ [১৮৯২])। Bengal Library Catalogue অনুসারে বইটির পরিচিতির জন্য দ্রষ্টব্য: উক্ত সংস্করণটির পরিশিষ্ট ১, পৃ. ১৬২-১৬৩

[139] পরিশিষ্ট ৩ ও ৪, তদেব, পৃ. ১৬৫-১৭৪

[140] পরিশিষ্ট ২, তদেব, পৃ. ১৬৪

বিচার করিয়া যাহা বক্তব্য, তাহা.. পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত" করার অধিকার পেয়ে যান।[141] এবং কী আশ্চর্য, হার্শেলের মত রামাক্ষয়ও সেই এডোয়ার্ড হেনরির 'করকমলে' তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছেন![142]

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত রামাক্ষয়ের বাংলায় লেখা বইয়ের একটি ইংরেজি সারসংক্ষেপ গোড়াতেই ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলা 'উপক্রমণিকা'য় স্পষ্ট করেছেন লেখক: "কার্য্যপদ্ধতির দোষ প্রদর্শন কালে গবর্ণমেন্টের বা কোন শ্রেণীর কর্ম্মচারীবিশেষের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোন কথা বলা হয় নাই। উল্লিখিত দোষ সমূহের সংশোধন হইয়া মঙ্গলসাধন হয় এইমাত্র উদ্দেশ্য"।[143] একে অবসরকালীন পেনশন বড়ো বালাই। তার উপরে যদি ঔপনিবেশিক শাসক কিংবা তাদের শাসন-কাঠামোর সমালোচনা করা হয়, তাহলে আর রক্ষা নেই। উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে তখন 'রিফর্মড' শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের বোঝাপড়া মজবুত। সেই বোঝাপড়ায় শাসিতের তরফে শাসকের কাছে নিবেদনের ধরনটাই হলো আত্মসমালোচনামূলক, কেবল সেই আত্ম আক্ষরিক অর্থে আমি নয়, বরং দেশীয় জনসমাজের এমন সব অংশ যাদের সহজ চাঁদমারি করা যায়— দেশীয় পুলিশ-দারোগা তেমনই এক পরিচয়।[144]

অতিবিনীত সমালোচনামূলক প্রস্তাবও যে শাসক মেনে নেবে তেমনটা নয়— "শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়দিগের কৃত কোন প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষদিগের সমীপে এককালে সম্পূর্ণরূপে যে পরিগৃহীত হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না"।[145] তাহলে রামাক্ষয় কোন আশায় এই বই লিখছেন? আশা-ভরসার স্থল সেই "সুশিক্ষিত পাঠক" যারা বইতে বর্ণিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করলে "সময়ে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতে পারে"।[146] অর্থাৎ এক সংস্কারক তাঁর সহাবস্থানে থাকা সমমনস্ক লোকেদের মধ্যে একটি বিষয়ে একরকমের ঐকমত্য তৈরি করতে চাইছেন। এবং আশা করেছেন বইটি কেবল যে "এদেশীয় পুলিস অফিসরদিগের পাঠোপযোগী হইবে এমত নহে", বরং গৃহস্থ, জমিদার, প্রজা, গরিব, অর্থবান— সমস্ত বর্গের লোকের, বিশেষত "নব্যসম্প্রদায়দিগের" কাছে ফলদায়ক হবে।[147] লক্ষণীয় যে, রামাক্ষয়ের মূল সুরটা গিরিশচন্দ্র বসুর থেকে খুব একটা আলাদা নয় এবং সেটা হওয়ার কথাও নয়। একরকমের বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক তথা শ্রেণিগত ঐকমত্যের ভিত্তিতেই শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা 'সংস্কার' করতে নেমেছিলেন, ঔপনিবেশিক প্রভু যদি-বা তাতে কান নাও-দেয় তবু বাকি অধঃস্তন ও সমগোত্রীয়দের কাছে কথাগুলো পেড়ে রাখা ভালো।

---

[141] 'উপক্রমণিকা' এবং 'পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কে দু-চার কথা', তদেব

[142] 'Dedication', তদেব

[143] 'উপক্রমণিকা', তদেব

[144] 'পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কে দু-চার কথা', তদেব

[145] 'উপক্রমণিকা', তদেব

[146] তদেব

[147] তদেব

পুলিস ও লোকরক্ষা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক পুলিশি-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত 'গোয়েন্দা'দের নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করেছেন। ঔপনিবেশিক কর্তার কাছে পাঠানো বইয়ের ইংরেজি সারসংক্ষেপে তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় লেখা হয়েছিল— "Hints on the system of detection of Indian crimes for the guidance of Police Officers."[148] রামাক্ষয় অধ্যায়ের শুরুতেই বলছেন যে, "পুলিসের কাজ বড় শক্ত"। সেই 'শক্ত কাজে' তথ্যের হদিশ দিয়ে পুলিশকে মামলা নিরসনে সাহায্যকারীকেই রামাক্ষয় "গোয়েন্দা" বলেছেন। যদিও লেখক জানেন 'আজকাল "গোয়েন্দা" নাম শুনিলেই লোকটি হেয়, ঘৃণাস্পদ ও অবিশ্বাসভাজন বলিয়া পরিগৃহীত হয়'।[149] অর্থাৎ রামাক্ষয়ের এই বইয়ের সমকালে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর কিংবা অন্যান্য দারোগা-গোয়েন্দা-সম্পর্কিত লেখাপত্র বেরোতে থাকলেও ভদ্রলোকের সমাজে ঐ দুই পেশাকে হেয় গণ্য করার রেওয়াজ বহাল ছিল।[150]

'গোয়েন্দা' বলে কোনো সমসত্ত্ব বর্গ যে নেই সেকথা স্পষ্ট করেছেন রামাক্ষয়— "উদ্দেশ্যভেদে সচরাচর চারি প্রকার গোয়েন্দা দেখিতে পাওয়া যায়"।[151] সম্ভবত এই প্রথম কোনো লেখায় গোয়েন্দা নিয়ে এমন স্তর বিভাজন করা হলো এবং সেই স্তরগুলি বিশেষভাবে খেয়াল করার মতো। প্রথম শ্রেণির গোয়েন্দা তিনি যিনি "অপরাধ ঘটনা ও কৃতাপরাধ ব্যক্তির সম্বন্ধে যে পরিমাণে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান.. জনসমাজের হিতকামনায় সরলভাবে প্রকৃতরূপে প্রকাশ করে(ন)" এবং এই মহাশয় গোয়েন্দারা "অতি প্রশংসনীয় ও উচ্চদরের লোক"।[152] লেখকের মতে "এইরূপ সন্ধানদাতার সাহায্য বহুমূল্য এবং তাহার সঙ্গে পুলিস অফিসরের সাধু ব্যবহার করা সমুচিত"।[153]

রামাক্ষয়ের বর্গীকরণের দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছে সেই গোয়েন্দারা যারা "কোন দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মের দোহাই দিতে দিতে ঘটনার সন্ধান বলিতে অগ্রসর হয় এবং প্রকৃত কথা প্রকাশ করে"।[154] তাদের মনে "অনিষ্ট কামনা" এবং বদ মতলব থাকলেও যেহেতু তারা "প্রকৃত কথা প্রকাশ করে" তাই তাদের একটু গুরুত্ব দিতেই হয়।[155] তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে "ভয়াতুর গোয়েন্দা"।[156] এরা হয় আসল কথা জানে কিংবা নিজেরা সেই অপরাধে কিছুটা বা পুরোটাই জড়িত থাকে। এদের পেটের কথা মুখে বেরিয়ে আসতে চাইলেও পাছে তার বা তার কোনো আত্মীয়ের

---

148 'Synopsis of a volume on Police and protection in Bengali, consisting of four chapters', তদেব

149 তদেব, পৃ. ৬৬-৬৭

150 শিষ্য দেবেন্দ্রবিজয়কে গুরু অরিন্দম বলেছিলেন: "তথাপি এদেশের লোকেরা ডিটেক্টীভদের সম্মান করে না— তা' তাদের দোষ নয়, আমাদেরই অদৃষ্টের দোষ।… বোধ করি বাঙ্গালাদেশের ডিটেক্টীভশ্রেণির উপর বিধাতার একটা অমোঘ অভিসম্পাৎ আছে"। দ্রষ্টব্য: পাঁচকড়ি দে, মায়াবী (কলকাতা : ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেস, ১৯০১), পৃ. ২৮৮

151 রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, পুলিশ ও লোকরক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

152 তদেব

153 তদেব

154 তদেব

155 তদেব

156 তদেব, পৃ. ৬৭-৬৮

বিপদ ঘটে তাই তথ্য কবুল করতে ভয় পায়। এদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে আঁতের কথা বের করার জন্য পুলিসকে কৌশল করতে হয়। আসল মুশকিল হয় চতুর্থ শ্রেণির "ঘৃণাস্পদ" গোয়েন্দাদের নিয়ে। তারা বাকি তিন শ্রেণির "অপেক্ষা কুটিলমতি কপটাচার" এবং "অতি ভয়ঙ্কর জিনিস"। এরা প্রায়ই দারোগাদের বিপদে ফেলে দেয়। "লোকের অনিষ্ট চেষ্টায়" ব্যস্ত এই শ্রেণির "লোকই গোয়েন্দা নামের কলঙ্ক"।[157] রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের এই রচনাটি প্রথম নব্যভারত মাসিক পত্রিকায় বেরোয়। উনিশ শতকের শেষদিকে উচ্চশিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল এই নব্যভারত। সেই মাসিকপত্রের শিক্ষিত পাঠক রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাব বিশদে পড়েছিলেন নিশ্চয় এবং তা জনপ্রিয় হয়েছিল বলেই পরে লেখাটি বই আকারে দু-হাজার কপি ছাপা হয়।[158]

এর থেকে এটাই প্রতিপাদ্য যে, বাংলায় বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী আবেগের আবহে গোয়েন্দা কাহিনীর যে বিকাশ ঘটবে তা পুরোটা ইংরেজি ও ফরাসি ধারার অনুকরণ নয়। শার্লক হোমসকে দেশীয় নাম-পোশাকে হাজির করতে হলেও তার গ্রহণীয়তার সামাজিক বাস্তবতা থাকতে হয়। রামাক্ষয়-বর্ণিত ঐ প্রথম শ্রেণির মহাশয় গোয়েন্দারাই বোধ হয় বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় দীক্ষিত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙালি গোয়েন্দার আর্কিটাইপ বা আদিকল্প। কিন্তু, গোয়েন্দার গোত্রভেদে অপারগ দেশীয় সমাজে ঐ মেধাজীবী 'সত্য'সন্ধানীদের মান-মর্যাদা বিশেষ নেই। রামাক্ষয়ের বই বেরোনোর এক দশক পরেই ঐ উচ্চকোটির গোয়েন্দাদের সামাজিক মর্যাদাহীনতা সম্পর্কে আক্ষেপ করে "হুগলী জেলার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট... খ্যাতি ও প্রতিপত্তি"-প্রাপ্ত "একজন প্রধান ডিটেক্টীভ"[159] ১৯০১ সালে প্রকাশিত পাঁচকড়ি দে-র লোমহর্ষক উপন্যাস মায়াবী-তে অরিন্দম বসু তাঁর শাগরেদ দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রকে বলেছিলেন:

> এই গোয়েন্দাগিরি কাজ বড় শক্ত, দেবেন্দ্রবাবু। যেখানে একটু সন্দেহের ছায়া আছে, সেই সন্দেহকে সত্যের আসনে বসিয়ে, সেখানে আমাদের এক প্রকাণ্ড আয়োজন ঠিক করে রাখতে হয়। তোমার যেরূপ উৎসাহ দেখ্‌ছি, কিছুদিন আমার সঙ্গে থাক্‌লে তুমিও একজন বড় ডিটেক্‌টিভ হতে পারবে। **তোমার কিছু কিছু ডাক্তারী জানা আছে, এ কাজে ডাক্তারী শিক্ষাটাও সময়ে সময়ে উপকারে আসে।**[160]

এই কথা শুনে যখন দেবেন্দ্রবিজয় ডাক্তারির মত "মান্য" জীবনদায়ী কাজের সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির তুলনায় সংশয় ব্যক্ত করেন, তখন অরিন্দম আরও ব্যাখ্যা করে বলেন:

---

[157] তদেব,পৃ. ৬৮

[158] পরিশিষ্ট ১, তদেব, পৃ. ১৬২-১৬৩

[159] পাঁচকড়ি দে, মায়াবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[160] তদেব, পৃ. ২৮৭ । সন্দেহের বশে কিন্তু প্রমাণের অভাবে ফাঁদ পেতে অপরাধী ধরার ঘটনার মধ্যে অনেক সময়ে গোয়েন্দার তরফে হত্যার মত ঘটনাও সাহিত্যে দেখা যায়। 'চোরাবালি' গল্পে কেবল পরোক্ষ প্রমাণ তথা circumstantial evidence থেকে গড়ে ওঠা সন্দেহের ভিত্তিতে ব্যোমকেশ কালীগতি ভট্টাচার্যকে হত্যার পরিকল্পনাই করে বসে— "মৃত্যুই ছিল কালীগতির একমাত্র শাস্তি"। দ্রষ্টব্য: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চোরাবালি', ব্যোমকেশ সমগ্র (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৭ [১৯৯৫]), পৃ. ১২৮-১৬০ (বিশেষত পৃ. ১৫৯)।
আর, ডাক্তারি শিক্ষার প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আর্থার কনান ডয়েলে ও ডাক্তার বেলের ছায়া অবলম্বনে তৈরি শার্লক হোমসের কথা মনে পড়তে পারে।

> **গোয়েন্দাগিরিতে ডাক্তারি অপেক্ষা সহস্রগুণে লোকের উপকার করা হয়।** এই গোয়েন্দাগিরি কত ধনে-প্রাণে-মরণাপন্ন ব্যক্তির ধন ও প্রাণ ফিরিয়ে এনে, তার অবসন্ন দেহে নূতন জীবন সঞ্চার করে। গোয়েন্দাগিরি অপহৃত স্নেহের নিধি সন্তানের শোকাতুর পিতা মাতার শূন্য ক্রোড় পরিপূর্ণ করে। এই গোয়েন্দাগিরি দস্যুর হাত থেকে, খুনের হাত থেকে কত নিরবলম্বন শিশুর পিতা ও কত অভাগিনী স্ত্রীর স্বামীকে উদ্ধার করে থাকে; তাতে কি পরোপকারের কিছুই নাই?— কেবল পণ্ডশ্রম? বোধ করি কোনো ডাক্তারকে পরোপকারের জন্য গোয়েন্দাদিগের মত শ্রমস্বীকার কর্‌তে হলে ডাক্তারী বিদ্যাটি মস্তিষ্ক হতে শীঘ্র বহিষ্কৃত করে ফেল্‌বার জন্য স্মৃতিনাশক কোন আশুফলপ্রদ নূতন ঔষধের আবিষ্কার কর্‌তে সচেষ্ট হয়ে উঠ্‌তো। **কতক বা কৌতূহল, কতক বা দয়া, কতক বা রোষ পরবশ হয়ে ডিটেক্‌টীভরা শরণাপন্নের যে সকল ভয়ানক ভয়ানক বিপদ নিজের মাথায় নিয়ে নিজের অসহায় প্রাণটাকে খুনেদের ছুরির নীচে সচ্ছন্দে যেমন ছেড়ে দেয়, আর কে তেমন পারে বল দেখি?**[161]

লক্ষণীয় অরিন্দম মিত্রর জবানিতে গোয়েন্দাগিরি আদতে 'অপরাধ' বর্গের সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের পেশা, নিখাদ পরহিতৈষণা, তার প্রাপ্তিযোগের থেকেও উপচিকীর্ষার দিকটিই প্রধান। কিন্তু, ঔপনিবেশিক দেশীয় প্রজার সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রভু-সমাজের জনগণের বৌদ্ধিক তফাত অনেক। ফলে, শ্বেতাঙ্গ-সমাজের তুলনায় দেশীয় সমাজ সেই পরোপকারের যথোচিত গুরুত্ব অনুধাবনে অপারগতাহেতু মর্যাদাদানেও উদাসীন। তাই অরিন্দমের গলায় আক্ষেপ ধ্বনিত হয়:

> লণ্ডন, ফ্রান্স ও আমেরিকার ডিটেক্টীভরা যেরূপ সম্মানিত হয়ে থাকে, এবং আবালবৃদ্ধবনিতার এমন একটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে যে,… যখন অবসরে এক একবার নিজেদের কথাগুলি ভাবি, তখন মনে যেমন দুঃখ হয়, তেমনি জীবনের প্রতি একটা ঘৃণাও জন্মে। আমরা পরের জন্য দেহপাত ও প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত, কিন্তু পরে সেটা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত এবং একটু সম্মান দেখাইতে একেবারে অপ্রস্তুত। আমরা যদি তাহাদের দুইচক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিই, আমরা পরের জন্য জন্মিয়াছি এবং পরের জন্য বাঁচিয়া আছি এবং যখন মরিতে হইবে পরের জন্যই মরিব, তথাপি তাহারা কিছুতেই বুঝিবে না।[162]

এখানে অরিন্দম মিত্রর বয়ান খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীতে ফারসি গোয়েন্দা শব্দের অর্থে নিহিত গুপ্তচরবৃত্তির অনুষঙ্গ ক্রমে আড়াল হয়ে গিয়ে ডিটেকটিভ (detective) ও গোয়েন্দা সমার্থক বলে গৃহীত হচ্ছে ও তার সঙ্গে একটা বৌদ্ধিক মেধাজীবীর ছাঁচ জুড়ে যাচ্ছে।[163] রামাক্ষয়ের করা শ্রেণিবিভাগে উৎকৃষ্টতম গোয়েন্দারা সেই মেধাজীবী 'সত্য'সন্ধানীর আদিরূপ। কিন্তু, তার পরের তিনটি "নিকৃষ্ট" শ্রেণিকে নাকচ না-করে সেই প্রথম শ্রেণির জয়যাত্রার নিশান ওড়ানো সম্ভব ছিলো না। বিংশ শতকে জাতীয়তাবাদী চেতনায়-পুষ্ট-গোয়েন্দা-গল্পের-লেখকরা সেই নাকচ করার দায়িত্ব নিলেন। শুধু নাকচ-ই করা হলো না, সঙ্গে মুছে ফেলা হলো অনেক কুলুজি-পরিচয়। হিন্দু বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক বেসরকারি গোয়েন্দা হয়ে উঠল

---

[161] পাঁচকড়ি দে, মায়াবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-২৮৮

[162] তদেব, পৃ. ২৮৮

[163] সেই সময়েই রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কিংবা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের বই প্রকাশিত হচ্ছিল। তবে, পাঁচকড়ি দে-র বইয়ের (হত্যা-রহস্য) বিজ্ঞাপনে দেখা যায় 'Detective Series' লিখে তার বাংলা করা হয়েছে 'দারোগা-কাহিনী'। হয়ত, দারোগা শব্দের ব্যবপক ব্যবহার ও সামাজিক পরিচিতি তথা দারোগার দপ্তর-এর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণেই দারোগা ও ডিটেকটিভ শব্দদুটি সমার্থবোধক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন পাঁচকড়ি। গোয়েন্দা কাহিনী নামের 'ব্র্যান্ড'টিরও হয়ত 'দারোগা' শব্দের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা চালু ছিল।

প্রায়-স্বয়ম্ভূ এমন এক আদিরূপ যার কোনো দেশজ পূর্বসূরী নেই (অনেকটা যেমন হোমস মুছে ফেলতে চেয়েছিল তার পূর্বসূরীদের)। বস্তুত, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বৃত্তান্ত ফাঁদতে হলে পূর্বপ্রচলিত ব্যবস্থাকে অস্বীকার তথা খারিজ করা জরুরি হয়ে পড়ে। সাহিত্যের 'নব্য' বেসরকারি শখের গোয়েন্দা ধারণাকে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে জুড়তে হলে পূর্ব প্রচলিত দেশীয় 'গোয়েন্দা' বৃত্তিকে নস্যাৎ করতেই হত।

বস্তুত, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের মুখে পড়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তথা শাসকের সঙ্গে হিন্দু শিক্ষিত বিত্তবান ও মধ্যবিত্তের সম্পর্কের চরিত্র ক্রমে বদলে গিয়েছিল। দেশীয় ছোটোলোকের চুরি-ডাকাতি-ধরে-সুনাম-কুড়ানো শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক দারোগার সামনে এসে হাজির হলো বিপ্লবী আন্দোলন, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থা। চাকরি বজায় রেখে ইহকালে করে খেতে হলে আন্দোলনকারীদের দমন করতে হবে দারোগাকেই।[164] অন্যদিকে ব্রিটিশ-পুলিশ তখন ঔপনিবেশিক অত্যাচারের প্রতীক। ফলে, পুলিশ-দারোগা-খতম স্বদেশী বিপ্লববাদের অন্যতম কর্মসূচি। এই পরিস্থিতিতে দারোগা বা পুলিশি গোয়েন্দাকে কেন্দ্রে রেখে সুখস্বপ্নিল আখ্যান নির্মাণের ছাঁচ ভেস্তে যেতে বাধ্য। সরকারি গোয়েন্দা যেহেতু দারোগার মতো সরাসরি পুলিশি-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলো, তাই সেইসব চরিত্র দিয়ে জাতীয়তাবাদী পাঠকের মনোরঞ্জন করা মুশকিল। অথচ ততদিনে পাঠ্যের বাজারে গোয়েন্দা গল্পের চাহিদা ভালোই। চাহিদার সঙ্গে বাস্তবতাকে মেলাতে গিয়ে দারোগা ও সরকারি গোয়েন্দাদের বোলবোলাও খর্ব করে তুলে আনা হলো এক নতুন পরিচিতি— বেসরকারি গোয়েন্দা। সে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের অঙ্গ নয়। ফলে, কার্যত ঔপনিবেশিক শাসনের মান্যতা প্রতিষ্ঠা করলেও, 'সত্য'সন্ধানী বেসরকারি গোয়েন্দার গায়ে প্রাতিষ্ঠানিক দারোগা-পুলিশের মতো ঔপনিবেশিক পীড়নতন্ত্রের ছাপ নেই। প্রসঙ্গত, ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা বিষয়ে মিশেল ফুকোর বক্তব্য মনে পড়ে যায়:

> At the beginning of the nineteenth century, then, the great spectacle of physical punishment disappeared; the tortured body was avoided; the theatrical representation of pain was excluded from punishment. The age of sobriety in punishment had begun.[165]

উনিশ শতক থেকেই ইউরোপে 'অপরাধী'র শাস্তি বিধানের হিংস্র প্রকরণগুলিকে বুদ্ধির খেলায় পরিণত করে কীভাবে জনভোগ্য আখ্যান নির্মাণে জোর পড়েছিল তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফুকো আবারও লিখছেন:

> The punitive practice of the nineteenth century was to strive to put as much distance as possible between the 'serene' search for truth and the violence that cannot be entirely effaced from punishment. It set out to mark the heterogeneity that separates the crime

---

[164] বস্তুত, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থানের সঙ্গে ঔপনিবেশিক পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্মের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ডেভিড আর্নল্ড দেখিয়েছেন যে: "In 1860 the Police Commission had seen no need for the creation of a separate detective or intelligence branch, believing that the regular police were adequate for all kinds of police work. In 1887, two years after the founding of the Indian National Congress and at a time of growing communal tension and anti-colonial opposition in India, the Government of India took the first substantial step towards the formation of an intelligence agency by entrusting to the Thugi and Dakaiti Department responsibility for collecting information about political and social movements as well as organized crime. This innovation was replicated at the provincial level by the formation in Madras of a police 'Special Branch' in 1888." দ্রষ্টব্য: David Arnold, *Police Power and Colonial Rule : Madras 1859-1947* (Delhi : OUP, 1986), পৃ. ১৮৬

[165] Michel Foucault, *Discipline and Punish : The Birth of the Prison* (New York : Vintage, 1995 Second Vintage Book Edition [First English translation 1977]), পৃ. ১৪

> that is to be punished and the punishment imposed by the public power. Between truth and punishment, there should no longer be any other relation than one of legitimate consequence. The punishing power should not soil its hands with a crime greater than the one it wished to punish.[166]

বস্তুত, ঔপনিবেশিক বাংলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে যেভাবে সাহিত্যে শখের গোয়েন্দা বা বেসরকারি গোয়েন্দার মিছিল দেখা যায় এবং সেখানে যেভাবে 'অপরাধ' বর্গের হিংস্র আচরণের প্রতিবিধান কার্যত 'অপরাধী' ও গোয়েন্দার বৌদ্ধিক লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল, তার সঙ্গে ফুকোর বিশ্লেষণের মিল পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, ফুকো লিখেছেন:

> We are far removed indeed from those accounts of the life and misdeeds of the criminal in which he admitted his crimes, and which recounted in detail the tortures of his execution: we have moved from the exposition of the facts or the confession to the slow process of discovery; from the execution to the investigation; from the physical confrontation to the intellectual struggle between criminal and investigator.[167]

যে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকেরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পত্রিকায় ও সাহিত্যে নীচুজাত এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের দারোগার মুণ্ডপাত করতো সেই ভদ্রলোক বর্গেরই উত্তরসূরী হিসাবে হাজির হয় জয়ন্ত, হেমন্ত, কিরীটি কিংবা ব্যোমকেশ। তারা আধুনিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত, কখনও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার-পোষিত, কখনও মক্কেলের দক্ষিণা-পুষ্ট, কখনও-বা 'অপরাধী' ধরে দেওয়া বাবদ সরকার-তরফে ঘোষিত ইনামভোগী। দেশ-দুনিয়ার খবর তাদের করতলগত, রোজ গায়ে-গতরে খাটলে তবে পেটের ভাত জুটবে তেমন হাভাতের দশাও তাদের নয়। উপরন্তু তাদের জাতীয়তাবাদী মননটি সর্বদা সক্রিয়।

'জয়ন্তের কীর্তি' (১৯৩৬) গল্পে গোয়েন্দা জয়ন্ত ও তার সহযোগী মানিকলালের পরিচয় দিতে গিয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় জানাচ্ছেন যে উভয়েই "নন-কো-অপারেশেন" আন্দোলনের ফলে ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছিল এবং— "তারা দুজনেই মাতা-পিতৃহীন, কাজেই স্বাধীন। দুজনেরই কিছু-কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, কাজেই তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ও নেই।"[168] উদ্ধৃত অংশে অভিভাবকহীনতা ও রিক্থর অধিকার উভয় ক্ষেত্রেই কার্য-কারণ সম্পর্কে 'কাজেই' শব্দের দুটি ব্যবহারই লক্ষণীয়। একদিকে পারিবারিক বন্ধন তথা অভিভাবকত্বের অভাবে যাপনগত স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে আর্থিক সংগতি থাকার ফলে জীবিকা অর্জনের দায় থেকে মুক্তি— উভয় স্বাধীনতার যোগফল সাংসারিক দৈনন্দিনতা ও আয়ের চিন্তাবিহীন অখণ্ড অবসর, যা মেধাজীবীর আবশ্যিক শর্ত। কায়িক শ্রম নয়, অবসর-সঞ্জাত বৌদ্ধিক বৃত্তির অহং সেখানে স্পষ্ট। 'অন্ধকারের বন্ধু'

---

166 তদেব, পৃ. ৫৬

167 তদেব, পৃ. ৬৯। প্রসঙ্গত, অপরাধের বর্গবিভাজন ও অপরাধ সাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে ফুকোর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ. ২৮৬-২৮৭।

168 হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'জয়ন্তের কীর্তি', হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী, দশম খণ্ড (কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), পৃ.১৩ (নজরটান সংযোজিত)

(১৯৪১) গল্পের শুরুতেই হেমন্তের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে শৈশবে বাপ-মা হারালেও ধনীর সন্তান এবং যৌবনেই ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে এসেছে।[169]

পপুলার সিরিজের উনিশতম সংখ্যায় যতীন্দ্রনাথ পাল-লিখিত শয়তান উপন্যাস গোয়েন্দা প্রশান্ত বোসও তার প্রয়াত বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান এবং প্রভূত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলভোগী শিক্ষিত নাগরিক উচ্চবর্ণ হিন্দু ভূস্বামীর মতই প্রশান্তর জমিদারির সব ভার নায়েব সামলান, কারণ সে নিজে আশৈশব ডিটেকটিভ হতে বদ্ধপরিকর।[170] ঔপনিবেশিক শাসনে সবচেয়ে বিদ্রূপের শিকার সাংসারিকভাবে নুব্জ ও আর্থিকভাবে ক্লিষ্ট বঙ্গীয় কেরানিকুলের প্রতিনিধি নয় বাঙালি গোয়েন্দারা, তারা বরং গড়পড়তা ঔপনিবেশিক প্রজার উল্টোদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিভূ, ঔপনিবেশিক আধুনিকতা-সঞ্জাত বুর্জোয়া রূপকথার রাজপুত্র। সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রধান দুটি লক্ষণ পিতা-মাতার প্রয়াণ ও আর্থিক স্বাবলম্বন। খেয়াল করা দরকার যে, ব্যোমকেশ বক্সী কিংবা প্রদোষচন্দ্র মিত্রও অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন ও যৌবনেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। তবে, তাদের দুজনের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রভূত সম্পত্তি নেই, বরং উভয়েই মধ্যবিত্ত সচ্ছল মেধাজীবীর আদর্শরূপ।

এই মেধাজীবী বেসরকারি গোয়েন্দারা অঢেল ফুরসত-যাপনের অঙ্গ হিসাবে দেশহিতব্রত পালনের উদ্দেশ্যে গোয়েন্দাগিরি করে, টাকার জন্য নয়, মগজের পুষ্টিসাধনার্থে ও 'সত্য' জানতে এবং আইনের শাসন তথা নৈতিক শৃঙ্খলা বলবৎ রাখতেই তারা উদ্যোগী। 'অপরাধী' উদ্ঘাটনের খেই ধরে আখ্যানের তলায় তলায় চারিয়ে যায় বিশেষ নৈতিকতার বৃত্তান্ত।[171] সেই বৃত্তান্তে 'আধুনিক' ও 'ঐতিহ্য'— দুয়ের মিশেল ঘটে নিক্তি মেপে। কার্যত, ইংরেজি-শিক্ষিত সুবিধাভোগী প্রজা হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের যাবতীয় সুফল পুরো অস্বীকার করা সম্ভব হয় না, তাই দরকারমত ঔপনিবেশিক আধুনিকতার জয়গান গাওয়া হয়। যেমন, ছোট থেকেই ডিটেকটিভ হতে-চাওয়া হেমন্ত কিন্তু রাতারাতি গোয়েন্দা বনে যায়নি। "কাল্পনিক" এবং "অতি-উদ্ভট" গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে সে বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা হয়নি, বরং সেজন্য "তাকে সাধনা করতে হয়েছে দস্তুরমত"। সেই সাধনার টানেই সে ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়েছিল "পাশ্চাত্য দেশের সত্যিকার গোয়েন্দারা কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে" সেসবই হাতে-কলমে শিখতে। সেই শিক্ষা-যাত্রার জন্য সহায়ক হয়েছিল ঔপনিবেশিক পুলিশের কতিপয় বড়কর্তার "সুপারিস-পত্র"। তার জেরেই হেমন্ত "গোয়েন্দা বিভাগের ভিতর থেকে পাশ্চাত্য-পুলিশদের কাজ দেখবার সুযোগ" পেয়েছিল। সঙ্গে

---

169 হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'অন্ধকারের বন্ধু', হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী, একাদশ খণ্ড (কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), পৃ.৫৬

170 যতীন্দ্রনাথ পাল, শয়তান (কলকাতা: শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬-৭

171 হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লিখেছেন ধীরেন্দ্রলাল ধর। সেখানে তরুণ সাহিত্যিক ধীরেন্দ্রলালকে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হেমেন্দ্রকুমার রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপদেশ দেন: "… সারা দেশের সঙ্গে ছোটরা পরিচিত হবে, দেশের কথাও জানবে। আর তার সঙ্গেই দেবে দেশপ্রেম, ছোটরা যেন এই দেশের মানুষ বলে গর্ব করতে পারে।" এরপরে হেমেন্দ্রকুমার ধীরেন্দ্রলালকে বলেন, লেখার সাহিত্যগুণের থেকেও জরুরি হল পাঠকের "চরিত্র ও আদর্শ" তৈরি করা। দ্রষ্টব্য: ধীরেন্দ্রলাল ধর, "ভূমিকা", হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৮২ [১৯৭৬]), পৃ.০৫

বুঝেছিল যে, বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতিরেকে গোয়েন্দা হওয়া মুশকিল। তাই প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি নিয়মিত বিজ্ঞান-চর্চা করে হেমন্ত।[172]

আবার অন্যত্র ঐতিহ্য, প্রথা তথা পরাধীন দেশের একদা গৌরবের পক্ষেও জোরাল সওয়াল পেশ হয়। রবিনের জিজ্ঞাসার জবাবে হেমন্ত জানায়, "আসামীদের আঙুলের ছাপ" নেওয়ার পদ্ধতি "বাংলা পুলিশের স্যর উইলিয়ম হার্সেল সাহেব" প্রথম গ্রহণ করলেও, "ভারতে এই পদ্ধতির জন্ম বহুকাল আগে"। ফলে, মোগল বাদশাহ শাহজাহানের পাঞ্জার ছাপ কিংবা প্রাচীন হিন্দুদের দলিলের উপরে আঙুলের টিপসই— রেওয়াজ এদেশে বহু পুরোনো। "সুতরাং আধুনিক পুলিসের আবিষ্কারের ভেতরে কোনই বাহাদুরি নেই"।[173] অর্থাৎ, আজ ঔপনিবেশিক প্রভু যে কৃৎকৌশলকে প্রশাসনিকতার অঙ্গ করে তুলেছে সেই কৌশল একদা ভারতীয় সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। এ এক বিগত-স্বর্ণযুগের আখ্যান, সেই স্মৃতিচারণ উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর পাশাপাশি কাহিনীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকে কীভাবে তাবৎ ঔপনিবেশিক শাসন যা পারল না, সেই সমস্যার সমাধানকারী দেশীয় যুবক গোয়েন্দার প্রশস্তি। এ যেন, শাসকের খেলাতেই শাসককে পরাস্ত করার গৌরব। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়ার এও এক বহিঃপ্রকাশ।

তবে পাছে লোকে দারোগার সঙ্গে তাদের গুলিয়ে ফেলে সেই উদ্বেগে সাহিত্যের বেসরকারি গোয়েন্দারা সর্বদা শার্লক হোমসের কায়দায় স্বাতন্ত্র্য ঘোষণায় ব্যস্ত। সেই আত্ম-ঘোষণার অন্যতম কৌশল হলো জনসমক্ষে দারোগাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, তাদের বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা ও উদ্যমের অভাব নিয়ে কটু-কাটব্য করে হেয় প্রতিপন্ন করা। পেশার তাগিদ যে মগজের পুষ্টি সাধনে সহায়ক নয়, তারই প্রতিভূ যেন সুন্দরবাবু। তিনি উদরপূর্তিতে যতটা ব্যগ্র যুক্তির নিশ্ছিদ্র জালে অপরাধীকে ধরতে ততটা উদ্যোগী নন। সেই অনুদ্যোগের কারণ মেধার অভাব। সেই মেধাতন্ত্রের পিছনে শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। বস্তুত, মাতৃরাষ্ট্র ইংল্যান্ডে উনিশ শতকের শেষ থেকেই কনান ডয়েলের হোমস-কেন্দ্রিক জগতেও সেই শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব স্পষ্ট। আর ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদী আখ্যানে মেধা কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের করায়ত্ত। তাই বেসরকারি গোয়েন্দার আসল হাতিয়ার তার বুদ্ধিবৃত্তিগত উৎকর্ষ বা "মগজাস্ত্র"। 'ছোটলোক'সুলভ গায়ে-গতরে শ্রমের বদলে সেই ভদ্রলোক নিজের মাথা খাটায়। মাথা অর্থাৎ মেধাই 'ক্লু'গুলিকে অবরোহ পদ্ধতিতে সাজিয়ে জটিল মাথা-ঘোরানো রহস্য জলবৎতরল করে তুলতে সাহায্য করে। রহস্য উন্মোচনের দুর্নিবার টানে ছোটলোকের সঙ্গে যদি মিশতেও হয়, তবু ভদ্রসন্তান তার মেধার জোরেই পাঁক ঘেঁটেও নির্মল থাকতে পারে। এই কথাটাই স্পষ্ট করে লেখেন রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রস্তাবে, গোয়েন্দা ও পুলিশের মধ্যে অনেক অসৎ লোক থাকলেও এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সমাজের বিভিন্ন নীচুস্তরের

---

[172] হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'অন্ধকারের বন্ধু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯

[173] তদেব, পৃ. ১৩

লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলেও "নিজ উদ্দেশ্যে লক্ষ্য রাখিলে সঙ্গদোষে মজিবার ভয় নাই। নির্ম্মল বা পঙ্কিলজলে ডুব মারিলেও রাজহংসের শুভ্রতা বিকৃত হয় না"।[174]

বস্তুত, যেন-বা রামাক্ষয়ের প্রস্তাব মেনেই গোয়েন্দা হেমন্ত চৌধুরীও কেবল পুলিশের সঙ্গেই মেশে না, সমাজের বিভিন্ন স্তরের 'অপরাধী'দের মধ্যেও তার অবাধ গতি। বস্তুত, শার্লক হোমসকেও পেশার প্রয়োজনে লন্ডনের 'নীচু' শ্রেণির হরেক বর্গের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখা যায়। কিন্তু, সেই মেলামেশার 'কু'প্রভাব হোমসের উপরে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত মেধার জোরেই সে বারবার স্বতন্ত্র শ্রেণি-অবস্থানে ফিরে আসতে পারে। তেমনই সেই "দাগী পুরাতন পাপীদের" সঙ্গে মেলামেশায় হেমন্তর ভরসা ছদ্মবেশ, এবং সেই ছদ্মবেশের বিবরণ থেকে বাংলা গোয়েন্দা আখ্যানে উচ্চাবচ বর্গীকরণের স্বরূপ ধরা পড়ে:

> **মুসলমানের ছদ্মবেশ** প'রে প্রায়ই সে মেছোবাজারের ও সহরের অন্যান্য কু-বিখ্যাত পাড়ার বস্তী এবং কফিখানায় ঢুকে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেয়।... ফলে এমন অনেক বদমাইসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, যাদের রাস্তায় আনাচে-কানাচে দেখলে **ভদ্রলোকদের** বুক ভয়ে না কেঁপে পারে না![175]

এইখানে এসে হিন্দু রঞ্জিকা-র উদ্বেগ ও রামাক্ষয়ের বক্তব্যের সাহিত্যিক প্রতিরূপ দেখা যায়— ভদ্রলোকের যদি মাথা ঘুরে না-যায়, সে যদি নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকে তাহলে অসৎসংসর্গে উচ্ছন্নে যাওয়ার ভয় নেই। মাথা খাটিয়ে রহস্যের কুজ্ঝটিকা ভেদ করতে রামাক্ষয়ের উপদেশ হল: "ভিতরে প্রবেশ কর। বাহ্যরূপ জগতের প্রকৃত রূপ নহে" এবং খেয়াল রাখতে হবে "সামান্য সূত্রেও বৃহৎ কাজ হয়। বালু-কণা সদৃশ বীজে বৃহৎ বট ও অশ্বত্থের জন্ম"।[176] বাহ্যরূপের ভেতরে বা মনের গহনেই নিহিত থাকে আচরণের অপার রহস্য— ইউরোপীয় মনঃসমীক্ষণের ধারা স্পষ্টতই উপনিবেশে এসে পড়ছে, নির্ণীত হচ্ছে এক নতুন সমীকরণ— অপরাধও একরকমের রোগ, ফলে অপরাধীও আদতে রোগী, তার রোগ মনের গভীরে, আর সেই রোগের নিদান শাস্তি। "দাগী পুরাতন পাপীদের সঙ্গে... মিশতে... ঘৃণা হয়" কিনা জানতে চাওয়ায় হেমন্তর জবাবেও ফিরে আসে সেই ব্যাধি ও চিকিৎসকের রূপক, তার মধ্যে যেন মিশে থাকে 'অপরাধ/অপরাধী' সম্পর্কে পশ্চিম ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি ও যুক্তিবাদ তথা বৈজ্ঞানিকতার যুক্তির প্রতিধ্বনি:

> ডাক্তাররা ঘৃণা-ভরা মন নিয়ে যক্ষা আর কুষ্ঠ প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের কাছে যান না। **আমিও হচ্ছি আর-এক শ্রেণীর ডাক্তারের মত, আর অপরাধীদের মনে করি রোগীদের মত।** সাধারণ রোগীদের দেহ হয় ব্যাধিগ্রস্ত, আর এ ব্যাধি আক্রমণ করে অপরাধীর দেহকে নয়, মনকে। চুরি জুয়াচুরি

---

[174] রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, পুলিশ ও লোকরক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

[175] হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'অন্ধকারের বন্ধু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০ (নজরটান সংযোজিত)। 'মুসলমান' ছদ্মবেশে 'বস্তী'তে যাওয়ার সঙ্গে 'ভদ্রলোক'-এর যে বর্গীয় দূরত্ব সেটি লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত, হোমসও অনেক সময়ে বিভিন্ন শ্রমিকের ছদ্মবেশ নিত। বঙ্গীয় সমাজে শ্রেণির সঙ্গে সম্প্রদায়গত পরিচয়ও জুড়ে গিয়েছিল।

[176] রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, পুলিশ ও লোকরক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

> খুন ডাকাতি মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। ও-সব ব্যাধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হ'লে অপরাধীদের সঙ্গে ভাব না করলে চলে না।[177]

তবে, শেষাবধি অবশ্য পরাধীন প্রজার দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে সাহিত্যের বেসরকারি গোয়েন্দার মুক্তি নেই। আখ্যানের উপসংহারে ঔপনিবেশিক শাসকের ছকে দেওয়া শাসন-শৃঙ্খলার মূল কাঠামোকেই রক্ষা করার ভার নিতে হয় বাঙালি গোয়েন্দাকে। পাশাপাশি, নতুন নেশনের যে কাঠামো তাতে কাকে কোন মান্যতা/বশ্যতার পাঠ দেওয়া দরকার, কার কোন ধাপে ঠাঁই হবে— সে সবের একটা আদলও যেন দেখতে পাওয়া যায় গল্পগুলির অন্দরে-অন্তরে। উচ্চবর্গ ও বর্ণের পরিচয়বাহী হিন্দু পুরুষের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক-অর্থনীতির অবস্থান থেকে বাকি সবকিছুকে দেখার, বিচার করার ও প্রতিনিধিত্ব করার যে মনোভঙ্গি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বর্গে প্রকট, গোয়েন্দা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম বিশেষ দেখা যায় না।[178]

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধিতার ধাক্কায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসকের রাজধানী হওয়ার গৌরব হারিয়ে ফেলে কলকাতা। উপরন্তু, ততদিনে দানা বেধেছে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ-রাজনীতি। এহেন পরিস্থিতিতে মাথা অর্থাৎ মগজ বা তথাকথিত মেধাই যে আসল অস্ত্র বা পুঁজি সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছিল এই শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের কাছে। ফলে তাদের কল্পিত নেশনের মাথায় যারা বসবে তারা 'মাথা'ওয়ালা লোক— এই হল মেধাতন্ত্র বা Meritocracy-র যুক্তি। এই বিমূর্ত যুক্তির প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক প্রতিরূপ হলো বেসরকারি গোয়েন্দা। তার মধ্যে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখির সংহার হয়— প্রথমত, 'হাড়ীমুচী-নেড়ে' কিংবা ঔদরিক দারোগারা যে বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু বাঙালী মেধাজীবী শখের গোয়েন্দার মগজাস্ত্রের সমকক্ষ নয় সেটা বারবার নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়ে শ্রেণিগত অবস্থানের উচ্চাবচতাকে স্পষ্ট করে তোলা, এবং দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক দমন-পীড়নের অঙ্গ দেশীয় দারোগা-পুলিশের সমালোচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী অহংকে উশকানি দান।

নতুন নেশনের নেতৃত্ব সেই মেধাজীবী হিন্দু বাঙালী ভদ্রসন্তানের হাতেই রাখতে হবে, যারা ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থেকেই জাতীয়তার এক বিকল্প আখ্যান— 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'— রচনা করবে, যেখানে নীচু জাত, মুসলমানের পাশাপাশি আক্রমণ ও ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়ে উঠবে কেরানিকুল ও দেশীয় পুলিশ-বাহিনী। সেই নতুন ইতিহাস-আখ্যান নির্মাণকল্পে নিজেদের অতীত সামাজিক-সাংস্কৃতিক কুলুজি-বিলোপী উদ্যোগে প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়াত একটি বিশেষ শব্দের ব্যবহার: টিকটিকি। মেধাজীবী গোয়েন্দার অংহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে, ব্যঙ্গের বিষয়ে নামিয়ে আনতে এই বিশেষ শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে লক্ষণীয়। শব্দটি যেন ঐ 'ঘৃণাস্পদ'

---

177 হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'অন্ধকারের বন্ধু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০। আগে উল্লিখিত দেবেন্দ্রবিজয়কে বলা অরিন্দমের ডাক্তারি ও গোয়েন্দার অনুষঙ্গটিও স্মর্তব্য।

178 লক্ষণীয় যে, বাঙালি বেসরকারি গোয়েন্দাদের পদবী চিহ্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের চৌহদ্দিতেই মূলত আটকে থেকেছে। "ব্যোমকেশকে ব্রাহ্মণ না করে কায়স্থ করলেন কেন?"— এই প্রশ্নের উত্তরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান: "আমার ধারণা কায়স্থরা ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে।" দ্রষ্টব্য: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার", শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সমগ্র (কলকাতা : আনন্দ, ২০০৭ [১৯৯৫]), পৃ. ১০০১

গোয়েন্দা বা spy-এর স্মৃতিবাহী। মেধার জোরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্মান তথা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা-কল্পে ঐ পুরোনো 'অপমানকর' পরিচয় বিলোপের চিহ্ন হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ির তেতলায় দরজার পাশে পিতলের ফলকে লেখা ছিল— 'শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী — সত্যান্বেষী'। অজিতের প্রশ্নের উত্তরে ঐ অভিধার ব্যাখ্যা হিসাবে ব্যোমকেশ বলেছিলেন— "ওটা আমার পরিচয়। ডিটেকটিভ কথাটা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি— সত্যান্বেষী।"[179]

[179] অবশ্য, পুলিশের বড়কর্তার কাছে গিয়ে ব্যোমকেশ নিজের পরিচয় দিয়েছিল "বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ", সেখানে 'সত্যান্বেষী' অভিধায় কাজ হত না। তাছাড়া, ঔপনিবেশিক প্রজা হিসাবে ব্যোমকেশের আত্মছলনাময় গৌরব যে আদতে অন্তঃসারশূন্য সে কথা অজিতও জানত। ব্যোমকেশ সম্পর্কে তার অভিমত এই যে:"'ডিটেক্‌টিভ' শব্দটার প্রতি তাহার যতই বিরাগ থাক, বস্তুত সে যে একজন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সে মনে মনে ভাল রকমই জানিত"। দ্রষ্টব্য: 'সত্যান্বেষী' এবং 'পথের কাঁটা', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. যথাক্রমে ৪১ ও ৪৮

পঞ্চম অধ্যায়

গোয়েন্দায় ‘গেল!’ রব

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর মুদ্রিত জনজীবন

এ অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবসরে পাঠকের সুখদা-সঙ্গিনী, লোক চরিত্র শিক্ষায়, সংসার পরিচয়ে সুনিপুণা শিক্ষয়িত্রী।...**ইহা নারীপাঠ্য। অবাধে আপন আপন প্রণয়িনীর কর-কমলে উপহার দিতে পারেন।** পড়িয়া অঙ্কলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীপনা শিখিবেন-পথভ্রষ্টা পাপিনীর পরিণাম দেখিয়া আত্মদমন করিবেন-সতীর সুখ দেখিয়া জীবনের আদর্শ গড়িবেন। বিরক্তা, অনুরক্তা হইবেন। মুগ্ধা উন্মাদিনী হইয়া সংসারে স্বর্গের সুখ আনিবেন।

— সংসার সর্ব্বরী[1]

কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এই দারোগার দপ্তরের দ্বারা জুয়াচোর, বদ্‌মায়েসদিগের নূতন জুয়াচুরি বুদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু জানি না, ইহা দ্বারা জুয়াচোরগণ সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কিম্বা সাধারণ লোকে সেই জুয়াচোরগণ-কৃত কার্য্যের বিপক্ষে বাধা দিবার জন্য উপায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।... কিন্তু **যখন কল্পনার অতিরঞ্জিত ঘটনা-পূর্ণ নভেলাদি পড়িয়া এ দেশীয় স্ত্রী-বালকগণ বিকৃত-বুদ্ধি ও বিজাতীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়**, তখন ত কেহ কোন কথা কহেন না..

— বাণীনাথ নন্দী[2]

(এই) পুস্তক পাঠে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি-সকলেই হইবেন। ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতায় ইহা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করিবে।... ঘটনাগুলি যেরূপ কৌতুকাবহ, লেখাও সেইরূপ সরল। বিক্রয়ও শুনিলাম, বিলক্ষণ হইতেছে। আমরাও এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। **অসার উপন্যাস পাঠাপেক্ষা এরূপ “গোয়েন্দা-কাহিনী” পাঠে উপকার আছে।** পুস্তকের মূল্যও অতি অল্প।

— সোমপ্রকাশ[3]

---

[1] শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরীর ম্যানেজার কর্তৃক প্রকাশিত সংসার সর্ব্বরী [ভব-সংসারের গুপ্তকথা] বইটির বিজ্ঞাপনের অংশ (নজরটান সংযোজিত)। সেই বিজ্ঞাপন অনুসারে এই “আদিরসপ্রধান রহোন্যাস”টিই হরিদাসীর গুপ্তকথা নামে সাধারণে পরিচিত। দ্রষ্টব্য: ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, প্রমোদা (কলিকাতা : শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ), শেষে বিজ্ঞাপন অংশ।

[2] বাণীনাথ নন্দী, ‘প্রকাশকের মন্তব্য’, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, বেওয়ারিশ লাস (অর্থাৎ পথ-পার্শ্বস্থ পুলিন্দার ভিতরে প্রাপ্ত লাসের অদ্ভুত রহস্য!), ৭৩তম সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ, বৈশাখ (কলিকাতা : সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩-৪ (নজরটান সংযোজিত)

[3] শরচ্চন্দ্র সরকারের লেখা গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কে সোমপ্রকাশ-এর উদ্ধৃতিটি ছাপা হয়েছিল মৃত্যু-রঙ্গিনী বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে বিজ্ঞাপন অংশে (নজরটান সংযোজিত)। ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বইটি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল। সেকালে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে গোয়েন্দা কাহিনী উৎসর্গের রেওয়াজ পাঁচকড়ি দে বা শরচ্চন্দ্র সরকারের বইতে দেখা যায়। দ্রষ্টব্য : শরচ্চন্দ্র সরকার (সঙ্কলিত), মৃত্যু-রঙ্গিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা : দ্য বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৮)।

ইস্কুলের বিষ্টুবাবু ভাবতেও পারেননি যে তাঁর প্রিয় ছাত্র জগবন্ধু মলাটের আড়ালে 'গ্রামার' না-পড়ে লোমহর্ষক ডিটেকটিভ নাটক পড়ে! ছাত্রবয়েসে লুকিয়ে 'যশোবন্ত দারোগা' নামের গোয়েন্দা বই পড়াটা যে "জ্যাঠামি বিদ্যে" তা নিয়ে মাস্টারমশায়ের মনে সংশয় ছিল না। ফলে, সেদিন দাশুর 'কীর্তি'র জন্য জগবন্ধুর কপালে জুটেছিল বেজায় ধমক।[4] ওদিকে পুলিশে চাকরি-করা মামা ও গোয়েন্দা উপন্যাস-লেখক পিসেমশাইয়ের দৌলতে স্কুলেই ডিটেক্‌টিভ বনে গিয়েছিল জলধর। শেষে যখন চোর ধরতে গিয়ে বিড়াল ধরা পড়ে, তখন তার আর বাক্যস্ফূর্তি হয়নি।[5] গোয়েন্দার অনুষঙ্গ-জড়িত সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) গল্পদুটি সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৩ বঙ্গাব্দের মাঘে ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্তিকে।

তার দু-দশক আগেই পুলিসের কর্মচারী মহিমচন্দ্রের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পুলিশ বিভাগে সামান্য কর্মচারী হয়ে ঢুকে অবশেষে মহিম ডিটেক্‌টিভ-পদে উত্তীর্ণ হয়। তার উচ্চাশা ছিল ডিটেক্‌টিভ-লাইনে সে "সকলের সেরা" হবে, সুনাম প্রতিষ্ঠা করবে। বস্তুত, "এ সম্বন্ধে যতকিছু বিবরণ এবং গল্প আছে" সবই তার পড়া, এবং যতই পড়ে ততই শুধু তার "মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা" বেড়ে চলে। কারণ, বঙ্গদেশের "অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্বোধ, অপরাধগুলা নির্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই"।[6] এদেশে "খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সংবরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জীব দেশে ডিটেক্‌টিভের কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।"[7] ফলে, হতাশ মহিমচন্দ্র "বড়োবাজারের মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার" করে নীরবে আপন মনে তাকে তুলোধোনা করেছে: "ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুণী ওস্তাদলোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল"।[8] খুনীকে পাকড়াও করে স্বগতোক্তি করেছে: "গবর্মেন্টের সমুন্নত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মতো গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল— তোদের না আছে উদার কল্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস!"[9]

মহিমের মানসকল্পনায় তখন ভাসছে কেবল লন্ডন ও প্যারিসের জনবহুল পথ। সেই "জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীতবাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী" দেখে সে রোমাঞ্চ অনুভব করত, মনে মনে ভাবত, "এই হর্ম্যরাজি এবং

---

[4] সুকুমার রায়, 'পাগলা দাশু', সুকুমার সাহিত্যসমগ্র, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, (সম্পা.) সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৬ [১৯৭৩]), পৃ. ১৪৯-১৫০

[5] সুকুমার রায়, 'ডিটেক্‌টিভ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৪

[6] ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ডিটেক্‌টিভ'। পুলিশের গোয়েন্দা নিয়ে ব্যঙ্গের পাশাপাশি 'মাড়োয়ারী জুয়াচোর' যুগ্মপদটিও লক্ষণীয়। দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ডিটেক্‌টিভ', গল্পগুচ্ছ (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩০৭-৩১২

[7] তদেব

[8] তদেব

[9] তদেব

পথ-উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সৌন্দর্যস্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সামীপ্যে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্যকৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাট্‌ভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে"।[10] কোথায় সেই কুলীন অপরাধীর রমণীয় আবহাওয়া আর কোথায় এই ঔপনিবেশিক কেরানি-সংকুল "কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্নাবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, দাম্পত্যকলহ, বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ"-লাঞ্ছিত পরিবেশ। "কোনো-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনো এ কথা মনে হয় না যে, হয়তো এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনো-একটা কোণে সয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে"।[11] কিন্তু, মহিম স্বভাবে গোয়েন্দা। ফলে সজাগ সতর্ক পর্যবেক্ষণ তার পেশা ও নেশা। মুখ ও চলার ভাবে যে পথিককে সন্দেহ করত মহিম, পরে দেখা যেত সে "নিষ্কলঙ্ক ভালোমানুষ"। আবার, পথিকদের মধ্যে সবচেয়ে যাকে "পাষণ্ড" বলে মনে হয়েছে, সে কোনো "উৎকট দুষ্কার্য" করেনি, বরং সেই ব্যক্তি "একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনাকার্য সমাধা" করে বাড়ি ফিরছে। এইসব মানুষেরা যে ভালো হয়ে আছে, সে কেবল ঔপনিবেশিক সমাজের দৈন্য। নয়ত তেমন জলহাওয়ার "কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত"।[12]

উনিশ শতকের একেবারে শেষে ঔপনিবেশিক সমাজে গোয়েন্দা চরিত্র ও তাকে কেন্দ্র করে লেখা কাহিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এহেন তীব্র ব্যঙ্গ সত্ত্বেও, দারোগার দপ্তর বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৮৯০-এর দশক থেকেই পুলিশি তদন্ত ও গোয়েন্দা কাহিনী প্রকাশের সময় থেকেই দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক 'নব্য' পুলিশি তদন্তকারী এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে সরকারি ও বেসরকারি গোয়েন্দাদের নবকলেবর সমকালীন বাঙালি পাঠকের সমাদর পেয়েছিল। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা পাঁচকড়ি দে-র রচনার প্রশংসা যেমন বাংলা-ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হত, তেমন দীনেন্দ্রকুমার রায়ও জলধর সেন (১৮৬১-১৯৩৯)-এর মত মান্য সাহিত্যিক-সম্পাদকের প্রশ্রয় পেয়েছিলেন। আর পাঁচকড়ি কিংবা দীনেন্দ্রকুমারের বইগুলির যে বিক্রির হিসাব পাওয়া যায়, তাতে সেগুলিকে 'বেস্ট সেলার' বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।[13]

প্রবাসী ও *Modern Review*-খ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) কর্তৃক সম্পাদিত প্রদীপ পত্রিকাতেও গোয়েন্দা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত, একজন আলোচক খেয়াল করিয়েছেন যে, বাংলা গোয়েন্দা

---

[10] তদেব

[11] তদেব

[12] তদেব

[13] লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর ভাষা ধার করে বলা যায় যে, ঐ বইগুলি "সেলিং লাইক হট কচুরিজ"। বিজ্ঞাপন অনুসারে পাঁচকড়ি দে-র মায়াবী উপন্যাস দশম সংস্করণে কুড়ি হাজার ও নীলবসনা সুন্দরী "অতি অল্পদিনে" অষ্টম সংস্করণে পনের হাজার বই বিক্রি হয়েছিল। মায়াবিনী-র একাদশ সংস্করণে আঠারো হাজার বই ছাপা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: পাঁচকড়ি দে, মায়াবিনী — উপন্যাস (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, একাদশ সংস্করণ)।

কাহিনিকে মান্যতা দিতে অবশ্যই প্রদীপ বড় একটা ভূমিকা নিয়েছিল।[14] অবশ্য, জলধর সেন কিংবা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সহায়তা সত্ত্বেও তথাকথিত মূল ধারার মান্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে গোয়েন্দা সাহিত্যের একটা খারিজ করার মনোভাব তথা নৈতিক দূরত্ব বজায়ের চেষ্টা প্রথম থেকেই ছিল। শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অনেকেই গোয়েন্দা কাহিনী পড়ার বিষয়ে জনসমক্ষে বীতরাগ প্রকাশ করতেন। আদৌ গোয়েন্দা কাহিনী 'সৎ' সাহিত্য তথা পাঠযোগ্য কি-না তা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সখেদ অভিযোগ উঠতে থাকে যে, অস্বাভাবিক এইসব কাহিনীর প্রতি সাধারণ পাঠক এমন অনুরক্ত যে 'সৎ' সাহিত্যের কদর করার রুচিশীলতাই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। তাই গোয়েন্দা কাহিনী একদিকে হু হু করে বিক্রি হয় অথচ ভালো বইগুলির দিকে কেউ ফিরে তাকায় না।[15]

বস্তুত, বিশুদ্ধতাবাদী সমালোচনার পরিসরে একদিকে ছিল 'উচ্চ' সাহিত্য, যেখানে লেখক ও পাঠকের অবস্থানগত সাযুজ্য ছিল। অন্যদিকে ছিল গণভোগ্য সাহিত্য। কিন্তু, মূল বিতর্কটা ছিল ঐ গণভোগ্যতার সঙ্গে রুচি 'বিকৃতি'র সম্পর্ক নিয়ে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়েও যাতে পাঠকের রুচির মানোন্নয়ন হয়, যাতে সাহিত্যপাঠের আনন্দ ও সমাজ সংস্কার যুগপৎ চলতে পারে, সেটাই ছিল কেন্দ্রীয় বিতর্ক। গণরুচির মানোন্নয়ন ক্রমে সুরুচিকর সমাজের জন্ম দেবে— এই ছিল মূল ভাবনা।[16] গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক-প্রকাশকরা সেই ভাবনার প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখালেও, সেগুলিতে যে পরিমাণে যৌনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগল, তাতে উনিশ শতকীয় সংস্কার-প্রকল্পের মূলে আঘাত লাগল। রুচিমান পাঠকের নির্মাণ সংক্রান্ত সংস্কারমুখী-প্রকল্প পাঁচকড়ি প্রমুখের যৌনতা-ভরপুর বর্ণনায় ধাক্কা খেল। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মত উচ্চকোটির পাঠকের গোয়েন্দা কাহিনীর প্রতি বীতরাগের মূল কারণ সেটিই। তাই, গোয়েন্দা গল্প আদৌ পাঠযোগ্য কিনা সেই বিতর্কে সুরুচি, যৌনতা ও শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নগুলি মিলেমিশে গিয়ে মুখ্য বিচার্য হয়ে উঠেছিল। ফলে, উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের শুরুতে অনেক শিক্ষিত বাঙালিই গোয়েন্দা গল্প বিষয়ে খারিজ-সুলভ মনোভাব দেখাতেন এবং নানা ওজর-আপত্তি তুলে কিংবা সাহিত্যপ্রসাদহীনতার কথা বলে তাঁরা গোয়েন্দা কাহিনির জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে নৈতিকতার আগল দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাধা বাজারের নিয়মেই হার মেনেছিল।

"বঙ্গের গেবোরিয়ো" ও "রহস্যোদ্ভেদে কনান ডয়্যাল" : পাঁচকড়ি দে-র জগত

একদা সেই বাজারে প্রায় সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন পাঁচকড়ি দে। তিনি গোয়েন্দা উপন্যাস লিখে যে প্রভূত লক্ষ্মীলাভ করেছিলেন তা অনেকেই উল্লেখ করেছেন।[17] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেই বঙ্গভঙ্গের বছরে শার্লক হোমসের দুটি বিখ্যাত

---

[14] অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা গল্প (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৯), পৃ. অনির্দেশিত

[15] নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রগল্প', ভারত-মহিলা, ৬ষ্ঠ ভাগ, দশম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

[16] এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি দে বনাম দীনেন্দ্রনাথ রায়-এর ছায়াযুদ্ধ পরে বিশদে আলোচিত হয়েছে।

[17] বারিদবরণ ঘোষ, "রোমাঞ্চন", পাঁচকড়ি দে রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: করুণা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭

উপন্যাস *A Study in Scarlet* ও *The Sign of Four* পাঁচকড়ি দে-র কলমে একমলাটে ঢুকে হয়ে গিয়েছিল গোবিন্দরাম বইয়ে।[18] তবে, বইয়ের গোড়ায় 'বিজ্ঞাপন' অর্থাৎ মুখবন্ধে অংশে লেখক স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, তাঁর লেখায় বিদেশী গল্পের ছায়া আছে:"একই গ্রন্থকারের ইংরাজী ভাষায় দুইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভ উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে "গোবিন্দরাম" সঙ্কলিত। ইহা সঙ্কলন করিতে আমাকে সর্ব্বত্র বড়ই স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে হইয়াছে। মূলগ্রন্থ হইতে বাহুল্য বোধে অনেকস্থান পরিবর্জিত হইয়াছে; কোন কোন স্থান একেবারে স্বকোপলকল্পিত। ইহাতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা আমারই।"[19] অবশ্য, পাঁচকড়ি গোবিন্দরামকে একটি উপন্যাসেই ছেড়ে দেননি। চারটি উপন্যাসব্যেপে গোবিন্দরামের চরিত্রটিকে তিনি একটি ছাঁচে ফেলেছিলেন। প্রতিজ্ঞা-পালন (১৯১৪) উপন্যাসে পৌঁছে দেখা যায় যে, বৃদ্ধ ও বিপত্নীক গোবিন্দরাম গোয়েন্দাগিরি থেকে ভালো রোজগার করে "এখন মাণিকতলার নিকটে সুন্দর বাগান-বাটীতে নির্জ্জনে বাস করেন। আর ডিটেক্‌টিভের কাজ করেন না; লোকজনের সঙ্গে মিশামিশি—দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন।"[20] পাঁচকড়ির খ্যাতি একদিকে যেমন গল্পের অভিনব প্লটের জন্য, তেমনই তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম একজোড়া গোয়েন্দার আমদানি ঘটান। সেই গোয়েন্দা-দ্বয় একদাবিখ্যাত দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র ও তাঁর গুরু ও সহায়ক অরিন্দম বসু।

একের পর এক বাজার-কাঁপানো বই লিখে প্রায় প্রবাদে পরিণত হন পাঁচকড়ি দে। তাঁর বইগুলির অনুবাদের বাজারও বিভিন্ন প্রদেশে বেশ ছড়ানো ছিল।[21] ইংরেজিনবিশ পাঠকের কাছেও যে পাঁচকড়ির বইগুলি জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইংরেজি পত্রিকায় ওঁর বইগুলির আলোচনা থেকে।[22] মুদ্রণসৌকর্য্য ও ছবিসহ সেইসব বই

---

[18] সুকুমার সেন লিখেছেন, "পাঁচকড়ি দে'র নামে প্রকাশিত, 'হরতনের নওলা' কোনান ডয়েলের 'দি সাইন অফ ফোর' (১৮৯০) বইটির অনুবাদ। শার্লক হোমসের গল্পের অনুবাদ বাংলায় এই প্রথম।" দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি (কলকাতা : আনন্দ, ২০১২ [১৯৮৮]), পৃ. ১৮৩। কিন্তু, আদতে হরতনের নওলা বইটি সংকলক শরচ্চন্দ্র সরকারের নামে বেরিয়েছিল। পাঁচকড়ি দে বইটি "আদ্যাপান্ত সংশোধন" করে দিয়েছিলেন বলে প্রকাশক মন্তব্য করেন। হরতনের নওলা উৎসর্গ করা হয়েছিল রাজনারায়ণ বসুকে।

[19] পাঁচকড়ি দে, গোবিন্দরাম (কলিকাতা : বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৫), পৃ. অনির্দেশিত। সেই সময়ে অনেক বইয়ে 'বিজ্ঞাপন' বলে আদতে মুখবন্ধই বোঝানো হত। এই রচনায় মুখবন্ধ অর্থে 'বিজ্ঞাপন' এবং advertisement বা জ্ঞাপন অর্থে বিজ্ঞাপন (উদ্ধৃতি চিহ্নবর্জিত) লেখা হয়েছে।

[20] পাঁচকড়ি দে, প্রতিজ্ঞা-পালন (কলিকাতা : বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ [১৩১৩ বঙ্গাব্দ]), পৃ. ১৪-১৫

[21] পাঁচকড়ি দে-র বই যে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হত। সে-কথা প্রচারও করা হত: "পুস্তকগুলি সর্ব্বত্র এতদূর আদৃত যে, হিন্দী, উর্দু, তেলুগু, তামিল, মারাঠী, গুজরাটী, সিংহলীস্, ইংরাজী প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। চিত্তোত্তেজক উপন্যাস প্রণয়নে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন।" পাঁচকড়ি দে-র বইয়ের তরজমা বিষয়ে দীর্ঘ বিজ্ঞাপনের জন্য দ্রষ্টব্য: পাঁচকড়ি দে, জয় পরাজয় (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. অনির্দেশিত। এই তরজমার বিষয়টি নিয়ে ফ্রাঞ্চেস্কা ওরিসিনি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: Francesca Orsini, *Print and Pleasure : Popular Literature and Entertaining Fictions in Colonial North India* (Ranikhet : Permanent Black, 2017 [2009]), পৃ. ২২৬-২৭২। তবে, ওরিসিনির বক্তব্যের সঙ্গে কিছু দ্বিমত পোষণ করেছেন অরিন্দম দাশগুপ্ত। দ্রষ্টব্য: অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৭), পৃ. অনির্দেশিত।

[22] বিভিন্ন ইংরেজি পত্র-পত্রিকা যেমন, *The Indian Echo*, *The Indian Empire*, *Amrita Bazar Patrika*, *The Illustrated Police News*, *The Bengalee* প্রভৃতিতে পাঁচকড়ি দে-লিখিত বিভিন্ন উপন্যাসের আলোচনা প্রকাশিত হত। দ্রষ্টব্য: দ্রষ্টব্য: পাঁচকড়ি দে, জয় পরাজয় (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ), বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত

মান্য-ইতর ভেদ প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছিল।[23] পাঁচকড়ি দে-র বিখ্যাত উপন্যাস নীলবসনা সুন্দরী (১৯০৪)-র আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন:

> পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ভাল ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ছিল না—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু বঙ্গীয় পাঠকগণের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সমাদর করি। তাঁহার ন্যায়-প্রতি পরিচ্ছেদে এমন নব নব কৌতূহল সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আর কাহারও দেখি না। যদি এমন উপন্যাস পড়িতে চাহেন, যাহা একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, দশবার পড়িয়া দশজনকে শুনাইতে ইচ্ছা করে, তবে এই "নীলবসনা সুন্দরী" পাঠ করুন। পড়িতে পড়িতে যেন এই উপন্যাস চুম্বকের আকর্ষণে পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। ঘটনা যেমন কৌতূ হলজনক, ভাষাও তেমনি সরল ও তরল, যেন নির্ঝরিণীর ন্যায় তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। শব্দচ্ছটাও অতি সুন্দর। বঙ্গসাহিত্যে গ্রন্থকারের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের যথেষ্ট আদর আছে; আমরা আশা করি. ভবিষ্যতে আরও সমাদর লাভ করিবে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু রহস্যবিন্যাসে বঙ্গের গেবোরিয়ো, এবং রহস্যোদ্ভেদে কনান ডয়্যাল; তাঁহার সৃষ্ট অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় লিকো ও সার্লক হোমসের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনীয়।[24]

পাঁচকড়ি দে-ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের বই উৎসর্গ করতেন। জীবন্মৃত-রহস্য (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে— "শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর/শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মহাশয় করকমলেষু"।[25] জীবন্মৃত-রহস্য উপন্যাসের প্রথম নাম ছিল সেলিনা-সুন্দরী।

এহেন উৎসর্গ রবীন্দ্রনাথ কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন জানা নেই, তবে কাহিনীর ভাষার দিক থেকেও পাঁচকড়ি দে-র রচনায় একরকমের আপাত-গাম্ভীর্য ছিল। উপরন্তু, তিনি চেষ্টা করতেন প্রতি পুনর্মুদ্রণে বইকে পরিমার্জিত করার। যেমন, ১৩০৭ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয়বার ছাপার সময় মায়াবিনী (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের ভূমিকায় লেখেন: "এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কণকার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল এবং তিনখানি ছবি দেওয়া হইল"।[26] মায়াবিনী-র আগে যে মায়াবী (১৯০১) 'রহস্যন্যাস' লেখা হয়েছিল সেই বই সম্পর্কে বঙ্গবাসী পত্রিকায় (২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২) লেখা হয়:

> আমরা অন্যান্য অনেক লেখকের ও অনেক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িয়াছি কিন্তু তন্মধ্যে কোনখানি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু লিখিত উপন্যাসের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী নয় নাই। হয়ত সেগুলিতে নানা রকমের বীভৎস ঘটনার দ্বারা কেবল একটা গল্প তৈয়ারী করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বাঁধন নাই, গল্প সাজাইবার যে

---

[23] বইগুলির বিজ্ঞাপনে সুন্দর ছবি ও 'সুরম্য' বাঁধাইয়ের উল্লেখ অবশ্যই থাকত। উপরন্তু অনেক বইতে আখ্যাপত্রে বলে দেওয়া হত "এই পুস্তক মূল্যবান স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক-উড কাগজে ছাপা হইল।" বই পণ্যের প্রতি সংস্কৃতিমনস্ক পাঠকের যে আগ্রহ তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই বিজ্ঞাপনগুলি ছাপা হত।

[24] বঙ্গভূমি, ১৯ মাঘ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ। এই উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য: শরচ্চন্দ্র সরকার, রঘু ডাকাত (কলকাতা : বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ [১৩০১ বঙ্গাব্দ]), সমালোচনা অংশ, পৃ. অনির্দেশিত।। 'গেবোরিয়ো' ফরাসি গোয়েন্দা কাহিনীকার এমিল গাবোরিও এবং 'লিকো' মঁসিয় লেকক।

[25] পাঁচকড়ি দে,জীবন্মৃত-রহস্য (কলকাতা: পাল ব্রাদার্স, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম 'হিপ্‌নটিক উপন্যাস' বলে দাবী করেছিলেন পাঁচকড়ি এবং বইয়ের শেষে পাঠককে শিক্ষিত করতে পরিশিষ্ট হিসাবে ১৪ পৃষ্ঠাব্যেপে লিখেছিলেন 'হিপ্‌নটিজম কি?'।

[26] পাঁচকড়ি দে, মায়াবিনী (কলকাতা: বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯১৫, সপ্তম সংস্করণ), বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত

> একটা কৌশল থাকা দরকার তাহাও নাই। নতুবা হয়ত কোন একখানি ইংরাজি বা ফরাসী উপন্যাসের ধারাবাহিক অক্ষম অনুবাদ। 'মায়াবী'র ঘটনা সর্বাঙ্গসুন্দর। ভাষাও গ্রন্থকারের নিজস্ব, যেমন প্রাঞ্জল তেমনি মধুর। গ্রন্থকারের গল্প সাজাইবার বেশ হাত আছে-রহস্য বিন্যাসের ক্ষমতাও অতুলনীয়। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তি পর্যন্ত পাঠককে বিপুল আগ্রহে অগ্রসর হইতে হয়।[27]

জুমেলিয়া ও 'ভ্রষ্ট' যৌনতার আদর্শছাঁচ

কেবল পত্র-পত্রিকার প্রশংসায় আপ্লুত হয়ে যাননি পাঁচকড়ি। যেহেতু নিজের নামে বই ছাপার ব্যবসাতেই তিনি স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন, তাই সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেকালের রীতিমাফিক কাহিনীর শেষে তাঁর অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপাতেন। সেইসব বিজ্ঞাপনে কখনও আবার ছবিও ছাপা হত। প্রথম খেয়ালেই যেটা নজরে পড়বে তা হল বিজ্ঞাপনগুলির ভাষায় রহস্য-রোমাঞ্চ ও যৌনতার সমন্বয়, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী চরিত্র নিয়ে দ্বিত্ব নির্মাণ। "সুন্দরী রমণীর পৈশাচিক কার্যকলাপপূর্ণ অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী" মনোরমা-র (১৯০৩) বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল:

> ইহাতে দেখিবেন, কামরূপদেশের স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় কি অমানুষিক পরাক্রমে, কি অলৌকিক সাহসে পরিপূর্ণ। সেই ভয়ানক হৃদয়ে, যখন আবার যে প্রেম বিকশিত হইয়া উঠে-সে প্রেমও কত ভয়ানক, কত আবেগময়, দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানপরিশূন্য। সেই পৈশাচিক প্রেমের জন্য অতৃপ্ত লালসায় প্রেমোন্মাদিনী হইয়া তাহারা না পারে, এমন ভয়াবহ কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই। **শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর কোন উপন্যাসই অসার বাজে কথায় পূর্ণ নহে, এমন কি তাঁহার একখানিমাত্র পুস্তক পড়িয়া শেষ করিলে বোধ হয়, যেন ১০/১২ খানি উপন্যাস একসঙ্গে শেষ করিয়া উঠিলাম।**[28]

মায়াবী-র বিজ্ঞাপনেই ছিল সেই ছবি, যা 'স্বপ্নে' দেখেছিলেন প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত: "সেই রাত্রে ভীষণ বিভীষিকার স্বপ্ন দেখলাম। আমি যেন পুণায় বেড়াতে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলায় লাকড়ি ব্রিজের কাছে পা ফস্‌কে জলে পড়ে গেলাম। জোরে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু জলে একটুও শব্দ হল না। একটা ঢেউ উঠল না, একটা বুদ্বুদও নয়। মনে হল একটা বড় কাচের টুকরোর মতন জল আমাকে চারদিক থেকে চেপে রেখেছে। যখন একেবারে ডুবে যাচ্ছি, তখন কয়েকটা শিকড়ের সঙ্গে হাত আটকে গেল। কোনও রকমে সেটা ধরে উঠবার চেষ্টা করছি, এমন সময় উপরের দিকে তাকিয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। পরনে কালো শাড়ি পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার মুখ ভাল করে দেখতে পেলাম না। মনে হল ছেলেবেলায় জুমেলিয়ার যে ছবি দেখেছিলাম তার সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে। আমি যতবার শিকড়

---

[27] পাঁচকড়ি দে, জয় পরাজয়, প্রাগুক্ত, বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত। ঐ আলোচনার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকের মধ্যে তুলনা টানা হয়েছিল: "ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখা বড় শক্ত হইলেও আজকাল উহার লেখকের অভাব নাই— হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যেমন শক্ত; এ বঙ্গদেশে উহার ডাক্তারেরও তেমনি ছড়াছড়ি।"

[28] পাঁচকড়ি দে, মায়াবিনী, প্রাগুক্ত, বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত। নজরটান সংযোজিত

ধরে উঠবার চেষ্টা করছি মেয়েটি ছুরি বার করে শিকড় কেটে দিচ্ছে। আমি হঠাৎ চীৎকার করে উঠলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তার আগে তার মুখের কাপড় সরে গিয়েছিল। এক সেকেন্ডর জন্য দেখতে পেলাম সে মুখ জুমেলিয়ার নয়, সে মুখ সত্যবতীর।"[29]

সে হেন "অভিনব রহস্যময়-ডিটেক্‌টিভ-প্রহেলিকা" সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে:

> ভীষণ ঘটনাবলীর এমন অলৌকিক ব্যাপার কেহ কখনও পাঠ করেন নাই। সিন্দুকের মধ্যে রোহিণীর খণ্ড খণ্ড মৃতদেহ, আসমানী লাস—সেই খুন-রহস্য উদ্ভেদ। নরহন্তা দস্যু-সর্দ্দার ফুলসাহেবের লোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ড এবং ভীতিপ্রদ শোণিতোৎসব। নৃশংস যদুনাথ অর্থ-পিশাচ ক্রুরকর্মা গোপালচন্দ্র, পাপ-সহচর গোরাচাঁদ, আত্মহারা মোহিনী ও নারীদানবী মতিবিবি প্রভৃতির ভয়াবহ ঘটনায় পাঠক স্তম্ভিত হইবেন। ঘটনার উপর ঘটনা-বৈচিত্র্য-বিস্ময়ের উপর বিস্ময়— বিভ্রম-রহস্যের উপর রহস্যের অবতারণা— পড়িতে পড়িতে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। **প্রতারকের প্রলোভনে মোহিনী ধর্ম্মভ্রষ্টা, শোকে দুঃখে মোহিনী উন্মাদিনী, নৈরাশ্যে মোহিনী মরিয়া, কারুণ্যে পরোপকারে মোহিনী দেবী— সেই মোহিনী প্রতিহিংসায় লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পিণী।** দোষে গুণে, পাপে পুণ্যে, কোমলে কঠিনে, মমতায় নির্মমতায় মিশ্রিত মোহিনীর চরিত্র অতি

[29] প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, "ব্যোমকেশ, সত্যবতী ও সত্যবতীর গাড়ি", শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সমগ্র (কলকাতা : আনন্দ, ২০০৭ [১৯৯৫]), পৃ. ২০। বিজ্ঞাপনী ছবিটির উৎস: পাঁচকড়ি দে, মায়াবিনী, প্রাগুক্ত, বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত।

> অপূর্ব্ব। এক চরিত্রে সহস্রবিধ বিকাশ। মোহিনীর চরিত্রে আরও দেখিবেন, **স্ত্রীলোক একবার ধর্মভ্রষ্টা পাপিষ্ঠা হইলে তখন তাহাদিগের অসাধ্য কর্ম্ম আর কিছুই থাকে না।** স্বর্গীয় প্রণয়ের পবিত্র বিকাশ, এবং প্রণয়ের অসাধ্য সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত— কুলসম ও রেবর্তী। এমন সুবৃহৎ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস এ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে বাহির হয় নাই। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে অদম্য আগ্রহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।[30]

কিন্তু শুধু বিজ্ঞাপনী বুলিতে মোটেই বিক্রির চিঁড়ে ভিজবে না, তাই বইটি "না পড়িলে বিজ্ঞাপনের কথায় ঠিক বুঝা যায় না।" উপরন্তু, দীর্ঘদিন বইটি পাওয়া যাচ্ছিল না বলে হাজার হাজার পাঠক যে চিঠি লিখে পুনঃপ্রকাশের জন্য তাগাদা দিয়েছে সেই কথাটাও আলগোছে বলে চাহিদার কাল্পনিক বাজার সম্পর্কে ধারণাও দেওয়া হল।[31]

পাঁচকড়ি দে-র বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনীর মূল চরিত্র জুমেলিয়া। মায়াবিনী উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে জুমেলিয়া চরিত্রটির কাজকারবার সম্পর্কে ছোট্ট বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট ছিল: "**জুমেলিয়া নাম্নী কোন নারীপিশাচীর ভীতিপ্রদ ঘটনাবলী।** সেই পিশাচী অপেক্ষা আরও ভয়ানক রমণী জুমেলিয়ার লোম-হর্ষণ বিভীষিকাময় হত্যা-উৎসব পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত ও ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়।"[32] হত্যা-রহস্য (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের বিজ্ঞাপনেও সেই দেবী/দানবী বৈপরীত্যটিকেই বিপণনের মুখ্য বিষয় করে তুলতে দেখা যায়:

> রূপজমোহে মুগ্ধ হইলে মানুষ কেমন করিয়া পাপের অধস্তন গহ্বরে নিমজ্জিত হয়, নরহত্যাকাণ্ডে হস্তপ্রসারণ করিতেও সঙ্কোচ করে না: **আবার এদিকে যখন প্রেমের পূর্ণজ্যোতি হৃদয়ে বিভাসিত হয়— তখন নারী কিরূপে দেবীর আসন প্রাপ্ত হয়— আবার তাহারই বিকারে কিরূপে রমনী দানবী সাজে, তাহা ইহাতে সুচিত্রিত দেখিবেন**, আরও দেখিবেন, লোমহর্ষণ ভীষণ নরহত্যা— সয়তানের প্রলোভনে মানবের অধঃপতন— দেবত্ব হইতে পশুত্বে পরিণত। তাহার পর অপার্থিব প্রেমের অমর-কাহিনী— পবিত্র মন্দাকিনী-ধারার বিপুল প্লাবন।[33]

বইটি যে সচিত্র তার উল্লেখ করে বাঁধাই সম্পর্কে বিশেষ করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়: "সুদৃঢ় স্বদেশী বাঁধান"।[34] বিজ্ঞাপনের এই শৈলী অবশ্য কেবল পাঁচকড়ি দে-র বইয়ের ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না। শরচ্চন্দ্র সরকারের মৃত্যু-রঙ্গিনী (১৩০২ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল: "এই উপন্যাসের নায়িকাসুন্দরী যথার্থই মৃত্যু-রঙ্গিনী বটে! **এই রমণী, পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী**, নরহত্যা, নারীহত্যা, স্বামী হত্যা, হত্যার উপরে হত্যা; এই রমণী সাহসে

---

30 পাঁচকড়ি দে, মায়াবিনী, প্রাগুক্ত, বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত। নজরটান সংযোজিত

31 তদেব

32 পাঁচকড়ি দে, সুহাসিনী ও ঠিকে ভুল (কলকাতা: বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৮, নূতন সংস্করণ), বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত। নজরটান সংযোজিত। সুহাসিনী ও ঠিকে ভুল দুটি আলাদা কাহিনী।

33 পাঁচকড়ি দে, মায়াবিনী (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, একাদশ সংস্করণ), বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত। নজরটান সংযোজিত সংযোজিত। প্রসঙ্গত বলা যায়, সেলিনা-সুন্দরী বা জীবন্মৃত-রহস্য উপন্যাসেও জুলেখা চরিত্রটি সম্পর্কেও বিজ্ঞাপনে 'নারী-নাগিনী', 'প্রলঙ্করী', 'ডাকিনী' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছিল।

34 তদেব

প্রতাপে, কৌশলে চাতুর্য্যে, শঠতায়, দম্ভে, গর্ব্বে কোন অংশে রঘু ডাকাতের কম নহে; ইহাকে মেয়ে রঘু ডাকাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।”[35]

মনীন্দ্রনাথ বসুর লেখা ও পাঁচকড়ি দে-র সম্পাদনায় প্রকাশিত ভীষণ-প্রতিশোধ উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে খেয়াল করার মত শব্দ ছিল ‘রমণী ধর্ষণ’। নারী হত্যা কিংবা ‘পিশাচী’ জাতীয় শব্দের বহুল প্রচলন থাকলেও আলাদা করে ধর্ষণের উল্লেখ বিজ্ঞাপনে খুব বিরল। সেইদিক থেকে এই বিজ্ঞাপনটি স্বতন্ত্র। মনীন্দ্রনাথ বসুর বাবা ছিলেন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও আদিপর্বের জাতীয়তাবাদী চিন্তক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। অথচ মনীন্দ্রনাথের বংশপরিচয় গোয়েন্দা গল্প লেখায় এবং সেখানে যৌনতামূলক ও নারীর প্রতি ধর্ষণের মত হিংসাত্মক নানান প্রসঙ্গ বা ঘটনার কথা উল্লেখ করায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সেই বিজ্ঞাপনে বলা ছিল:

> এ যে-সে প্রতিশোধ নহে— অস্ত্রে অস্ত্রে— রক্তে রক্তে— জীবনে মরণে প্রাণঘাতী ‘জ্বলন্ত প্রতিশোধ! বিষ প্রয়োগ-ঘাতক নিয়োগ! অকূল সমুদ্রবক্ষে জাহাজে জাহাজে ভীষণ যুদ্ধ-কার্মান গর্জ্জন— মুহুর্মুহুঃ জ্বলন্ত গোলাগুলি বর্ষণ— রমণী ধর্ষণ; এক সুন্দরী শিরোমণি রূপসীরাণী রমণীকে লইয়া প্রণয়-বিদ্বেষে সাংঘাতিক সংঘর্ষ! আদালত-প্রাঙ্গণে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করিয়া ভীষণ নারী-হত্যা, নদীগর্ভে নরকঙ্কাল উদ্ধার! ইংরাজ ডিটেক্‌টিভের সহিত ভারতবর্ষীয় ডিটেক্‌টিভের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা-উভয়েই মহা চতুর। যাহা কখনও পড়েন নাই, এইবার পড়ুন।[36]

ভীষণ প্রতিশোধ বইটি পড়লে ভীষণ-প্রতিহিংসা উপন্যাসটিও পড়তে হবে বলে বিজ্ঞাপনে দাবি করা হতো: “আপনি যদি ‘ভীষণ প্রতিশোধ’ পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে ঠিক সেই ধরণের চমকপ্রদ ঐন্দ্রজালিক রহস্যপূর্ণ এই উপন্যাসখানিও আপনি না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহাতেও রহস্য তেমনি গভীর-নিবিড়-ঘটনা-বৈচিত্র্যে তেমনি লোমহর্ষণ-ভীষণ হইতে ভীষণতর, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিস্ময়ে স্তম্ভিত-ভয়ে শিহরিত-উদ্বেগে অস্থির-গভীর চক্রান্তে চমকিত-আগাগোড়া অতুল কৌতূহলে আকুল করিয়া তুলিবে।”[37]

অর্থাৎ, বাজার ধরার মূলমন্ত্র ছিল লোমহর্ষক রহস্য ও যৌনতা। উনিশ শতকী সংস্কার ও বিশ শতকী জাতীয়তাবাদের ছাঁচে-ঢালা বাঙালি শিক্ষিত সমাজে বাহ্যত যৌনতা সম্পর্কে যে নীতিবাগীশ শুচিতার ধারণা ছিল, তার তলায় তলায় সেই যৌনতাকেই পণ্যায়িত করা হয়েছিল গোয়েন্দা কাহিনীতে। উপরে আলোচিত বিজ্ঞাপনগুলির ভাষা তারই প্রমাণ। সঙ্গে ছিল নানান ছবি। সেই ছবিগুলিতে স্খলিতবসনা নারীর প্রতিকৃতি প্রায়ই দেখা যেত। ফলে, এক গোপন যৌন কল্পজগতের হাতছানির উৎস হয়ে উঠেছিল ঐ গোয়েন্দা কাহিনীগুলি। তাই বারেবারে জনসমক্ষে সেগুলির সঙ্গে সামান্যতম সংস্রবও খারিজ করাই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কৌলীন্যের দস্তুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, কেবল নারী-কেন্দ্রিক যৌনতার টানে পুরুষ পাঠক তবু যদি-বা আসে, মহিলা পাঠকের বাজারই-বা বাদ থাকবে কেন?

---

[35] শরচ্চন্দ্র সরকার, মৃত্যু-রঙ্গিনী (কলকাতা: বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৮, দ্বিতীয় সংস্করণ [১৩০২ বঙ্গাব্দ]), বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত। নজরটান সংযোজিত

[36] পাঁচকড়ি দে, মায়াবিনী, প্রাগুক্ত, একাদশ সংস্করণ, বিজ্ঞাপন অংশে মুদ্রিত।

[37] তদেব

ফলে, সতী-লক্ষ্মীর উল্টোদিকে উদ্দাম যৌনাচারী পিশাচী— এই বৈপরীত্য তথা দ্বিত্বের নির্মাণে জোর পড়েছিল। দেবেন্দ্রবিজয়কে মধ্যে রেখে রেবতী ও জুমেলিয়ার চরিত্রে সেই বিপরীত ভাবের নির্মাণ করেছিলেন পাঁচকড়ি। সাহিত্যে যৌন বর্ণনার সমকালীন মাপকাঠিকে ভেঙে-গড়ে নিয়েছিলেন তিনি। তার আদর্শ উদাহরণ জুমেলিয়ার সঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয়ের দুটি সাক্ষাৎ-বর্ণনা। মায়াবিনী উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রবিজয়কে জুমেলিয়া চিঠিতে লিখছে:

> তুমি যুবা বটে, কিন্তু বড় ধর্মভীরু। কি ভ্রম, তোমাকে ভালবাসিতে আমার প্রাণ চায়; চাহিলে হইবে কি, তুমি যা' চাহিবে, তা' আমি জানি; তুমি যে আমাকে ভালবাসিবে না— তা আমি জানি, তাই ত তোমার উপর আমার এত ঘৃণা। জুমেলিয়া শুধু ঘৃণা করিতে জানে না— জুমেলিয়া শুধু হিংসা করিতে জানে না —জুমেলিয়া শুধু শঠতা করিতে জানে না— জুমেলিয়া ভালবাসিতেও জানে। যদি তুমি আমার প্রতি একবার প্রেম-কটাক্ষপাত করিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে, জুমেলিয়া কেমন ভালবাসিতে জানে, কেমন সোহাগ করিতে জানে, কেমন আদর করিতে জানে, কেমন স্বর্গীয় সুখসাগরে প্রেমিককে ভাসাইতে জানে। বুঝিতে পারিতে, জুমেলিয়ার মুখচুম্বনে কত সুখ পাওয়া যায়। জুমেলিয়ার বুকে বুক রাখিলে কেমন তৃপ্তি হয়![38]

অবশ্য সেখানেই থামেননি পাঁচকড়ি। ঐ একই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আবারও যখন দেবেন্দ্রবিজয় ও জুমেলিয়া সংঘাতমুখর পরিস্থিতিতে একে অন্যকে আক্রমণ করতে উদ্যত, তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের ছুরির সামনে জুমেলিয়া নিজেকে সমপর্ণ করেছে। সেই সমর্পণের দৃশ্য বর্ণনা করছেন পাঁচকড়ি:

> তোমার পদতলে তোমার নিকটস্থ গুপ্ত অসির সম্মুখে এই বুক পাতিয়া দিতেছি; কোন্ অস্ত্র শাণিত করিয়া আনিয়াছ— জুমেলিয়ার বুকে বসাইয়া দাও। নির্দয় দেবেন্— নিষ্ঠুর দেবেন্! সুন্দর বক্ষ অস্ত্রে বিদ্ধ করিতে, একজন স্ত্রীলোকের বক্ষ অস্ত্রদীর্ণ করিতে যদি তুমি কিছুমাত্র কাতর না হও, তাহাতে যদি তোমার আনন্দ হয়— কর পার কর—এই তোমার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিলাম!
> এই বলিয়া জুমেলিয়া বক্ষের বসন ও কাঞ্চলী খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। জানু পাতিয়া বসিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের সমক্ষে সেই স্নিগ্ধ শশাঙ্ক-করে কামদেবের লীলাক্ষেত্রতুল্য পীনোন্নত বক্ষ পাতিয়া দিল।[39]

এরপরেই আখ্যান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সরাসরি পাঠকের সঙ্গে কথা জুড়লেন পাঁচকড়ি, তাদের মনে উশকে দিলেন এক আবহ, যেখানে যৌনতার উপরে ভাষার কারিকুরির আড়াল তোলার চেষ্টা স্পষ্ট, তাতে একদিকে যেমন পাঠকের যৌন আবেদনকে পণ্যায়িত নারী শরীরের কল্পনায় মাতিয়ে তোলা যাবে, তেমনই শব্দের অনুপ্রাসবাহুল্যে সেই যৌন বর্ণনার উপরে আপাত এক সভ্যতার আস্তরণ দেওয়া যাবে। :

> পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন, এ দৃশ্য কতদূর কল্পনাতীত! মাথার উপরে নীলানন্ত নির্মূল গগনে থাকিয়া শশী অনন্তকিরণপ্লাবনে জগৎ ভাসাইয়া সুধাহাসি হাসিতেছিল; কাছে—দূরে—এখানে—ওখানে থাকিয়া নক্ষত্রগুলা ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। বৃক্ষাবলীর অগ্রভাগারূঢ়পত্রগুলি ধীরে ধীরে হেলিতে-দুলিতেছিল; নিম্নে—পার্শ্বে—পশ্চাতে—দূরে—অতিদূরে অনন্ত নিস্তব্ধতা; সেই ঘোর নীরবতার মধ্যে শশিকিরণে আভূমিপ্রণত শ্যামলতা নীরবে দুলিতেছিল; নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত, পীত, লোহিত

[38] তদেব, পৃ. ২৬-২৭

[39] তদেব, পৃ. ৫৩-৫৪

> ফুল্লফুলদল বিকসিত ছিল। সেই নির্জ্জন, নীরব উদ্যানমধ্যে দেবেন্দ্রবিজয় দণ্ডায়মান; তাঁহার সম্মুখে— দৃষ্টিতলে অর্দ্ধবিবস্ত্রভাবে জুমেলিয়া চন্দ্রকরোজ্জ্বল অনাচ্ছাদিত পীনোন্নত পীবর বক্ষ পাতিয়া বসিয়া।[40]

আত্মবলদর্পী সটান দাঁড়ানো পুরুষের সামনে নতজানু আত্মনিবেদিত নারী— পাঠকের অহংদীপ্ত পৌরুষ ছুঁয়ে যেতে এর থেকে উপযুক্ত উপমা তৈরি করতে পারতেন না পাঁচকড়ি। কিন্তু, সেই পুরুষ গোয়েন্দা, ও ঐ নারী তার ঘোষিত শত্রু, যে তার স্ত্রীকে বন্দী করেছে। কিন্তু, দেবেন্দ্রবিজয়ের শরীরে সেই দৃশ্য হিল্লোল তুলল: "দেবেন্দ্রবিজয় বিচলিত হইলেন, বারেক সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; প্রত্যেক ধমনীর শোণিত-প্রবাহে যেন একটা অনুভূতপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক প্রবাহ মিশিয়া সর্ব্বাঙ্গে অতি দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। কি— বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রবিজয় নীরবে রহিলেন।"[41] জুমেলিয়ার হাতে বন্দী স্ত্রী রেবতীকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর দেবেন্দ্রবিজয় পরমুহূর্তেই কর্তব্যে অটলচিত্ত, স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্তি। 'পিশাচী' জুমেলিয়া শরীরের প্রলোভনে দেবেন্দ্রবিজয়কে 'অন্যায়' পথের শরিক করে তুলতে চায়, কিন্তু সেই প্রলোভন অগ্রাহ্য করে এক পত্নীগতপ্রাণ শিক্ষিত ভদ্রলোক যুবক। 'পিশাচী'র শরীরী প্রেমকে তুচ্ছ করে 'সতী-সাধ্বী' স্ত্রীর আদর্শায়িত প্রেমের দিকে বারেবারে ফিরে যাওয়ার যে ছক সংস্কারমনস্ক বঙ্গীয় সমাজের বিভিন্ন বর্গের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল, তা পাঁচকড়ি প্রমুখের গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতেও নানান ভাবে বিভিন্ন নামে ফিরে ফিরে এসেছিল। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে কীভাবে 'ভ্রষ্টা' নারীর বর্ণনায় সুগঠিত ও উন্নত স্তনকেই প্রধান বিষয় করে তোলা হয়েছে। "পীনোন্নত পীবর বক্ষ"— এই বর্ণনার একাধিক ব্যবহার পাঠকের মনে যে এক সুনির্দিষ্ট রূপকল্প হাজির করবে, তাতে লেখক নিশ্চিত ছিলেন। উপরন্তু, ছিল কাঠখোদাই চিত্র, যেখানে জুমেলিয়ার প্রতিকৃতিতে উন্মুক্ত স্তন স্পষ্ট দেখানো হয়েছে।

বস্তুত, একটি বিষয়ে সংস্কারমুখী উচ্চবর্গীয় বিভিন্ন সামাজিক প্রতর্কের সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনীর মনোভঙ্গির মিল বিশেষত লক্ষণীয়— নগরের গণিকা ও 'ভ্রষ্টা' নারী। উনিশ শতকের কলকাতার 'নিষিদ্ধ পল্লী'তে একটি চালু প্রবাদ ছিল— "মাছ খাবি তো ইলিশ; নাঙ্গ ধরবি তো পুলিশ"। পুলিশ 'বাবু' থাকলে বারাঙ্গনাকে অন্য পুলিশ হেনস্থা করত না। উপরন্তু, পুলিশ 'নাঙ্গ'-এর ভয়ে গুন্ডা-বদমায়েশের হুজ্জুতির থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। উনিশ শতকী কলকাতার বেশ্যাপল্লীতে পুলিশের প্রচণ্ড দাপট ছিল। বস্তুত, পুলিশের অত্যাচারের প্রধান লক্ষ্য ছিল গরিব বারাঙ্গনারা। কারণ, প্রতিষ্ঠিত বাবুদের আশ্রয়ে থাকা গণিকাদের পুলিশ ঘাঁটাতে যেত না।[42] সংস্কারমনা শিক্ষিত ভদ্রলোকের চোখে সামাজিক পরিসরে বেশ্যার উপস্থিতিই একটি 'সমস্যা'। ফলে, বিংশ শতকের গোড়াতেই প্রবাসী পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি সম্পর্কে "কলকাতা: লোকসংখ্যা" শিরোনামের এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল যে, কলকাতায় (প্রতিবেদক কলকাতা বলতে 'সহরতলী'সহ পুরো ভৌগোলিক পরিসরটিই

---

[40] তদেব

[41] তদেব

[42] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সারজন্ থানার চৌকিদার', উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৩ [২০০৮]), পৃ. ২৮৮-২৯০

বুঝিয়েছেন) "মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অনেক অধিক প্রচলিত", এবং "অন্য সকল ধর্মাবলম্বী অপেক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে অনুপাতে বিধবার সংখ্যা অধিক"।[43] একই সঙ্গে ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "কলিকাতায় বেশ্যাদের মধ্যে শতকরা ৮৮.৯ জন হিন্দু,...অথচ কলিকাতার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুরা শতকরা ৬৫ জন মাত্র। সুতরাং হিন্দুসমাজ হইতে এত অধিক বেশ্যার উদ্ভব, হিন্দুহিতৈষী মাত্রেরই চিন্তার বিষয়।"[44] হিন্দু বেশ্যার এহেন সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকের প্রতি উক্ত প্রতিবেদকের স্পষ্ট বক্তব্য হল, "কলিকাতায় স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার এত পার্থক্য বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা না কমিলে কলিকাতায় দুর্নীতির স্রোত বাড়িয়া চলিবে।"[45]

ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী কলকাতায় এহেন লিঙ্গগত অসাম্যের ফলে একদিকে যেমন পেশা হিসাবে গণিকাবৃত্তির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল, তেমনই তাদের সঙ্গে অপরাধের সংস্রব পুরুষ কাহিনীকারদের আখ্যানে বারেবারে ফুটে উঠেছিল। প্রিয়নাথের দারোগার দপ্তর-এর দুর্ধর্ষ চরিত্র ত্রৈলোক্যতারিণী, বা পাঁচকড়ি দে-র জুমেলিয়া— সর্বত্রই দেহোপজীবিনী কিংবা সংসারত্যাগিনী 'ভ্রষ্টা' নারীর 'কুপথ'গামিনী হয়ে ওঠার মূলসূত্রটি নজর এড়ায় না।[46] প্রসঙ্গত বলা যায়, দারোগার দপ্তর প্রকাশ করার আগে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের "সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত নারী চরিত্র" আদরিণী প্রকাশ পায়।[47] সেই বইয়ের বিজ্ঞাপনে লেখক বলেন:

> হরিদাসী কি রূপে আপন **স্বতীত্ব-ধর্ম্ম** বার বার রক্ষা করিয়াছে তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত তাহার জীবনের প্রকৃত ঘটনার দুই একটা বিষয় মাত্র অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইল।.... হরিদাসী **সতীত্ব ধর্ম্ম** রক্ষার নিমিত্ত আপন জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, **এই দৃষ্টান্তে যদি একটা মাত্র স্ত্রীলোকেরও কিছু মাত্র জ্ঞান লাভ হয়** তাহা হইলে সমস্ত শ্রম ও ব্যয় সার্থক মনে করিব।[48]

বস্তুত, গোয়েন্দা কাহিনীর বাঁধা ছক বলতে যে সূত্র অনুসন্ধান ও অবরোহী যৌক্তিক প্রণালী প্রয়োগ করে সন্দেহভাজনদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অপরাধীকে শনাক্ত করার প্রক্রিয়া বোঝায়, সেই নিরিখে পাঁচকড়ি দে কিংবা শরচ্চন্দ্র সরকার বা মণীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের উপন্যাসগুলি খাপ খায় না। বরং, বাংলায় আদিপর্বের গোয়েন্দা কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল রোমাঞ্চকর ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা। তার সঙ্গে ভাষার আপাত সৌকর্য্য ও তলায়

---

[43] প্রবাসী, তৃতীয় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১০, পৃ. ২০০-২০৫

[44] তদেব

[45] তদেব

[46] শম্পা রায় ওঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বাংলা গোয়েন্দা গল্পের আদিপর্বে মূলত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও সমকালীন লেখকদের রচনায় বহু নারী অপরাধীর চরিত্র উঠে আসার একটা কারণ হতে পারে যে, উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশক থেকে সম্পত্তির অধিকার দাবি করে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছিলেন বাঙালি মেয়েরা। তাঁদের সম্পর্কে পুরুষ সমাজের একাংশের বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই বোধ হয় প্রতিফলন ঘটেছিল গোয়েন্দা আখ্যানগুলিতে। দ্রষ্টব্য: Shampa Roy, *Gender and Criminality in Bangla Crime Narratives : Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries* (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017)

[47] প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, আদরিণী, (কলিকাতা: এ জি সেন কোম্পানি, ১৮৮৭)। বইটি কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট হেনরি স্যামুয়েল জনস্টনে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

[48] 'বিজ্ঞাপন', তদেব। নজরটান সংযোজিত

আলো-আঁধারির আবছায়ায় যৌন কল্পজগতকে উশকে দিয়েই বাজার তৈরি করেছিলেন ঐ আদিপর্বের লেখকরা। পাঠকের চাহিদা পাঁচকড়ি স্পষ্টই বুঝতেন:

> **আমার উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠকের চিত্তরঞ্জন! অদ্যাপি আমার যে কয়েকখানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় সেই উদ্দেশ্যে লিখিত।** ইহাও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত। ইহাতেও আমি সেই উদ্দেশ্য-সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমার যত্ন ও চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের বিচারাপেক্ষ। ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখিয়া আমার সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে আমি যেরূপ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব উৎসাহ পাইয়াছি, ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেইরূপ উৎসাহ পাইলে, এই ধরণের আরও দুই-একখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা আছে।... **চিত্তোত্তেজক উপন্যাস (Sensational Novel) সকলেরই পক্ষে উপাদেয়— বিশেষতঃ কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত বঙ্গীয় পাঠকগণের পক্ষে। কারণ, তাঁহাদের অবসর খুব কম। সেই ক্ষুদ্র অবসরে ভাববহুল, এবং গভীর গবেষণা ও নীতিপূর্ণ উপন্যাস অপেক্ষা এইরূপ ঘটনাবহুল চিত্তাকর্ষক উপন্যাস প্রীতিকর।**[49]

স্পষ্টই বোঝা যায় এই কাজের চাপে নুব্জ, ক্লান্ত "বঙ্গীয় পাঠক" মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত কেরানি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। সেই সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক তাচ্ছিল্য যতই হোক, আদতে গোয়েন্দা কাহিনীর বইয়ের বাজার তাদের চাহিদার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ফলে, পাঁচকড়ি তাদের নিয়েই ভাবিত, এবং এক্ষেত্রে পাঠক ও লেখক উভয়েই এক সাধারণ রুচি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় জুড়ে যাচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে ঘড়ির-শাসনে-বাঁধা কেরানি-শ্রমিকের অবসর অল্প। সেই সামান্য অবসরে যদি সংস্কৃতি চর্চা করে মনের আনন্দ— "চিত্তরঞ্জন"— জোগাড় করতে হয়, তাহলে মেধাবী রচনা নয়, যৌনতার ছোঁয়ালাগা রোমাঞ্চকর গল্পই তাদের ক্লান্তিতে ঢুলে পড়ার বদলে পাতার পর পাতা উল্টে যাওয়ার উৎসাহ জোগাবে। কিন্তু, সংস্কার-প্রিয় সমাজে উচ্চবর্গীয় প্রতীতি ছিল যে, কেবল চিত্ত মাতানোই সাহিত্যের কাজ নয়। হোক-না গোয়েন্দা কাহিনী ঔপনিবেশিক আধুনিকতার দোসর, তবু তারই মধ্যে সুযোগ পেলেই ঐতিহ্যের অনুকীর্তন করে যেতে হবে।

সুগন্ধী নির্যাসের জন্য বিখ্যাত শেখ ফসিউল্লার প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা উপন্যাস রমা। বইটির প্রকাশকাল ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ। ততদিনে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ঝাঁজ কমেছে, ঢাকায় মুসলিম লিগ তৈরি হয়ে গেছে (১৯০৬), পূর্ববঙ্গে দাঙ্গার উপক্রম হবে। সেই সময়েই প্রকাশিত রমা-র মুখপাতে (frontispiece) মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ভূপেন্দ্র নাথ দত্তর ছবি ছিল। গোয়েন্দা রহস্যের বইতে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের ছবি বেশ বিরল, কিন্তু মান্যতা নির্মাণের প্রক্রিয়াটিও খেয়াল রাখতে হবে। রোমাঞ্চকর লোমহর্ষক চটকদারির সঙ্গে যদি কাজের কথাও উপন্যাসে ঢুকিয়ে দিতে হয় তাহলে সেই কথার ধাঁচটা অবশ্যই হতে হবে ঐতিহ্যের পুনঃস্মরণ। গোয়েন্দা প্রবোধচন্দ্রের দক্ষতায় রমার স্বামী ঔপনিবেশিক আদালতে বেকসুর খালাস পায়। কিন্তু, যোগীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুযায়ী সেই মুক্তির পিছনে শেষাবধি গোয়েন্দার তদন্ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়, আসলে জরুরি ছিল ধর্মাচরণ। ধর্মের পথে থাকলে পাপীর সংহার এবং পুণ্যবান-পুণ্যবতীর (তারা অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী) জয় নিশ্চিত:

---

[49] পাঁচকড়ি দে, জীবন্মৃত-রহস্য (কলকাতা: পাল ব্রাদার্স, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ), 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপন', পৃ. অনির্দেশিত। নজরটান সংযোজিত

> অন্ন-চিন্তায় মনমোহনকে আত্মহারা হইতে হইয়াছিল; বন্ধু প্রবোধকুমার না থাকিলে বোধ হয় তাহাদিগকে কতদিন একেবারে উপবাসী থাকিতে হইত; কিন্তু ধার্ম্মিকের উপবাস ত ভগবানের অভিপ্রেত নয়; ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে তাহার অন্নাভাব হয় না; **ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে সকলপ্রকারে রক্ষা করেন।**...অতএব অধর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে প্রাণান্ত হইলেও তাহা অবশ্য পালনীয়; তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের রমা ও মনমোহন।[50]

কাহিনীর শেষে লেখক সরাসরি পাঠককে কোনো কল্পনার সুযোগ না-দিয়ে নৈতিক উপদেশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন:

> পাঠক! আপনি এই ধার্ম্মিক সংসার এবং এই ধার্ম্মিক দম্পতীর পবিত্র চরিত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মে জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে তাহাদের মত অতুল ঐশ্বর্য্য ও সোণার পুত্র কোলে লইয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিবেন।... স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হউন, স্বদেশরেণু স্বর্ণরেণু অপেক্ষা মূল্যবান মনে করিয়া স্বদেশব্রতে প্রাণপণ করুন। স্বদেশবাসী ভ্রাতাগণের প্রত্যেক কাজে সহায় হইয়া মনমোহন ও রমার ন্যায় স্বদেশ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন, ধন যথার্থ সৎপথে ব্যয়িত হইবে, জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক হইবে। ভারতের ইতিহাসে ভারতবাসীর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। যে বিদেশী বণিকগণ তোমাদিগকে অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহারাই আবার তোমাদের কার্য্য দেখিয়া ভারত-পূজ্য আর্য্যবংশধর জ্ঞানে মহামান্য করিবে।[51]

উপন্যাসটির সময়কাল খেয়াল রাখলে যোগীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপদেশনা কাহিনীর গোয়েন্দার কেরামতি ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্ম ধারণাটিকে তিনটি স্তরে ব্যবহার করেছেন তিনি— প্রথম স্তরে ব্যক্তিগত ভাগ্যচক্রের আবর্তনে ধর্মের ভূমিকা। ঘোরার নিয়মেই সময় বদলাবে, তবুও সুখ-দুঃখের টানাপোড়েনে প্রকৃত ধার্মিক স্থিতধী হয়ে নিজের ধর্মানুশীল থেকে সরবে না। দ্বিতীয় স্তরে, ধর্মের অনুশীলনে কেবল যে পারলৌকিক লাভ তাই নয়, ইহলোকেও অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও পুত্র সন্তান পাবে। পুত্রই ঐশ্বর্যভোগের দাবিদার, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তৃতীয়ত, ধর্মের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে জাতীয়তাবাদ— স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে আহ্বান করাটা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মতাদর্শ যেমন, তেমনই খেয়াল রাখতে হবে যোগীন্দ্রনাথের পোষ্টা শেফ ফসিউল্লাহ সুগন্ধীর ব্যবসা। পাশাপাশি, দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রভৃতি ধর্মাচরণ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। ততদিনে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে দেশভক্তির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অনেকটা গাঢ় হয়েছে। আর একেবারে শেষে দেশে শ্রেষ্ঠ তাই 'পূজ্য' এক কল্পিত আর্য-গৌরবকে ভারতীয়ত্বের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের অঙ্গ করে তুলছেন যোগীন্দ্রনাথ।

---

[50] যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রমা (কলকাতা: শেফ ফসিউল্লা সাহেব, ১৯০৭), পৃ. ১৪২-১৪৩। নজরটান সংযোজিত। এই বইটি যোগীন্দ্রনাথ "কলিকাতা, সিমলানিবাসী বন্ধুবর ক্ষেত্র মোহন ঘোষ মহাশয়ের পবিত্র কর কমলে" উৎসর্গ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রমোহন যদি প্রতাপচাঁদ প্রভৃতি বইয়ের লেখক হন, তাহলে কি তিনি কোনো এক সময়ে বর্ধমানের গৌরডাঙা ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন?

[51] তদেব, পৃ. ১৪৫

গোয়েন্দা কাহিনীর প্রতি "শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা" : দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রকল্প

পাঁচকড়ি-প্রদত্ত জুমেলিয়ার বর্ণনা হজম করে জনসমক্ষে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ায় লোকলজ্জার ভয় থাকলেও, তথাকথিত গুরু ও লঘু সাহিত্যের দা-কাটা বিভাজন আদৌ বাস্তবে দেখা যেত কিনা তা নিয়ে বিতর্ক তোলাই যায়। সুকুমার সেন লিখেছেন, "সেকালে ইংরেজী শিক্ষিত ভাল ভাল লোকেরাও আগ্রহ করে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তেন"।[52] বস্তুত, সমকালীন বইয়ের বিজ্ঞাপন থেকেও মনে হয় যে, তথাকথিত 'সৎ' ও 'অ-সৎ' সাহিত্যের পাঠকে বিশেষ শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী (১৮৬৯) উপন্যাসের উপসংহার হিসাবে বাবু সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য লিখেছিলেন হেমচন্দ্র। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকা ও *The Bengalee* সেই বইয়ের সুখ্যাতি করেছিল। তারই বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, হেমচন্দ্র কিনলে সঙ্গে 'উপহার' হিসাবে পাওয়া যাবে চিঠিতে খুন (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)। আবার এহেন "দার্শনিক পণ্ডিত" সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যই লিখেছিলেন "লোমহর্ষণ ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস" হত্যা-বিভীষিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। সেই বইয়ের শেষে প্রকাশক যে নতুন বইয়ের তালিকাটি ছেপেছিলেন তা খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ মেধাজীবীরা যতই আক্ষেপ করুন, আদতে তাঁদের সগোত্রীয় বর্গে গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠক-লেখকের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল।

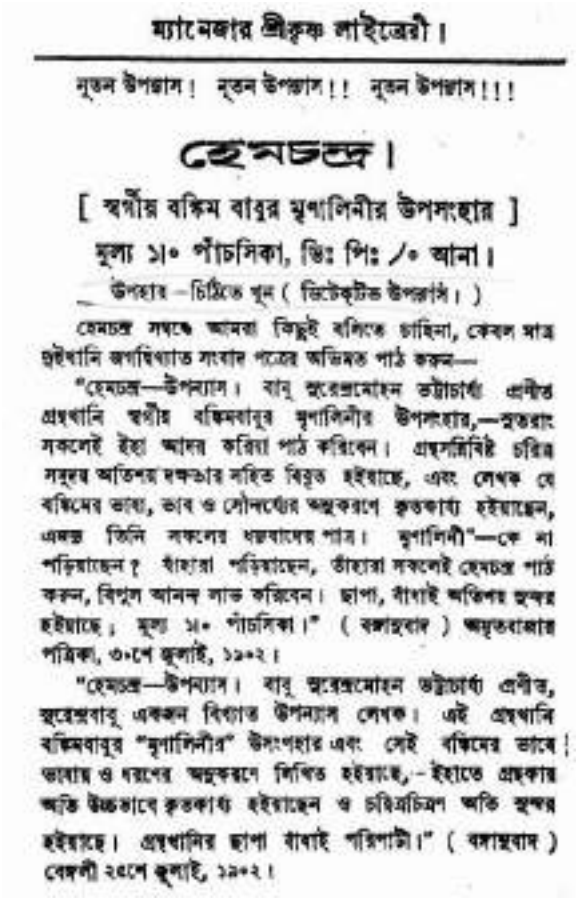

ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

নূতন উপন্যাস! নূতন উপন্যাস!! নূতন উপন্যাস!!!

হেমচন্দ্র।

[স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনীর উপসংহার]

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, ভিঃ পিঃ ৶০ আনা।

উপহার – চিঠিতে খুন (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাহিনা, কেবল মাত্র দুইখানি জগদ্বিখ্যাত সংবাদ পত্রের অভিমত পাঠ করুন—

"হেমচন্দ্র—উপন্যাস। বাবু সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থখানি স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনীর উপসংহার,—সুতরাং সকলেই ইহা আদর করিয়া পাঠ করিবেন। গ্রন্থসন্নিবিষ্ট চরিত্র সমূহ অতিশয় দক্ষতার সহিত বিবৃত হইয়াছে, এবং লেখক যে বঙ্কিমের ভাষা, ভাব ও সৌন্দর্য্যের অনুকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। মৃণালিনী"—কে না পড়িয়াছেন? যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হেমচন্দ্র পাঠ করুন, বিপুল আনন্দ লাভ করিবেন। ছাপা, বাঁধাই অতিশয় সুন্দর হইয়াছে; মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।" (বঙ্গানুবাদ) অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০শে জুলাই, ১৯০২।

"হেমচন্দ্র—উপন্যাস। বাবু সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত, সুরেন্দ্রবাবু একজন বিখ্যাত উপন্যাস লেখক। এই গ্রন্থখানি বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনীর" উপসংহার এবং সেই বঙ্কিমের ভাবে ভাষায় ও ধরণের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে,—ইহাতে গ্রন্থকার অতি উচ্চভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ও চরিত্রচিত্রণ অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থখানির ছাপা বাঁধাই পরিপাটী।" (বঙ্গানুবাদ) বেঙ্গলী ২৫শে জুলাই, ১৯০২।

—নূতন পুস্তকের তালিকা—

মধু মিলন	(মিলন মধুর উপন্যাস)	চতুর্থ সংস্করণ
সাইরীমেরে	(রহস্যময় উপন্যাস)	তৃতীয় সংস্করণ
সতীলক্ষ্মী	(পল্লী চিত্র)	,, ,,
মাধব মন্দির	(উপন্যাস)	,, ,,
হিন্দু-সতী	(সতীর তেজ)	,, ,,
রাজপুত বীরাঙ্গনা	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	দ্বিতীয় সংস্করণ
মতিঝিল	(,,)	চতুর্থ সংস্করণ
প্রীত-চিঠি	(দাম্পত্য পত্রাবলী)	দ্বিতীয় সংস্করণ
আশার শেষ	(নারী কাহিনী)	,, ,,
গৃহ-লক্ষ্মী	(চরকা ও অহিংস অসহযোগ মূলক উপন্যাস)	,, ,,
হত্যা-বিভীষিকা	(লোমহর্ষণ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)	,, ,,
কথ আবেশ	(আধুনিক সভ্যতামূলক উপন্যাস)	তৃতীয় সংস্করণ
সইয়ের বর	(স্ত্রী পাঠ্য উপন্যাস)	দ্বিতীয় সংস্করণ
খুনিকে খুন	(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)	,, ,,
প্রেমের স্বপন	([illegible] উপন্যাস)	,, ,,

---

[52] সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

মিলনান্তক উপন্যাস মধু মিলন, নারীর সতীত্ব-ধারণাকেন্দ্রিক সতীলক্ষ্মী কিংবা হিন্দু-সতী যেমন ছাপা হচ্ছে, তেমনই সেইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রচারকল্পে "চরকা ও অহিংস অসহযোগ মূলক উপন্যাস" গৃহ-লক্ষ্মী, "নারী জাগরণ"মূলক উপন্যাস ব্যথার শেষ কিংবা ইতিহাস-গৌরব প্রচার করার জন্য রাজপুত বীরাঙ্গনা ইত্যাদি উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত "দাম্পত্য পত্রাবলী" স্ত্রীর-চিঠি এবং বিভিন্ন ধরনের গোয়েন্দা কাহিনী— হত্যা-বিভীষিকা, খুনিকে খুন— ছাপার সঙ্গেই আলাদা করে "স্ত্রী পাঠ্য উপন্যাস" সইয়ের বর প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুলির সংস্করণের হিসাব যদি সত্য হয় তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, বাস্তব পাঠকসমাজে 'সৎ' বনাম 'অ-সৎ' সাহিত্যের গোত্রভেদ আদৌ ছিল না। বাজারের 'অদৃশ্য হাত' সমস্ত সাংস্কৃতিক কৌলীন্য ও নৈতিক ভেদাভেদ মুছে সবার উপরে মুনাফাকেই একমাত্র সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের গৌরব, কিংবা সামাজিক উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী ও 'আদর্শ' নারীচরিত্র-কেন্দ্রিক উপন্যাস— সবই জনপ্রিয় ছিল। ঐতিহাসিক মুদ্রণ সৌকর্য্য নিয়ে প্রকাশকেরা যে বর্ণনা দিতেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁদের উদ্দিষ্ট পাঠকশ্রেণির অবস্থান বহুক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয়, যারা "সুন্দর বহুমূল্য এ্যান্টিক্ কাগজে মুদ্রিত ও সুন্দর সুন্দর রঙ্গিন চিত্রে শোভিত" বই কিনতেই উৎসাহী ছিল।

একদিকে 'ভালো, সুপাঠ্য' গোয়েন্দা কাহিনী লেখার তাগিদ, অন্যদিকে বাজারলক্ষ্মীর টান— সরস্বতী ও লক্ষ্মীর এহেন যুগ্ম সেবা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চাননি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি। দর্শন, ইতিহাস কিংবা ধর্মীয় বিষয়ের বই লেখার পাশাপাশি তাঁরা গোয়েন্দা কাহিনীও লিখতেন।[53] সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কিংবা মনীন্দ্রনাথ বসুর মতো আরেকজন ছিলেন ইতিহাস-লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখের সংস্পর্শ-ধন্য হরিসাধন গোয়েন্দা কাহিনীও লিখেছিলেন। কলিকাতা— সেকালের ও একালের (১৯১৫) বইটি এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করলেও, সেকালে তাঁর লেখা কঙ্কণ-চোর (১৯১৬), লাল-চিঠি (১৯১৬), মৃত্যু-প্রহেলিকা (১৯১৭), শয়তানের দান (১৯১৯) প্রভৃতি গোয়েন্দা কাহিনীও জনপ্রিয় ছিল। সুকুমার সেন বলেছেন, "মৃত্যু-প্রহেলিকা বইটি নিক ডনোভানের একটি উপন্যাসের অনুবাদ"।[54] তথাকথিত রুচিমান সাহিত্যের লেখক-পাঠকরাও গোয়েন্দা কাহিনী নামের পণ্যটিও উৎপাদন ও ভোগ করতেন। তবে, আদমশুমারি সম্পর্কে প্রবাসী-তে প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে কলকাতা ও সহরতলির শিক্ষার যে হার উল্লিখিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ হয়, বিজ্ঞাপনগুলিতে সহস্রাধিক-লক্ষাধিক কপি বই বিক্রির দাবিগুলির আদৌ কতটা বাস্তব ভিত্তি ছিল।

---

[53] বস্তুত, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি দে-ও গোয়েন্দা কাহিনীর পাশাপাশি অন্য স্বাদের বই লিখেছিলেন। যেমন, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ধর্ম্মপ্রবন্ধ (কলকাতা: হেয়ার প্রেস, ১৮৯২) কিংবা পাঁচকড়ি দে (সঙ্কলিত), কৃষ্ণযাত্রা — গীতিনাট্য (কলিকাতা : পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)।

[54] সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁচকড়ি দে তাঁর হত্যা-রহস্য (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটি "ইতিহাস-কুশল প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়"-কে উৎসর্গ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য: পাঁচকড়ি দে, হত্যা-রহস্য (কলকাতা: বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ [১৩১৪ বঙ্গাব্দ])

পাঁচকড়ি দে-র লক্ষ্মীলাভের আকর্ষণেই হয়ত গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে শুরু করেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। একদা বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের বাংলার শিক্ষক দীনেন্দ্রকুমার সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক জলধর সেনের আহ্বানে বরোদা ছেড়ে ফিরে এসে ঐ পত্রিকায় যোগদান করেন সাংবাদিক হিসেবে। ক্রমে দীনেন্দ্রকুমার বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যখ্যাতির একদিকে ছিল বাংলার পল্লীজীবন সম্পর্কে রচনাগুলি। উনিশ শতকের গ্রামবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, উৎসব-পার্বণ নিয়ে রচিত তাঁর পল্লীচিত্র (১৩১১), পল্লীবৈচিত্র্য (১৩১২), পল্লীকথা (১৩২৪) প্রভৃতি গ্রাম বাংলার যাপন ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাবলি পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এহেন দীনেন্দ্রকুমার ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অংশ হয়েও একসময়ে রীতিমত গোয়েন্দা কাহিনীতে হাত পাকান। তাঁর আর্থিক সংস্থানের সম্ভবত প্রধান ভিত্তিই ছিল গোয়েন্দা গল্প রচনা। নন্দনকানন নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সেখানে প্রকাশিত হয় তাঁর রহস্য লহরী। ক্রমে তিনি মূলত রহস্য লহরী-র জন্যই বিখ্যাত হয়ে যান এবং প্রধানত গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে পড়েন। কিন্তু, দীনেন্দ্রকুমার কখনই নিজেকে পাঁচকড়ি বা শরচ্চন্দ্র গোত্রীয় মনে করতেন না। ফলে, একদিকে তিনি যেমন গোয়েন্দা আখ্যান সম্পর্কে শিক্ষিত সমালোচকের অবজ্ঞা-উন্নাসিকতার জবাব দিয়েছেন, অন্যদিকে 'ইতর'জনোচিত গোয়েন্দা কাহিনীর মুণ্ডুপাত করে বাজারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধরাশায়ী করেছেন। উপরন্তু, দরকার অনুযায়ী রাজভক্তি প্রকাশেও কার্পণ্য করেননি। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বই হিসাবে প্রকাশিত অজয় সিংহের কুঠী-র নিবেদন অংশে দীনেন্দ্রকুমার লেখেন:

> **'ডিটেক্‌টিভ' উপন্যাসের প্রতি এ দেশের শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা নাই**, না থাকা অসঙ্গত নহে; কারণ **যে সকল 'ডিটেক্‌টিভ' উপন্যাস বাঙ্গালা দেশে আজকাল খ্যাতি লাভ করিয়া হাজার হাজার বিক্রয় হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই বঙ্গের শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিয়ত হিষ্টিরিয়ার আবাদ করিতেছে**, — কে সে স্রোত নিবারণ করিবে? পাপের প্রতি অদম্য ঘৃণা ও পাপীর প্রতি অক্ষুণ্ণ সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা, মনুষ্যের হৃদয়গত দেবত্ব ও পশুত্বের কঠোর সংগ্রাম দেখাইবার উদ্দেশ্য তাহাদের কয়খানির আছে?— **কেবল 'মিষ্ট্রী', কেবল আত্মহত্যা ও খুন, কুলবালার সতীত্বনাশ, পিশাচের প্রেতকীর্ত্তি, কলঙ্কিনীর নৈশ অভিসার, নরকের চিত্র; বাঙ্গালার অর্দ্ধশিক্ষিত পাঠক সমাজ রুদ্ধ নিশ্বাসে সেই সকল কদর্য্য কাহিনী কেবল গল্পের লোভেই গিলিয়া থাকেন!** পাঠিকাগণও তাহা পাঠের জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন,— এ পুস্তক তেমন মুখরোচক বা চিত্তাকর্ষক হইবে, এ রূপ আশা অবশ্যই নাই।[55]

নিজের রচনা সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমারের ব্যজস্তুতির স্বর এখানে স্পষ্ট। তাছাড়া খেয়াল করার বিষয় এই যে কীভাবে গোয়েন্দা কাহিনীর বর্গের মধ্যে গোত্র-বিভাজন করলেন তিনি। নিজের লেখার থেকে তথাকথিত 'হীন' কাহিনীগুলিকে নৈতিকতার মাপকাঠিতে ফেলে সেগুলি "বাঙ্গালার অর্দ্ধশিক্ষিত পাঠক সমাজ" কর্তৃক আদৃত বলে

---

[55] উদ্ধৃতির সূত্র: অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ, ২০১৭[২০১৬]), পৃ. অনির্দেশিত। নজরটান সংযোজিত

দেগে দিলেন। অর্থাৎ, গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকসমাজে স্পষ্টতই শিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত—এই দ্বি-কোটিক শ্রেণি বিভাজন করে দিলেন দীনেন্দ্রকুমার। উপরন্তু, 'পাঠক' থেকে আলাদা করলেন 'পাঠিকা'কে, এবং 'কুলবালার সতীত্বনাশ' কিংবা 'কলঙ্কিনীর নৈশ অভিসার' প্রভৃতি যে 'বঙ্গের শুদ্ধান্তঃপুরে' ঢুকে মেয়েদের নৈতিক 'অবক্ষয়' ঘটাচ্ছে সেই কথাটিও স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। কিন্তু, তাঁর নিজের রচনা সেই 'দোষ' থেকে মুক্ত। সেখানে গোয়েন্দা আখ্যানের নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য— "মনুষ্যের হৃদয়গত দেবত্ব ও পশুত্বের কঠোর সংগ্রাম"— তুলে ধরেছেন বলে দাবী করলেন দীনেন্দ্রকুমার।

সেই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন দীনেন্দ্রকুমার ১৩১৭ বঙ্গাব্দের মাঘে প্রকাশিত পিশাচ পুরোহিত বইয়ের 'নিবেদন'-এ:

> আজকাল বঙ্গসাহিত্যে গল্পপুস্তক ও উপন্যাসের অভাব নাই; বঙ্গের সুলভ মুদ্রাযন্ত্র হইতে অল্প মূল্যের **চটি উপন্যাস** যে কত বাহির হইতেছে, বাঙ্গলা গবর্মেন্টের লাইব্রেরীয়ান মহাশয় ভিন্ন অন্যের তাহা ধারণা করা কঠিন। আবার **যে উপন্যাস যত অধিক অপাঠ্য, তাহার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর তত অধিক**!... বঙ্গসাহিত্যে প্রতিমাসে যে রাশি রাশি উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, **তন্মধ্যে কয়খানি উপন্যাস সরলমতি বালক বালিকাগণের হস্তে বা শুদ্ধান্তবাসিনী মহিলাবর্গের করকমলে অসঙ্কোচে প্রদান করিতে পারা যায়**? বিকৃত প্রেমের গল্প, উৎকট গোয়েন্দা-কাহিনী, ভীষণ হত্যারহস্য ও লোমাঞ্চকর 'মিষ্ট্রী' এখন উপন্যাসের প্রধান উপসর্গ। **শিক্ষিত পাঠকসমাজ** আর এ সকল চর্ব্বিত চর্ব্বণের পক্ষপাতী নহেন।[56]

খেয়াল করা দরকার যে, কেবল আর 'শুদ্ধান্তবাসিনী মহিলাবর্গের করকমলে' গোয়েন্দা কাহিনী তুলে দিয়ে দীনেন্দ্রকুমার ক্ষান্ত নন, তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকবর্গে 'সরলমতি বালক বালিকা'রাও ঢুকে পড়েছে। আর তাই সুলভ কমদামি বইগুলিকে 'চটি উপন্যাস'-এর তকমানিন্দিত করে দিয়েছেন তিনি। 'বিকৃত প্রেম', 'ভীষণ হত্যারহস্য' ও লোমহর্ষক 'মিষ্ট্রী'র উদ্বেগজনক 'উপসর্গ' ত্যাগ করে 'নূতন আদর্শের অনুসরণ' করেছেন দীনেন্দ্রকুমার এবং তাঁর 'সুশিক্ষিত রসগ্রাহী পাঠক' সেইসব বই পড়ে 'তৃপ্তিলাভ' করছেন, কারণ সেই কল্পিত পাঠককে পাঁচকড়ি দে-বর্ণিত কাজের চাপে ক্লান্ত পাঠকের থেকে তিনি আলাদা করে দিচ্ছেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পাঁচকড়ি প্রমুখের পাঠক "বাঙ্গালার অর্দ্ধশিক্ষিত পাঠক সমাজ" এবং দীনেন্দ্রকুমার নিজের পাঠককে ইতোমধ্যেই 'শিক্ষিত' তকমা দিয়ে রেখেছেন। এই যে একে অপরকে 'চটি উপন্যাস' বা বৃহত্তর অর্থে 'বটতলার বই' বলে দাগিয়ে দেওয়ার রাজনীতিটা খেয়াল করা দরকার।

পাঁচকড়ি দে-র লেখায় সেভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নমুনা দেখা না-গেলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে দীনেন্দ্রকুমার সেই বশ্যতা ঘোষণায় পিছপা হননি। তিনি জানতেন যে, বই ছাপিয়ে উপার্জন করতে হলে এমন কিছু লেখা যাবে না যাতে শাসকের মনে সংশয় জাগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) আবহে ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে রহস্য-লহরী সিরিজে প্রকাশিত সেই কৈসার-অন্তঃপুর রহস্য

---

[56] দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'নিবেদন', পিশাচ পুরোহিত (নদীয়া : দীনেন্দ্রকুমার রায়, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ) নজরটান সংযোজিত

উপন্যাসে যখন জর্মন-সম্রাটকে কেন্দ্র করে গল্প ফাঁদছেন দীনেন্দ্রকুমার, তখন স্পষ্ট করে দিচ্ছেন ঔপনিবেশিক প্রজা হিসাবে তাঁর অবস্থান: "আত্মরক্ষায় অসমর্থ, রাজশক্তির প্রতি একান্ত নির্ভরপরায়ণ, রাজভক্ত ভারতীয় প্রজামণ্ডলী মহিমান্বিত ভারত সম্রাটের বিজয় কামনায়, রাষ্ট্রীয় অমঙ্গল ও অরাজকতার কবল হইতে মুক্ত থাকিবার আশায়, প্রতিদিন বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতেছে।"[57] বইটি 'নিবেদন' করতে গিয়ে তাঁর 'সুশিক্ষিত রসগ্রাহী পাঠক'বর্গকেও সেই বিপদের দিনে আশ্বস্ত করেছেন তিনি: "আমরা বৃটীশ গবর্ণমেন্টের অনুরক্ত প্রজা। রহস্য-লহরীর কোনও উপন্যাসে বৈদেশিক রাজনীতির অভাস থাকিলেও, গবর্মেন্টের স্বার্থের প্রতিকূল কোনও আলোচনা তাহাতে কখনও স্থান পাইবে না।"[58]

বস্তুত, ঐ 'নিবেদন' অংশে দীনেন্দ্রকুমারের বক্তব্য তিনটি ভিন্ন স্তরে ঘোরাফেরা করেছে। প্রথমত, তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, রহস্য-লহরী পড়লে শাসক-দ্রোহের ভয় নেই, কারণ তাঁর গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক যে ভৌগোলিক পরিসরে যাই কীর্তি ঘটিয়ে থাকুক-না-কেন "গবর্মেন্টের স্বার্থের প্রতিকূল কোনও আলোচনা" সেখানে আসবে না, কারণ তিনি ও তাঁর "সম্ভ্রান্ত" পাঠকবর্গ ('আমরা' বহুবচনের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ) "বৃটীশ গবর্ণমেন্টের অনুরক্ত প্রজা", ফলে তিনি এমন কিছু ছাপতেই পারেন না যাতে শাসকের অর্থাৎ "গ্রেট ব্রিটনের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের বিন্দুমাত্র অভাব" প্রকাশ পায়। তাই তাঁর বই কিনলে "ফ্যাসাদ" ঘটবে না। দ্বিতীয় স্তরে আরও একধাপ এগিয়ে তিনি "ইউরোপীয় সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আত্ম-নির্ভরের কঙ্কাল"কেই আদর্শায়িত করেছেন। শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী যেভাবে বিপদে পড়েও নিজের মান-সম্ভ্রম বাঁচাতে যুঝে যায়, তাকেই দেশীয় "রমণী-সমাজের" কাছে অনুকরণীয় বলে তুলে ধরেছেন তিনি। খেয়াল করতে হবে, যাবতীয় ব্যঙ্গ-সমালোচনা সত্ত্বেও পাঁচকড়ি, শরচ্চন্দ্র, যোগীন্দ্রনাথ কিংবা দীনেন্দ্রকুমার সকলেই ঘুরেফিরে সেই নারীর সম্ভ্রম রক্ষার প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন। তৃতীয় স্তরে দীনেন্দ্রকুমার আবারও সেই পাঠকবর্গের বয়ঃভেদজনিত চক্ষুলজ্জার প্রসঙ্গটি টেনে এনেছেন এবং সব বয়েসের ও লিঙ্গের পাঠক-পাঠিকাকে আহ্বান করেছেন। বালক, যুবক কিংবা বৃদ্ধ কাউকেই আর মলাট দিয়ে লুকিয়ে রহস্য-লহরী পড়তে হবে না। সকলের সামনেই ছেলে তার বাবার সংগ্রহ থেকে সেই বই নিয়ে পড়তে পারে। মধ্যবিত্ত রুচি ও শ্লীলতার সামাজিকতা তাতে কিছুমাত্র টোল খাবে না, কারণ দীনেন্দ্রকুমারের এই বই মধ্যবিত্ত রুচিমানতার মাপকাঠিতে নিন্দিত "চটি উপন্যাস" নয়, তা রীতিমত "নূতন রসের" কারবারি। সেই রসভোগে মেয়েরা শামিল হলে যে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে তাও তিনি জানেন। তাই একেবারে শেষে পুরুষ-পাঠক-প্রিয় গোয়েন্দা কাহিনী যাতে "বঙ্গের মাতৃগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ,— শিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাগণ" সাদরে গ্রহণ করেন সেই ডাক দিয়েছেন দীনেন্দ্রকুমার। কারণ একদিকে এই বইগুলি 'গুপ্তকথা' নয়, তাই বালিশের তলায় লুকিয়ে পড়তে হয় না, অন্যদিকে এই বইয়ে যে

---

[57] দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'ভূমিকা', কৈসার-অন্তঃপুর রহস্য (নদীয়া : দীনেন্দ্রকুমার রায়, ১৩২২ বঙ্গাব্দ)

[58] দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'নিবেদন', তদেব

কীর্তিমন্ত প্রভুসমাজের নারীদের রূপ তুলে ধরা হয়েছে, তা অনুকরণযোগ্য আদর্শ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আদর্শ সহচরী ভদ্রমহিলা হয়ে ওঠার যাত্রাপথের শরিক।[59]

এহেন, রুচিমানতায় যাতে ধাক্কা না-লাগে তেমন গোয়েন্দা কাহিনী লেখাই দীনেন্দ্রকুমারের অভীষ্ট। ছয়টি গোয়েন্দা গল্পের সংকলন পট (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) বইয়ের শুরুতেই 'দুই একটা কথা' বলতে গিয়ে তিনি আবারও সেই শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত পাঠকের গোত্র বিভাজনে জোর দিয়ে লিখেছেন: "বাঙ্গলায় ভাল ডিটেক্‌টিভের গল্প নাই, এ কথা বোধ করি আমাদের শিক্ষিত পাঠকগণ অস্বীকার করেন না"।[60] দীনেন্দ্রকুমারের বইয়ের সমালোচকও সেই বিভাজন স্বীকার করেছিলেন:

> **আজকাল ডিটেক্‌টিভ গল্প বলিলেই ইংরেজী অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠক কুৎসিত প্রণয়-রহস্য, পাপের বীভৎস কাহিনী, প্রতারণা প্রবঞ্চনার লোমহর্ষণ চিত্র, ঘৃণিত হত্যাকাণ্ড, পাপের পৈশাচিক দৃশ্য প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারেন না।** এ জন্য তাঁহাদের অপরাধ নাই; তাঁহারা এইরূপ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠেই অভ্যস্ত। ডিটেক্‌টিভ কাহিনী পাপচিত্র যে না হইতেও পারে, কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে পারে, বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারে, তাহা "পট" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। **'পটের' প্রধান গুণ এই যে, ইহার রুচি মার্জিত; কোন স্থানে এরূপ একটী শব্দ নাই, যাহা আপত্তিজনক, বা যেজন্য এই পুস্তক গৃহ-লক্ষ্মীগণের হস্তে অসঙ্কোচে দেওয়া যায় না।** বঙ্গরমণীগণ অনায়াসে ইহা পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, গ্রন্থকারের ইহাই প্রধান কৃতিত্ব।[61]

এখানে সমালোচক আরও স্পষ্ট করে দিলেন যে, বাজারচলতি বাংলা গোয়েন্দা গল্পের পাঠক 'ইংরেজি অনভিজ্ঞ'। কিন্তু, যাঁরা লিখছেন তাঁরা যে ইংরেজি জানতেন তা পাঁচকড়ি দে-র বইগুলিতে ইংরেজি উদ্ধৃতির বহর দেখলেই বোঝা যায়। কিংবা, ইংরেজি না-জানলে বিদেশী উপন্যাস থেকে অনুকরণই সম্ভব হত কীভাবে? তাহলে কী পাঠক ইংরেজি জানে না বলে লেখক যা-খুশি-তাই 'বিকৃত' রুচির আখ্যান গোয়েন্দা কাহিনীর নামে চালিয়ে দিতেন? অভিযোগটা সেদিকে হলেও পাঁচকড়ি দে কিংবা শরচ্চন্দ্র সরকারের বইয়ের উৎসর্গপত্রগুলি খেয়াল রাখলে এবং বিভিন্ন উচ্চবর্গীয় বাংলা ও ইংরেজি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের বইয়ের প্রশংসা খেয়াল রাখলে এই অভিযোগের সারবত্তা নিয়ে অবশ্যই সংশয় তৈরি হয়। কিন্তু, এই 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'-র ছকটা সেই আমলে গোয়েন্দা কাহিনীর সব লেখক-প্রকাশক ও সমালোচকদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বাজারে নিজের পণ্য বেচতে হলে অন্যেরটা যে খারাপ সেটা বলাই বিধেয়।

অবশ্য পট-এর উপর্যুক্ত আলোচনা শুধু তাতেই ক্ষান্ত হয়নি। সাহিত্য যথার্থ শিল্প— 'আর্ট'— হয়ে উঠছে কিনা সেটাও শিক্ষিত পাঠকের তথা রসজ্ঞ সমালোচকের কাছে কদর পাওয়ার ক্ষেত্রে জরুরি মাপকাঠি। সেই বিচারে 'শিক্ষিত' অনামা সমালোচক দীনেন্দ্রকুমার সম্পর্কে রায় দিয়েছেন:

---

[59] তদেব

[60] দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'দুই একটা কথা', পট (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

[61] ১৩০৮ বঙ্গাব্দের প্রদীপ পত্রিকায় মুদ্রিত এই সমালোচনাটি অস্বাক্ষরিত ছিল। উদ্ধৃতিটির সূত্র: অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা গল্প , প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত। নজরটান সংযোজিত

> **বাঙ্গলা দেশের পাঠক সাধারণের সম্মুখে সাধারণতঃ যে সকল বাঙ্গলা ডিটেক্‌টিভ গল্প সংগৃহীত দেখা যায়, তাহা যে শিক্ষিত পাঠকের আনন্দপ্রদ হয় না, তাহার প্রধান কারণ তাহার ভিতরে 'আর্ট' নাই**; হয়ত তাহার ভিতর ডিটেক্‌টিভ গল্পের সমস্ত উপাদান ভাদ্রের কুলপ্লাবিনী তরঙ্গভঙ্গময়ী ভাগীরথী বক্ষে আলুলায়িতা-কুন্তলা রমণীর লম্ফ প্রদান, খড়্গাঘাতে নিদ্রিত দস্যুর শিরচ্ছেদন করিয়া কোন বিপন্না রমণীর পর্বতশৃঙ্গ হইতে পতন, এই রকম অসংখ্য বিষয় আছে, যাহা সাধারণ পাঠক নিশ্বাস রোধ করিয়া পাঠ করেন, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান, কিন্তু গল্প রচনার যাহা 'আর্ট', তাহার অভাবে সে গল্পগুলি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া থাকে।[62]

'থ্রিলার' বনাম 'ডিটেকসন' : বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর প্রাগিতিহাসের অবসান

উপরের আলোচনায় গোয়েন্দা কাহিনী লেখার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক টানাপোড়েনটা স্পষ্ট। আদতে গোয়েন্দা কাহিনী এমন একটি সাহিত্য-পণ্য যার মূল কাঠামোটা স্থান-কাল-পাত্রভেদে পুনরাবৃত্তি করা যায়। ফলে, বাজার ধরতে তেমন পণ্য তৈরি করা সহজ। কারণ তাতে আসল-নকল, মৌলিক-কৃত্রিম প্রভৃতি ভেদাভেদ থাকে না। রহস্য জমলে আর পড়তে গিয়ে লোম খাড়া হলেই হল। 'হত্যাকারী কে?' তা জানার পরে দ্বিতীয়বার ফিরে সেই বইটি পড়ার উৎসাহ পাঠকের থাকবে না— এটাই গোয়েন্দা কাহিনীর সাধারণ চরিত্র। ফলে, সাহিত্য হিসাবে তার জীবৎকাল খুবই সীমিত। তাই তাকে জাতে তোলার জন্যই এত আয়োজন— তা সে ভালো ছাপাই-বাঁধাই কিংবা ছবি জোড়া হোক বা গল্পের মধ্যে নানান নীতিবাক্য গুঁজে দেওয়া। কিন্তু, শেষত 'আর্ট' হলেও গোয়েন্দা কাহিনী অভিজাত সাহিত্য গোত্রে গণ্য হয় না। ফলে, দীনেন্দ্রকুমার যে এইসব গোয়েন্দা গল্প লিখে নিজের সাহিত্য প্রতিভার 'অপচয়' করছেন, তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন উক্ত আলোচক:

> কিন্তু তথাপি আমরা দীনেন্দ্র বাবুকে ক্ষমা করিব না। মাসিক সাহিত্যে যিনি পরিচিত চিত্র আঁকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পাঠকগণকে মুগ্ধ করিয়া দেন, **যাঁহার 'হামিদারের' ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভের যোগ্য ও আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে, তিনি ডিটেক্‌টিভের গল্প দিয়া বাঙ্গালী পাঠককে ভুলাইয়া রাখিতে চাহেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই।** চেষ্টা করিলে যিনি বঙ্গ ভাষার বরাঙ্গ হীরক-খচিত স্বর্ণাভরণে সজ্জিত করিতে পারেন, তিনি আজ একখানি ডাকের গহনা হাতে করিয়া ছেলে ভুলাইতে আসিয়াছেন, ইহা অসহ্য, দীনেন্দ্র বাবুর এই কৃপণতা ক্ষমার অযোগ্য।[63]

বস্তুত, আলোচ্য সমালোচনাটি উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকেদের নৈতিক দোলাচলের প্রমাণ। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রক্ষিপ্ত সন্তান হিসাবে তারা গোয়েন্দা কাহিনীকে গ্রহণ করতেও পারেনি, বর্জন করতেও পারেনি। কিন্তু, সংস্কারমনা জাতীয়তাবাদী পুরুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'নারীর প্রশ্ন'। ফলে, স্বঘোষিত অভিভাবক হিসাবে গোয়েন্দা কাহিনীতে নারীর নিজের শরীর ও যৌনতা অধিকার বিষয়ে যে তর্কটা ঘুরপথে আসছিল, তাকে

---

[62] তদেব। নজরটান সংযোজিত

[63] তদেব। নজরটান সংযোজিত

সংস্কারের বেড়া দেওয়ার জন্য অনেকেই উদগ্রীব ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমারের সওয়ালে বারবার 'অন্তঃপুর'-প্রসঙ্গ থেকেই তার আন্দাজ পাওয়া যায়।

বস্তুত, বাজারে পণ্য বিক্রির নিয়ম মেনেই একজন লেখক আরেকজনকে 'নিকৃষ্ট' হিসাবে খারিজ করার মাধ্যমেই নিজের উৎকর্ষ প্রমাণের চেষ্টা করত। পাঁচকড়ি থেকে দীনেন্দ্রকুমার— সকলের বক্তব্য সেই চেষ্টারই নজির। যেমন, দীনেন্দ্রকুমার যে অনেক ক্ষেত্রে পাঁচকড়িকেই নিশানা করে সমালোচনা করেছিলেন, সেটা বুঝেই পাঁচকড়িও সুযোগমত রহস্য-বিপ্লব (১৯০৪) বইয়ের ভূমিকা বা 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখলেন যে, কাহিনীর কাঠামোটি তিনি একটি ফরাসি উপন্যাস থেকে নিয়েছেন, কারণ সেগুলি ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর থেকেও উৎকৃষ্ট। কিন্তু, বিদেশের থেকে গল্প ধার করলেও, বৈদেশিক সমাজ ও সংস্কৃতির 'খারাপ' উদাহরণগুলি তিনি বাদ দিয়েছেন:

> পুস্তকখানিকে হৃদয়গ্রাহী করিতে সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা পাইয়াছি। অথচ সেদিকে একাগ্রচিত্ত থাকিয়াও **উপন্যাসোচিত শিক্ষা ও সুনীতি সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে ত্রুটি করি নাই।** এবং ইহা ফরাসী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের ছায়াবলম্বিত হইলেও **ইহার মধ্যে কুল-ললনার নৈশ অভিসার, নদীতীরে নির্জন মিলন, কুমারীর গর্ভাধান, ভ্রূণ-সংগোপন প্রভৃতি কুৎসিত ঘটনাবলীর কুৎসিত দৃশ্যসমূহ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা দূরে থাক, আমি তাহা সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করিয়াছি।**[64]

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, গোয়েন্দা কাহিনী বৃহত্তর সমাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তথা মতাদর্শগত মান্যতা তৈরির উপকরণ হিসাবে চারিয়ে যেতে থাকে দেশীয় পাঠকসমাজে। সমকালীন পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নারীর উপরে কর্তৃত্বের যে বিধি তাকেই বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে চলেছিলেন পুরুষ লেখকরা।[65] ফলে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় যাকে "The Nationalist Resolution of the Women's Question" বলে বিশ্লেষণ করেছেন, তারই প্রতিফলন এই পর্যায়ের বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে দেখা যায়।[66]

অবশ্য, আদর্শনৈতিক ভারে গল্প পড়ার আনন্দ যাতে মাটি না-হয় সেদিকেও লেখক-প্রকাশককে হামেহাল নজর রাখতে হত। তত্ত্বের কানাগলিতে রহস্যের রোমাঞ্চ হারিয়ে গেলে বিক্রির হিসাব যে মার খাবে তা নিশ্চিত ছিল। অন্যদিকে, বাজার ধরে রাখতে গেলে সংস্কারক-সমালোচকদের কটুকাটব্যের মোকাবিলা করাটাও লেখক-প্রকাশকদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছিল। ফলে, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকে পপুলার সিরিজের উনিশতম সংখ্যায় যতীন্দ্রনাথ পাল-প্রণীত শয়তান উপন্যাসের গোড়ায় এক দীর্ঘ সওয়াল-জবাবে নামেন প্রকাশক:

---

64 উদ্ধৃতির সূত্র : অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত। নজরটান সংযোজিত

65 এই পর্যায়ে নারীদের লেখা গোয়েন্দা কাহিনীর বিশ্লেষণ করলে আলাদা কোনো মনোজগতের হদিশ কি পাওয়া সম্ভব? এই বিষয়টি বিস্তারিত ও গভীর গবেষণার যোগ্য। বর্তমান সন্দর্ভে সেই প্রসঙ্গটি আলোচনার অবকাশ নেই। সম্প্রতি, নারীদের লেখা গোয়েন্দা কাহিনির একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে: অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.), বামাগণ বিরচিত সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, (কলকাতা : আনন্দ, ২০২৪)। পাশাপাশি, বাংলায় মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনী নিয়েও স্বতন্ত্র ও নিবিড় গবেষণা করা দরকার। বিশেষত, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর (১৯০৫-১৯৭২) সৃষ্ট কৃষ্ণা ও শিখা এবং নলিনী দাশের (১৯১৬-১৯৯৩) গোয়েন্দা গপ্পালু গভীর আলোচনার যোগ্য।

66 Partha Chatterjee, "The Nationalist Resolution of the Women's Question", in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, eds, *Recasting Women* (New Delhi: Kali for Women, 1989), পৃ. ২৩৩-২৫৩

> বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকবৃন্দের নিকট আমাদের এক নিবেদন আছে। এইরূপ ডিটেকটিভ কিম্বা ঘটনাবৈচিত্র্যময় উপন্যাসের নাম শুনিলেই তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু কেন যে করেন তাহার কারণ আমরা এখন পর্যন্তও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। **অবসন্ন মস্তিষ্ককে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া, গুরুতর কার্য্যের পর অপেক্ষাকৃত লঘু সাহিত্য সেবায় চঞ্চল মনকে কিছু কাল স্বাস্থ্যকর খোরাক সরবরাহ করা-লঘু সাহিত্যের এই ত উদ্দেশ্য—** আমাদের জানা ছিল। উপন্যাসকে সকলে লঘু সাহিত্যই বলিয়া থাকেন। তাহাই যদি হয় তবে **উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ককে যথাসাধ্য বিশ্রাম দেওয়া, গুরুপাক ভোজন না করাইয়া অপেক্ষাকৃত লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া, কিছুকালের জন্য নির্দোষ আমোদ দেওয়া আর গৌণ উদ্দেশ্য যাহাতে মন উন্নত হয়, তাহার দিকেও দৃষ্টি করা।**[67]

এখানে পাঁচকড়ি দে-প্রস্তাবিত ক্লান্ত পাঠককে তত্ত্বভারাক্রান্ত উপন্যাসের বদলে উত্তেজক গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে দেওয়ার যুক্তিটা যেমন ফিরে আসছে, তেমনই উপন্যাসকেই 'লঘু' করে গোয়েন্দা কাহিনীকেও মান্য সাহিত্য করে তোলার চেষ্টা লক্ষণীয়। সেই চেষ্টায় আবারও যেমন 'অন্যেরটা খারাপ— আমারটা ভাল'— সেই যুক্তি ফিরে আসছে, তেমনই একটা নতুন কথা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হল দেশীয় উচ্চবর্গের উন্নাসিকতার পাল্টা আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান প্রতীচ্যের উদাহরণ টেনে আনা। পাঁচকড়ি বা দীনেন্দ্রকুমার যেমন ফরাসি গোয়েন্দা গল্পের সুখ্যাতি করেছিলেন তেমনই শয়তান-এর প্রকাশক স্পষ্ট তুলনা হাজির করেছেন: "ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বলিতে তথা কথিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বলিয়া বাজারে প্রচলিত কয়েকখানি কুরুচিপূর্ণ বইই বুঝায়, কিন্তু আমাদের এ বইগুলি সে ধরণের হইবে না। অধুনা ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ডিটেক্‌টিভ গল্পকে তাহারা এক উচ্চদরের সাহিত্য করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের এ সব বইতেও সেই সবের যাহা কিছু ভাল তাহা লইতে দ্বিধা বোধ করিব না, এবং মনে হয় মোটের উপর আমাদের বইও সে সকল দেশের বইর অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট হইবে না।"[68] তার সঙ্গে অবশ্যই "বইগুলির বহিসৌন্দর্য্যও" আগের থেকে বেশি হবে। "মনোরম" করার জন্য "প্রত্যেক বইতে অনেকগুলি করিয়া রঙিন ও একরঙা ছবি থাকিবে। তাহা ছাড়া সচিত্র প্রচ্ছদ পট থাকিবে— বাঙ্গালা দেশে ইহা সম্পূর্ণ নূতন।" আর গুণমানের সঙ্গে দামের বিচার করলে দেখা যাবে "এত অল্প মূল্যে এমন সুন্দর, সুদৃশ্য, বই বিদেশী কোন প্রকাশকও দিতে" পারবে না।[69]

লেখক ও প্রকাশকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের এই যে ধারা এটা বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর মুদ্রিত জনজীবনে বারেবারে ফিরে এসেছিল। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায় কিংবা যতীন্দ্রনাথ পাল— সকলকেই লড়াই করে বাজার ধরতে হয়েছিল। সেই লড়াই মূলত দু-দিক থেকে। প্রথমত, বাজারে একই পণ্য— গোয়েন্দা কাহিনী— নানান নামে ও মোড়কে নানান জন বিক্রি করছে। ফলে অপরের নিকৃষ্ট রচনার তুলনায় আমারটি উৎকৃষ্ট— এই বিজ্ঞাপনী যুক্তির দস্তুরতো ছিলই। দ্বিতীয়ত, লেখক-প্রকাশকদের লড়তে হত উন্নাসিক সমালোচকের অবজ্ঞার বিরুদ্ধেও। মনে রাখতে

---

[67] যতীন্দ্রনাথ পাল, শয়তান (কলিকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'প্রকাশকের নিবেদন'। নজরটান সংযোজিত

[68] তদেব

[69] তদেব

হবে সেই আমলে যখন এমনিতেই সাক্ষরতার হার খুব কম তখন আঞ্চলিক বাজার হিসাবে বাংলা বইয়ের কাটতি নিয়ে সংঘাত অনিবার্য ছিল। সেই সংঘাতে তথাকথিত রুচিমানতার মাপকাঠিতে গোয়েন্দা কাহিনীও যে উতরে যায় সেই কথাটা বারেবারে জোর দিয়ে বলার দরকার হয়ে পড়ত।

আবার অন্যদিকে, দেখা যাচ্ছে অনেক লেখক-প্রকাশকই ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজেকে 'সৎ' সাহিত্যের কারবারি প্রমাণ না-করে সরাসরি প্রভু-সমাজের নজির টানছেন। তাঁদের প্রশ্ন, সাহেবের দেশে যে বইয়ের আদর-কদর, সেই ধরনের বইকে দেশীয় সমাজ কোন যুক্তিতে অগ্রাহ্য করতে পারে? বরং গোয়েন্দা কাহিনী পড়ায় লজ্জার কিছু নেই, কারণ সাহেবের দেশেই সকলে তা পড়ে। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে বিচিত্র রহস্য সিরিজের প্রথম বই নাগিনী প্রকাশ করতে গিয়ে ভূমিকায় প্রকাশক সেই সাহেবি কেতাকেই দস্তুর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন:

> কথাটা এই যে, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প'ড়ে যদি কেউ আনন্দ পায়, তবে তাতে লজ্জার কোন কারণ নেই। যে-দেশের মুখ চেয়ে, আমরা সাহিত্য সেবা করি, সে-দেশের প্রধান মন্ত্রীও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়েন। শুধু তাই নয় ধনবিজ্ঞানে মস্ত পণ্ডিত, পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও অনেক গণ্যমান্য সাহিত্যিক-ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনা করতে দ্বিধা করেন না।

এরপরে আলোচ্য প্রকাশক বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীকে দুটো স্বতন্ত্র ধারায় ভেঙে দিয়েছেন। সেই দ্বি-বিভাজনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তার মধ্য দিয়ে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর সম্পূর্ণ নতুন একটা পর্যায়ের হদিশ পাওয়া যায়:

> ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের দুটি দিক আছে। এডগার এলেন পো যে-জাতীয় **ডিটেকসনের গল্প** সুরু করেন, সার কনান ডয়াল-এর লেখায় তার বিকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। সে ধরণের উপন্যাস আজও আমাদের দেশে চলন হয়নি। সেগুলি বুঝতে মাথা খাটাতে হয়, সময় লাগে, তাই সাধারণ লোকে সেগুলি পড়তে চায় না। অন্য জাতীয় গল্পগুলিকে সাধারণতঃ **থ্রিলার বা রোমাঞ্চকর উপন্যাস** বলে। থ্রিলারের সুবিধা হল, বই পড়তে বসে ভাবতে হয় না, খরস্রোতার মত তর তর করে ঘটনা স্রোত বয়ে যায়। এই ধরণের বই লোকে সাধারণতঃ ভালবাসে। "নাগিনী" বই এই শ্রেণীর। ক্রমে ক্রমে দু-শ্রেণীর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসই বার করবো।[70]

শেষ বিচারে লোকে বই পড়ে আনন্দের জন্য। ফলে গোয়েন্দা কাহিনীর আদত উদ্দেশ্য আনন্দদান: "এখন পৃথিবীতে এমন দিন এসেছে বই পড়ে লোকে সময় কাটাবে, আনন্দ পাবে, যেমন খেলাধূলা করে পায়। এই আনন্দ দেবার জন্য আমরা বই বার করছি। এতে এমন কিছু থাকে না যা সাধারণের আনন্দের পথে বাধা হ'তে পারে।"[71]

১৩০৫ বঙ্গাব্দে দারোগার দপ্তর দ্বিতীয় বছর পূর্তির সময়ে কার্য্যাধ্যক্ষ বাণীনাথ নন্দী যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন প্রায় চার দশক পরে নাগিনী-র প্রকাশক সেই একই কথায় ফিরে আসছেন, কেবল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আরও মৌলিক একটি বিভাজন ঘটে যাচ্ছে। বাণীনাথ বলেছিলেন পাশ্চাত্যে, মূলত ইংল্যান্ডে পাঠকসমাজ গোয়েন্দা গল্প বেশি বেশি পড়তে চায়। ঔপনিবেশিক প্রজাকুলের শিক্ষিত বর্গও তা চাইছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায়

---

[70] সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, নাগিনী (কলিকাতা : সিদ্ধেশ্বর প্রেস ডিপজিটরী, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ), 'নিবেদন'। নজরটান সংযোজিত

[71] তদেব

তেমন বই নেই। সেই শূন্যস্থান ভরাট করতে ব্যবসায় নেমেছিল দারোগার দপ্তর।[72] প্রায় চল্লিশ বছর পরে নাগিনী-র প্রকাশক স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্যেও রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী ও গোয়েন্দা কাহিনীর জগত ক্রমে আলাদা খাতে বয়ে গেছে। পো-ডয়েলের হাতে বিকশিত 'ডিটেকসনের গল্প', এবং সেখানে পাঠকেরও একরকমের বৌদ্ধিক দীক্ষা লাগে। ঔপনিবেশিক প্রজাসমাজে সকলের সেই বৌদ্ধিক দীক্ষা নেই, ফলে আগ্রহও কম। অন্যদিকে যেখানে তত বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ নেই, কিন্তু লোমহর্ষক ঘটনাক্রম আছে, সেই থ্রিলার বা রহস্য-রোমাঞ্চকর বই উপনিবেশের পাঠকের বেশি প্রিয়। কিন্তু, সেই প্রিয়-পাঠের মধ্যে যৌনতার কথা বেশি থাকলে সবাই যে তার কদর করবে না, সে সম্পর্কে সচেতন নাগিনী-র প্রকাশক স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, "এতে এমন কিছু থাকে না যা সাধারণের আনন্দের পথে বাধা হ'তে পারে"।

খেয়াল করা দরকার যে, এই দুই বর্গ বিভাজনের মূল যুক্তি হল সেই 'মাথা খাটানো', অর্থাৎ মেধার উচ্চাবচতা। যে মেধার উঁচু-নীচু দিয়ে ঔপনিবেশিক দারোগা ও বেসরকারি গোয়েন্দার উচ্চাবচতা নির্ধারিত হয়েছিল, সেই একই যুক্তিতে পাঠকেরও উল্লম্ব বর্গবিভাজন হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে গণভোগ্যতার স্পষ্ট তফাত করা হচ্ছে। এই তফাতটাই অস্বীকার করে এগোতে চেয়েছিলেন পাঁচকড়ি, শরচ্চন্দ্র প্রমুখ। কিন্তু, ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহে সেই বিভাজনের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) কিংবা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) প্রমুখের লেখা গোয়েন্দা গল্পগুলিতে। খেয়াল রাখতে হবে যে, শরদিন্দুর প্রথম (প্রকাশকাল অনুযায়ী) ব্যোমকেশ-কাহিনী 'পথের কাঁটা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩৩)। আইন অমান্য আন্দোলন ও বিপ্লববাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঢেউয়ে সমগ্র উপমহাদেশে জনসমাজ উজ্জীবিত। তার কিছু বছর পরেই ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমারের 'জয়ন্তর কীর্তি'। সেখানে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে জয়ন্ত ও মাণিকলালের যুক্ত হওয়ার কথা জানাচ্ছেন লেখক। আবার ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 'অন্ধকারের বন্ধু' কাহিনীতে আরেক জোড়া গোয়েন্দা ও তার সহকারী— হেমন্ত-রবিন— হাজির করলেন হেমেন্দ্রকুমার। জাতীয়তাবাদী গণ-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত ঐসব কাহিনী আদর্শনৈতিকভাবে সর্বার্থেই পাঁচকড়ি দে কিংবা শরচ্চন্দ্র সরকারের লেখা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

হেমেন্দ্রকুমার মূলত কিশোর বয়সের পাঠকদের কথা ভেবে লিখেছেন তাই সেখানে যৌনতার প্রসঙ্গ উহ্য হয়ে গিয়ে বেশি জোর পড়েছিল ঐ 'ডিটেকসন' অর্থাৎ অবরোহী যুক্তিপ্রণালীর প্রয়োগ। তাঁর হাতে পড়ে জয়ন্ত কিংবা হেমন্ত-কেন্দ্রিক গোয়েন্দা গল্পগুলি যৌন ইশারা-ইঙ্গিত ছেড়ে একদিকে বুদ্ধিবৃত্তির মারপ্যাঁচ ও অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী কৈশোর ও যৌবনের আদর্শায়িত পুরুষ কেমন হওয়া উচিত তার বৃত্তান্ত হয়ে উঠেছিল। বিশেষত খেয়াল করা দরকার যে, পাঁচকড়ি দে-ও শার্লক হোমসের কাহিনী অবলম্বন করেছিলেন, আবার হেমেন্দ্রকুমারও

---

[72] অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), "দারোগার দপ্তর' প্রসঙ্গে', রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ১ (কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৪), পৃ. অনির্দেশিত

হোমসের আখ্যান ধার করেছিলেন। কিন্তু, দুজনের পরিবেশনায় তারতম্য ঘটে গিয়েছিল। সেই তারতম্য সবথেকে স্পষ্ট হয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ-কাহিনীতে। বয়স্ক পাঠকের জন্য লেখে হলেও, সেখানে উদ্দাম যৌনতার ইঙ্গিত প্রায় নেই। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ-কাহিনীতে অবশ্যই বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক, যৌন ঈর্ষা, কুমারীর সন্তান-সম্ভাবনা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এসেছিল। কারণ, প্রথমত সেগুলি সামাজিক বাস্তবতার অঙ্গ ছিল এবং দ্বিতীয়ত, শরদিন্দুর উদ্দিষ্ট পাঠক-পাঠিকা বয়ঃপ্রাপ্ত। কিন্তু, তবুও, কোনো কাহিনীতেই সেই যৌনতার প্রসঙ্গগুলি মুখ্য বর্ণনার বিষয় হয়নি এবং সেগুলি কেবল 'অপরাধ'-এর মোটিভ হিসেবেই পর্দার পিছনে থেকে গিয়েছে। পাঁচকড়ি দে-লিখিত জুমেলিয়ার বর্ণনা খেয়াল করলে আমূল তফাতটি সহজেই নজরে পড়বে। শরদিন্দু বা হেমেন্দ্রকুমারের গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতে সাহিত্যপ্রসাদগুণের পাশাপাশি গোয়েন্দা সেখানে মধ্যবিত্ত, ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী মেধাজীবী পাঠকের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। অলৌকিক কীর্তি কিংবা রুচিমান সমাজ-নিষিদ্ধ যৌনতা— সবেরই প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। সেই কাহিনীগুলি কেবলই গোয়েন্দা ও অপরাধীর মধ্যে বুদ্ধির লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল এবং ক্রমে গোয়েন্দা কাহিনী বাংলা সাহিত্যের জগতে 'জাতে' উঠেছিল।[73] সেই জাতে ওঠার জন্য যৌনতার পরিসর বাদ দিতেই হত। সেটাই হেমেন্দ্রকুমার ও শরদিন্দু সার্থকভাবে করে দেখিয়েছেন। সেখানেই পাঁচকড়ি-শরচ্চন্দ্রদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আদি ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস ক্রমে পরিণত ঔপনিবেশিক ইতিহাসের পথে পা বাড়িয়েছিল। সেই পথেই উত্তর-ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজে সত্যজিৎ রায়-এর প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা তথা দেশভাগ-পরবর্তী খণ্ডিত বঙ্গে শিক্ষিত রুচিমান সমাজে যৌনতার-তিলমাত্র-সংশ্রবহীন বৌদ্ধিক উৎকর্ষের আদর্শ।

---

[73] সেখানে বুদ্ধির দাবা খেলায় গোয়েন্দা ও অপরাধী একে অন্যকে মাৎ করার চেষ্টায় ব্যগ্র, এবং সেই প্রয়াস-বৃত্তান্ত উপভোগ করে পাঠক এক অলীকে মগ্ন। তাই গোয়েন্দা কাহিনী ও দাবা খেলার মিল সহজেই নজরে পড়ে। "The game is sublimated warfare and chess players are compelled to kill, but unlike the gruesome horror of war, the martial conceit of chess allows us to experience aesthetic liberation. Every battle is a unique geometric story where two protagonists seek to destroy each other, but the underlying logic feels beautiful and true. The more intense the battle and the more sublime the ideas, the more we experience power and freedom."— এই কথাগুলি দাবার মত গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। উদ্ধৃতির সূত্র: Jonathan Rowson, *The Moves That Matter : A Chess Grandmaster on the Game of Life* (UK : Bloomsbury, 2019), পৃ. ১

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

এই গবেষণা সন্দর্ভে সরাসরি লেখার সূত্র-উৎস হিসাবে ব্যবহৃত বই, পত্রিকা ও প্রবন্ধ এখানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু, এগুলি ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের উপাদান ভাবনা-চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। বাহুল্যবোধে সেগুলি নির্দেশ করা হয়নি। যে-সব বাংলা প্রবন্ধ ও কাহিনী গ্রন্থ হিসাবে সংকলিত হয়েছে ও সেগুলির সবিস্তার হদিশ পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রতিটি গ্রন্থপঞ্জীতে পুনরায় না-উল্লেখ করে মূল প্রবন্ধ ও কাহিনী সংকলনটির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশকের নামের পরে ব্যবহৃত সংস্করণের সাল ও ক্ষেত্র বিশেষে তৃতীয় বন্ধনীতে ([]) প্রথম প্রকাশের সাল নির্দেশিত হয়েছে।

বাংলা ভাষার আকর ও সহায়ক গ্রন্থাবলী

অনুসন্ধান-এর মূল পত্রিকাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ রক্ষিত আছে। সেন্টার ফর স্টাডিজ় ইন সোশাল সায়েন্সজ়-এর হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমরিয়ল আর্কাইভে মাইক্রোফিল্‌ম কপিগুলি আছে এবং সেন্টার ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউট-এর যৌথতায় সেগুলির ডিজিটাল কপি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে— https://fid4sa-repository.ub.uni-heidelberg.de/view/schriftenreihen/sr-34.html?lang=en

অরিন্দম দাশগুপ্ত (অনূদিত), মিয়াজান দারোগার একরারনামা , কলকাতা : চর্চাপদ, ২০০৯

— (সম্পা.), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ, ২০১৭ [২০১৬]

— (সম্পা.), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ, ২০১৭

— (সম্পা.), সেকালের গোয়েন্দা গল্প, কলকাতা : আনন্দ, ২০১৯

— (অনূদিত ও সম্পাদিত), আর্দালি পাঁচকড়ি খানের ঝাঁকিদর্শন , কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯

— (সম্পা.), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ, ২০২১

— (সম্পা.), বামাগণ বিরচিত সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, কলকাতা : আনন্দ, ২০২৪

অরুণ নাগ (সম্পাদিত), সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা , কলকাতা: আনন্দ, ২০১০

অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ১, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৪

— (সম্পা.), রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ২, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৪

— (সম্পা.), রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ৩, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০২১

আর্থার কনান ডয়েল, এ স্টাডি ইন স্কারলেট, অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত, শার্লক হোমস সমগ্র, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: লালমাটি, ২০১১

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবিতা সংগ্রহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা : গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৯২ বঙ্গাব্দ

কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়), 'সচিত্র গুলজারনগর', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৬৫ [১২৭৮ বঙ্গাব্দ]

কোরক, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক্-শারদ, ১৪২০

কিশোরীমোহন বাকচি, সচিত্র অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড, কলকাতা : জয়ঢাক প্রকাশন, ২০২০ [১৩১৫ বঙ্গাব্দ/১৯০৭]

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত, প্রতাপচাঁদ, কলিকাতা : ৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, চৈতন্যপ্রেসে শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত, ১৯০৩

—, প্রমোদা , কলিকাতা : শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ
গিরিশচন্দ্র বসু, সেকালের দারোগার কাহিনী, অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৩ [১৮৮৮]
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান , এলাহাবাদ : ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ-মঞ্জরী, কলিকাতা: সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, ১৩১২ বঙ্গাব্দ
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রচনাসংগ্রহ, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১
দীনেন্দ্রকুমার রায়, পট , কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
— পিশাচ পুরোহিত , নদীয়া : দীনেন্দ্রকুমার রায়, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ
— কৈসার-অন্তঃপুর রহস্য , নদীয়া : দীনেন্দ্রকুমার রায়, ১৩২২ বঙ্গাব্দ
ধীরেন্দ্রলাল ধর, "ভূমিকা", হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৮২ [১৯৭৬]
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রগল্প', ভারত-মহিলা, ৬ষ্ঠ ভাগ, দশম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার", শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সমগ্র , কলকাতা : আনন্দ, ২০০৭
পাঁচকড়ি দে, মায়াবী , কলকাতা : ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেস, ১৯০১
— জীবন্মৃত-রহস্য , কলকাতা: পাল ব্রাদার্স, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ
— গোবিন্দরাম, কলিকাতা : বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৫
— সুহাসিনী ও ঠিকে ভুল , কলকাতা: বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৮, নূতন সংস্করণ
— হত্যা-রহস্য , কলকাতা: বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ [১৩১৪ বঙ্গাব্দ]
— প্রতিজ্ঞা-পালন , কলিকাতা : বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ [১৩১৩ বঙ্গাব্দ]
— মায়াবিনী , কলকাতা: বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯১৫, সপ্তম সংস্করণ
— জয় পরাজয় , কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ
— (সঙ্কলিত), কৃষ্ণযাত্রা — গীতিনাট্য, কলিকাতা : পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ
— মায়াবিনী , কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, একাদশ সংস্করণ
— মায়াবিনী , কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, একাদশ সংস্করণ
পূর্ণচন্দ্র বসু, 'সাহিত্যে খুন', সমালোচনা-সাহিত্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ
প্রতিভা বিশ্বাস, হুজুর দর্পণ , কলিকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, "ব্যোমকেশ, সত্যবতী ও সত্যবতীর গাড়ি", শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সমগ্র , কলকাতা : আনন্দ, ২০০৭ [১৯৯৫]
প্রবাসী, তৃতীয় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১০
প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সাহিত্যের গোয়েন্দা , কলকাতা : পরশপাথর, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, আদরিণী, কলিকাতা: এ জি সেন কোম্পানি, ১৮৮৭
— ধর্ম্মপ্রবন্ধ , কলকাতা: হেয়ার প্রেস, ১৮৯২
— ডিটেক্‌টিভ পুলিশ, প্রথম কাণ্ড, কলিকাতা : সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার, ১৩০০ বঙ্গাব্দ
— বেওয়ারিশ লাস (অর্থাৎ পথ-পার্শ্বস্থ পুলিন্দার ভিতরে প্রাপ্ত লাসের অদ্ভুত রহস্য!), কলিকাতা : সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ
— তেত্রিশ বৎসরের পুলিস কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী, কলিকাতা : উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১২
প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'রহস্য কাহিনীর পটভূমি ও পরাশর রহস্য', বিভাব, বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা— ৩৬, ধরণী ঘোষ ও সিদ্ধার্থ ঘোষ সম্পা, গ্রীষ্ম, ১৩৯৪
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১৭
— বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১৭
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, (সম্পা.) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রণীত), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি , কলিকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), "রোমাঞ্চন", পাঁচকড়ি দে রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: করুণা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
— পাঁচকড়ি দে রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: করুণা, ২০১১
— পাঁচকড়ি দে রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: করুণা, ২০১২
— পাঁচকড়ি দে রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: করুণা, ২০১৩
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪২
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবুচোর — অত্যদ্ভুত ডাকাতী রহস্য, কলিকাতা : বসুমতী, ১৩১২ বঙ্গাব্দ
মন্মথনাথ ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ
মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : মুনসী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ
মৃণালকুমার বসু, দারোগার দরবার : উনিশশতকীয় বাংলার পুলিশ ব্যবস্থার দর্পণে , কলকাতা : এবং মুশায়েরা, ২০০৮
যতীন্দ্রনাথ পাল, শয়তান , কলকাতা: শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ
যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রমা , কলকাতা: শেফ ফসিউল্লা সাহেব, ১৯০৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ডিটেক্‌টিভ', গল্পগুচ্ছ , কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
— গীতবিতান (অখণ্ড) , কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০১ বঙ্গাব্দ
রাজশেখর বসু (পরশুরাম), পরশুরাম গল্পসমগ্র, দীপংকর বসু সম্পাদিত, কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৯২, অখণ্ড সংস্করণ
রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, পুলিশ ও লোকরক্ষা, সংকলন ও সম্পাদনা অশোক উপাধ্যায় ও অরিন্দম দাশগুপ্ত, কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
শরচ্চন্দ্র সরকার (সঙ্কলিত), মৃত্যু-রঙ্গিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : দ্য বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৮
— রঘু ডাকাত , কলকাতা : বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি, ১৯০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ [১৩০১ বঙ্গাব্দ]
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সমগ্র (কলকাতা: আনন্দ, ২০০৭ [১৯৯৫])
শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ , কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৯ [১৯০৪]
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য , কলিকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯১
— বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা , কলিকাতা : গাঙচিল, ২০১৪
শিশিরকুমার দাশ (সংকলন ও সম্পাদনা), সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী , কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০১১ [২০০৩]
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভিক্‌টোরিয়া-গীতিমালা অর্থাৎ পদ্যে গ্রথিত হিন্দু-সঙ্গীতানুগত ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলিকাতা : পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৭ / ১৯৩৩ সম্বৎ
সত্যজিৎ রায়, ফেলুদা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫ [১৯৯২]
— ফেলুদা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫ [১৯৯২]
— সোনার কেল্লা, সিনেমা https://youtu.be/aLhF9IemSYU?si=u9cAZfg_ny_BRL50
সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, নাগিনী, কলিকাতা : সিদ্ধেশ্বর প্রেস ডিপজিটরী, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ
সুকুমার রায়, সুকুমার সাহিত্যসমগ্র, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, (সম্পা.) সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু, কলকাতা : আনন্দ, ২০১৬ [১৯৭৩]
সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, কলকাতা : আনন্দ, ২০১২ [১৯৮৮]
— গল্প সংগ্রহ, কলকাতা : আনন্দ, ২০০৯
সুবলচন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা : নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৩৬ [১৯০৬]
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলী বসু (সম্পাদিত), সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান , কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৩ [২০০৮]
সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ , কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৬৩
সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), বাঁকাউল্লার দপ্তর (কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১৩), পৃ. ২০
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, নিউ দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৬
হেমেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ
— হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, কলকাতা : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

Primary Sources and Secondary Literature in English

Anderson, Clare. *Legible Bodies : Race, Criminality and Colonialism in South Asia*, UK : Berg, 2004

Arnold, David. "Crime and Crime Control in Madras, 1858–1947," in Anand A. Yang, ed., *Crime and Criminality in British India* , Ann Arbor: Association for Asian Studies, 1985

— *Police Power and Colonial Rule : Madras 1859-1947* , Delhi : OUP, 1986

— *Science, Technology and Medicine in Colonial India,* UK: Cambridge University Press, 2000

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, *Postcolonial Studies: The Key Concepts*, London & New York : Routledge, 2013 [2000]

Ashley, Bob (ed.). *The Study of Popular Fiction: A Sourcebook*, London : Pinter Publishers, 1989

Auden, W. H. 'The Guilty Vicarage : Notes on the detective story, by an addict', in *Harper's Magazine* (May 1948 Issue). DOI : https://harpers.org/archive/1948/05/the-guilty-vicarage/ 04/09/24, 10:21 PM

Bandyopadhyay, Sekhar. (ed.), *1857: Essays from Economic and Political Weekly,* Hyderabad : Orient Blackswan, Reprinted 2011

Banerjee, Sumanta. *The Wicked City : Crime and Punishment in Colonial Calcutta*, New Delhi : Orient Blackswan, 2009

Barthes, Roland. *Writing Degree Zero*, USA : Hill and Wang, 1970

— *Mythologies*, USA : Hill and Wang, 1973

Baruah, Ved Prakash. *Addicts, Peddlers, Reformers: A Social History of Opium in Assam, 1826–1947*, (PhD thesis) submitted to the Cardiff University, 2016.

Bates, Crispin. "Race, Caste and Tribe in Central India: the early origins of Indian anthropometry", in Robb, Peter (ed.), *The Concept of Race in South Asia* , Delhi: Oxford University Press, 1995

Beavan, Colin. *Fingerprints: The Origins of Crime Detection and the Murder Case that Launched Forensic Science,* New York : Hyperion, 2001

Bengal Police (Bird) Committee 1837-38: Report, appendices and evidence. [Calcutta, 1838], British Library, Asian and African Studies Collection, IOR/V/26/150/1.

Benjamin, Walter. *One Way Street and Other Writings*, Trans. Edmund Jephcott & Kingsley Shorter, London : New Left Books, 1979

Berridge, Virginia and Griffith Edwards, *Opium and the People: Opiate Use in Nineteenth-Century England* , New Haven and London: Yale University Press, 1987[1981]

Bloch, Ernst. "A Philosophical View of the Detective Novel", *Discourse*, Vol. 2, Mass Culture Issue (Summer, 1980)

— *The Utopian Functon of Art and Literature: Selected Essays*, Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 1988

Booth, William. *In Darkest England and the Way Out* , London: The Salvation Army, 2001[1890]. https://www.canonsociaalwerk.eu/1887_ldhreclassering/1890Boothdarkestengland.pdf

Bose, Hem Chandra. *Hints on Finger-prints with a Telegraphic Code for Finger Impressions,* Calcutta & Simla : Thacker, Spink & Co., 1916

Bradford, Richard. *Crime Fiction: A Very Short Introduction,* UK: Oxford University Press, 2015

Braham, Persephone. *Crimes against the State Crimes against Persons : Detective Fiction in Cuba and Mexico*, Minneapolis, London : University of Minnesota Press, 2004

Brantlinger, Patrick. *Rule of Darkness : British Literature and Imperialism, 1830-1914* , Ithaca and London : Cornell University Press, 1990 [1988]

— 'What Is "Sensational" About the "Sensation Novel"?', *Nineteenth-Century Fiction*, Vol. 37, No. 1 (Jun., 1982)
Brown, Mark, "Crime, Governance and the Company Raj: The Discovery of Thuggee", *The British Journal of Criminology*, Vol. 42, No. 1 (Winter, 2002)
Burrow, Merrick. 'Holmes and the History of Detective Fiction' in *The Cambridge companion to Sherlock Holmes*, edited by Janice M. Allan & Christopher Pittard , UK: Cambridge University Press, 2019
Campbell, Mark. *Sherlock Holmes,* UK: Pocket Essentials, 2007
Carpenter, William Benjamin. *Principles of Mental Physiology* , London: Appleton, 1883
Cawelti, John G. *Adventure, Mystery, and Romance : Formula Stories as Art and Popular Culture* , Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977 [1976]
Chakrabarti, Pratik. *Medicine and Empire —1600–1960* , UK: Palgrave Macmillan, 2014
Chatterjee, Partha. *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse*, London : Zed Books, 1993 [1986]
— "The Nationalist Resolution of the Women's Question", in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, eds, *Recasting Women* , New Delhi: Kali for Women, 1989
— *The Black Hole of Empire : History of a Global Practice of Power* , Princeton & Oxford :Princeton University Press, 2012
Chattopadhyay, Basudeb. *Crime and Control in Early Colonial Bengal : 1770-1860*, Calcutta : K P Bagchi & Co., 2000
Chattopadhyay, Gautam. (Ed.), *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century (Selected Documents)* Vol.1, Calcutta: Progressive Publishers,1956
Chaudhuri, Rosinka. *India's First Radicals : Young Bengal and the British Empire* , India : Penguin Random House, 2025
Chekhov, Anton. 'The Swedish Match', 1884. https://www.chekhovshorts.com/stories/014.html
Chesterton, G.K. 'The Blue Cross', *The Innocence of Father Brown*, New York : John Lane, 1911
Chowdhury, Indira, *The Frail Hero and Virile History : Gender and t1e Politics of Culture in Colonial Bengal*, Delhi : OUP, 1998
Christie, Agatha. *Murder on the Orient Express,* USA: Harper, 2011 [1934]
Clarke, Clare. *Late Victorian Crime Fiction in the Shadows of Sherlock* , UK: Palgrave Macmillan, 2014
— *British Detective Fiction 1891–1901: The Successors to Sherlock Holmes,* UK: Palgrave Macmillan, 2020
Cohn, Bernard S. *Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India* , New Jersey: Princeton University Press, 1996
Cole, Simon A. *Suspect Identities : A History of Fingerprinting and Criminal Identification* , Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2002 First Harvard University Press paperback [2001]
Collet, Sophia Dobson. *The Life and Letters of Raja Rammohan Roy*, (Ed.) D. K. Biswas & P. C. Ganguli, Calcutta : Sadharan Brahmo Samaj, 1962 [1900]
Collins, Philip. *Dickens and Crime* , London: Macmillan, 1994 [1962]
Collins, Wilkie. *The Moonstone*, ed. John Sutherland, London : Oxford University Press, 1999
Coope, John. *Doctor Chekhov: A Study in Literature and Medicine* , Chale: Cross Publishing, 1998
Cooter, Roger. *The cultural meaning of popular science: Phrenology and the organization of consent in nineteenth-century Britain*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984
"Criminal Identification: The Bertillon System". https://www.clevelandpolicemuseum.org/historical/criminal-identification-the-bertillion-system/Published 07 A

David, Deirdre. *Rule Britannia: Women, Empire, and Victorian Writing* , Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1995

Davie, Neil. "Mapping the Racial Other: Phrenology, Race and Colonial Discourse in Britain, c. 1810-1850" https://www.researchgate.net/publication/340528400_Mapping_the_Racial_Other_Phrenology_Race_and_Colonial_Discourse_in_Britain_c_1810-1850

Davies, John D. *Phrenology Fad and Science : A 19th-Century American Crusade,* New Haven: Yale University Press, 1955

de Quincey, Thomas. *Confessions of an English Opium-Eater* (Transcribed from the 1886 George Routledge and Sons edition)

Deb Barman, Debayan. *Critical Essays on English and Bengali Detective Fiction* (Lexington Books : Lanham, 2022).

Derks, Hans. *History of the Opium Problem. The Assault on the East, ca. 1600-1950* , Liden & Boston : Brill, 2012

Derrida, Jacques. 'Plato's Pharmacy' in *Dissemination*, Translated with an Introduction and Additional Notes by Barbara Johnson, Chicago: The University of Chicago Press, 1981

Dickens, Charles. 'A Detective Police Party [i]', *Household Words,* Volume I, Magazine No. 18, 27 July 1850. https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/fulllist/special/crimefiction/dickens_a_detective_police_party_i_1850.pdf

Dirks, Nicholas B. *Castes of Mind : Colonialism and the making of Modern India* , Princeton & Oxford : Princeton University Press, 2001

Doyle, Sir Arthur Conan. *A Study in Scarlet,* in *The Complete Sherlock Holmes,* Vol. 1, New York: Barnes & Noble, 2003

—*The Sign of Four* in *The Complete Sherlock Holmes,* Vol. 1, New York: Barnes & Noble, 2003

Drummond, David. *Objections to Phrenology, Being the substance of a series of papers communicated to the Calcutta Phrenological Society, with additional notes* , Calcutta : Printed for the Author & Sold by Samuel Smith & Co. & William Thacker & Co., 1829

Dutt, Romesh Chunder. *The Peasantry of Bengal* , Calcutta : Thacker, Spink & Co. & London : Trübner & Co., 1874

Dyke, C.V. 'Cocaine' in *Substance abuse: Clinical problems and perspectives*, edited by J. Lowinson. & P. Ruia, Baltimore: Williams and Wilkins, 1981

Edney, Matthew H. *Mapping an Empire: The Geographical construction of British India, 1765-1843* , Chicago and London : University of Chicago Press, 1997

Eliot, T. S. 'Wilkie Collins and Dickens' (1927), *Selected Essays,* London : Faber & Faber, 1932

Ellis, Havelock. *The Criminal* , London : Walter Scott, 1890

Emperor v. Sahdeo, Madhya Pradesh High Court Jul 5, 1904 Case No. Criminal Appeal No. 46 of 1904. Judges H.J Stanyon Esq. C.I.E Additional Judicial Commissioner Central Provinces

Emsley, Clive. *Crime, Police, and Penal Policy : European Experiences 1750–1940* , New York : OUP, 2007

Erlenmeyer, Albrecht. 'The morphia habit and its treatment', Journal of Mental Science, 34 (1888-89)

Erlenmeyer, Albrecht. *On the treatment of the Morphine habit* , Michigan, 1889

Evans, Christine Anne. "On the Valuation of Detective fiction : A Study in the Ethics of Consolation", *Journal of Popular Culture*, 28:2, Fall, 1994

Fairbank, John King and Merle Goldman, *China : A New History* , Massachusetts : The Belknap Press, 2006 [2nd. enlarged ed.]

Farooqui, Amar. “Opium as a household remedy in nineteenth-century western India?” in *The Social History of Health and Medicine in Colonial India*, edited by Biswamoy Pati & Mark Harrison , London & New York : Routledge, 2009

Faulds, Henry. *Guide to Finger Print Classification* , Hanley : Wood, Mitchell and Co.,1905.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison,* New York : Vintage Books, 1995 [1977]

Franks, Rachel. “Building a Professional Profile: Charles Dickens and the Rise of the “Detective Force”,” *M/C Journal* 20(2) (2017). https://doi.org/10.5204/mcj.1214

Free, Melissa. ““Dirty Linen”: Legacies of Empire in Wilkie Collins's The Moonstone”, *Texas Studies in Literature and Language*, Vol. 48, No. 4 (Winter 2006)

Freud, Sigmund. *Cocaine papers,* ed. Robert Byck , New York: Stonehill Publishing Company, 1974

— ‘Uber Coca: Freud’s Cocaine Discoveries’ in *Journal of Substance Abuse Treatment*, Vol. I, 1984

Gall, Francis Joseph & Johann Caspar Spurzheim, *Recherches sur le système nerveux en général, et sur celui du cerveau en particulier; mémoire présenté à l'Institut de France, le 14 mars 1808, suivi d'observations sur le rapport qui en a été fait à cette compagnie par ses commissaires* [*Research on the nervous system in general, and on that of the brain in particular; memoir presented to the Institut de France, March 14, 1808, followed by observations on the report made to this company by its commissioners*] (Paris: F. Schoelle et H. Nicolle, 1809)

— *Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier. Tome 1 /* , *avec des observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par la configuration de leurs têtes* [*Anatomy and physiology of the nervous system in general and of the brain in particular. Volume 1 /, with observations on the possibility of recognizing several intellectual and moral dispositions of man and animals by the configuration of their heads*] (Paris: F. Schoelle, 1810)

Galton, Francis. *Fingerprints* , London & New York : Macmillan, 1892

Gerrish, Frederick Henry. “The Hypodermic Administration of Morphine as a Substitute for Hanging in the Execution of Criminals”, *Boston Medical and Surgical Journal,* Vol. 113, No. 12 (1885): 270-271 https://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/NEJM188509171131203

Ghosh, Parimal. *What Happened to the Bhadralok,* New Delhi: Primus Books, 2016

Ginzburg, Carlo. *The Cheese and the Worms : The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller*, Translated by John and Anne C. Tedeschi, Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2013 [1980]

— “Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method”, *History Workshop*, No. 9 (Spring, 1980)

— *Clues, Myths, and the Historical Method* , Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 1989

Giustino, David de. *Conquest of Mind: Phrenology and Victorian Social Thought,* London : Routledge, 2016 [1975]

Gramsci, Antonio. *Selections from the Cultural Writings*, Q. Hore & G. Nowell-Smith (eds. & trans.,) London : Lawrence and Wishart, 1985

Greenword, James. *The Seven Curses of London* , London, 1869

Griffiths, Sir Percival. *To Guard My People: The history of the Indian police ,* London: Ernest Benn Limited & Bombay: Allied Publishers Private Limited, 1972 [1971]

Guha, Ranajit. *A Rule of Property for Bengal : An Essay on the Idea of Permanent Settlement* , Ranikhet: Permanent Black & Orient Blackswn, 2016[1963]

Guyon, Loïc P. ‘In Vidocq’s footsteps — A comparative study of some explicit and implicit references to the adventurer Vidocq in nineteenth-century literature’, *Journal of European Studies*, Vol. 33, No. 2, 145-160 (2003). https://dspace.mic.ul.ie/bitstream/handle/10395/516/Guyon,L.(2003) 'In Vidocq's footsteps.' (Journal Article).pdf?sequence=2&isAllowed=y

Halliday, Stephen. *Newgate: London's Prototype of Hell*, UK: The History Press, 2013
Haycraft, Howard. *Murder for Pleasure* , New York : Dover Publications, 2019 [1941]
Heller, Tamar. *Dead Secrets : Wilkie Collins and the Female Gothic* , USA: Yale University Press, 1992
Henry, E. R. *Classification and Uses of Finger Prints* , London : George Routledge & Son, 1900
Herschel, William J. *The Origin of Finger-Printing* , London : Oxford University Press, 1916
Hobsbawm, E. J. *The Age of Capital, 1848-1878* , Great Britain : Weidenfeld and Nicolson, 1975
— *The Age of Empire 1875-1914* , Great Britain : Weidenfeld and Nicolson, 1987
Hobson, John A. *Imperialism— A Study* (1902) https://www.marxists.org/archive/hobson/1902/imperialism/index.htm
Horowitz, Anthony. *The Word Is Murder* , Great Britain : Century, The Penguin Random House, 2017
Hughes, William. *The Dome of Thought : Phrenology and the nineteenth-century popular imagination* , Manchester: Manchester University Press, 2022
Hunter, W. W. *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. I, Abar To Benares, London : Trübner & Co., 1881
Hunter, W. W. *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. I, Abar To Balásinor , London : Trübner & Co., 1885, Second Edition
Jackson, J. W. *Ethnology and Phrenology as an aid to the Historian* , London: Trübner & Co., 1863) https://www.rct.uk/collection/1090389/ethnology-and-phrenology-as-an-aid-to-the-historian-with-a-memoir-of-the-author
— "The Aryan and the Semite", *The Anthropological Review*, Vol. 7, No. 27 (Oct., 1869)
James, P. D. *Talking about Detective Fiction*, New York : Alfre A. Knopf, 200
JanMohamed, Abdul R. 'The Economy of Manichean Allegory' in *The Post-colonial Studies Reader*, ed. by Bill Ashcroft, et al. , London: Routledge, 2003 [1995]
Jann, Rosemary. 'Sherlock Holmes Codes the Social Body', ELH, Vol. 57, No. 3 (Autumn, 1990)
Kapila, Shruti. "Race Matters: Orientalism and Religion, India and Beyond c.1770–1880", *Modern Asian Studies*, Vol. 41, No. 3 (May, 2007)
Kawana, Sari. *Murder Most Modern : Detective Fiction and Japanese Culture*, Minneapolis & London : University of Minnesota Press, 2008
Kayman, Martin A. *From Bow Street to Baker Street : Mystery, Detection and Narrative* , New York : Palgrave Macmillan, 1992
Kemp, Sandra, Introduction, Wilkie Collins, *The Moonstone,* London : Penguin, 1998
Khan, Miya Mithu. *Confessions of a Constable* , Benaras : E. J. Lazarus & Co., 1875
Klein, Kathleen Gregory. (Ed.), *Diversity and Detective Fiction* , Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press,1999
Klinger, Leslie S. 'The World of Sherlock Holmes', in *The New Annotated Sherlock Holmes,* Vol. 1, New York: W. W. Norton and Company, 2003
Knepper, Paul. "Laughing at Lombroso: Positivism and Criminal Anthropology in Historical Perspective", in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*, (ed.) Ruth Ann Triplett, Chichester: Wiley- Blackwell, 2018
Knight, Stephen. *Crime fiction, 1800–2000 : Detection, Death, Diversity*, New York : Palgrave Macmillan, 2004
Kobritz, Sharon J., *Why Mystery and Detective Fiction was a Natural Outgrowth of the Victorian Period,* University of Maine, 2002. Electronic Theses and Dissertations. 483. https://digitalcommons.library.umaine.edu/etd/483
Kopley, Richard. (Ed.), *Edgar Allan Poe and the Dupin Mysteries,* New York: Palgrave Macmillan, 2008

Lakshmi, Aishwarya. 'The Mutiny Novel : Creating the Domestic Body of the Empire' in *1857: Essays from Economic and Political Weekly*, ed. by Sekhar Bandyopadhyay, Hyderabad : Orient Blackswan, Reprinted 2011

Lal, Vinay. "Criminality and Colonial Anthropology", UCLA Social Sciences, *MANAS*, https://southasia.ucla.edu/history-politics/british-india/criminality-colonial-anthropology/

Lenin, Vladimir Ilyich. *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism* (1917) https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/index.htm

Lombroso, Cesare and Guglielmo Ferrero, Criminal Woman, the Prostitute, and the Normal Woman, Translated and with a new Introduction by Nicole Hahn Rafter and Mary Gibson, Durham and London : Duke University Press, 2004

— *Criminal Man*, translated by Mary Gibson and Nicole Hahn Rafter with assistance from Mark Seymour , Durham: Duke University Press, 2006

MacKenzie, John M. *Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960* , Manchester: Manchester University Press, 1984

Macpherson, C. B. *The Political Theory of Possessive Individualism : Hobbes to Locke*, USA : Oxford University Press, 1964

Maestro, Marcello T. *Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law* , New York : Columbia University Press, 1942

Mandel, Ernest. *Delightful Murder : A social history of the crime story*, Minneapolis : University of Minnesota Press, 1984 Reprint

Manguel, Alberto. *A Reading Diary* , Great Britain : Canongate, 2005

Marx, Karl. 'The Indian Revolt', *New-York Daily Tribune*, September 16, 1857. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/09/16.htm

— *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume I, Translated by Samuel Moore and Edward Aveling, Edited by Frederick Engels, USSR : Progress Publishers, 1887

— *Capital* : *A Critique of Political Economy*, Volume One, Introduced by Ernest Mandel, Translated by Ben Fowkes , London : Penguin, 1982 [1976]

Maxim Gorky. 'Soviet Literature' (1934). https://www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1934/soviet-literature.htm

Maxwell, Richard. *The Mysteries of Paris and London,* Charlottesville and London: University of Virginia, 1992

McClintock, Anne. *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest*, New York : Routledge, 1995

Mehta, Jaya. "English Romance: Indian Violence.", *The Centennial Review*, Vol. 39, No. 3 (Fall 1995)

Mercer, Colin. 'That's Entertainment: The Resilience of Popular Forms' in Bennett Tony ed., *Popular Culture and Social Relations*, Milton Keynes : Open University Press, 1986

Miller, D. A. *The Novel and the Police* , Berkeley: University of California Press, 1988

Mitchell, Timothy, 'Orientalism and the exhibitionary order' in *Colonialism and Culture* edited by Nicholas B. Dirks , Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995 [1992]

Mitchell, Leslie. "Dickens and Government Ineptitude Abroad, 1854–1865" in *A companion to Charles Dickens*, edited by David Paroissien , USA: Blackwell Publishing, 2008

Moktefi, Amirouche & Francine F. Abeles (Ed.), 'What the Tortoise Said to Achilles' - Lewis Carroll's Paradox of Inference (special issue), *The Carrollian*, No. 28, Double Issue , November 2016

Moore, Grace. *Dickens and Empire : Discourses of Class, Race and Colonialism in the Works of Charles Dickens* , London & New York : Routledge, 2004
Moretti, Franco. *Signs Taken for Wonders: Essays in the Sociology of Literary Forms,* New York: Verso, 1988
Moss, Alan and Keith Skinner, *The Victorian Detective* , Great Britain: Shire Publications, 2013
Mukherjee, Upamanyu Pablo. *Crime and Empire : The Colony in Nineteenth-Century Fictions of Crime* , Oxford: Oxford University press, 2003
Mukherjee, Uponita. *Colonial Detection: Crime, Evidence, and Inquiry in British India, 1790-1910,* Unpublished PhD thesis in Columbia University, 2022
Nayder, Lillian. *Unequal partners : Charles Dickens, Wilkie Collins, and Victorian authorship* , New York: Cornell University Press, 2010 [2002]
Nigam, Sanjay. "Disciplining and policing the 'criminals by birth', Part 2: The development of a disciplinary system, 1871-1900", *Indian Economic Social History Review*, 1990 27: 3
Nigam, Sanjay. "Disciplining and policing the 'criminals by birth', Part 1: The making of a colonial stereotype— The criminal tribes and castes of North India", *Indian Economic Social History Review*, 1990 27: 2
Nightingale, Florence. *Suggestions for Thought*, Collected works of Florence Nightingale ; V. 11, Ed. Lynn McDonald, Canada : Wilfrid Laurier University Press, 2008
"On the Life, Character, Opinions, and Cerebral Development, of Rajah Rammohun Roy", *Phrenological Journal* (No. XL, 1832-1834)
Opie, Robert. *Rule Britannia: Trading on the British Image,* London:Viking, 1985
Orr, Stanley. "Postmodernism, "Noir", and "The Usual Suspects"", Literature/Film Quarterly, 1999, Vol. 27, No. 1 (1999) https://www.jstor.org/stable/43797759
Orsini, Francesca. *Print and Pleasure : Popular Literature and Entertaining Fictions in Colonial North India* , Ranikhet : Permanent Black, 2017 [2009]
Pande, Ishita. *Medicine, Race and Liberalism in British Bengal : Symptoms of empire* , London & New York : Routledge, 2010
Paterson, George Murray. "On the phrenology of Hindostan", *Transactions of the Phrenological Society*, 1824
—. *Letters*, https://cpparchives.org/repositories/2/resources/965
Pati, Biswamoy and Mark Harrison (Ed.), *The Social History of Health and Medicine in Colonial India* , London & New York : Routledge, 2009
Pati, Biswamoy. (ed.), *The Great Rebellion of 1857 in India: Exploring transgressions, contests and diversities* , London & New York : Routledge, 2010
Peters, Catherine. *The King of Inventors : A Life of Wilkie Collins* , New Jersey : Princeton University Press, 1991
Piccato, Pablo. *A History of Infamy: Crime, Truth, and Justice in Mexico* , California: University of California Press, 2017
Poincaré, Jules Henri. https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/dreyfus/dreyfusenglish.pdf
Poirot Obituary: https://www.nytimes.com/1975/08/06/archives/hercule-poirot-is-dead-famed-belgian-detective-hercule-poirot-the.html
Poovey, Mary. "Ambiguity and Historicism: Interpreting "Confessions of a Thug"" in *Narrative*, Vol. 12, No. 1 (Jan., 2004)
Poskett, James. *Materials of the Mind: Phrenology, Race, and the Global History of Science, 1815-1920*, Chicago & London: University of Chicago Press, 2019

Priestman, Martin. *Crime Fiction from Poe to the Present* , Plymouth: Northcote House, 1997
Pykett, Lyn. *The Nineteenth-Century Sensation Novel* , United Kingdom : Northcote House Publishers Ltd, Revised and expanded second edition 2011 [1994]
Raman, Bhavani. *Document Raj: Writing and Scribes in Early Colonial South India* , Chicago & London : The University of Chicago Press, 2012
Ramsay, H.M. *Detective Footprints, Bengal, 1874-1881: With Bearings for a Future Course,* London : Army and Navy Co-operative Society, 1882
Ramsay, H.M. *Anthropometry in Bengal: Or, Identification of Criminals by Anthropometric Measurement and Thumb Impressions,* Calcutta : Thacker, Spink & Co., 1889
Reed, John R., "English Imperialism and the Unacknowledged Crime of The Moonstone", *Clio: An Interdisciplinary Journal* (June,1973)
Reid, R. *Every Man His Own Detective!,* Calcutta : W. Newman & Co., 1887
Reitz, Caroline. *Detecting the Nation : Fictions of Detection and the Imperial Venture* , Columbus : The Ohio State University Press, 2004
Richards, Thomas. *The Commodity Culture of Victorian England: Advertising and Spectacle, 1851-1914* , California: Stanford University Press, 1990
Richards, Thomas, The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire , London : Verso, 1993
Richards, John F. "Opium and the British Indian Empire: The Royal Commission of 1895", *Modern Asian Studies*, Vol. 36, No. 2 (May, 2002). URL: https://www.jstor.org/stable/3876660
Riffenburgh, Beau. *Pinkerton's Great Detective : The Amazing Life and Times of James McParland* , New York : Viking, 2013
Roginski, Alexandra. *The Hanged Man and the Body Thief: Finding Lives in a Museum Mystery*, Australia : Monash University Publishing, 2015
Roth, Marty. *Foul and Fair Play: Reading Genre in Classic Detective Fiction*, Athens: University of Georgia Press,1995
Roy, Ashish. "The Fabulous Imperialist Semiotic of Wilkie Collin's The Moonstone", *New Literary History*, Vol. 24, No. 3, *Textual Interrelations* (Summer, 1993)
Roy, Pinaki. *The Manichean Investigators: A Postcolonial and Cultural Rereading of the Sherlock Holmes and Byomkesh Bakshi Stories*, New Delhi : Sarup & Sons, 2008
Roy, Shampa. *Gender and Criminality in Bangla Crime Narratives : Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries,* United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017
Roy, Shampa. *True Crime Writings in Colonial India : Offending Bodies and Darogas in Nineteenth-Century Bengal*, London & New York : Routledge, 2021
Rowson, Jonathan. *The Moves That Matter : A Chess Grandmaster on the Game of Life* , UK : Bloomsbury, 2019
Russo, Mary. *The Female Grotesque: Risk, Excess, and Modernity* , New York: Routledge, 1995
Rzepka, Charles J. *Detective Fiction* , UK: Polity Press, 2008 [2005]
Said, Edward W. 'Yeats and Decolonization' in *Nationalism, Colonialism and Literature,* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990
Said, Edward W. *Culture and Imperialism* , New York : Vintage, 1994 [1993]
Saito, Satoru. *Detective Fiction and the Rise of the Japanese Novel, 1880–1930*, Cambridge, Massachusetts & London : Harvard University Press, 2012

Samet, Elizabeth Dale. ""When Constabulary Duty's To Be Done": Dickens and the Metropolitan Police", *Dickens Studies Annual*, Vol. 27 (1998)

Sandberg, Eric. *Studying Crime in Fiction: An Introduction* , New York & London: Routledge, 2024

Sen, Ranjit. 'Social Banditry in Bengal 1757-1857' in *A Comprehensive History of Modern Bengal 1700–1950*, Vol. I, edited by Sabyasachi Bhattacharya, Delhi: Primus Books, 2020

Sengoopta, Chandak. *Imprint of the Raj: How fingerprinting was born in colonial India* , London: Macmillan. 2003

Shpayer-Makov, Haia. *The Ascent of the Detective : Police Sleuths in Victorian and Edwardian England* , New York : OUP, 2007

Silver, Mark. *Purloined letters : Cultural borrowing and Japanese crime literature, 1868–1937,* Honolulu : University of Hawai'i Press, 2008

Singha, Radhika. "'Providential' Circumstances: The Thuggee Campaign of the 1830s and Legal Innovation", *Modern Asian Studies*, Vol. 27, No. 1, Special Issue: *How Social, Political and Cultural Information Is Collected, Defined, Used and Analyzed* (Feb., 1993)

Singha, Radhika. *A Despotism of Law: Crime and Justice in Early Colonial India*, Delhi: Oxford University Press, 1998

Singha, Radhika. "Punished by Surveillance: Policing 'dangerousness' in colonial India, 1872–1918", *Modern Asian Studies*, Vol. 49, No. 2 (March, 2015)

Sinha, Mrinalini *Colonial masculinity : The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century*, Manchester : Manchester University Press, 1995

Sleeman, William H. *Ramaseeana, or a Vocabulary of a Peculiar Language used by the Thugs, With an Introduction and Appendix Descriptive of the System Pursued by that Fraternity ad of the Measures which have been adopted by the Supreme Government of India for its suppression* , Calcutta : O. H. Huttmann, Military Orphan Press, 1836

Sleeman, William H. *The Thugs or Phansigars of India: comprising a history of the rise and progress of that extraordinary fraternity of assassins; and a description of the system which it pursues, and of the measures which have been adopted by the supreme government of India for its suppression*, Vol. 1, Philadelphia: Carey and Hart, 1839

Sodhi, G. S. and Jasjeet Kaur, "The forgotten Indian pioneers of fingerprint science", *Current Science*, Vol. 88, No. 1 (10 January 2005)

Spry, Henry Harpur. "Some Account of the Gang-murderers of Central India, commonly called Thugs; Accompanying the Skulls of Seven of Them", *The Phrenological Journal and Miscellany*, Vol. III, December 1832 - June 1834

Staum, Martin S. *Labeling People: French Scholars on Society, Race, and Empire, 1815–1848* , Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press, 2003

Stokes, Eric. *The English Utilitarians and India,* Great Britain : Oxford Clarendon Press, 1963 [1959]

Storr, Anthony. 'Review', *Journal Of The Royal Society Of Medicine*, Volume 91, (March, 1998 থেকে। https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/014107689809100321

Suleri, Sara. *The Rhetoric of English India* , Chicago : University of Chicago Press, 1992

Symons, Julian. *Bloody Murder — From the Detective Story to the Crime Novel : A History*, London : Faber & Faber, 1972

Taylor, Captain Meadows. *Confessions of A Thug,* London: Richard Bently, 1839

"The Children of Charles & Catherine Dickens: 4", https://victorianweb.org/authors/dickens/family/child4.html

Taylor, Philip Meadows. *The Story of My Life*, Ed. by "his daughter" , Edinburgh: William Blackwell & Sons, 1878 [1877]
Taylor, Philip Meadows. *The Letters of Philip Meadows Taylor to Henry Reeve*, Sir Patrick Cadell (ed.) , Oxford: Oxford University Press, 1947
Thomas, Ronald R. "Minding the Body Politic: the Romance of Science and the Revision of History in Victorian Detective Fiction", *Victorian Literature and Culture* 19 (1991)
Thomas, Ronald R. "The Fingerprint of the Foreigner: Colonizing the Criminal Body in 1890s Detective Fiction and Criminal Anthropology", *ELH*, Vol. 61, No. 3 (Autumn, 1994)
Thomas, Ronald R. *Detective Fiction and the Rise of Forensic Science* , UK: Cambridge University Press, 2003 [1999]
Thompson, Jon. *Fiction, Crime, and Empire : Clues to Modernity and Postmodernism* , Urbana and Chicago : University of Illinois Press, 1993
Thompson, Courtney E. *An Organ of Murder: Crime, Violence, and Phrenology in Nineteenth-Century America*, New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press, 2021
Thoms, Peter. 'Poe's Dupin and the power of detection', in *The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe* edited by Kevin J. Hayes , UK: Cambridge University Press, 2004
Tomlinson, Stephen. *Head Masters : Phrenology, Secular Education, and Nineteenth-Century Social Thought* , Tuscaloosa : The University of Alabama Press, 2005
Tolen, Rachel J. "Colonizing and Transforming the Criminal Tribesman: The Salvation Army in British India," in Jennifer Terry and Jacqueline Urla, eds., *Deviant Bodies: Critical Perspectives on Difference in Science and Popular Culture* , Bloomington: Indiana University Press, 1995
Todorov, Tzvetan. 'The Typology of Detective Fiction' (1966), in Chris Greer (Ed.) *Crime and media: a Reader*, UK: Routledge, 2010
Trautmann, Thomas R. *Aryans and British India* , Berkeley and Los Angeles and London : University of California Press, 1997
Tredoux, Gavan. "Henry Faulds: The Invention of a Fingerprinter", December, 2003, https://galton.org/fingerprints/faulds.htm
Trodd, Anthea. 'Introduction' to *The Moonstone* , New York: Oxford University Press, 1991
Unger, Matthew P., Jean-Philippe Crete, George Pavlich, "Criminal Entryways in the Writing of Cesare Beccaria", in *The Handbook of the History and Philosophy of Criminology*, (ed.) Ruth Ann Triplett Chichester: Wiley-Blackwell, 2018
Viswanathan, Gauri. *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India* , New York : Columbia University Press, 2015 [1989]
Wagner, Kim A. "Confessions of a Skull: Phrenology and Colonial Knowledge in Early Nineteenth-Century India", *History Workshop Journal*, No. 69 (Spring, 2010)
Wagner, Kim A. *The Skull of Alum Bheg : The Life and Death of a Rebel of 1857,* Oxford: Oxford University Press, 2017
Walsh, Anthony A. "George Combe: A portrait of a heretofore generally unknown behaviorist", *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, Volume 7, Issue 3, 1971
Walsh, Anthony A. "Phrenology and The Boston Medical Community in the 1830s", *Bulletin of the History of Medicine*, Vol. 50, No. 2 (Summer, 1976)
Wei, Yan. *Detecting Chinese Modernities : Rupture and Continuity in Modern Chinese Detective Fiction, 1896–1949*, Leiden & Boston : Brill, 2020

Welsh, Alexander. *Strong Representations: Narrative and Circumstantial Evidence in England* , Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992
Wilkinson, Stephen. *Detective Fiction in Cuban Society and Culture*, Bern : Peter Lang, 2006
Wills, William Henry. "The Modern Science of Thief-Taking." in *Household Words* 1.16 (1850)
Wilson, Edmund. "Why do people read Detective Stories?" (October 14, 1944),
"Who cares who killed Roger Ackroyd?" (January 20, 1945). http://www.crazyoik.co.uk/workshop/edmund_wilson_on_crime_fiction.htm
Wyhe, John van. *Phrenology and the Origins of Victorian Scientific Naturalism*, London & New York : Rout ledge, 2016 [2004]
Zimmerman, Brett. "Phrenology", in Kevin J. Hayes (Ed.) *Edgar Allan Poe in Context*, New York : Cambridge University Press, 2013